বাগদাদের ঈগল

মাছুম বিল্লাহ্

বাগদাদের ঈগল

মাছুম বিল্লাহ

প্রকাশনায়

মাদানী লাইব্রেরী

ইসলামী টাওয়ার

১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মার্চ ২০০৩, ইরাকের রাজধানী বাগদাদ।

আধুনিকতার অপরূপ সাজে সজ্জিত এ মহানগরীর অধিবাসীদের মাঝে এক অজানা উদ্বেগ পরিলক্ষিত হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে উপসাগরীয় অঞ্চলে ঈঙ্গ-মার্কিন যৌথ বাহিনীর ব্যাপক কর্ম তৎপরতা এবং মার্কিন রণতরী মোতায়েন থেকেই মূলত তাদের এ উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। হয়তো অল্প ক'দিনের মধ্যেই এখানে এমন এক ঘটনার জন্ম নিবে, যা সমগ্র বিশ্ববাসীকে স্তম্ভিত করে দিবে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, জাতিসংঘের অনুমোদনেরও অপেক্ষা করা হবে না এজন্য। তাই দেশী-বিদেশী সাংবাদিকরা পরিস্থিতির উপর সার্বক্ষণিক সতর্ক দৃষ্টি রাখছেন। সালমান এই বিদশেী সাংবাদিকদের একজন। সে বাগদাদ এসেছে দিন পনের আগে।

মার্কিনীরা বিশ্ববাসীকে বোকা বানাতে এবং ইরাকীদের ধোকা দিতে, তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য গোপন রেখে, একদল অনুগত ও মদদপুষ্ট সংবাদ কর্মীর দ্বারা দেদারছে অপপ্রচার চালাচ্ছে। এরা যেন বুশ নামক হিটলারের এক একজন প্রপাগান্ডা মন্ত্রী 'গোয়েবলস'। এতদসত্ত্বেও দু'একজন সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিক মাঝেমধ্যেই তাদের এমন সব গোপন তথ্যও পরিকল্পনা বিশ্ববাসীর সম্মুখে ফাঁস করে দিচ্ছে, যাতে তাদেরকে বেশ বেকায়দায়ই পড়তে হচ্ছে। সালমান এদের মধ্যে অন্যতম।

গভীর রাত। হোটেল প্যালেস্টাইনের ১০৫ নম্বর রুম। আশপাশের রুমের বাতি যদিও বন্ধ, তবু এ রুমের বাতি জ্বলছে এখনও। আধার রাতের নিস্তব্ধতায় সমগ্র বাগদাদ নগরী সুপ্ত থাকলেও এ রুমের নিশাচর মানুষটি কর্মচাঞ্চল্যে এখনও দীপ্ত। টেবিলে রাখা কয়েকটি কাগজেই তার মনযোগ সীমাবদ্ধ। দু'আঙ্গুলের ফাঁকে ধরা চায়নার তৈরী দামী কলমটি মাঝে মাঝেই সচল হয়ে উঠছে। কখনও চলছে অতিদ্রুত আবার কখনও বা একটু শ্লথ গতিতে। আবার কিছুক্ষন নিচ্ছে সামান্য বিশ্রাম। আর এরই মাঝে তৈরী হচ্ছে তথ্যবহুল গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিবেদন। লেখা শেষ, এ মুহূর্তে শেষবারের মত প্রতিবেদনটি একবার দেখতে শুরু করল সালমান। হঠাৎ দরজা খোলার শব্দে তার চমক ভাংলো। সম্মুখে দেখল তিনজন লোক। সে বিস্মিত হল। যদিও এরা অপরিচিত নয়, তবুও এত রাতে তাদের আগমন সালমানকে অবাক করল। তদুপরি আগন্তুক ত্রয়ের দুজনই মেয়ে, তৃতীয়জন পুরুষ; তবে সে গুরুত্বপূর্ণ কেউ নয়-হোটেল বয়। মেয়েরা তাকে সাথে নিয়ে এসেছে।

হাসি মুখে অভিবাদন জানাল মেয়েরা। সালমান কোন উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "এত রাতে আমার রুমে আসার হেতু কি? তোমাদের জালায় তো আমি অস্থির হয়ে পরেছি।"

"হেতু তো অবশই আছে'–বলল মেয়েদের একজন–'তা জনাব সালমান সাহেব এত রাত জেগে কি করছেন, তাই একটু দেখতে এলাম আরকি! এতে অস্থির হবার কি আছে?"

সালমান দরজা লক না করে বসার জন্য নিজেকে মনে মনে ধিক্কার দিল। একটু ভুলের জন্য এখন কত বড় এক আপদ এসে উপস্থিত। তার উপর মেয়েটির উত্তরে খুব রাগ হলো তার; তবু নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলল, "মিস ব্রিসী এবং মিস গ্লোরিয়া! আমি কি করছি তা জানার জন্য এত রাতে এখানে আসার কোন প্রয়োজন ছিল না; ফোনে জিজ্ঞেস করলেই পারতে। তোমরা যেহেতু সাংবাদিক, সেহেতু তোমাদের ভালোভাবেই জানা আছে, একজন সাংবাদিক রাত জেগে কি করে থাকে।" কণ্ঠে তার রাগও শ্লেষ মিশ্রিত।

"এত রাত জেগে যখন প্রতিবেদন তৈরী করছেন, নিশ্চয়ই তবে এটা গুরুত্বপূর্ণ কোন প্রতিবেদন হবে–দ্বিতীয় মেয়ে যার নাম ব্রিসী লোপস, সালমানের রাগের পরেও সে হাসি মুখে বলল–অনুগ্রহপূর্বক একটু দেখাবেন কি ওটা আমাদের? দেখলে আমরাও হয়তো মূল্যবান প্রতিবেদন লিখা শিখতাম।"

সালমান মেয়ে দুটোকে ভালোভাবেই চেনে এরা কারা; অবশ্য ওদের একজন 'গ্লোরিয়া'ই তাকে বলেছিল তাদের আসল পরিচয়। কিন্তু তাদের কাছে এমন এক ভয়ঙ্কর মারণাস্ত্র আছে যা প্রয়োগ করলে মারাত্মক বিপর্যয় ঘটবে। তাই আর এক মুহূর্তও সালমান এদেরকে রুমের ভিতর দেখতে রাজি নয়। পরিচিত না হলে এতক্ষণে ঘার ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া যেত। একটু ভেবে সে নিজেই বেরিয়ে গিয়ে হোটেলের নিরাপত্তা রক্ষীদের ডেকে আনল। দূরে থাকতে তাদের দেখেই মেয়ে দুটো নিঃশব্দে কেটে পড়ল; যেন আগেই তারা প্রস্তুত ছিল।

সালমান একেবারে হাফ ছেড়ে বাঁচল। দরজা লক করে, এসিটা অন করে টান টান হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল সে সাথে সাথে। কিন্তু শুলে কি হবে! ঘুম তার হারিয়ে গেছে। তার নাগাল পাচ্ছে না সে। হরেক রকম চিন্তা তারিয়ে ফিরছে তাকে। কোন সিদ্ধান্তে পৌছতে পারছেনা সে। বড় সিরিয়াস মেয়ে এরা! যেদিন থেকে এই হোটেলে উঠেছে সেদিন থেকেই এরা তার পিছু লেগেছে। পরিচয় দিয়েছিল সাংবাদিক হিসেবে। আসলে তারা সাংবাদিক ছিল না। বরং তারা এ হোটেলেই অবস্থানরত দু'মার্কিন সাংবাদিকের বিনোদন কর্মী। সালমানের পিছনে তাদের লাগানো হয়েছে গোয়েন্দা হিসেবে। কিন্তু এ কাজে যে তারা অপটু তা তাদের আজকের আচরণও প্রমাণ করল। কেননা কোনো সাংবাদিক অন্য সাংবাদিককে একথা জিজ্ঞেস করেনা যে, "তুমি এত রাত..." কিংবা "প্রতিবেদনটি আমাদের দেখালে..." তবু তারা যেহেতু সাংবাদিক পরিচয় দিয়েছে, তাই সেও তাদের সাংবাদিক হিসেবেই সম্বোধন করে থাকে। সে তারা যাই হোক, তাদের যে বিষয়টা সবচেয়ে স্পর্শকাতর, তাহলো নজর কাঁড়া ভুবন মোহিনী রূপ এবং পাগল করা উদ্ভিন্ন যৌবন। তাছাড়া তাদের পোষাক এবং আচরণও এত অসংলগ্ন যে, যেকোন

আদর্শবান পুরুষও মুহূর্তে দিওয়ানা হতে বাধ্য। এজন্যই খৃষ্টানরা সালমানকে এই নারী অস্ত্র প্রয়োগ করে তাদের দলে ভিড়াতে চাচ্ছে। কিন্তু তারা জানেনা, সালমান সে ধরনের যুবক নয়; উপরন্তু সেই তাদের একটি মেয়েকে হাত করে নিয়েছে।

দুই মেয়ের মধ্যে প্রথম মেয়ে। নাম গ্লোরিয়া মারিয়া। অত্যাধিক রূপসী। তারচেয়ে বেশী আবেগ প্রবণ। সালমানকে রূপের জালে আটকাতে গিয়ে নিজেই কাবু হয়েছে তার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের কাছে। অবশেষে নিজের পরিচয় লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সবই বলে দিয়েছিল সে তার কাছে।

সালমান তাকে তার পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'শোন গ্লোরিয়া! তুমি একজন অতিশয় রূপসী মেয়ে তাতে কোন সন্দেহ নেই! কিন্তু নিজেকে তুমি যত রূপসীই ভাবনা কেন, তোমার ঐ রূপে কোন জৌলুস নেই-নেই কোন আকর্ষণ! তোমার ঐ রূপ কামুক পুরুষদের কামোত্তেজনা বাড়াতে পারলেও কারো মনে তোমার প্রতি ভালবাসার সৃষ্টি করবে না। ওদের কাছে তুমি একটি সুদর্শন খেলনা মাত্র; খেলা শেষে যা ছুড়ে ফেলে দেয়া হয়। আর আমার মত যাদের অন্তরে সামান্য ঈমানও আছে তাদের কাছে তুমি আপাদমস্তক একটি পাপের মূর্তি। তোমার জাতি আমাদের ঈমানকে ধ্বংস করার জন্য তোমাদের মত সুন্দরী মেয়েদের ব্যবহার করছে। কিন্তু মনে রেখ, আমার ঈমানকে অত সহজে কিনতে পারবে না।

সালমানের কথার কোন প্রতি উত্তর করলনা গ্লোরিয়া। তার দু'চোখ বেয়ে টপ্ টপ্ করে অশ্রু ঝড়তে লাগল। এ মুহূর্তে তার মনে পড়ল বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই বয় ফ্রেন্ডের কথা। যার সাথে তার প্রেম ছিল। বিবাহের কথাও পাকাপাকি হয়েছিল। কিন্তু ছেলেটি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করায় সে বিয়ে ভেঙ্গে যায়। সেই ছেলেটির বিরহেই মূলত তার এই অন্ধকার জগতে আসা। ইরাক আসার পাঁচদিন পূর্বে নিউইয়র্কের এক পার্টিতে যখন তার সেই পুরানো প্রেমিকের সাথে সাক্ষাত হয়েছিল তখন সেও তাকে অন্ধকার জগতে থেকে ফিরে আসতে প্রায় অনুরূপ কথা বলেছিল, যা এইমাত্র সালমান বলল। তার মুখের অভিব্যক্তিই যেন ফুটে উঠেছে সালমানের মুখে। তাই সে আবেগের অতিসয্যে সালমানের হাতটি ধরে চুমু খেলো। অতঃপর বিস্তারিত ঘটনা খুলে বলল তাকে। অবশেষে সে এই অভিমত ব্যক্ত করল যে, তার প্রেমিক যে ধর্ম গ্রহণ করেছে, সে ধর্ম বা তার অনুসারীদের কোন ক্ষতি সে করবে না; উপরন্তু যতটুকু পারে তাদের উপকার করবে। সালমানকে গোপন তথ্য সংগ্রহ করে দিবে সে তার সাধ্যমত।

সালমান ভাবছে গ্লোরিয়ার এই সহযোগিতা সত্ত্বেও এই হোটেলে থাকাটা এখন মুশকিল হয়ে পড়েছে। কেননা মেয়ে দু'টো রাত-দিন যেভাবে আনাগোনা করছে, তাতে যেকোন সময় কোন আপত্তিকর ঘটনা ঘটে যেতে পারে। যদিও গ্লোরিয়া তাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে, তদুপরি তার অর্ধ উলঙ্গ হাটু। খোলামেলা সোনালী চুল। প্রায় দুই তৃতীয়াংশ নগ্ন বুক। বডি স্পেয়ারের কড়া সুগন্ধী মাঝে মাঝেই তাকে কেমন অন্যমনস্ক করে

তোলে। ব্রিসী তো একেবারেই বেহায়া। রুমে আসলে প্রায় সময়ই সে তার গা ঘেষে বসে পরে। এমতাবস্থায় হোটেল ছেড়ে দেয়াই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু পারছে না, একে তো গ্লোরিয়ার মাধ্যমে মার্কিন সাংবাদিকদের থেকে তাদের বাহিনীর গোপন সংবাদ প্রাপ্তির পথ বন্ধ হয়ে যাওয়া; দ্বিতীয়ত এই হোটেলের ন্যায় এত সুযোগ সুবিধাপূর্ণ হোটেল বাগদাদে দ্বিতীয়টি আছে কিনা তাও তার অজানা। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এ হোটেলে গেষ্টদের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় সব সুযোগ-সুবিধা যেমন, সরাসরি আন্তর্জাতিক ডায়ালিংয়ের সুযোগ, রুম সংলগ্ন ছোট্ট কিচেন, সংযুক্ত বাথরুম, রেফ্রিজারেটর, ভয়েস মেইল, ভিডিও টেপ, ফ্যাক্স-কপিয়ার-প্রিন্টার, মাইক্রো ওয়েব ওভেন ব্যবহারের সুযোগ, বিনামূল্যে দৈনিক পত্রিকা সরবরাহ, লোকাল ফোন কল ও অন্যান্য। আর এ জন্যেই বিদেশী সাংবাদিকরা হোটেল প্যালেস্টাইনকে নিজেদের নির্ভরযোগ্য ও নিরাপদ আস্তানা ভেবে থাকে। তাই সেও এর বিকল্প ভাবার সুযোগ পাচ্ছে না।

অনেক ভাবনা-চিন্তার পরও কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে না পারায় এবং চোখে ঘুমও না আসায়, সালমান বিছানা থেকে উঠে বাতি জালালো। উদ্দেশ্য প্রতিবেদনটি পুনরায় পড়া; যাতে কোন অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হলে এখনই সেড়ে নেয়া যায়। কেননা প্রতিবেদনটির ব্যাপারে তার এতটুকু আত্মবিশ্বাস আছে যে, এটি প্রকাশিত হলে আমেরিকার ইরাক আক্রমণ কম করে হলেও অন্তত ছয় মাস পিছিয়ে যাবে, আর এ ফাঁকে ইরাক তার বাহিনীকে আরো কিছু কঠিন বিষয় অনুশীলন করানোর সুযোগ পাবে। কিন্তু প্রতিবেদনটি কই? টেবিলের উপরই তো রেখে ছিল ওটা! হঠাৎ তার মনে পড়ল গ্লোরিয়ার কথা, সে আগেই তাকে বলেছিল যে, 'ব্রিসী বার বার আসে শুধু আপনার সংগৃহীত সংবাদ চুরি করতে।' সুতরাং আজ সে সেই তার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদনটি চুরি করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই তখনই সে গ্লোরিয়ার কাছে ফোন করল। ফোন ধরল ব্রিসী, বলল, 'মিঃ সালমান সাহেব! গ্লোরিয়া আর কখনো আপনার ফোন ধরবে না এবং গোপনে আপনার সাথে মিলিত হয়ে স্বজাতি বিরোধী কর্মকান্ডেও লিপ্ত হবে না। সে আজ ভোরের ফ্লাইটে বাগদাদ ছাড়ছে। তার পরবর্তী কর্মস্থল কুয়েত।'

'গ্লোরিয়াকে একবার ফোনটা দিন মিস ব্রিসী!'

'সে এখন আমাদের হাতে বন্দী। আর বন্দীকে ফোন করতে দেয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।' রুক্ষ্ন কণ্ঠে বলল ব্রিসী এবং সাথে সাথে ফোন রেখে দিল।

সালমান ভীষণ দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছে। সে বুঝে ফেলল তার গোপন তথ্য সংগ্রহের পথটি বন্ধ হয়ে গেল। পাশাপাশি মার্কিন সাংবাদিকদের কাছে তার উক্ত প্রতিবেদন পৌঁছে যাওয়া মানে নিজের ছোড়া গুলি নিজের গায়ে লাগা। সুতরাং এখন আর হোটেল ছেড়ে চলে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। একবার ভাবল ইরাকী প্রশাসনের সহায়তা নিবে। কিন্তু পরক্ষণেই সে চিন্তা দূর করে দিল এইভেবে যে, এ মুহূর্তে তাদের দেশ-জাতির অস্তিত্বই বিপন্ন। অবশেষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিল অন্যত্র চলে যাওয়ার।

* * *

সালমান কোরেশী। পাকিস্তানী একটি জনপ্রিয় দৈনিকের সাংবাদিক। ইরাকে মার্কিনীদের কর্মতৎপরতার রিপোর্ট তৈরী করতে তার বাগদাদে আগমন। অতিশয় উদ্দমী, আত্মপ্রত্যয়ী, দারুন সাহসী, ধৈর্য্যশীল পরোপকারী, অত্যন্ত কর্মনিষ্ঠ এবং অকল্পনীয় জাতীয় চেতনাধারী উদার মনের যুবক এই সালমান কোরেশী। বয়স ২৫ পেরিয়ে ২৬ এর ঘর ছুঁই ছুঁই করছে। মহান সৃষ্টিকর্তা এই ছেলেটিকে অনুপম দেহাবয়বে সৃষ্টি করেছেন। গায়ের রং উজ্জ্বল ফর্সা। পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় গোলগাল চেহারা। এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। শুধু শারীরিক সৌন্দর্যই নয়, সে সাথে আত্মিক সৌন্দর্যও পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হয়েছে ছেলেটির মধ্যে। সুন্দর-কমনীয় মুখাবয়বে ঈমানের দ্যুতি ঝলমল করে সর্বদা। এছাড়াও তার উন্নত চরিত্র, বিনয়-নম্রতা এবং মিষ্টি মধুর আচরণ অতি সহজেই সবার মন আকৃষ্ট করে তুলে।

পাশ্চাত্য অপসাংস্কৃতি যে মুহূর্তে আমাদের (মুসলমানদের) যুব মানষে নগ্ন যৌন অশ্লীলতার বিষবাষ্প ঢুকিয়ে দিয়ে নৈতিক মূল্যবোধ প্রায় নিঃশেষ করে দিয়েছে, সে মুহূর্তে সালমান নিজেকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে, কলুষিত এই আবহাওয়া থেকে সযত্নে দূরে সরিয়ে রেখেছে। উপরন্ত ধ্বংসের এই বিষাক্ত ভাইরাস থেকে জাতির প্রহরী তরুণ সমাজকে রক্ষা করতে আপ্রাণ চেষ্টাও চালাচ্ছে। বলা চলে এই ময়দানেও সে একজন লড়াকু সৈনিক। শিক্ষা-দীক্ষায়ও সে কারো থেকে পিছিয়ে নেই। তুখোর মেধার অধিকারী এই অধ্যবসায়ী যুবক জেনারেল শিক্ষায় উচ্চতর ডিগ্রী হাসিলের পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষায়ও সমান পারদর্শী। উপরন্তু সে পবিত্র কালামে হাকীম, আল-কুরআনুল কারীমকে সযত্নে আপন বক্ষে ধারণ করেছে হিফজ-এর মাধ্যমে। মোটকথা বর্তমান চারিত্রিক অবক্ষয়ের নাজুক সময়ে সালমানের মত ছেলে হাজারে একটা মেলা কঠিন ব্যাপার।

সালমানের ইরাক আগমন সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত; এজন্য কেউ তাকে বাধ্য করেনি কিংবা উৎসাহিতও করেনি। বরং পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তাকে এতবড় কঠিন ঝুঁকি নিতে নিষেধ পর্যন্ত করেছিল। কিন্তু তার যুক্তি ছিল এই–"বাস্তবিকভাবেই যদি ইরাকে যুদ্ধ শুরু হয়, তবে আমরা (ইরাকের বাইরের মানুষরা) বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ জানতে পারব না। কেননা বর্তমান দুনিয়ার মিডিয়াসমূহ ইহুদী-খৃষ্টান সেই দানবীয় শক্তির নিয়ন্ত্রণে, যারা একটা বাস্তব সত্যকে মিথ্যা এবং একটা নির্জলা মিথ্যাকে সত্য আখ্যা দিয়ে প্রচারণ চালায়। ইরাক যুদ্ধটা যেহেতু হবে তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট, সেহেতু কখনই তারা সঠিক সংবাদ প্রচার করবে না। এর প্রমাণ আমরা আফগান যুদ্ধেও পেয়েছিলাম। অতএব আমার স্থির সিদ্ধান্ত, আমি অবশ্যই ইরাক যাব। যাতে হাজারো মিথ্যার জাল ছিন্ন করে কিঞ্চিৎ হলেও সত্য সংবাদ বিশ্ববাসীকে জানাতে পারি।' তার এই বজ্র কঠিন সংকল্প, পত্রিকা কর্তৃপক্ষের অনুমতি আদায়ে সহায়ক হয়েছিল। তাঁরা তাকে ইরাকে আসার সকল ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। পরেরদিনই সে ইরাকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিল।

ইরাক এসে সালমান উঠেছিল বাগদাদের বিখ্যাত ও প্রসিদ্ধ প্যালেস্টাইন হোটেলে। কেননা অধিকাংশ বিদেশী সাংবাদিক এখানে অবস্থান করে থাকেন। এর কারণ উপরে উল্লেখিত হয়েছে। বলা চলে এ হোটেলটি বিদেশী সাংবাদিকদের জন্যই বরাদ্ধ। এখানে থেকে সে বেশ স্বাচ্ছন্দেই কাজ করতেছিল। কিন্তু বিপত্তি দেখা দেয় তার তৈরী সেই প্রতিবেদনটি মার্কিন সাংবাদিকদের হস্তগত হওয়ার পর যেটি সেদিন রাতে ব্রিসী লোপস তার রুম থেকে চুরি করে নিয়েছিল। এ ঘটনার পরে সে যখন অন্য হোটেলে চলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, ঠিক সে সময় দুজন ব্রিটিশ ও মার্কিন সাংবাদিক এসে তাকে সাবধান করে দিয়ে গেল এই বলে যে, সে যেন ভবিষ্যতে এরকম কাজ করার চেষ্টা কখনো না করে এবং এই মুহূর্তে হোটেল ছেড়ে পারলে ইরাক ছেড়ে চলে যায়, নতুবা তাকে অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে; যা খোদ ইরাক সরকারের পক্ষেও সামাল দেয়া সম্ভব হবেনা। তাদের এ ধরনের উস্কানিমূলক কথায় সালমান কোনরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত না করে নিরবে হোটেল ছেড়ে চলে এলো।

সালমানের নীরবতার কারণ হলো, তার মতে এদের সাথে বাকবিতন্ডা করা মানে ক্ষ্যাপা কুকুরের লেজে আগুন দেয়া। তার হোটেল ছাড়ায় যদি সমস্যার সমাধান হয়, তবে আর সমস্যা বাড়িয়ে লাভ কি? তাই সে অন্য হোটেলে উঠল। এটিও বাগদাদের এক বিখ্যাত হোটেল। সালমান দেখল এই হোটেলের ভবন, আয়তন এবং আনুষঙ্গিক সবকিছু অন্যান্য ফাইভস্টার হোটেল এমনকি প্যালেস্টাইন হোটেলের তুলনায় অধিক বিস্তৃত প্রশস্ত এবং আরামদায়ক। এই হোটেলের খরচও অন্যান্য হোটেলের তুলনায় একটু বেশী। কিন্তু স্বাধীনভাবে কাজ করার জন্য সে এই বাড়তি খরচটুকু নির্দ্বিধায় মেনে নিল। কেননা তার ভাল করেই জানা আছে, "কিছু পেতে হলে, কিছু দিতে হয়।"

* * *

সালমান নতুন হোটেলে উঠেছে আজ ১২ দিন। ২৭শে মার্চ সকাল ১০টা। বাগদাদের রাস্তা দিয়ে দ্রুত গতিতে হাটছে সালমান। কাঁধে ঝুলান মাঝারি ধরনের একটি সাইডব্যাগ। ডান হাতে ধরা একটি ক্যামেরা। চোখে খয়েরি রংয়ের সানগ্লাস। হাটার গতিতে মনে হচ্ছে, হয়তো কেউ ধাওয়া করছে তাকে। এক জায়গায় হোচট খেয়ে সানগ্লাসটি পরে গেল; ক্যামেরা ছিটকে গেল তারও আগে। কিন্তু ওগুলো কুড়িয়ে নেয়ার মত সময় তার হাতে নেই। উঠে হাটার গতি আরও বাড়িয়ে দিল। কিছুদূর যেয়ে বামে মোড় নিতেই তার চলৎ শক্তি যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। সমস্ত শিরা-উপশিরার রক্ত চলাচল যেন বন্ধ হয়ে গেল। সেই কালো রংয়ের গাড়িটাই তো এদিকে ধেয়ে আসছে। কয়েক সেকেন্ড সে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। অতঃপর ডানের রাস্তা ধরে দৌড়াতে লাগল। পিছনে তাকিয়ে দেখল গাড়ি নেই; লাপাত্তা। কিন্তু সে তার দৌড় চালু রাখল সমান গতিতে; যেন দৌড়ের প্রতিযোগিতা করছে সে।

সালমান ছোটবেলা থেকেই দৌড়ে খুব পটু। বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালীন বার্ষিক ক্রিড়া অনুষ্ঠানে প্রত্যেকবার সে প্রথম পুরস্কার নিতো দৌড়ে জিতে। এজন্য তাকে তার বন্ধুরা

খেতাব দিয়েছিল 'RUN BOY' নামে। কিন্তু আজ আর সে পারল না। হেরে গেল নিয়তির কাছে। আনুমানিক ২/৩ মিনিট দৌড়ানোর পর তার চেতনা লোপ পাওয়ার উপক্রম হলো। সে দেখলো, ধাওয়াকারী কালো গাড়িটি দক্ষিণ দিকের সরু এক গলি থেকে বেড়িয়ে তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। সহসা গাড়ি থেকে বেড়িয়ে এল চার মুখোশধারী। তাদের অগ্নেয়াস্ত্র দেখে প্রথমে একটু ঘাবরে গেল সে; কিন্তু তাদেরকে তা বুঝতে না দিয়ে সে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে নিল। ইতিমধ্যে দু'মুখোশধারী ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। সে তাদের আক্রমণ প্রতিহত করে পাল্টা আঘাত হানল। অপর দু'মুখোশধারীও যোগ দিল তাদের সঙ্গীদের সাথে। এবার চারজনের সাথে লড়ছে সে একা।

আক্রমণকারীরা সাথে অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও হাতাহাতি লড়াই কেন করল? এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেছে পরবর্তীতে। আর এটাই ছিল সালমানের জন্য প্লাস পয়েন্ট। কেননা, খালি হাতে দশ-বিশজনের সাথে লড়ার মত দক্ষতা তার আছে। আর এ দক্ষতা সে অর্জন করেছিল স্কুলে পড়াকালীন সময়েই। সে কৌশলী লড়াইয়ের মাধ্যমে একজনকে যতদূতের হাতে সোপর্দ করতে সক্ষম হলো। আক্রমণকারীরা এজন্য গুলি ছুড়ছিল না যে, জায়গাটা ছিল একটি ক্যাম্পের নিকটে। গোলাগুলির শব্দ শুনে রিপাবলিকান গার্ডের সদস্যরা যদি এসে পরে, তবে তাদের মার্কিন দালালী ধরা পরে যাবে। আর তাই সালমানকে তারা নিঃশব্দে হত্যা করতে চাচ্ছে। কিন্তু তার হাতেই বরং নিজেদের একজনকে খুন হতে দেখে, তারা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। যত ক্ষিপ্তই হোক সালমানের সাথে তারা কিছুতেই পেরে উঠছে না। ইতিমধ্যে তার সংহারী আক্রমণে আরেকজন মুখোশধারী ধরাশয়ী হল। সে এক পার্শ্বে পরে যন্ত্রণায় কাৎরাচ্ছে।

সালমান এবার বাকী দু'জনের সাথে লড়ছে। এক পর্যায়ে দু'জনই জান নিয়ে পালাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। কিন্তু সে সুযোগ তারা পেয়ে উঠছে না। এমন মুহূর্তে ঘটলো বিপত্তি। একটি পাথরের সাথে ঘা লেগে সালমানের বাম পাটি উল্টে গেল। বসে পড়ল সে। আর যায় কোথায়! মুখোশধারীরা যেন এক মহাসুযোগ পেল! বলা চলে এমন একটি মুহূর্তের অপেক্ষাই করছিল তারা! সুতরাং সুযোগটিকে তারা হাত ছাড়া করল না। তাদের একজন ক্লাশিনকভের বাট দিয়ে আঘাত হানল সালমানের মাথায়; অপরজন হানল হাতে। মাথা ফেটে, হাত ভেঙ্গে নিস্তেজ হয়ে শুয়ে পড়ল সে মাটির উপর। তাকে এ অবস্থায় রেখেই পালিয়ে গেল মুখোশধারীরা। তাদের ধারণা, প্রাণ বায়ু বের হয়ে গেছে তার। কিন্তু আল্লাহ্ যাকে বাঁচান তাকে মারে সাধ্য কার?

এর কিছুক্ষণ পরই এই রাস্তা দিয়ে ইরাকী সৈন্যদের একটি টহল ইউনিট যাচ্ছিল। সাথে একজন মেজরও আছেন। মেজর সাহেব বসা ছিলেন গাড়ির সামনের ছিটে; ড্রাইভারের পাশে। তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টি ঘুরে ফিরছে চারিদিকে। হঠাৎ তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল আহত সালমান। অকুস্থলে এসে ড্রাইভার তার নির্দেশ মোতাবেক গাড়ি থামাল।

সৈনিকদের বললেন লোকটিকে গাড়িতে উঠাতে। অতঃপর তাকে নিয়ে পৌঁছে গেলেন বাগদাদের আল-কিনদী হাসপাতালে। সেখানে রোগীকে রেখে মেজর সাহেব চলে গেলেন ডিউটিতে; হাতে তার সময় কম।

দীর্ঘ প্রায় ৭ ঘণ্টা পর বিকাল পাঁচটার দিকে সালমানের জ্ঞান ফিরলো। চোখ মেলে নিজেকে নরম বিছানায় শায়িত দেখে আশ্চার্য হলো। আশপাশে অপরিচিত লোকজন দেখে এক প্রকার চেঁচিয়ে উঠল, 'আমাকে এখানে এনেছ কেন? আমি তো তোমাদের কোন ক্ষতি করিনি! আমার ব্যাগ-ক্যামেরা কোথায়?' সে ভেবেছিল মার্কিন দালালেরা বুঝি তাকে এখানে নিয়ে এসেছে। তাই সে শোয়া থেকে উঠে বসল এবং একই কথা পুনরাবৃত্তি করল। ডাক্তাররা তাকে পুনরায় শুইয়ে দিলেন এবং বললেন, 'আমরা আপনাকে এখানে আনিনি; এনেছেন মেজর জেনারেল আসাদুল্লাহ সাহেব। এটা হাসপাতাল। আমরা এখানকার ডাক্তার। আপনার হুশ ফেরার ব্যাপারে আমরা পেরেশান ছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ! আপনার হুশ ফিরেছে? । কিন্তু আপনার ক্যামেরা এবং ব্যাগের ব্যাপারে আমরা কিছুই...' ডাক্তার তার কথা শেষ করতে পারলেন না এরই মধ্যে কক্ষে প্রবেশ করল আপদমস্তক কালো বোরকাবৃতা একটি যুবতী মেয়ে। ঢুকেই সে বলল, 'আমি জানি আপনার ব্যাগ এবং ক্যামেরা কোথায়?' সকলে উৎসুক হয়ে তাকাল মেয়েটির দিকে।

'ওগুলো আমার হেফাযতে আছে মিঃ সালমান–বলে চললো মেয়েটি–ঘাতকরা আপনাকে ধাওয়া করার পূর্বেই আমি আপনার অনুস্মরণ করছিলাম। যে সময় কালো রংয়ের গাড়িটি দেখে আপনি দৌড়ে পালাচ্ছিলেন, সে সময় আপনাকে আমি সাহায্য করতে চেয়েছিলাম কিন্তু মেয়ে মানুষ বলে সে সাহস করতে পারিনি। অতঃপর যখন ওরা আপনার কাছে হেরে, আপনাকে আহত করে ওদের আহত-নিহত দু'সঙ্গীকে নিয়ে পালিয়ে গেল, তখন আমি আপনাকে উদ্ধার করার জন্য কাছে গেলাম। আপনি ছিলেন অচেতন। আমি আপনাকে আমার গাড়ীতে তোলার চেষ্টা করি। কিন্তু একা বলে ব্যর্থ হই। অবশেষে কোন সাহায্যকারীর আশায় এদিকে-ওদিকে খোঁজ নিতে লাগলাম। পেয়েও গেলাম। কিন্তু এসে দেখি সেনাসদস্যরা আপনাকে নিয়ে চলে যাচ্ছে। আমি তাদের গাড়ির পিছু নেই। যখন দেখলাম তারা হাসপাতালের দিকে যাচ্ছে, তখন আশ্বস্ত হয়ে ফিরে যাই। আপনি চাইলে আপনার সেবা করার জন্য আমি এখানে থেকে যেতে পারি অথবা যদি হোটেলে যেতে চান, সেখানেও আমি আপনার সেবা করতে প্রস্তুত আছি।'

মেয়েটির বক্তব্য শুনে উপহাসের হাসি হাসল সালমান। বলল, 'মিস ব্রিসী! তোমার নাটকটি চমৎকার মঞ্চায়ন হয়েছে। আর এজন্য যে পোষাকটি তুমি নির্বাচন করেছো সেটাও বড় যুৎসই হয়েছে।' একটু থেমে সে আরও বলল, 'তুমি একথা বলছো না কেন যে, ঘাতকরা তোমাদেরই নিয়োজিত লোক ছিল। আমাকে আহত করার পর তুমি পর্যবেক্ষণ করতে গিয়েছিলে আমাকে উদ্ধার করতে নয়, বরং মৃত্যু হল কিনা তা নিশ্চিত হতে। যখন দেখলে হইনি, তখন তাদেরকে পুণরায় ডেকে এনেছিলে। কিন্তু এসে

দেখলে শিকার হাতছাড়া হয়ে গেছে; তাই সেনা জীপের পিছু নিয়েছিলে শিকার কোথায় নিয়ে যাচ্ছ তা দেখতে। আর এখন এসেছে সেবার নাম করে শিকারকে নিজেদের করায়াত্তে নিয়ে নিতে এবং চূড়ান্ত সেবা দিয়ে চিরনিদ্রায় শায়িত করাতে, না? বিস্ময়কর তোমার কৌশল মিস ব্রিসী লোপস!'

সালমানের মন্তব্যে মেয়েটি ভরকে গেল। উত্তর কি দেবে ভেবে পাচ্ছে না। সহসা সে নতুন কৌশলের আশ্রয় নিল। 'আমি কোন অভিনয় করিনি মিঃ সালমান সাহেব!' অত্যন্ত বিনয় বিগলিত ভঙ্গিতে বলল মেয়েটি, 'ঘাতকদের কাউকে আমি চিনিনা। আমি শুধু একটি কথা বলার জন্য আপনার পিছু নিয়েছিলাম কিন্তু এখন আপনি অসুস্থ তাই সেবা করার আগ্রহ প্রকাশ করেছি, এটা যদি আমার অন্যায় হয়ে থাকে, তবে আমাকে তার শাস্তি দিন।'

'অন্তর্জামীই ভালো জানেন তোমার উদ্দেশ্য কি ছিল'– বলল সালমান– 'আচ্ছা বলতো শুনি, কি কথা বলার জন্য তুমি আমার পিছু নিয়েছিলে, আবার এখানেও এসেছো?'

'আপনি অবশ্যই আমার সহকর্মী গ্লোরিয়া মারিয়াকে ভুলে যাননি'– বলল বিস্রী লোপস–'তাকে এখান থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল আপনারই জন্য। যেদিন সে কুয়েতের উদ্দেশ্যে ইরাক ত্যাগ করে, সেদিন আমার হাত ধরে সে একটি অনুরোধ করেছিল যে, আমি যেন (যেভাবে হোক) আপনাকে তার বর্তমান কর্মস্থলের ঠিকানাটি পৌঁছে দেই। তখন থেকেই আপনাকে আমি খুঁজতে থাকি। আজ সকালে আমি যখন ক্যাফে হাউসে নাস্তা করছিলাম, তখন আপনি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, তাই আমি আপনার পিছু নিয়েছিলাম।' এই বলে খামে মোড়ানো ঠিকানাটি সে সালমানের হাতে দিল।

সালমান খামটি হাতে নিয়ে বলল, 'মিস ব্রিসী! তোমার কথা যদি সত্যি হয় এবং তুমি যদি কোন দুরভিসন্ধি ছাড়াই আমার সেবা করার আগ্রহ প্রকাশ করে থাকো, তাহলে তুমি আমার ব্যাগ ও ক্যামেরা ফেরত দাও, তবেই আমি তোমার সকল কথা বিশ্বাস করবো এবং বুঝবো যে, প্রতারণা নয় সত্যি সত্যি তুমি আমার উপকার করতে চাচ্ছ!'

'আচ্ছা, আমি আপনার সব কিছু এনে দেবো' –বলল ব্রিসী– 'কিন্তু আমাকে আপনার নিশ্চয়তা দিতে হবে যে, আপনি আমার সাথে যাবেন এবং আমাকে আপনার সেবা করার সুযোগ দিয়ে কৃতার্থ করবেন; যাতে আমি গ্লোরিয়ার কাছে গৌরব করে তা বলতে পারি! বলুন আমার শর্ত মানবেন কিনা?'

মেয়েটির শর্ত শুনে সালমান বেশ কিছু সময় মৌনতা পালন করল। সে ভাবতে লাগল, 'মেয়েটি আমার সেবা করার জন্য এভাবে উঠে পরে লাগার পিছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ আছে! যাকে সেদিন গ্লোরিয়াকে ফোন দিতে বলায় ক্ষেপে গিয়েছিল, আজ কিনা সে আমার সেবা করে গ্লোরিয়াকে খুশী করতে ব্যধিব্যস্ত। 'শিয়াল যদি মুরগী ছানার নিরাপত্তার দাযিত্ব নিতে চায় তাহলে ব্যাপারটি কি ভাবা যায়?' তাই সে ব্রিসীকে লক্ষ্য করে বলল, 'তুমি আমার জিনিষগুলো আগে ফেরত দাও, তারপর ভেবে দেখবো তোমার সাথে যাব কি যাব না।' একথা শুনে ব্রিসী লোপস তৎক্ষণাৎ হাসপাতাল থেকে বের হয়ে গেল।

* * *

২৮ মার্চ সকাল ৭টা। আল-কিনদী হাসপাতালে গেট পেড়িয়ে বেরুলো একটি নেভী ব্লু কালারের পাজারো জীপ। গাড়ির আরোহী দু'জন-মেজর জেনারেল আসাদুল্লাহ সাহেব ও আহত বিদেশী সাংবাদিক সালমান কোরেশী। গাড়িটি মধ্যম গতিতে এগিয়ে চলছে তার গন্তব্য পানে। মেজর সাহেব সালমানকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'বেটা! এবার বলতো, ওরা কারা এবং তোমাকে অপহরণ করতে চাচ্ছিল কেন? আর তুমি এভাবে আহতই বা হলে কি করে?'

ব্রিসী লোপস হাসপাতাল থেকে চলে যাওয়ার পর পুনরায় আবার এসেছিল রাত দু'টার দিকে। তবে একা নয়, সাথে আরো তিনজন। সে সালমানের জিনিসপত্র তো আনেইনি বরং এসেছে তাকে অপহরণ করার কুমতলবে। কিন্তু ডাক্তাদের সাহসী পদক্ষেপ এবং সতর্ক প্রহরার কারণে তারা সফল হতে পারেনি। অবশ্য যে কোন সময় তাকে তুলে নিবে বলে হুমকি দিয়ে গেছে। সে কারণে মেজর সাহেব ফজরের নামায পড়ে হাসপাতাল আসলে, ডাক্তারগণ দ্রুত রোগীকে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন তাকে।

ডাক্তারদের পরামর্শানুযায়ী কালবিলম্ব না করে মেজর সাহেব সালমানকে নিয়ে হাসপাতাল থেকে বেড়িয়ে আসেন। অতঃপর তিনি সালমানকে তার আহত হওয়া এবং অপহরণ প্রচেষ্টা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে, সালমান নিজের পরিচয়, ইরাক এসে ফিলিস্তিন হোটেলে অবস্থান, অতঃপর সেখানে তার বিরুদ্ধে মার্কিন ও ইহুদী সাংবাদিকদের ষড়যন্ত্র, এর ফলে হোটেল পরিবর্তন এবং সর্বশেষ গতকাল সকালে মার্কিনীদের লেলিয়ে দেয়া সন্ত্রাসী কর্তৃক আক্রান্ত হওয়া, হাসপাতালে ব্রিসী লোপসের ধোকা দিয়ে অপহরণ প্রচেষ্টা, সবিস্তারে বলল সে মেজর সাহেবের কাছে। বলল তার জীবনের নিরাপত্তাহীনতার কথাও।

সব শুনে মেজর সাহেব বললেন, 'বেটা! আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত যাকে হেফাযত করেন, দুনিয়ার এমন কোন শক্তি নেই তাকে মারতে পারে। তুমি নিরাপত্তার কথা ভাবছ? আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তুমি এমন নিরাপদময় স্থান পেয়ে যাবে, যেখানে মার্কিনীদের দালাল কিংবা সৈন্য দূরে থাক স্বয়ং তাদের গুরু 'বুশ' এলেও তোমাকে খুঁজে পাবেনা। তোমার নিরাপত্তার দায়িত্ব আমি নিলাম; তুমি নিশ্চিন্ত থাক।'

মেজর সাহেবের কথা শুনে সালমান ভাবনায় পরে গেল যে, গোটা ইরাক জুড়ে এখন যুদ্ধের লেলিহান আগুন ছড়িয়ে পড়েছে, এমতাবস্থায় মেজর সাহেব এমন নিরাপদ স্থান এখানে কোথায় পাবেন! মনে সংশয় জাগলেও মেজর সাহেবকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা সমীচীন মনে করলো না সে। বরং তাঁর কথার উপর আস্থা স্থাপন করে চুপচাপ বসে রইল। মন তার বিষণ্ণতায় আচ্ছন্ন। কেননা, যে কাজের জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই সুদূর ইরাক আসা, সে কাজই যদি না করা যায়, তবে আর নিরাপদ স্থান পেয়েই কি লাভ।

সালমানকে বিষণ্ণভাবে বসে থাকতে দেখে মেজর সাহেব প্রশ্ন করলেন, 'বেটা! তুমি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ইরাক আসলে কেন? যুদ্ধের সংবাদ সংগ্রহের জন্য এখানে

সাংবাদিকের কি কোন কমতি আছে? তুমি তো পাকিস্তান বসেই ইন্টারনেট ওয়েব সাইডের মাধ্যমে সকল সংবাদ জানতে ও পত্রিকায় ছাপাতে পারতে!'

'তা পারতাম বৈকি–বলল সালমান–'কিন্তু আপনি লক্ষ্য করলে দেখবেন, বর্তমান বিশ্বের তথ্য-প্রবাহের উপর মুসলমানদের নিয়ন্ত্রণ নেই বললেই চলে। সাংবাদিকতার অঙ্গনে ধর্মহীন গোষ্ঠীর একচ্ছত্র আধিপত্য বিদ্যমান। ইহুদী প্রোটোকলের গোপন পরিকল্পনা মোতাবেক ইহুদীদের দালালেরা সাংবাদিকতার উপর নিজেদের থাবা বসানোর জন্য পূর্ণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ কাজে তারা কোন প্রকার বাঁধার সম্মুখীন হয়নি। টেলিভিশন, রেডিও, পত্রিকা ম্যাগাজিন, নভেল, উপন্যাস, ডিস এন্টেনা, ইন্টারনেট সর্বত্র আপনি ইহুদীদের বিষ সুস্পষ্ট দেখতে পাবেন। সুতরাং একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, বর্তমান যুগের মিডিয়া এবং বর্তমান যুগের সাংবাদিকতা ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক ভয়ঙ্কর উদ্যোগ।' একটু থেমে আবার সে বলতে লাগল–'এ কারণে প্রিন্টেড ও ইলেকট্রনিক উভয় মিডিয়ায় মুসলমানদের কোন সংবাদ সঠিকভাবে প্রকাশ করা হয় না। মুসলমানদের সংবাদগুলি হয়তো অতিরঞ্জিত করে, নয়তো একেবারে নিঃশেষ করে প্রচার করে থাকে। তাই আমাদের পাকিস্তানের কিছু গণ্যমান্য ও শীর্ষস্থানীয় ধর্মীয় নেতৃবর্গ সাংবাদিকার প্রচলিত নীতিমালা থেকে বেড়িয়ে এসে সততা, নিষ্ঠা এবং জবাবদিহিতামূলক সাংবাদিকতা চালু করার এক সুমহান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সামনে রেখে একটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকা চালু করেছেন। এই পত্রিকার সাথে জড়িত সাংবাদিকবৃন্দ একান্ত এখলাছের সাথে সত্য সংবাদ পরিবেশনে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। আমি উক্ত পত্রিকারই একজন ক্ষুদ্র সাংবাদিক। ইরাকের উদ্ভূত পরিস্থিতির বাস্তব সম্মত মূল্যায়ন এবং সঠিক সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই আমার বাগদাদ আগমন...'

ড্রাইভার একটি বাড়ির গেটে গাড়ি থামালে সালমানের কথা বলা থেমে যায়। মেজর সাহবে গাড়ি থেকে নামতে নামতে বললেন, 'আল্লাহ্ পাক তোমার মহৎ উদ্দেশ্য এবং নেক নিয়্যাতের উত্তম বদলা দান করুন! এবার এসো বেটা! আমরা গন্তব্যে এসে গেছি।' বলে তিনি তাকে ধরে গাড়ি থেকে নামালেন।

উভয়ে ঘরের দরজার সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালেন। অতঃপর মেজর সাহেব দরজায় নক করলে; খানিক বাদে দরজা খুলল তাঁর ষোড়শী কন্যা। সহসা যুবতীর অতুলনীয় রূপ-সুষমা সালমানের দৃষ্টিগোচর হল। সেকি ভুবন মোহিনী সাকারা! অমন সৌন্দর্যে কার না নজর কাঁড়ে! মেয়েটির পড়নে আরবীয় কাটিংয়ের সেলোয়ার কামিজ। ওড়নী দিয়ে মাথাটা নিখুঁতভাবে জড়ানো; কিন্তু মুখটি একেবারে খোলা। তাতে মনে হচ্ছে, যেন ঘনমেঘের চাঁদর ছিন্ন করে পূর্ণিমা শশী নীল আকাশে তার স্বগৌরব উপস্থিতি জানান দিচ্ছে বিরতিহীনভাবে।

বসন্তের সদ্যফোটা গোলাপ কলির ন্যায় ফুটন্ত এই আরব ললনার অপরূপ মুখাবয়বখানি দর্শনে বিমোহিত সালমান। সে ভাবছে মানুষ কি এত সুন্দর হতে পারে।

তবে একবারের বেশী সে মেয়েটির দিকে তাকায়নি। কেননা, সে জানে এতে তার অনেক গুনাহ হবে।

মেজর আসাদুল্লাহ সাহেবের একমাত্র কন্যা রুকাইয়া। গায়ের রবং একেবারে দুধে-আলতা। ঠোঁট দু'টি যেন প্রস্ফুটিত গোলাপ পাঁপড়ি। সুডৌল গন্ডদ্বয়ের মধ্যখানে উন্নত নাসিকা। পটলচেড়া আখিযুগলের উপর কাজল কালো সরু দু'টি ভ্রূ। সব মিলিয়ে মেয়েটির পুরো চেহারায় বিরাজ করছে এক অপার্থিব মায়াবী সৌন্দর্য শোভা। এতটা হৃদয়গ্রাহী, এতটা দৃষ্টিনন্দন-মনভুলানো রূপসী মেয়ে সালমান ইতিপূর্বে কখনো দেখেনি। মেয়েটিকে দেখে তার মনে হচ্ছে–হয়তো জান্নাতের কোন হুর-পরী ভুলক্রমে ধরায় নেমে এসেছিল, আর মেজর সাহেব তাকে পেয়ে কন্যা হিসেবে আপন আলয়ে ঠাঁই দিয়েছেন।

দরজা খুলে পিতার সাথে একজন অপরিচিত লোক দেখে মেয়েটি লজ্জা পেয়ে ভিতরে চলে গেল। মেজর সাহেব সালমানকেসহ ঘরে ঢুকলেন। অতঃপর সামনের বারান্দায় সোফার উপর তাকে বসিয়ে রেখে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে বলে তিনি ভিতর বাড়িতে চলে গেলেন।

সালমান সোফার একটু কুশন হাতের নিচে রেখে আধো শোয়া হয়ে বিশ্রাম নিতে লাগল। মেজর সাহেবের এই বারান্দাটি অত্যন্ত পরিপাটি করে সাজানো গোছানে। পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার ছাপ সুস্পষ্ট। সুবিশাল রিডিং টেবিলের উপর সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো ছোট-বড় প্রচুর বই। পাশেই একটি রঙ্গিন ডালায় সদ্য ফোটা লাল-সাদা বেশ কিছু গোলাপ ফুল সাজিয়ে রাখা; যার সুবাশে কক্ষটি মাতোয়ারা। ফুলগুলি দেখে সালমান মনে মনে স্বগোতুক্তি করল, 'হে জালিম আমিরিকা! তুমি ইরাকের গ্রাম-শহরে শত শত টন বোমা মেরে তাদের ধ্বংস-নিশ্চিহ্ন করতে চাচ্ছ। আর এই দেখ! ইরাকীরা জীবনের কঠিনতম মুহূর্তেও ফুলের সুবাস ছড়িয়ে প্রকৃতিকে শান্তি ও নিরাপত্তায় ভরে দিতে চাচ্ছে।'

সালমান আরও লক্ষ্য করল, টেবিলের উপর দিকের দেয়ালে সাটানো ইরাকী মানচিত্র এবং জাতীয় পতাকাটি। পতাকাটি দেখে তার চোখে পানি এসে গেল। কেননা, এর ভিতর লেখা 'আল্লাহু আকবার' অর্থাৎ আল্লাহ্ বড়, এই তাওহীদ বাণী আজ ভুলুণ্ঠিত হওয়ার পথে। তার বিশ্বাস, যদি ইরাক সত্যি সত্যি আমেরিকার দখলে চলে যায়, তাহলে তারা এই পবিত্র পতাকাটিকে অবশ্যই পদদলিত করবে এবং মানচিত্রটিকে খাবলে ছিড়ে খাবে।

সালমান বসে বসে মানচিত্রটি নিগুরভাবে দেখছে আর ভাবছে ইরাকের সোনালী দিনের সেইসব গৌরবময় ইতিহাসের কথা। যখন হযরত সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) বাহ্যতঃ সম্বলহীন অবস্থায়, জীর্ণ পোশাক এবং ধারবিহীন তরবারী হাতে এখানে এসে পৌছেন। তখন প্রথমে সম্রাট তাঁদেরকে গুরুত্বহীন প্রতিপক্ষ মনে করে এড়িয়ে যায়। কিন্তু 'কাদেসিয়ার' বিপদজনক যুদ্ধ কিসরার মেরুদন্ড চূর্ণ করে দেয়। তারা মাদায়েন নরগীতে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে, তারা মনে করত যে, তাদের অজেয় দূর্গ এবং তার সম্মুখে প্রবাহিত দজলা নদী মুসলমানদের আক্রমণ থেকে তাদেরকে রক্ষা করবে। কিন্তু আল্লাহর

সে সকল বান্ধা পৃথিবীর বুকে আল্লাহ্‌র নাম সমুন্নত করার লক্ষ্যে বের হয়েছেন, কোন সাগর বা কোন পর্বত তাদের অভিযানের পথ রোধ করতে সক্ষম নয়। পরিশেষে মাদায়েনের সেই অজেয় নগরী থেকে কিসরার দাপট ও প্রতাপের পতাকা এমনভাবে ভূলুণ্ঠিত হলো যে, সেখানে আর কোনদিন তা উড্ডীন হতে পারেনি। সে দিনের পর থেকে আজ পর্যন্ত এই শহর তথা এই দেশ মুসলমানদের কর্তৃত্বাধীন রয়েছে। আড়াই হাজার বছরের সেই কিসরা সম্রাটের রাজধানী মাদায়েন মুসলমানগণ অধিকার করিলেন। কিন্তু আজ! আজ মুসলমানদের সেই শহর, সেই দেশ দখল করে নিতে চলেছে সভ্যতার মুখোশ পড়া পথভ্রষ্ট, অভিশপ্ত এবং চিহ্নিত সন্ত্রাসী ইহুদী-খৃষ্টান অক্ষশক্তি।

এসব ভাবতে ভাবতে সালমান অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। ঠিক তখন মেজর সাহেবের হাতের পরশে তার মোহ ভাংলো। মেজর সাহেব তার হাতটি ধরে ঘরের দিকে হাটা দিলেন। সালমান যদিও একাই হাটতে পারে তবুও কিছুটা অসুবিধা হয় বিধায় তিনি তাকে ধরে নিচ্ছেন। তারা যখন হলরুম অতিক্রম করছিল, তখন সালমান অনুমান করল, তাদের পিছনে হয়তো কেউ আসছে। হাটা অবস্থায়ই সে ঘার ফিরিয়ে পিছনে তাকালে, দেখল অন্য কেউ নয়, মেজরের সেই সুন্দরী কন্যা। হাতে তার কি একটি ভারী জিনিস।

মেজর সাহেব ঘরের দু'তিনটি কক্ষ পেরিয়ে সালমানকে এমন একটি কক্ষে আনলেন যেখান থেকে সম্মুখে যাওয়ার কোন উপায় নেই। সালমান ভাবল এখানেই মনে হয় তার বিশ্রামের আয়োজন করা হবে। সে এতটুকু হেটেই বেশ ক্লান্তি অনুভব করছিল। কিন্তু তাকে অবাক করে দিল মেজর কন্যা রুকাইয়া। সে ডানপার্শ্বের দেয়ালে অবস্থিত বৈদ্যুতিক সুইসের বোর্ড থেকে একটি সবুজ সুইস অন করতেই ঘটল অভাবনীয় এক অদ্ভুত কান্ড। অভূতপূর্ব এ বিস্ময়কর দৃশ্য দেখে সালমান রীতিমত চমকে গেল। চোখ যেন ছানাবড়া। সে দেখল তার সম্মুখে সদর্পে দাঁড়িয়ে থাকা দেয়ালটির একাংশ মুহূর্তের মধ্যে নিচের দিকে মাটির মধ্যে দেবে গেল। সালমান বিস্ফারিত নয়নে সেদিকে তাকিয়ে রইল। বিস্ময়ের ঘোরে সে কিছু জিজ্ঞেস করার অবকাশও পেল না।

এবার রুকাইয়া সামনে চলছে আর মেজর সাহেব সালমানকে নিয়ে তার অনুস্মরণ করছেন। কিছু সামনে গিয়েই দেখা গেল ছোট একটি রুম। আকারে অতি জোর একটা টয়লেটের সমান হবে হয়তো। সালমান মনে মনে ভাবল, 'এখানেই কি আমাকে রাখবে এরা!' রুকাইয়া চাবি দিয়ে রুমের তালাটি খুলল। 'আরে এত আসলেই একটি টয়লেট!' সালমান ভেবে পায়না, তাকে এ মুহূর্তে টয়লেটের নিকট আনা হল কেন! সেতো মেজর সাহেবের নিকট ইস্তিঞ্জার হাজত পেশ করেনি। সে মনে মনে অত্যন্ত আশ্চার্য হলেও মুখ খুলে কিছুই জিজ্ঞেস করল না। বরং পরিস্থিতির উপর সে নিজেকে সোপর্দ করে দিল। কিন্তু তাকে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না, পরক্ষণেই দেখতে পেল, না! এটা আসলে কোন টয়লেট নয়, অনকিছু, যদিও বাহ্যিকভাবে সম্পূর্ণ টয়লেটের আয়োজন। এ সকল আশ্চার্য কান্ড দেখে সে একেবারে হতবাক হয়ে গেল। এখন সে ইতিপূর্বে মেজর

সাহেবের বলা সেই কথাটি 'বাগদাদে তোমাকে নিরাপদ রাখার মত জায়গার অভাব হবেনা' এর কিছুটা আঁচ করতে পারলো।

রুকাইয়া টয়লেট সদৃশ রুমের বহিরাংশে অবস্থিত ছোট একটি বৈদ্যুতিক সুইসের বোর্ড, যা দেখতে মূলতঃ এই রুমের বাতির সুইস বলে মনে হলেও সেখান থেকে এক রহস্যের দ্বার উন্মোচন করল। অর্থাৎ সে উক্ত বোর্ডের কাবার খুলে সেখানে লুকায়িত একটি গোপন সুইস অন করার সাথে সাথে টয়লেটের প্যান্টসহ স্লাপটি স্পিরিংয়ের ন্যায় উপরের দিকে উঠে এক পাশে চেপে গেল। সালমান ভাবল, এবার নিশ্চয়ই কঠিন দুর্গন্ধ সইতে হবে। কিন্তু বাস্তবে হলো তার উল্টো। দুর্গন্ধের পরিবর্তে এমন সুগন্ধ আসতে লাগলো সে, সে ইতিপূর্বে কখনও এত সুমিষ্ট ঘ্রাণ শুকেনি, যা এই মুহূর্তে পেল।

মেজার কন্যা অতঃপর সাথে নিয়ে আসা রশির সিঁড়ি ভিতরে ফেলে উপরের মাথা জানালার গ্রিলের সাথে মজবুত করে বেঁধে দিল। অতঃপর নিজেই প্রথমে সিড়ি বেয়ে ভিতরে প্রবেশ করল। ভিতরে ঢুকে সেখানে বাতি জালালো। ভিতরটা একেবারে আলোকিত হয়ে গেল। এবার মেজর সাহেব সালমানকে ধরে আস্তে আস্তে নিচে নামালেন। তারা সেখানে পৌঁছলে সালমানের বিস্ময় আরো বেড়ে গেল। এত চড়াই উৎরাই পেরিয়ে এখানে এসে লাভ কি হল! এতটুকু এক রুম! চারিদিকে দেয়াল, দরজা-জানালা তো নাই। আর তা থাকবেই বা কি করে, এটা তো মাটির নিচের কক্ষ। এখানে আমি থাকব কেমন করে! কিন্তু এবারও তাকে বেশীক্ষণ পেরেশানীতে ভুগতে হলনা। সে দেখল মেজর কন্যা কক্ষের মেঝেতে বিছানো কার্পেটটা একটু সরিয়ে ছোট একটি বুতামে চাপ দিল। যেইনা চাপ দেয়া, অমনি পূর্বাংশের দেয়ালের বুক চিঁড়ে একটি প্রশস্ত দরজা খুলে গেল। যা দেখে মনে হচ্ছে, দরজাটা বুঝি এই মাত্রই তৈরী হলো। এই দেয়ালের কোলে যে এরকম প্রশস্ত দরজা লুকায়িত ছিল তা আগে বোঝার কোন উপায় ছিল না।

সালমান দেখল, নব উন্মোচিত দরজার ওপাশে একটি কংক্রিটের সিড়ি অনেক গভীরে চলে গেছে। তারা তিনজন সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে লাগল। এবার আর সালমান মুখ না খুলে পারল না। সে নামতে নামতে মেজর সাহেবকে জিজ্ঞেস করল 'আমরা কি রূপকথার রাজকুমারের সেই পাতাল কক্ষে যাচ্ছি?' তার প্রশ্নে মেজর সাহেব তাৎক্ষণিকভাবে কিছু বললেন না। সালমানের মনে হচ্ছে, তারা মূল ভূখন্ড থেকে কয়েক শ' ফুট গভীরে চলে এসেছে। সিঁড়ির ধাপ শেষ হলে দেখা গেল সম্মুখে একটি দরজা। আর তাতে বড় আকারের একটি তালা ঝুলান। রুকাইয়া তালা খুলে দরজা খুলতেই সালমান অবাক হলো। আরে! আমি কি বাস্তব জগতে আছি নাকি স্বপ্ন দেখছি?' সে নিজের শরীরে চিমটি কেটে দেখল। না! সে তো বাস্তব জগতেই আছে, এটা স্বপ্ন নয়।

মাটির এত গভীরে এমন সুপ্রশস্ত কক্ষ, যা বিশ্বাস করতেই কষ্ট হচ্ছে! সালমান নিজ চোখে না দেখলে কোনদিন হয়ত বিশ্বাসই করত না যে, কয়েক শ' ফুট মাটির নিচে এত

বিশাল কক্ষ তৈরী হতে পারে। শুধু প্রশস্তই নয় এ কক্ষ! উপরন্তু এমন জাকজমকপূর্ণ ও অপূর্ব সৌন্দর্যমন্ডিত যে, এরকম বিলাসবহুল মহল শুধুমাত্র আমীর-ওমরাদের খাস কামরাই হয়ে থাকে। তবে এ কথা সত্য যে, কক্ষটিতে প্রয়োজনীয় সামগ্রীই বেশী স্থান পেয়েছে। দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় সকল কিছুই আছে এখানে।

সালমানকে মেজর সাহেব একটি খাটের উপর বসালেন। তিনি নিজেও বসলেন তার পার্শ্বে। সালমান মেজর সাহেবের অনুমতি নিয়ে একটি বালিশ টেনে শুয়ে পড়ল। মেজর সাহেব তার কন্যাকে বললেন 'আম্মিজান! বেলা তো অনেক হয়েছে, সকালের নাস্তা এখনও করা হয়নি। তুমি মুয়াজকে সাথে নিয়ে নাস্তা আনো গিয়ে।' রুকাইয়া পিতার কথা মত নাস্তা আনতে চলে গেল। মেজর সাহেব সালমানের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হে বেটা! খুব ক্লান্ত লাগছে বুঝি?'

'ক্লান্ত যতটা না অসুস্থতার কারণে, তার চেয়ে ঢের বেশী আপনার এই পাতাল কক্ষের বিস্ময়কর ব্যবস্থাপনা দেখে!' হেসে উত্তর দিল সালমান। মেজর সাহেব বললেন 'আরো অনেক আশ্চার্য লুকিয়ে আছে এই ভুগর্ভস্থ কক্ষে! তাঁর ঠোঁটে রহস্যময় মুচকি হাসি–'আচ্ছা সালমান! তোমার কি মনে হয় এখানে তুমি নিরাপদ?

'আপনি এখানকার মালিক এবং সবকিছু অবগত' বলল সালমান–'তাই আমার চেয়ে আপনিই বেশী জানেন, আমি এ স্থানে নিরাপদ নাকি নিরাপদ নই'। সালমানও হেসে হেসেই বলল।

'ইনশাআল্লাহ্! তুমি এখানে পুরোপুরিই নিরাপদ এবং কোলাহল মুক্তও বটে' কিছুটা গম্ভীর্য্যের সাথে বললেন মেজর সাহেব–'আমরা এখন যেখানে আছি, ভূমি থেকে এ বাংকারের গভীরতা ৩০০ ফুট। এর দেয়াল দেড় মিটার চওড়া। মার্কিন বাহিনী কিংবা অন্যকোন হানাদারই হোকনা কেন, তাদের জন্য এই ভূগর্ভস্থ বাংকারে প্রবেশ করাটা দুঃসাধ্য। তুমি দেখেছ সুইসের মাধ্যমে বাংকারের দরজা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ৩ টন ওজনের এ দরজা অন্য কারো পক্ষে খোলা অসম্ভব এবং পারমাণবিক বোমার আঘাতেও এর কোনো ক্ষতি হবে না ইনশাআল্লাহ। এই বাংকার ২০ কিলোটন শক্তিশালী যে কোন বোমা প্রতিহত করতে সক্ষম।'

তাদের এই আলাপ চারিতার মধ্যেই মেজর কন্যা রুকাইয়া নাস্তা নিয়ে হাজির হয়ে গেল। সালমানের মনে এই বাংকার সম্বন্ধে আরো অনেক প্রশ্ন ছিল; কিন্তু এখন আর তা জিজ্ঞেস করার অবকাশ নেই। কারণ শরীর যথেষ্ট ক্লান্ত অনুভূত হচ্ছে, তাই তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে ঔষধ সেবন করা প্রয়োজন।

মেজর সাহেব রুকাইয়াকে বললেন 'আম্মিজান! তুমি একা আসলে যে, মুয়াজ কোথায়?'

'সে এখনও মসজিদ থেকে ফিরেনি' বলল রুকাইয়া।

'ঠিক আছে তুমি আমাদেরকে নাস্তা পরিবেশন কর' বললেন মেজর সাহেব–'আমার এখনই ব্যারাকে ফিরে যেতে হবে'।

রুকাইয়া তাঁদের সামনে দস্তরখানা বিছিয়ে রুটি, দুধ, খেজুর, আংগুর এবং আপেল পরিবেশন করল। নাস্তা পর্ব শেষ হলে সালমান ঔষধ খেয়ে পুনরায় খাটে শুয়ে পড়ল। মেজর সাহেব তাকে লক্ষ করে বললেন 'বাবাজি! আমি এখন ডিউটিতে চলে যাচ্ছি। এখানে তোমার দেখাশুনা করার জন্য আমার মা-মণি রুকাইয়া এবং আদরের মুয়াজ আছে।' সালমান এইমাত্র জানতে পারল যে, এই সুন্দরী ললনার নাম 'রুকাইয়া'। সে বলল 'ঠিক আছে চাচা জান! আপনি আপনার কাজে চলে যান, এরা থাকতে আমার কোন অসুবিধা হবে না ইনশাআল্লাহ্। যদি পারেন, রাতে ফেরার সময় একটু হাসপাতাল হয়ে আসবেন। ওখানে ঔষধের একটি ফাইল রেখে আসা হয়েছে।'

'আচ্ছা ফিরার সময় আমি ওটি নিয়ে আসার চেষ্টা করব।' বলে মেজরসাহেব চলে যেতে উদ্যত হলে রুকাইয়া বলল, 'আব্বাজান! আমার ঘরে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আমাদের মেহমান এখানে একেবারেই নতুন। একা থাকতে তার ভয় লাগতে পারে কিংবা খারাপও লাগতে পারে; যেহেতু সে রুগী। তাই আপনি যাওয়ার পথে মসজিদ থেকে মুয়াজকে একটু তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিবেন। ও আসলে আমি চলে যাবো। তখন আর মেহমানের ভয় লাগা বা একাকী থাকার অস্বস্তির কোন আশংকা থাকবে না।'

সালমান ইতিহাস পড়ে জেনেছিল, 'আরবীয়রা অতিথি সেবায় জগৎ বিখ্যাত। পৃথিবী জুড়ে কোন জাতি তাদের মত বিনয়ী ও অতিথিপরায়ণ নেই। কোন আরবীয়ের ঘরে কিংবা বিজন তাবুতেও যদি কেউ পৌছে যায়, তখন জ্ঞাতি পরিচিতির কোন প্রশ্ন নেই, একান্ত নবাগতের সঙ্গে তাঁরা এমন ব্যবহার করবে, যেন সে কতো পূর্বেকার পরিচিত–কতো আপনজন!' কিন্তু বর্তমানে তথাকথিত আধুনিক অহংকারী সভ্যতার বিষপাণ করে আরবীয়রা তাদের সেই জগৎবিখ্যাত সুনাম, আরবীয় ঐতিহ্য মেহমানদারী এবং মেহমানের সাথে উত্তম আচরণ করা প্রায় ভুলেই গেছে। পূর্ব পুরুষের গৌরব গাঁথা তারা ধরে রাখতে পারেনি।

এক্ষেত্রে মেজর আসাদুল্লাহ সাহেব ব্যতিক্রম। তিনি তার আরবীয় সেই ঐতিহ্য আঁকড়ে ধরে রেখেছেন। যা হাসপাতালের বেডে সালমানের সাথে তার প্রথম সাক্ষাতেই সে কিছুটা আঁচ করতে পেরেছিল এখন তাঁর কন্যার আচরণে এবং কথাবার্তায় পুরোপুরি বুঝতে পারলো যে, এরা আসলেই বাস্তববাদী আরব।

মেজর সাহেব বাংকার থেকে বেরিয়ে গেলেন। রুকাইয়া একটি চেয়ারে চুপচাপ বসে রইল। সালমান পূর্বেই খাটে শোয়া ছিল। এবার আস্তে আস্তে তার দু'চোখের পাতা বন্ধ হয়ে এলো। সে গভীর নিদ্রায় তলিয়ে গেল।

রুকাইয়া দেখল তাদের মেহমান গভীর ঘুমে অচেতন। তাই সে চেয়ার ছেড়ে উঠে কক্ষের উত্তর পার্শ্বে দর্শনীয় স্থানে অবস্থিত বুকসেলফটির নিকট গিয়ে দাঁড়ালো। এটি তার পিতার অতি প্রিয় সংগ্রহশালা। বাগদাদের বাসিন্দারা গ্রন্থশালা তৈরীতে বিশ্বে নামকরা। এমন কি পৃথিবীর প্রথম গ্রন্থশালা গড়ে উঠেছিল এই ইরাকে শুধু যে গ্রন্থসংগ্রাহক তারা,

তা নয় বরং আরবে প্রবাদ আছে "বই লেখা হয় কায়রোতে, ছাপা হয় বৈরুতে আর পঠিত হয় বাগদাদে।" মেজর সাহেব বাংকারের দেয়াল কেটে তৈরী করিয়েছেন তার বই রাখার তাকগুলি। এতে নতুন-পুরাতন মিলিয়ে কয়েক হাজার বই থরে থরে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। বিখ্যাত তাফসীর, হাদীস, ফেকাহ্, ইতিহাস গ্রন্থ ছড়াও দর্শন, চিকিৎসাশাস্ত্র এবং আধুনিক আরবী সাহিত্যের এক বিশাল ভান্ডার এই মাকতাবাতুল আসাদুল্লাহটি।

রুকাইয়া সেলফের বিভিন্ন পুস্তক উল্টে পাল্টে দেখতে লাগল। সম্ভবত সে কোন মনমতো ইতিহাসের বই তালাশ করছে। কেননা মেয়েটি ইতিহাস পাঠ করতেই বেশী স্বাচ্ছন্দবোধ করে। বিশেষ করে ইসলামের ইতিহাস। কিন্তু এ বিষয় তার একটি আক্ষেপ এই যে, আজ ইসলামের সন্তানরা তাদের ইতিহাস অধ্যয়ন না করার দরুন তারা ইতিহাসের নির্মম যাতাকলে নিষ্পিষ্ঠ হচ্ছে। দুনিয়ার তাবৎ কুফরী সম্প্রদায় তাদের উপর ছড়ি ঘুরাতে পারছে।' সহসাই একটি বই তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। 'ইরাকের প্রাচীন ইতিহাস এবং মুসলমানদের আগমণ' নামক বইটি হাতে নিয়ে সে পৃষ্ঠা উল্টাচ্ছিল, ঠিক এমনি মুহূর্তে কে যেন 'খবরদার' বলে এক হাক দিল। আওয়াজ বেশী উঁচু ছিলনা, কিন্তু ভূগর্ভস্থ কক্ষ বিধায় বিকট মনে হলো। হাক শুনে সে চমকে উঠল এবং কিছুটা ভয়ও পেল। বই রেখে তাড়াতাড়ি সে মেহমানের খাটের নিকট চলে এলো। কিন্তু কই! মেহমান তো গভীর ঘুমে পূর্বের ন্যায়ই অচেতন আছে। রুকাইয়া এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। 'অন্য কাউকেও তো দেখা যাচ্ছে না। তবে কি আমি ভুল শুনলাম।' এই ভেবে সে আবার বুকসেলফের নিকট যেতে উদ্যত হলো, আর তখনই শুনল খাটে শায়িত মেহমান ঘুমের ঘোরেই স্বগোতুক্তি করছে 'তোমাদের ঈশ্বরের দোহাই তোমরা একে...।' এবার সে মেহমানের দিকে ভালভাবে তাকালো। দেখল তার মুখ এখনও বিড়বিড় করছে। এই শীতের দিনেও তার কপালে হাল্কা ঘামের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে হাত-পা নড়েচড়ে উঠছে।

রুকাইয়া ইতিপূর্বে সালমানকে ভাল করে দেখেনি। এখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও যখন তাকালো, আর সে ছিল তখন ঘুমন্ত তাই সে চেয়ে রইল অনেকক্ষণ পর্যন্ত। ছেলেরাও যে এত সুন্দর হতে পারে, তা ছিল তার কল্পনার অতীত। অত্যাধিক সুন্দর গায়ের রং। গোলগাল মুখাবয়ব। হাল্কা গোফ থাকলেও দাড়ি এখনও পুরোপুরি ওঠেনি। যেন একেবারে রাজপুত্র। সুন্দর ফর্সা গাত্রবর্ণের সাথে ঈমানের নূর তার চেহারার রওনককে যেন শতগুণ বৃদ্ধি করে দিয়েছে। যেন স্বর্গীয় কোন দূত নেমে এসেছে দুনিয়ার বুকে। এমন মায়াবী চেহারা একান্তে দেখলে কোন মেয়েই প্রেমে না পড়ে পারে না। রুকাইয়ার অবস্থাও যেন অনেকটা সেরকম হল। ছেলেটি কেমন ভালবাসার জালে আটকে ফেলছে তাকে। সে দৃষ্টি সরাবার জন্য চেষ্টা করছে কিন্তু কেন যেন দৃষ্টি সরতে চায়না। সালমানকে দেখে তার তৃপ্তি যেন মিটতে চায়না। কিন্তু সে যখন ভাবলো 'আমি একজন বেগানা পুরুষকে এভাবে দেখছি এতে তো আমার গুনাহ হচ্ছে।' গুনাহের চিন্তা আসতেই সে তার দৃষ্টিকে নিচু করে নিল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সালমানের ঘুম ভেঙ্গে গেলো। চোখ খুলে সে ভয়ার্ত দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। রুকাইয়া তাকে জিজ্ঞেস করল 'আপনি কি কোন ভয়ংকর স্বপ্ন দেখছিলেন?' সালমানের সাথে এটাই রুকাইয়ার প্রথম কথা। ইতিপূর্বে পরস্পরের মধ্যে কোন প্রকার কথা হয়নি। কিন্তু ঘর থেকে এই বাংকারে আসা, এখানে বসে সালমানের সাথে মেজর সাহেবের এবং রুকাইয়ার সাথে তার পিতার কথোপকথনের কারণে উভয়ের নিকট উভয়ের কণ্ঠ পরিচত ছিল। তাই রুকাইয়ার কণ্ঠস্বর শুনে সালমান চমকে উঠে বলল, 'আরে! আরে! তুমি এখানে আছ?'

'আমি আবার গেলাম কোথায়? রুকাইয়া তার কথায় আশ্চার্য হয়ে বলল, 'আমিতো সে সময় অর্থাৎ আব্বাজান চলে যাওয়ার সময় থেকেই এখানে আছি। আমাকে কি কোথাও হারিয়ে যেতে দেখলেন আপনি?'

'হ্যাঁ, ওই শয়তানের দলেরা তো তোমাকে নিয়ে চলেই যাচ্ছিল প্রায়'– বলল সালমান। স্বপ্নের প্রতিক্রিয়া এখনও তার মধ্যে থেকে পুরোপুরি কাটেনি।

'আমাকে কারা নিচ্ছিলো? কোথায় নিচ্ছিলো?' জিজ্ঞেস করল রুকাইয়া– 'আপনি খুলে বলুন স্বপ্নে কি দেখেছেন। ঘুমের ভিতরেও আপনি উচ্চস্বরে হাক-ডাক দিচ্ছিলেন আর আপনার কপাল ঘামে ভিজে যাচ্ছিল। সে সাথে হাত-পাও ছুড়ছিলেন।'

'স্বপ্নের ভিতর আমি দেখলাম মার্কিন সৈন্যরা আমার এই বাংকারে আশ্রয় নেয়ার সংবাদ জানতে পেয়েছে'–বলতে লাগল সালমান– 'ওরা তো আমাকে হত্যার উদ্দেশ্যেই মুখোশধারী সন্ত্রাসীদের পাঠিয়েছিল। কিন্তু যখন তারা জানতে পারল আমি নিহত হইনি, উপরন্তু মেজর সাহেব আমাকে তাঁর বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছেন এবং আমি তার নিরাপত্তা বাংকারে অবস্থান করছি; তখন মার্কিন সৈন্যরা আমাকে ধরার জন্য এ বাড়িতে আসল। বাড়িতে আমাকে না পেয়ে এবং বাংকারে প্রবেশের কোন পথ তাদের জানা না থাকায় ওরা মেজর কন্যাকে অর্থাৎ তোমাকে ওদের গাড়ীতে করে তুলে নিয়ে যেতে চেষ্টা করল।

এমতাবস্থায় তোমার ছোট ভাই দৌড়ে এসে আমাকে এই সংবাদ জানাল। আমি সাথে সাথে বাংকার থেকে বেড়িয়ে সৈন্যদের সামনে হাজির হই। অতঃপর তাদের বলি, তোমরা একে ছেড়ে দাও, আমি তোমাদের সাথে যাচ্ছি। কিন্তু আশ্চার্যের ব্যাপার, ওই বদমাইশের দল আমাকে ধরতে এলেও আমাকে রেখে তোমাকে নিয়েই পালাতে চাচ্ছিল। তখন আমি নিজেকে সামলে রাখতে না পেরে খুব জোরে ওদের ধমক দেই 'খবরদার! ওকে রেখে যাও নতুবা অবস্থা তোমাদের ভয়াবহ হবে।' আমার এ হুমকিতে ওদের গাড়ী থমকে দাঁড়ালো। আমি গাড়ির নিকট গিয়ে ওদের বললাম, 'তোমাদের ঈশ্বরের দোহাই তোমরা একে নিয়ে যেওনা।' কিন্তু ওরা আমার অনুরোধ রক্ষা না করে গাড়ি দ্রুত চালিয়ে দেয়।'

'আর আমি আপনার 'খবরদার' হাক শুনে ভয় পেয়ে যাই'–বলল রুকাইয়া–'আমি ছিলাম তখন বুকসেলফটির নিকট। একটি বই হাতে নিয়ে কেবল পৃষ্ঠা উল্টাচ্ছিলাম আর

'খবরদার' হাক শুনে এদিক ওদিক তাকিয়ে কাউকেও দেখতে পেলাম না। আপনিও গভীর ঘুমে অচেতন। ভাবলাম হয়তো আমি ভুল শুনেছি। এরইমধ্যে আপনি ঘুমের ঘোরেই বলে উঠলেন 'তোমাদের ঈশ্বরের...'। এরপর আবার চুপ, আচ্ছা শেষ পর্যন্ত ওরা কি আমাকে নিতে পেরেছিল নাকি আপনি আমাকে উদ্ধার করেছিলেন ওদের হাত থেকে!' একথা বলে সে মুচকি হাসল।

'আমি তো তোমাকে উদ্ধার করতে প্রয়োজনে জীবন দিতেও প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু তখন কি করবো ভেবে পাচ্ছিলাম না'– বলল সালমান– 'হঠাৎ তোমার ছোট ভাই কোত্থেকে যেন একটি অস্ত্র এনে আমার হাতে দিল। আমার পাশে সেখানে একটি হোন্ডা দাঁড় করানো ছিল। আমি দ্রুত অস্ত্রটি নিয়ে হোন্ডায় চড়ে, ফুলস্পিরিটে হোন্ডা চালিয়ে দিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা ওদের গাড়ির নাগাল পেলাম। যেই না নাগাল পাওয়া, সাথে সাথে গাড়ির টায়ার লক্ষ্য করে ফায়ার চালিয়ে দিলাম। টায়ার বাস্ট হয়ে গাড়িটি রাস্তার পাশে হুমরি খেয়ে পড়ল, কিন্তু আমার ফায়ার বন্ধ হলো না। দেখতে না দেখতে গাড়িটিতে আগুন ধরে যায়। সৈন্যরা অনেকেই আগুনে পুরে মারা যায়। আর বাদবাকীরা তোমাকে রেখে পালিয়ে যায়। আর তখনই আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়।'

তাদের এই কথোপকথনের মধ্যে কে যেন আপামনি, আপমনি বলে ডাকতে ডাকতে এগিয়ে আসলো। এতে সালমান কিছুটা ভয় পেয়ে গেল। কারণ এখনও তার স্বপ্নের সেই মারামারি-গোলাগুলির ভয়াবহ দৃশ্যের রেশ পুরোপুরি কাটেনি। সালমান দেখল সাত-আট বছরের একটি বালক হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে রুকাইয়ার কোলে বসে, তার গলা জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করল 'আপু এই কি আমাদের মেহমান?' বালকের প্রশ্নের উত্তরে রুকাইয়া বলল 'হ্যাঁ, ইনিই আমাদের মেহমান, তাঁকে তুমি সালাম করলেনা যে?'

সাথে সাথে বালকটি সালমানকে সালাম দিল এবং বলল, 'বাড়িতে মেহমান এসেছে শুনে খুশিতে সালাম দিতেই ভুলে গেলাম আপু!'

সালমান বালকের সালামের উত্তর দিয়ে তাকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করল 'তোমার নাম কি ভাইয়া'?

'আমার নাম মুয়াজ ইবনে আসাদুল্লাহ' বলেই সে সালমানকে জিজ্ঞেস করল 'আপনার নাম কি ভাইয়া?' তার এই পাল্টা প্রশ্ন মুনে সালমান-রুকাইয়া উভয়েই হেসে দিল। মুয়াজও সে হাসিতে যোগ দিল। রুকাইয়া সালমানকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'আমার ভাইটি একটু দুষ্ট প্রকৃতির আপনি কিছু মনে করবেন না কেমন!'

'এতে আবার মনে করার কি আছে–' বলল সালমান– 'এই দুষ্টই তো আমার এখানকার অবসরে একান্ত সাথী হতে পারবে। যেমনিভাবে সে একটু আগে আমার হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছিল।'

একথা শুনে মুয়াজ বলে উঠল, ‘কখন আমি আপনার হাতে অস্ত্র তুলে দিলাম? আপনার সাথে এটাইতো আমার প্রথম দেখা।’

এবার রুকাইয়া মুয়াজকে বলল, ‘আমাদের মেহমান স্বপ্নের ভিতর তোমাকে দেখেছেন। শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য তুমি তাঁর হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছি, তিনি এখন সে কথায়ই বললেন।’

‘আল্লাহ্ যেন বাস্তবেও তাই করেন’ –বলল মুয়াজ– ‘আমরা যেন একত্রে মার্কিনীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারি। কি ভাইয়া! আপনি আমাকে নেবেন না যুদ্ধ করতে? আব্বুকে আমি অনেকবার বলেছি কিন্তু তিনি আমাকে নেন না।’

মুয়াজের মুখে এই বিজ্ঞ সুলভ কথা শুনে সালমান তাজ্জব বনে গেল। এতটুকু ছেলে কিন্তু কথা বলে কত গুছিয়ে! সে তাকে আদর করে বলল ‘কেন ভাই! তোমার কি খুব যুদ্ধ করতে ইচ্ছে করে?’

‘ইচ্ছে থাকলেও আমাকে যুদ্ধ করতে হবে, না থাকলেও করতে হবে’ মুয়াজের চটপট জবাব।– ‘যেহেতু শত্রু আমার দেশে হানা দিয়েছে।’

‘তুমি তো এখনও অনেক ছোট, যুদ্ধ করার বয়স তোমার এখনও হয়নি। বড় হয়ে তুমি ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে কেমন?’ সালমান বলল।

‘আপনিও দেখছি আব্বুর মত একই কথা বলছেন’– মুয়াজ মুখ ভার করে বলল।

‘কেন তোমার আব্বাজান কি বলেন, ভাইয়া?’ মুয়াজকে আদর করে জিজ্ঞেস করলো সালমান।

‘তিনিও আপনার মত–তুমি ছোট, যুদ্ধ করার মত বয়স হয়নি, বড় হয়ে যুদ্ধ করবে’ এসব কথাই বলেন।’ সালমানের প্রশ্নের উত্তরে মুয়াজ বলল।

‘তবে কি তাঁর একথা ভুল? সালমান সস্নেহে প্রশ্ন করল মুয়াজকে।

‘ভুল নয়তো কি! আপনারা সকলে শুধু বলেন, ‘আমরা ছোট-যুদ্ধ করার বয়স হয়নি’ বলল মুয়াজ–‘অথচ ইসলাম ও মুসলমানের দুশমনরা আমাদেরকেই তাদের প্রধান শত্রুভাবে। কারণ তারা জানে আজকের এই মুসলিম শিশুরাই একদিন তাদের অপকর্মের শাস্তি প্রদান করবে। সে জন্যই তারা আমাদেরকে হত্যার টার্গেট বানিয়েছে। যার বাস্তব প্রমাণ হল, এই যুক্তরাষ্ট্রই ইতিপূর্বের যুদ্ধে দশ লক্ষাধিক ইরাকী শিশুকে হত্যা করেছিল। বর্তমান যুদ্ধেও তারা অনেক শিশুকে হত্যা করে চলেছে। সুতরাং আমরা যখন ওদের হত্যার টার্গেট হয়েই আছি আর ওরা আমাদেরকে অবশ্যই নির্বিচারে হত্যা করবে। তাই এমনি এমনি মরার চেয়ে ওদের সাথে যুদ্ধ করে মরাই কি উত্তম নয়?’ তার কণ্ঠে ক্ষোভ মিশ্রিত।

সালমান এই ইরাকী শিশুর প্রশ্ন-উত্তর শুনে হয়রান হয়ে গেল। এতটুকু ছেলের এমন বাস্তবধর্মী যুক্তিপূর্ণ উত্তরে সে হতবাক। যদিও তার এই প্রশ্নের সুন্দর উত্তর দেয়া যায়।

কিন্তু সালমান ভাবল তার আবেগকে অবদমন না করাই শ্রেয়। তাই সে তাকে এই বলে আশ্বস্ত করল, 'ঠিক আছে ভাইয়া! আমি তোমাকে যুদ্ধে নিয়ে যাব ইনশাআল্লাহ্!'

সালমানের এই কথায় মুয়াজ এত খুশী হল যে, যদি সে এখন সুস্থ থাকত, তবে এখনই তাকে নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে চলে যেত। আনন্দের অতিশয্যে সে সালমানের হস্তদ্বয় ধরে চুমু দিতে লাগল। রুকাইয়া ভাইয়ের কান্ড দেখে শুধু হাসল। অতঃপর বলল, 'মুয়াজ! তুমি মেহমানের সাথে থেকে গল্প করো আমি ঘরে ফিরে যাচ্ছি। ঘরে আমার অনেক কাজ পরে আছে।' এই বলে সে উঠে ঘরের দিকে চলে গেল। আর মুয়াজ থেকে গেল সালমানের সাথে।

অসম্ভব সুন্দর ফুটফুটে এক বালক মুয়াজ। অত্যাধিক চঞ্চল-চপলা ছেলে সে। বেশ সুন্দরভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে কথা বলতে পারে। বয়স আট বছর কিন্তু শারীরিক গঠন-গাঠনে মনে হয় বয়স নিশ্চয়ই দশ-বার বছর হবে হয়তো! সে বাগদাদের একটি প্রাচীন মসজিদ সংলগ্ন হেফজখানায় পড়ে। ইতিমধ্যে পবিত্র কুরআনুল কারীমের ১৫ পাড়া সে মুখস্ত করে ফেলেছে। প্রবল ধীশক্তির অধিকারী এই কচি বালক যেমনি অত্যাধিক দুষ্ট তেমনি দারুন বুদ্ধিমানও বটে। সালমান তাকে জিজ্ঞেস করল 'মুয়াজ তুমি এখন যে মসজিদ থেকে আসলে, সেখানে তুমি কি কর ভাইয়া?'

'সেখানে আমি পড়ি' বলল মুয়াজ।

'কি পড় তুমি সেখানে?' প্রশ্ন সালমানের।

'আমি সেখানে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব পড়ি,' বলে মুয়াজ মিটি মিটি হাসতে লাগল।

সালমান বুঝতে পেরেছে যে, সে পবিত্র কুরআনের কথা বলছে, তারপরও তাকে আনন্দ দেয়ার জন্য না বুঝার ভান করে বলল 'তুমি এতটুকু মানুষ, অথচ পড় বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব!'

'কেন আপনি কি সেটা পড়েননি কখনও'-হেসে হেসেই বলল মুয়াজ–'সেটা হলো সকল সৃষ্টির স্রষ্টা মহান রাব্বুল আলামিনের পবিত্র কালাম কুরআনুল কারীম।'

'তবে তুমি কুরআন শরীফ পড়!' বিস্মিত হওয়ার ভান করে সালমান বলল।

'জি আমি কুরআন শরীফ মুখস্ত পড়ি'–মুয়াজ বলল– 'ইতিমধ্যে আমার পনেরো পারা মুখস্থ হয়েও গেছে।'

'বলো কি মুয়াজ! তুমি ১৫ পারা হেফ্‌জ করে ফেলেছো!' এবার সত্যি সত্যিই সালমান বিস্মিত হল। সে মুয়াজের মাথাটা নুইয়ে তার কপালের মধ্যে একটি চুমো দিল খুশির আবেগে। এ পর্যায়ে দুই হাফেজে কুরআনের সম্পর্ক হয়ে উঠলো আপন সহোদরের ন্যায়।

সালমান মুয়াজকে বলল 'ভাইয়া! তুমি আমাকে তোমার কচি মুখে পবিত্র কালামের একটু সুর শুনাবে? আজ ক'দিন যাবৎ বিভিন্ন ব্যস্ততা এবং অসুস্থতার দরুন ঐ মধুর শুধা পানে বঞ্চিত আছি।'

'নিশ্চয়ই শুনাবো ভাইয়া! তবে কোন সূরা পড়ব সেটা আপনি বলে দিলেই ভাল হয়।' মুয়াজ বলল।

'তুমি আমাকে সূরা 'বারাআত' তথা সুরাতুল ক্বিতালটা তিলাওয়াত করে শোনাও।' বলল সালমান।

মুয়াজ সুন্দর সুললিত কণ্ঠে সূরা তাওবাহ্ তিলাওয়াত আরম্ভ করল। তার সহীহ্ শুদ্ধ তিলাওয়াত আর মায়াবী কণ্ঠের মনকাড়া সুর লহরী ভূগর্ভস্থ কক্ষটি মাতিয়ে তুলল। সালমান কল্পনাও করতে পারেনি যে, এতটুকু ছেলে এতটা হৃদয়গ্রাহীভাবে তিলাওয়াত করতে পারে! যে সুরে হৃদয় মন আপ্লুত হয়ে যায়। মনকে ছুটিয়ে নিয়ে যায় আরশে আজীমের প্রান্তদেশে। তার কণ্ঠের যাদুকরী তান আর সহীহ্ শুদ্ধ উচ্চারণের তিলাওয়াতে মনে হচ্ছে, যেন সবেমাত্র কুরআন লাওহে মাহফুজ থেকে অবতীর্ণ হচ্ছে। তিলাওয়াতের সুর এতটাই আকর্ষণীয় ও প্রভাবময় ছিল, মনে হচ্ছে যেন এই বাংকারের দেয়ালগুলি ছুটে এসে তিলাওয়াত কারীর পদতলে পতিত হবে।

সালমান নিবিষ্ট মনে তিলাওয়াত শ্রবণ করছে আর তার অর্থ হৃদঙ্গম করছে। কুরানের অর্থ তার হৃদয় তন্ত্রীতে এক অতুলনীয় আলোড়ন সৃষ্টি করল। সে কখনও চমৎকৃত হচ্ছে। কখনও ভয়ে প্রকম্পিত হয়ে উঠছে। নিজের অজান্তেই চক্ষু দিয়ে দরবিগলিত ধারায় অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল।

মুয়াজ ধীরগতিতে তার তিলাওয়াত নিয়ে সামনে অগ্রসর হচ্ছে। যখন সে এই আয়াত তিলাওয়াত করল, 'তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদের ছেড়ে দেয়া হবে এমনি, যতক্ষণ না আল্লাহ জেনে নেবেন তোমাদেরকে যুদ্ধ করেছে এবং কে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুসলমানদের ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছে। আর তোমরা যা কর সে বিষয় আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত।' তখন সালমানের কান্নার বেগ আরও বেড়ে গেল। তাঁকে এভাবে কাঁদতে দেখে মুয়াজের তিলাওয়াত বন্ধ হয়ে গেল। সালমান কাঁদো কাঁদো কণ্ঠেই বলল 'তিলাওয়াত বন্ধ করলে কেন মুয়াজ?'

'তাহলে আপনি এভাবে কাঁদছেন কেন'– বলল মুয়াজ–'আপনার কান্না আমি সইতে না পেরে তিলাওয়াত বন্ধ করেছি ভাইয়া!'

'কাঁদবো না কি করব ভাই!'– সালমান বলল –'আমি তো এখনও কোনদিন যুদ্ধ করিনি। আল্লাহর ধরা থেকে কিভাবে রেহাই পাব! এ চিন্তা করেই কাঁদছি। ঠিক আছে আর কাঁদবোনা। তুমি তিলাওয়াত করতে থাকো।'

মুয়াজ পূর্বের চেয়েও আকর্ষণীয় সুরে তিলাওয়াত আরম্ভ করল। আল্লাহ্ যেন সমস্ত সুর সুধা এই কচি হাফেজ বালকটির কণ্ঠে ঢেলে দিয়েছেন। আর এটা পবিত্র কুরআনেরও বিশেষ মহিমা যে, সে সর্বদা সর্বকালে তার নতুনত্বকে অক্ষুণ্নভাবে ফুটিয়ে তুলে পাঠক-শ্রোতাকুলকে এক অপার্থিব প্রশান্তির কোমল পরশে মাতিয়ে রেখেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। তাতে মোটেও তাঁর স্বাদ-আহ্লাদ হ্রাস না পেয়ে বরং উত্তরোত্তর তা বেড়েই

চলছে অবিরাম গতিতে। মুয়াজ তিলাওয়াত করে যাচ্ছে আর সালমান নিবিষ্ট মনে, হৃদয় উজার করে সুরের সাগরে অবগাহন করছে। তিলাওয়াতের গতি ধীর বিধায় মুয়াজের সময় একটু বেশী লাগছে। এখন সে ৩৮ নং আয়াত তিলাওয়াত করে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছে "হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কি হল, যখন আল্লাহর পথে বের হবার জন্যে তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধর, তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি স্বল্প। যদি বের না হও, তবে আল্লাহ্ তোমাদের মর্মন্তুদ আযাব দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আর আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে শক্তিমান।" (আয়াত ঃ ৩৮, ৩৯)

এই আয়াতদ্বয় শ্রবণ করে সালমান পুনরায় ফুফিয়ে কেঁদে উঠল। আর তা দেখে মুয়াজও তিলাওয়াতে বিরতি দিয়ে বলল 'ভাইয়া আপনি আবারও কাঁদছেন!'

'কেন কাঁদবোনা ভাইয়া! আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের এ সকল নির্দেশ অমান্য করার কারণেই তো আমরা আজ মার খাচ্ছি ইরাক, আফগান, আরাকান, কাশ্মীর এবং ফিলিস্তিনসহ প্রায় প্রতিটি দেশে। আল্লাহর হুকুমে জিহাদে বের না হওয়ার কারণেই শত্রু আজ আমাদের দ্বোর গোড়ায় পৌঁছে গেছে। আমার মনে হয় ইরাকে কুরআনের এই আয়াতের বাস্তবায়নই হতে চলেছে যেমনটি হয়েছিল ১২৫৮ সালে তাতারীদের বাগদাদ দখলের মাধ্যমে। এ কারণে অনিচ্ছা সত্ত্বেও কান্না এসে যায় ভাই! সে যাক, তুমি তিলাওয়াত চালিয়ে যাও।'

মুয়াজ পুনরায় তিলাওয়াত শুরু করল এবং এক সময় পূর্ণ সূরাটি তিলাওয়াত করে শেষ করল। সালমান বলল, 'মুয়াজ এই যুদ্ধের মধ্যে যে তুমি মসজিদে পড়তে যাও, তাতে যে কোন সময় শত্রুর বোমা হামলার শিকার হতে পার। তার চেয়ে তুমি এখানে বসে আমার কাছে পড়তে পার। আল্লাহর ইচ্ছায় আমার পবিত্র কুরআনের ত্রিশ পাড়াই মুখস্থ আছে।

'তাই নাকি ভাইয়া! খুশী হয়ে বলল মুয়াজ'–তবে আমার খুশীর অন্ত থাকবে না। সারাক্ষন আপনার কাছেও থাকতে পারবো, আর পড়ারও কোন ক্ষতি হবে না। কি মজা! কি মজা! আমি এখনই আপামনিকে জানিয়ে আসি যে, আমাদের মেহমান একজন হাফেজ; এই বলে সে দৌড় দিল।

* * *

রাত দশটা। বাগদাদ মহানগরীর প্রধান সড়ক দিয়ে ঝড়ের গতিতে ছুটে চলছে একটি গাড়ি। রাস্তার দু'ধারের দোকানগুলি সব বন্ধ। অথচ যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্বে রাত বারোটা একটা পর্যন্ত বাজার থাকত সরগরম মার্কেট গুলিতে থাকত ক্রেতার ভীড়। দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত বিক্ষিপ্ত আলোকমালা পৃথিবীর বুকে তারকাখচিত আকাশের দৃশ্যের অবতারণা করত। বলা হয় যে, প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের যুগে বাগদাদ নগরীর যে নগরায়নিক

উন্নতি ঘটেছে, তা নগরীকে অনেক সম্মুখে অগ্রসর করেছে। বাগদাদ বিংশ শতাব্দীর এক আধুনিক নগরী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিল। কিন্তু আজ সভ্যতার দাবীদারদের অসভ্য আচরণে রাত দশটা না বাজতেই দোকানপাট বন্ধ। মার্কেটগুলি ফাকা দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত এখন আর সেই অপরূপ দৃশ্য দেখা যায়না। চারিদিকে ভুতুরে অন্ধকার। বাগদাদ আজ বিশ্বের সবচেয়ে অস্বাস্থকর শহরে পরিণত হয়েছে।

অন্ধকারের বুক চিড়ে গাড়িটি এগিয়ে চলছে আপন গন্তব্যপানে। গাড়িটি চালাচ্ছেন মেজর জেনারেল আসাদুল্লাহ সাহেব। গাড়ির লাইটের আলোতে পথের ধারে দু'চারটি কুকুর দেখা যাচ্ছে। গাড়ির আওয়াজ শুনে ওরা ডাকছে ঘেউ ঘেউ শব্দ করে। কিন্তু সে ডাকের ভিতর কেমন যেন একটা করুণ সুর ভেসে উঠছে। মেজর সাহেব জীবনে কুকুরের ডাক বহু শুনেছেন। কিন্তু আজ কাল কুকুরগুলোর কি হলো! ওরা এবাবে ডাকে কেন! মনে হচ্ছে কুকুরগুলো এই শহরের হাসি-আনন্দ, সুখ-সমৃদ্ধি হরণকারী, তৈল চোর বুশ-ব্লেয়ারও তাদের সাঙ্গ-পাঙ্গদের অভিসম্পাত করছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে মেজর সাহেব পৌঁছে গেলেন তার বাড়িতে। তাঁর এই বাড়িটা দজলা নদী থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। আনুমানিক এক একর জমির উপর তৈরী করা হয়েছে তার এ বাড়িটি। মূল ঘরটি চারতলা বিশিষ্ট বিল্ডিং। পশ্চিমপার্শ্বে একটি বড়সর টিনসেট ঘর। এ ঘরটিতে গাড়ি রাখা হয়। মূল ভবনের সম্মুখে প্রসস্ত এক উঠান। বাড়ির চতুর্দিকে উঁচু দেয়াল ঘেরা। উঠানের পূর্ব দিকের দেয়ালের পাশ ঘেষে অনেকগুলো খেজুর গাছ সারিবদ্ধভাবে লাগানো। বাড়িতে ঢোকার সদর দরজার নিকটে দাড়োয়ানের ঘর। এ কারণে যে কেউ চাইলেই বাড়িতে ঢুকতে পারেনা। অনুমতি নিয়েই তবে ভিতরে ঢোকা যায়। নিরাপত্তার কথা ভেবেই এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

মেজর আসাদুল্লাহ সাহেবের পৈত্রিক নিবাস ফিলিস্তিনের আসকেলান শহরে। ১৯৪৮ সালে ইহুদী জারজ রাষ্ট্র ইসরাঈলের জন্ম হওয়ার পর নির্যাতিত হয়ে তার পরিবার গাজায় একটি শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেয়। তখন তার বয়স সবেমাত্র পাঁচ বছর। মাতা-পিতার একমাত্র সন্তান ছিলেন তিনি। তাই তাঁর পিতা সন্তানের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে ১৯৫০ সালের এপ্রিল মাসের কোন এক সোমবার স্ত্রী-সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে শরণার্থী শিবির থেকে বেড়িয়ে পড়েন অজানা গন্তব্যপানে। সীমান্ত অতিক্রমকালে ইসরাঈলী নরপশুদের নির্মম বুলেটের আঘাতে শাহাদাত বরণ করেন আসাদুল্লাহ সাহেবের মাতা। তাঁর পিতা রফিকুল ইসলাম সে স্থানেই স্ত্রীকে দাফন দিয়ে পুত্রকে নিয়ে চলে আসেন ইরাকের নাজাফ শহরে। কিন্তু সেখানে তাদের বেশি দিন থাকা হলনা। নাজাফে শিয়াদের প্রাধান্য থাকায় সুন্নি তথা সত্যিকারের মুসলমানদের সেখানে বসবাস করা দুরূহ হয়ে উঠে। অবশেষে রফিকুল ইসলাম সাহেব সন্তানকে নিয়ে চলে আসেন রাজধানী বাগদাদে। এখানে এসে তিনি একটি তেল কোম্পানীতে ম্যানেজার পদে চাকুরী নেন। আর ছেলে আসাদুল্লাহকে ভর্তি করিয়ে দেন স্কুলে। এভাবেই তারা ইরাকের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান।

মেজর সাহেব গেটে গাড়ি থামিয়ে হরেন বাজাতেই ৩৫ বছর বয়স্ক দারোয়ান আঃ রহিম গেট খুলে দিল। তিনি গাড়িটি টার্ন দিয়ে ভিতরে নিয়ে নির্ধারিত স্থানে রাখলেন। অতঃপর ঘরের দরজায় কলিংবেল চেপে দিলেন। ভিতর থেকে রুকাইয়া প্রশ্ন করল 'কে দরজায়?'

'আমি আম্মিজান! দরজা খুলে দাও।' বললেন মেজর সাহেব।

রুকাইয়া পিতার চির পরিচিত কণ্ঠ শুনেই দরজা খুলে দিল। মেজর সাহেব 'আসসালামু আলাইকুম' বলে ঘরে প্রবেশ করলেন। রুকাইয়া পিতার সালাম দেয়ায় কিছুটা লজ্জিত হল। কেননা সালামটা প্রথমে তার দেয়ার কথা; সবসময় দিয়েও আসছে, কিন্তু আজকে কেন যেন ভুল হয়ে গেল। মেজর সাহেব সে অবস্থাটা আঁচ করতে পেরে কন্যার মাথায় হাত বুলিয়ে স্নেহের পরশ মেখে বললেন 'আম্মিজান! সালাম তো সবাই সবাইকে দিতে পারে। ছোট বড়কে, বড় ছোটকে। যে সালাম দেয় তারই লাভ বেশী। তাই তুমি আগে না দিতে পারায় আমি বেশী সওয়াব পেলাম এতে আবার সঙ্কোচের কি আছে!' মা-মরা মেয়েটি পিতার অকৃত্রিম স্নেহে তার হস্তদ্বয় চুম্বন করল। বেগম আসাদ মারা গেছেন আজ থেকে পাঁচ বছর পূর্বে। তাই পিতাই রুকাইয়া এবং মুয়াজের সব। মেজর সাহেব কন্যাকে জিজ্ঞেস করলেন 'আম্মিজান! মুয়াজ কোথায়, সেকি ঘুমিয়েছে?'

'সে ঘুমায়নি' বলল রুকাইয়া–'বাংকারে মেহমানের সাথে গল্প করছে। এই অল্প সময়ে সে মেহমানের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ট সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। যেন সে তার আপন ভাই। তাকে ছেড়ে মুয়াজ এক মুহূর্ত থাকতেও রাজি নয়।' হেসে বলল রুকাইয়া।

'তাই নাকি! তবে তো সে একজন গল্প বলার সঙ্গী পেলো এতদিনে'– বললেন মেজর সাহেব–'সে বহুদিন আমার নিকট গল্প শোনার বায়না ধরেছিল। কিন্তু তাকে আমি সময় দিতে পারিনি। তবে কথা হলো, ও যদি সারাক্ষণ মেহমানের কাছে বসে থাকে তাহলে পড়াশুনার কি হবে।'

'মেহমান যতদিন একানে থাকবেন ততদিন সে মেহমানের নিকট তার ছবক আদায় করবে' –বলল রুকাইয়া–'কারণ আমাদের মেহমান একজন হাফেজে কুরআন।'

'সেটা হবে উত্তম'– মেজর সাহেব খুশি হয়ে বললেন–'আমি ওর ব্যাপারে সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকতাম যে, কখন আবার মসজিদে আসা-যাওয়ার পথে কোন হামলার শিকার হয় কিনা! যাক আল্লাহর শুকর যে, আমি সে চিন্তা থেকে মুক্তি পেলাম। এখন মেহমানের দেখাশুনা করবে মুয়াজ, আর মেহমান ওর পড়াশুনার প্রতি খেয়াল রাখবে। ভালই হল তাহলে।'

'আব্বাজান! একটি কথা বলতে ভুলে গেলাম' –বলল রুকাইয়া–'মেহমান এবং মুয়াজ কেউই এখনও রাতের খাবার খায়নি। আমি বললে তারা বলল, আপনার সাথে একত্রে খাবে।'

'আচ্ছা চল সবাই তবে একত্রেই খাই!' বলে তারা দু'জন চলে আসলেন ভূগর্ভস্থ কক্ষে। মেজর সাহেবকে দেখে সালমান সশ্রদ্ধ সালাম জানাল। তিনি সালামের উত্তর দিয়ে তার শয্যাপার্শ্বে বসলেন। অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন, 'শারীরিক অবস্থা কেমন বুঝতেছো বেটা? হাতের ব্যথা কমেছে তো?'

'আল্লাহর অশেষ এবং খাছ মেহেরবাণীতে এখন অনেকটা স্বাচ্ছন্দবোধ করছি' উত্তর দিল সালমান 'হয়তো অল্পদিনের মধ্যেই পুরোপুরি সুস্থ হয়ে উঠবো। হাতের ব্যথাও অনেকটা কম অনুভূত হচ্ছে।'

'রাতের খানা এখনও খাওনি কেন বেটা'–বললেন মেজর সাহেব–'মামনি বলল মুয়াজও নাকি খায়নি এখনও।'

'ভেবেছি আপনি আসলে একত্রে খাব আর গল্প করবো' বলল সালমান আর মুয়াজ তো আমি যা করি তাই অনুস্মরণ করার চেষ্টা করে।'

'এমনটি আর করনা বাবাজি!' বললেন মেজর সাহেব–'কারণ যুদ্ধ চলছে এখন তুমুলবেগে। কখন কোথা থেকে কোথায় যেতে হয় তা বলা যায়না। এমনও হতে পারে যে, কোনদিন আমি বাড়ি ফিরতেও পারবো না। তাই বলে তো আমার অপেক্ষায় তোমার বসে থাকা চলবে না। তুমি অসুস্থ। তোমার খাওয়া, ঘুম এবং ঔষধ সেবন সময়মত হওয়া অত্যন্ত জরুরী। আর এই নাও তোমার হাসপাতালে ফেলে আসা ঔষধ। আর নতুন ঔষধ, দিয়েছেন ডাক্তার।'

'চাচাজান আপনার তুলনা শুধু আপনিই' আপ্লুত কণ্ঠে বলল সালমান–'আমরা জানতাম প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম একজন একনায়কতান্ত্রিক স্বৈরশাসক। আর তার প্রশাসন, সেনাবাহিনী, পুলিশ বাহিনী, রিপাবলিকান গার্ড, ফেদাইন মিলিশিয়া সবই তার সেই স্বৈরতন্ত্রের সহযোগী। সেক্ষেত্রে আপনাকে দেখছি সম্পূর্ণ বিপরীত একজন সৎ, বন্ধুবৎসল, মানবিক দায়িত্ব সম্পন্ন, ও কোমল হৃদয় অতিথি পরায়ণ লোক হিসেবে।'

'শোন সালমান! তুমি একজন সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিক হিসেবে তোমার কাছে সত্য প্রকাশে আমার দ্বিধা নেই'–বললেন মেজর সাহেব–'সাদ্দাম হোসেন শুধু যে একনায়কতান্ত্রিক স্বৈরশাসক তাই নয় বরং সে একজন কমিউনিস্ট এবং তার পার্টি হচ্ছে বাথ পার্টি অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টি। আর তোমার অবশ্যই জানা আছে যে, কমিউনিস্টরা শুধু আল্লাহ্-রাসূলকেই অবিশ্বাস করেনা বরং তারা কোন ধর্মের অস্থিত্বই মানতে চায় না। কমিউনিস্টরা বলে, "ধর্ম একপ্রকার আফিম স্বরূপ যা মানুষকে মাতাল করে রাখে।" তাই বিজ্ঞ মুফতিগণ সাদ্দামকে কাফের হিসেবে ফতোয়া দিয়েছেন। তাঁরা এও বলেছেন 'ইসলামের সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই।'

'কিন্তু চাচাজান ২০ মার্চ মার্কিনীদের ইরাক আক্রমণের দু'সপ্তাহ আগে ২৪ ফেব্রুয়ারী আমেরিকার সিবিএস নিউজ-এর সাংবাদিক ড্যান র‍্যাদারকে সাদ্দাম হোসেন একটি দীর্ঘ

সাক্ষাৎকার দেন' –বলল সালমান–'সে সাক্ষাৎকারে মিঃ র‍্যাদারের এক প্রশ্নের জবাবে সাদ্দাম হোসেন বলেছিলেন, "আমার জন্ম ইরাকে এবং আমার জন্ম একজন প্রকৃত ঈমানদাররূপে। মুসলমান হিসেবে জন্মলাভ করায় আমি গর্বিত এবং আমি আমার সন্তানদের ঐতিহাসিক মূল্যবোধ এবং মানষিক মূল্যবোধের শিক্ষা দিয়েছি–যে মূল্যবোধের ভিত্তি ঈমান, যা মানুষ গ্রহণ করেছে, প্রত্যেকে গ্রহণ করেছে। সমগ্র সম্প্রদায়, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে।" তিনি র‍্যাদারের অন্য এক প্রশ্নের জবাবে বলেন "সবই আল্লাহ্‌র ইচ্ছা। আমরা ঈমানদার। আমরা বিশ্বাস করি, তিনি যা চান তাই হয়। ঈমান ছাড়া, বিশ্বাস ছাড়া জীবনের কোনও মূল্য নেই। ঈমানদাররা সব ধরনের বিপদাপদ এবং শত্রুদের পাতা ফাঁদ এড়িয়ে চলার জন্য সাবধান ও সতর্কতা অবলম্বন করে থাকেন এবং বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ্ যা করেন তা মেনে নিতে হয়।"

সালমানের এই বক্তব্য শুনে মেজর সাহেব হেসে বললেন–'দেখ সালমান! আমি একজন ইরাকী এবং সাদ্দাম হোসেনের স্পেশাল বাহিনীর একজন পদস্থ অফিসারও বটে। তার সম্বন্ধে আমার চেয়ে তুমি বেশী অবগত নও। তুমি তার সম্পর্কে যে তথ্য তুলে ধরেছো এটা কোন বাস্তবতা নয়। এসব ক্ষমতাপাগল শাসকগোষ্ঠীর মৌখিক বুলি মাত্র। ভিতরগত অবস্থা সম্পূর্ণ এর বিপরীত। তাছাড়া তার এ সকল কথাবার্তা এমন এক সময়ের বলে তুমি উল্লেখ করেছ, যখন সে এক ভয়াবহ বিপদের মুখোমুখি দাঁড়ানো। কথায় বলে, "বিপদে পড়লে পাক্কা কাফেরও আধা মুসলমান হয়ে যায়।" সাদ্দাম হোসেনের অবস্থাও ঠিক তাই। তিনি এখন আল্লাহর সিদ্ধান্ত মেনে নিতে চান এবং শত্রুর পাতা ফাঁদ এড়িয়ে চলতে চান। অথচ মহান রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়েছে আজ থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বে। আল্লাহ্ তায়ালা সাবধান করে বলেন, "হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করোনা। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ জালেমদেরকে পদ প্রদর্শন করেন না।* তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ তাঁর রাসূল এবং মুমিনবৃন্দ-যারা নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং বিনম্র।* আর যারা আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং বিশ্বাসীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, তারাই আল্লাহর দল এবং তারাই বিজয়ী। (মায়েদাহ ঃ ৫১, ৫৫, ৫৬)

অথচ ক্ষমতা গ্রহণের পর সাদ্দাম হোসেন আল্লাহর সিদ্ধান্ত লংঘন করে ইহুদী-খৃষ্টানদের সাথে বন্ধুত্ব করে জালিমের খাতায় নাম লেখান। অনেক বিলম্বে হলেও তিনি এখন বুঝতে পারছেন, এককালের মার্কিনী বন্ধুত্ব ছিলো পরাশক্তির খেলার বিষয়। তিনি খেলেছিলেন খেলোয়ার হিসেবে, ফায়দা লুটেছে ইহুদী-খৃষ্টানরা। এখন সাম্রাজ্যবাদীদের দৃষ্টিতে খেলোয়ার হিসেবে তিনি অযোগ্য। তাই খেলার রঙ্গমঞ্চ থেকে তাকে হটিয়ে নতুন খেলোয়ার নিয়োগ দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে মার্কিন কর্তা ব্যক্তিরা; যে খেলোয়ার দক্ষতার সাথে খেলবে আয়োজকদের ইচ্ছামতো। এই বাস্তব সত্যটি তিনি

এখন বুঝতে পেরেছেন। সেজন্য এখন তার মুখে শুনা যায় সাধু হওয়ার ধুলি। ঈমানদার-মুসলমান হওয়ার লম্বা চওড়া দাবি। প্রকৃত পক্ষে সাদ্দাম হোসেন তার দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে ইসলামের সাথে এবং ইসলামী ভাবাপন্ন জনতার সাথে এমন বৈরী আচরণ করেছেন যা রীতিমত লোমহর্ষক। এ সকল লোকেরা মুখ ফুটে নিজেদের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করতে পারেনি। ঈমানের কথাও তারা চিৎকার দিয়ে বলতে পারেনি। বরং ইচ্ছা করলে বেলেল্লাপনা করতে পেরেছে, অনৈতিক কাজ করতে পেরেছে। খাও-দাও ফূর্তি করার সুযোগ পেয়েছে। পায়নি শুধু ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ এর ভূমিকা পালন করতে। তিনি যদি প্রকৃত মুসলমান হতেন, পাক্কা ঈমানদার হতেন তবে এটা করার সুযোগ নিশ্চয়ই তিনি করে দিতেন। এবার মেজর সাহেব একটু থেমে পুনরায় বললেন, বেটা সালমান! শত হলেও তিনি আমাদের প্রেসিডেন্ট। তুমি আমাদের মেহমান তাই তোমার কাছে সব বলা সঙ্গত নয়; নতুবা তার অপকর্মের এবং ইসলামের সাথে বৈরীতার সকল ফিরিস্তি আমার জানা আছে।

'চাচাজান! সংক্ষিপ্ত করে হলেও বলুন, অত্যন্ত বিনয়ের সাথে সালমান বলল, কেননা আমরা অনেকেই সাদ্দাম হোসেনকে মুসলিম বীর যোদ্ধা অন্য কথায় বীর মুজাহিদ হিসেবে জ্ঞান করি। আমাদের দেশের এবং অপারাপর মুসলিম দেশেরও প্রায় সকল পত্রিকায় তাকে এ দৃষ্টিকোণ থেকেই মূল্যায়ন করা হয়। আমরা যেহেতু প্রচলিত সাংবাদিকতার উপরে উঠে, সত্যকে সঠিকভাবে তুলে ধরার প্রত্যয় নিয়েছি, তাই আপনার কাছ থেকে এ ব্যাপারে সঠিক তথ্যটা জানতে চাচ্ছি।

পাকিস্তানী এই সৎ সাংবাদিকের বিনীত যুক্তির কাছে মেজর সাহেব হার মানতে বাধ্য হলেন। তিনি বললেন, 'ঠিক আছে বাবাজি! বলছি তবে। আসলে সত্য প্রকাশে আমার দ্বিমত নেই। রাত্র বেশী হওয়ায় আলোচনা দীর্ঘায়িত করতে চাচ্ছিলাম না। সে যা হোক, আমি সাদ্দামের কাফির হওয়া সম্পর্কে বিশ্ববিখ্যাত আলেমে দ্বীন, বীর মুজাহিদ, মুফ্তী, শহীদ কমান্ডার ডঃ আব্দুল্লাহ্ আয্যম (রহঃ)-এর ফতোয়াই তোমাকে শোনাচ্ছি। তিনি বলেছেন, "সাদ্দাম যে ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। কেননা তিনি বাথ পার্টির আদর্শ ও গঠনতন্ত্রে বিশ্বাসী। তিনি বাথপার্টির একজন অন্যতম প্রচারক। কাফের-খৃষ্টান মাইকেল আফলাক তার আদর্শ ব্যক্তি। তাকে তিনি স্মরণ করেন দীক্ষাগুরু বা আদর্শিক নেতা বলে। মাইকেল আফলাক সম্পর্কে সাদ্দাম হোসেন বলেন, "আমি আমার মহান দীক্ষাগুরুর সামনে একঘন্টা বসে থাকলে আগামী ছয়মাস চলার মত আত্মিক শক্তি নিয়ে ফিরে আসি।' এধরনের কথা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। তাছাড়া বাথ পার্টির সক্রিয় কর্মীরা বিশ্বাস করে, এখন ইসলাম ছেড়ে সকলকে বাথ পার্টি গ্রহণ করা উচিত। ইসলামের স্থান এখন বাথ পার্টি দখল করে নিয়েছে। আরব জাতীয়তাবাদ এখন আরবদের ঐক্যের প্রধান নেয়ামক। বাথ পার্টির এ দর্শন ইসলামের চেয়ে উত্তম। এ ধরনের কথা বলার কারণে তারা ইসলাম ধর্ম থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে।

এছাড়া বাথ পার্টির লোকেরা দামেস্ক রেডিও থেকে সম্প্রচারিত একটি পংক্তির কথা মানুষের কাছে প্রচার করে। পংক্তিটি হলো– "আমি বাথ পার্টিকে রব হিসেবে বিশ্বাস করি, যার কোন অংশীদার নেই। আমি আরব জাতীয়তাবাদকে ধর্ম হিসেবে বিশ্বাস করি যার কোন বিকল্প নেই।"

বাথ পার্টির সদস্যরা বলে, আরব জাতীয়তাবাদ আমাদের নিকট একটি ধর্ম। আমরা হলাম আরব জাতীয়তাবাদী। মাহমুদ তাইমুর নামক এক বাথ পার্টির সদস্য বলেছিল, "প্রত্যেক যুগে কোন একটি বিষয়ে নবুয়ত হয় আর এ যুগের নবুয়ত হল 'আরব জাতীয়তাবাদ।' তাই প্রত্যেক আরবের উচিত, মুসলমানদের কুরআনের উপর ঈমান আনার ন্যায় আরব জাতীয়তাবাদের উপর ঈমান আনা।"

তাই এরা কাফের। সাদ্দাম হলো এদের নেতা। সে তার চারপাশে বাথ পার্টির আদর্শে বিশ্বাসী একদল স্বার্থান্বেষী লোককে জড়ো করেছে। সাদ্দাম এদের বিভিন্নভাবে পুরস্কৃত করছে। কাউকে ডক্টরেট ডিগ্রী দিচ্ছে। কাউকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উঁচু পদে আসীন করেছে। তাই বাথ পার্টির আদর্শে উজ্জীবত হয়ে সাদ্দামকে লক্ষ করে শফিক কামানী নামক এক কবি বলেছিল– " আমাদের মাঝে আপনার জ্যোতির্ময় ়বিত্র চেহারা উজ্জ্বল হয়ে বিভা ছড়াচ্ছে আল্লাহর চেহারার ন্যায় যাকে সিক্ত করা হয় মহিমার পরশে।" (নাউযুবিল্লাহ) এখন তুমিই বল সাদ্দাম কি কাফের নয়?'

'উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা তো স্পষ্টভাবেই তা প্রমাণিত হলো' বলল সালমান।

'ধর্মদ্রোহীতার সাথে সাথে স্বদেশী জনগোষ্ঠীর উপর সাদ্দাম ও তার বাহিনীর মধ্যযুগীয় বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতা হিটলার, মুসোলিনি, হালাকু খান ও স্টালিনের নির্মমতা ও হত্যাযজ্ঞের সাথে তুলনীয়' বললেন মেজর সাহেব–'তোমরা যতই "বাপের বেটা সাদ্দাম" বলে বাহবা দেওনা কেন আসলে সে "পাপের বেটা সাদ্দাম"। ১৯৬৮ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের পর সাদ্দামের রাজনীতির মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় যেন শিয়া ও কুর্দিদের রাজনৈতিকভাবে অবদমন, বিরোধী নেতা কর্মীদের নির্বিচারে হত্যা ও নির্যাতন। তার ক্ষমতার ভিত্তি বন্দুকের নল। দোসর হিসেবে আছে দু'পুত্র উদে-কুসে, নিকট স্বজন, বাথ পার্টির নেতা-কর্মী ও পেটোয়া বাহিনী রিপাবলিকান গার্ড। কি অবিশ্বাস্য নির্মমতায় সাদ্দাম নিজ দেশের জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অর্হনিশি যুদ্ধ করছেন তা ভাবতেও গা শিউরে উঠে। সাদ্দাম হোসেন ছিলেন মূলত প্রেসিডেন্ট আহমদ হাসান আল-বাকারের লাঠিয়াল বাহিনীর প্রধান। পরবর্তীতে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ইরাকের শাসক হওয়ার পর নিজের ভাই ক্যামিক্যাল আলীকে তিনি লাঠিয়াল বাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করেন। কুর্দি বিদ্রোহ দমনে ক্যামিক্যাল আলীর বর্বরতা আঁতকে উঠার মত। ১৯৮৮ সালে ইরান-ইরাক যুদ্ধ স্থগিত চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার ৪৮ ঘণ্টা পর ইরাকী বিমান থেকে কুর্দি গ্রামগুলোতে নির্বিচারে রাসায়নিক অস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়। ১৯৯১ সালে মোহাভিলে শিয়াদের বিরুদ্ধে যে গণহত্যা চালানো হয়, আমি তার একজন প্রত্যক্ষদর্শী ছিলাম। বুলডোজার দিয়ে নিহতদের

লাশ মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়েছিল। ১৯৯০ সালে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক প্রতিবেদক জানান, ইরাকের মানবাধিকার পরিস্থিতি এতটা ভয়াবহ যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তার তুলনা পাওয়া অসম্ভব।

মেজর সাহেব একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলেন–সালমান! ইতিহাস মানবজাতির বড় শিক্ষক। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা জানতে পারি নৈতিক অধঃপতন ও বিলাসিতা দুনিয়া জুড়ে যে কোন রাজবংশ, সরকার প্রধান, রাষ্ট্রপ্রধান ও রাজনৈতিক নেতার পতনের অন্যতম কারণ। ইসলামের দেড় হাজার বছরের ইতিহাস প্রমাণ করে যে, উমাইয়া, আব্বাসিয়া, সেলজুক, ফাতেমীয় ও উসমানীয় রাজত্বের অবসানের পেছনে মদ, নারী ও সঙ্গীতের প্রতি শাসক ও রাজন্যবর্গের আসক্তিই কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। উমাইয়া খলিফাদের মধ্যে ওমর ইবন আব্দুল আযীয ব্যতীত মোটামুটি সব খলিফা উপপত্নী রাখতেন। খলিফাগণ রাজধানী দামেস্কসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য প্রমোদ প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এসব প্রাসাদের শয়ন কক্ষে নগ্ন চিত্রাবলী শোভা পেত।

ইতিহাসের ঘটনাবলীর কি বিস্ময়কর সামঞ্জস্য ও সংগতি! হাজার বছর পর সাদ্দামের রাজত্বকালে অতীতের অধঃপতন ও বিলাসিতার হুবহু মিল পাওয়া যায়। প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের দু'স্ত্রী ছাড়াও ল্যামসন্স নামে এক উপপত্নী আছে। সাদ্দাম অতীতের বিলাশী রাজাদের ন্যায় ইরাকের বড় বড় শহরে রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেছেন অনেকটা অপ্রয়োজনীয় কারণে। প্রতিটি প্রাসাদে আছে প্রমোদ কুঞ্জ। এসব প্রাসাদে প্রবেশ করলে মনে হবে কোন এক স্বর্গে এসে উঠেছি। আমি একবার সাদ্দাম হোসেনের বডিগার্ড বাহিনীর প্রধান হিসেবে একটি প্রাসাদে ঢুকেছিলাম। তার ভিতরকার অবস্থা দেখে আঁতকে উঠেছি। এরকম প্রাসাদ জীবনে তো কখনও দেখিনি, এমনকি কখনো কল্পনাও করিনি।

প্রাসাদগুলোতে জনসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ। কড়া নিরাপত্তা বেষ্টিত প্রাসাদে সাদ্দামের পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন সময় অবস্থান করে। সাদ্দাম তার দীর্ঘ শাসনকালে দেশে আটটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন। প্রাসাদগুলোর বৃহদাকার বেডরুমগুলো আলিশান হোটেলের বেডরুমের আদলে গড়া। অত্যাধুনিক মানের ফার্নিচারগুলো খালি, তবে তা যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য অত্যন্ত ভাল কাপড় দিয়ে মোড়ানো থাকে। প্রাসাদে আসা মেহমানদের জন্য রয়েছে বড় বড় সুইমিংপুল। এছাড়া অনেকগুলো দরজা। দরজাগুলোও সুদৃশ্য এবং এতে রয়েছে বেশ কারুকাজ। কোন কোন প্রাসাদ রয়েছে যেগুলোতে প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম বা তার পরিবারের সদস্যদের কেউ গত ১০ বছরেও যাননি। তাতে কি? এগুলো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্টাফ রয়েছে যথারীতি। ২৪ ঘণ্টা নজরদারি ও ঝাড়ামোছার কাজে ডজন ডজন স্টাফ সেখানে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের ধারণা, এই বুঝি প্রেসিডেন্ট তার প্রাসাদে চলে আসছেন। বসরার প্রাসাদ নির্মিত হয় ১৯৯২ সালে। সে সময় থেকে প্রেসিডেন্ট এ পর্যন্ত সেখানে এক অথবা দু'বার গেছেন। প্রতি প্রাসাদের

চারপাশে পাহারার জন্য পাঁচ শতাধিক রিপাবলিকান গার্ড প্রস্তুত থাকে। প্রাসাদগুলোতে করিডোর, লন ও ফ্লোর অসংখ্য। প্রবেশদ্বার থেকে অভ্যর্থনা রুম পর্যন্ত যাওয়ার পথ মার্বেল পাথর ও মোজাইক পাথর দিয়ে তৈরী। শত শত কোটি ডলার ব্যয়ে নির্মিত প্রাসাদগুলোতে রয়েছে অসংখ্য কক্ষ। এর প্রতি কক্ষ ও কক্ষে যাওয়ার পথে সাদ্দাম হোসেনের ছবি টানানো। অভ্যর্থনা কক্ষের ফার্নিচার অত্যন্ত রাজকীয়। টেবিল, চেয়ার, সোফাসেট কোনটির কমতি নেই। রয়েছে বিভিন্ন শিল্প কর্ম খচিত বড় বড় পোষ্টার। দেয়ালে নগ্নবক্ষা স্বর্ণকেশী সুন্দরী তরুণীর চিত্র। টেবিলে, আলমারীতে অসংখ্য বিদেশী দামী মদ ভর্তি বোতল। প্রতি রুমে সুসজ্জিত বেড পড়ে আছে। প্রতি রুমেই রয়েছে একাদিক রঙিন টেলিভিশন। রান্না ঘরগুলোও সুসজ্জিত। প্রাসাদের বাইরে ফুলবাগানে ঘেরা, যার পরিচর্চায় রয়েছে বেশ কিছু মালী। এককথায় বলতে কি প্রেসিডেন্ট সাদ্দামের এই রাজকীয় প্রাসাদগুলি দুনিয়াতে অভিশপ্ত সাদ্দাদের তৈরী বেহেশতের মত এক একটা বেহেশেতের বাগিচা যেন।'

বলতে বলতে মেজর সাহেব একটা তপ্ত নিঃশ্বাস ফেলে বললেন 'সালমান! সত্যি বলতে কি, মানুষ সুখের দিনে আল্লাহকে বুলে যায়। এমনকি আল্লাহর সাথে বেআদবী করতেও কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু দুঃখের দিনে আল্লাহর নামের জপমালা ত্যাগ করতে চায় না। সাদ্দাম হোসেনের ব্যাপারটাও তাই ঘটেছে। সাদ্দাম হোসেন তার রাজত্বকালের সূচনাতে গঠন করেন বাথ পার্টি, যার আদর্শ সম্বন্ধে একটু আগেই তোমাকে বলেছি। ২৫ বছরের রাজত্বের সমাপ্তি লগ্নে সাদ্দাম জাতীয় পতাকায় 'আল্লাহু আকবর' সংযোজন করেছেন। মুখে আল্লাহর জপমালা, মুসলমান হওয়ার গৌরব আর ঈমানদার হওয়ার দাবী। কিন্তু তার এই দীর্ঘ শাসনামলে ইরাকে কোন বিশ্ববরেণ্য আল্লামা, মুফ্‌তী, মুহাদ্দিস ও বুযুর্গের জন্ম হয়নি। আগে থেকেই যারা ছিলেন তাঁরা পার্শ্ববর্তী দেশে হিজরত করে চলে গেছেন। কোথায় গেল 'মুসতানসিরিয়া' মাদ্রাসা ও 'নিজামিয়া মাদ্রাসা', যেখান থেকে ইমাম গাজ্জালীর মত বিশ্বখ্যাত দার্শনিক তৈরী হয়েছেন?

আমার ভাবতেও কষ্ট হয় যে, আরবী ভাষা, সাহিত্য, ইসলামিক স্টাডিজ, ফিক্‌হ এবং হাদীস বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীরা ভারত, পাকিস্তান, সউদী আরব, মিশর গিয়ে থাকে। কিন্তু সাদ্দামের ২৫ বছরের রাজত্বকালে উচ্চতর ইসলামী উলুম হাসিলের জন্য কোন বিদেশী ছাত্র বাগদাদ এসেছে এমন নজীর নেই। সাদ্দাম হোসেন মূলত সেকুলার চিন্তাধারার লোক। ধর্মের বর্ম ও নামাবলী রাজনৈতিক চাতুর্য মাত্র। তুরস্কের কামাল পাশা, সিরিয়ার হাফিজ আল আসাদ, বাংলাদেশের শেখ মুজিবুর রহমান, তিউনিসিয়ার হাবিব বরগুইরা, মিশরের জামাল আবদুন নাসের ও ইরাকের সাদ্দাম হোসেন একই চিন্তা-চেতনা ও চরিত্রের লোক। বাগদাদ, বসরা, কুফা, নাজাফ, নাসিরিয়া, উম্মে কসর, কিরকুক ও তিকরিতের পথে পথে সাদ্দামের মূর্তি ও ভাস্কর্য ধর্মবিশৃখতারই স্বাক্ষর বহন করছে।

তবে হ্যাঁ, সাদ্দাম ও তার প্রশাসন যে রকমই হোক না কেন, ইরাকের সেনাবাহনীর সকলেই কিন্তু বাথ পার্টির সদস্য নয়। আমার ন্যায় আরও বেশ ক'জন মেজর ও কর্ণেল

এমন আছেন যারা সদা-সর্বদা নীতির প্রশ্নে অটল। অবশ্য এ কারণে মাঝে মাঝে আমাদের কঠিন সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়।'

'আসলে এটাই সত্য যে শাসকগণ তাদের দুর্নীতি ও পাপাচারের কারণে যখন জাতিকে ধ্বংসের বেলাভূমিতে ডুবাতে শুরু করে, তখন সেনাবাহিনীর দু'চারজন সেসকল কর্তব্যনিষ্ঠ কর্মী যারা নীতি আদর্শ ও দেশপ্রেমের প্রশ্নে অটল-অবিচল, তারা জাতির কান্ডারীর দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেন।' –বলল সালমান–'কখনও তারা সফল হন, আবার কখনও হন বিফল। জানিনা আপনারা ইরাকী জাতির এই আধা ডুবো তরীকে রক্ষা করতে কতটুকু সফল হবেন!'

'আমিও সেই চিন্তাই করছি সালমান!' মেজর সাহেব বললেন।

রুকাইয়া তার পিতার ডানপার্শ্বের চেয়ারে বসে এসকল গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনছে। ওড়নী দিয়ে তার মাথা ঢাকা। তবে এখন সে ওড়নীটি এমনভাবে পড়েছে যে, তাতে তাঁর মুখমন্ডল আসপাশ থেকে দেখার কোন উপায় নেই। মুয়াজও খাটের উপরে সালমানের পাশে বসা। সেও এই আলোচনা মনযোগ দিয়ে শ্রবণ করছে। সে এমন নিবিষ্ট মনে আলোচনা শুনছে যে, এ মুহূর্তে কেউ দেখলে মনে করবে সেই যেন এখানের প্রধান শ্রোতা। এ পর্যায়ে রুকাইয়া বলল, 'আব্বাজান আলোচনা তো অনেক হলো, এখন খানা পরিবেশন করি?' মেজর সাহেব হ্যাঁ বলায় রুকাইয়া খাটের উপর দস্তরখানা বিছিয়ে খানা পরিবেশন করল। সে নিজেও একটি প্লেট নিয়ে পিতার পাশ দিয়ে বসে গেল।

খানা খাওয়ার ফাকে সালমান মেজর সাহেবকে লক্ষ্য করে বলল, 'চাচাজান আমার কৌতুহল নিবারনের জন্য আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে চাই।'

'কৌতুহল!'– বিস্মিত কণ্ঠে বললেন মেজর সাহেব–'এ মুহূর্তে আবার তোমার কিসের কৌতুহল জাগ্রত হল বেটা!'

'রাত্র অনেক হয়েছে আপনি যদি বিরক্তবোধ না করেন তবেই কেবল প্রশ্নটা করতে পারি।' হেসে হেসে বলল সালমান।

'আমি শুধু তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সারতে বলছি তোমার জন্য' – বললেন মেজর সাহেব–'যেহেতু তুমি অসুস্থ। তোমার ঠিকমত বিশ্রাম এবং রেস্টে থাকা প্রয়োজন। কথা কম বলাই মঙ্গলজনক। ঘুম সময়মত হওয়া উচিত; এজন্যই আমি আলোচনাটা আর সামনে বাড়াতে চাচ্ছি না।'

'আপনি সে চিন্তা করবেন না চাচাজান!' সালমান বলল, 'আমিতো এখন সারাক্ষণই প্রায় বিশ্রামে থাকি এবং যখন ইচ্ছা, যতক্ষণ ইচ্ছা ঘুমাতে পারি। তাই আপনি যদি অনুমতি দেন তবে প্রশ্নটা করতে পারি। নতুবা এই কৌতুহল আমাকে রাতে ঠিকমত ঘুমাতে দিবেনা।'

'তাই নাকি! তবে কর প্রশ্ন, শুনি তোমার কৌতুহল।' হেসে বললেন মেজর সাহেব।

'আমার প্রশ্ন এবং কৌতুহল এটাই' বলল সালমান–'আপনি এত টাকা ব্যয় করে এই বাংকার কেন তৈরী করলেন?'

'এই কি তোমার কৌতুহল নাকি আর কোন প্রশ্ন আছে?' বললেন মেজর সাহেব 'অন্য প্রশ্ন থাকলে তাও বলতে পার।'

'আপাদত এতটুকু জানলেই চলবে' হেসে বলল সালমান।

'আচ্ছা সালমান তুমি বলতো'– মেজর সাহেবও পাল্টা প্রশ্ন করলেন, 'আমি যে এই বাংকার তৈরী করেছি তা এখন কাজে লেগেছে কিনা?'

'জি তা তো অবশ্যই লেগেছে।' বলল সালমান।

'তবে মনে করতে পার। এমন একটা সময়ের জন্যই আমি এত ব্যয়বহুল এবং সুরক্ষিত এই পাতালকক্ষ বানিয়েছি– মেজর সাহেব বলে চললেন–'অবশ্য এর পিছনে উৎসাহদাতা আমার পরম শ্রদ্ধেয় পিতা, যিনি ছিলেন ইসলামী বিপ্লবী চেতনার সিংহপুরুষ। সারাটি জীবন তিনি দ্বীনের বিজয়ের জন্য, আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় স্বপ্ন ছিল মসজিদুল আকসাসহ সমগ্র ফিলিস্তিনভূমিকে স্বাধীন করা এবং এই ইরাকের হারানো খেলাফত ফিরিয়ে আনা। এ লক্ষেই তিনি আমাকে সেনাবাহিনীতে ভর্তি করিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর জীবনের সে স্বপ্নসাধ পূরণ হবার পূর্বেই তাঁর জীবন প্রদীপের তেল দ্রুত ফুরিয়ে আসছিল। এরই কোন এক বিকেলে আব্বাজান আমাকে ব্যারাক থেকে ডেকে আনালেন। আমি এসে পৌঁছলে আমাকে তিনি তাঁর কোলের কাছে টেনে বসান।

এরপর আব্বাজান আমাকে উদেশ্য করে বলতে লাগলেন, 'বেটা আসাদ! জালিমের এই দুনিয়া থেকে আমার বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এসেছে। মনে হয় আমি এখানে আর কয়েক মুহূর্তের মেহমান। তাই তুমি আমার জীবন সায়াহ্নের ক'টি কথা মনযোগ দিয়ে শুন। আমার জীবনের আশা আকাংখা, স্বপ্নসাধ সবই তুমি অবগত আছ। আমি চেয়েছিলাম ইরাক সত্যিকারে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত হোক। কিন্তু তা হয়নি। জালিম তা হতে দেয়নি। আমার সে আশা স্বপ্ন এখন দাফন হবার প্রস্তুতি নিচ্ছে।'

আমি বললাম, আব্বাজান কেন হয়নি? কোন জালিম তা হতে দেয়নি? তিনি বললেন, 'ওই বদমাশ সাদ্দামের কারণে হয়নি। সে হতে দেয়নি। আমি একাধিকবার তাকে দেশে ইসলামী শাসন প্রবর্তনের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছি, উৎসাহ দিয়েছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় সে দেশকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার পরিবর্তে বিদেশী সম্রাজ্যবাদীদের ইঙ্গিতে দেশতে ইসলামমুক্ত করে ছেড়েছে। সারাদেশে সে নিজের মূর্তি তৈরী করে দেশটাকে পরিণত করেছে পূজা মন্ডপে, আর নিজে সেজেছে ফেরাউনের ন্যায় খোদা। ফেরাউনী কায়দায় বন্ধ করে দিয়েছে ধর্মীয় শিক্ষার পথ। এরপর সেই বিদেশী প্রভুদের ইশারায় ১৯৮০ সে বিনা প্ররোচনায় ইরানের সাথে যুদ্ধ বাজিয়ে দেশকে মারাত্মক বিপর্যয়ের মুখে নিক্ষেপ

করেছিল। এখানেই সে থেমে থাকেনি ১৯৯০ সালে ওই আমেরিকার পরামর্শেই কুয়েতে অভিযান চালায়। যা পুরা আরব তথা মুসলিম বিশ্বের জন্য সমূহ বিপদ সৃষ্টি করে। সাদ্দাম জুজুর ভয় দেখিয়ে আমেরিকা আরব বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশে ঘাটি করে বসে। এই পাপিষ্ট স্বজাতীয় গাদ্দারের উছিলায় প্রিয় রাসূল (সাঃ)-এর জীবনে সর্বশেষ অসিয়ত 'তোমরা ইহুদী নাসারাগণকে জাজিরাতুল আরব থেকে বের করে দাও' এর অমান্য করা হয়। ইহুদী নাসারাগোষ্ঠী পবিত্র হারামাঈন শরীফাইনে প্রবেশ করে তার পবিত্রতাকে বিনষ্ট করে চলছে প্রতিনিয়ত।'

'আব্বাজান কিছুক্ষণ থেমে থেকে পুনরায় আমার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন 'ইরান-ইরাক যুদ্ধের সময় ইরানের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য আমেরিকা সাদ্দামকে জৈবিক ও রাসায়নিক অস্ত্রের উপাদান সরবরাহ করেছিল। এর পিছনে আমেরিকার উদ্দেশ্য ছিল অত্যন্ত খারাপ। তার লোলুপ দৃষ্টি ছিল ইরাকের তেলের উপর। তাই সে সাদ্দামকে এই অস্ত্র দিয়ে এক ঢিলে দুইপাখি শিকারের পথ পরিস্কার করেছে। একদিকে সাদ্দামকে নায়ক সাজিয়ে কুয়েত দখলের নাটক মঞ্চায়ন করে অন্যান্য আরবীয় সরকারগুলিকে এই 'কাগুজে বাঘ সাদ্দামের' ভয় দেখিয়ে নিজের বাগে এনে স্থায়ী সামরিক ঘাটি গারতে সক্ষম হয়েছে। অপরদিকে ইরাককে এখন নিষিদ্ধ অস্ত্রমুক্ত করার অভিযোগ তুলে ইরাকের বালুর নিচের 'তরল স্বর্ণ' তেল লুট করার পায়তারা চালাচ্ছে। আমার ভয় এবং আশঙ্কা হচ্ছে, আমেরিকা তার এই দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে অচিরেই ইরাকে আগ্রাসন চালাতে পারে।'

আমি আব্বাজানের একথা শুনে ভীত ও চিন্তিত হয়ে পড়লাম। তিনি আমাকে অভয় দিয়ে বললেন–'আসাদ! ঘাবরে যেওনা। বিপদের কথায় ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়া সাহসী ব্যক্তিদের কাজ নয়। বিপদ যত কঠিন এবং ভয়াবহ হোক, সাহসী ব্যক্তিরা তার মোকাবেলায় দৃঢ়প্রত্যয় নিয়ে সামনে এগিয়ে যায়। তুমি এক সাহসী পিতার গর্বের ধন। বিপদে মুষড়ে পরা তোমার শোভা পায়না। তোমার প্রতি আমার শেষ অসিয়ত এবং নির্দেশ এটাই, অনাগত সেই বিপদের মোকাবেলা করে দেশ-জাতি ইসলামের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য যথোপযুক্ত পদক্ষেপ নাও।'

কথা বলতে বলতে আব্বাজান হাপিয়ে উঠলেন। সহসাই তাঁর রোগ যন্ত্রণা বেড়ে গেল। আমি তাঁর মাথাটা কোলে তুলে নিলাম। তিনি আমাকে আরো কিছু বলতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু মালাকুল মাউত সে সুযোগ তাকে দিল না। তিনি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বলতে বলতে এই দুনিয়া ছেড়ে, আমাকে এতিম করে চলে গেলেন' বলতে বলতে মেজর সাহেব ঢুকরে কেঁদে উঠলেন। তা দেখে সালমানেরও কান্না পেল। সে তাকে সান্তনা দিল।

মেজর সাহেব কিছুটা আত্মস্থ হয়ে বললেন, 'আমি আর আব্বাকে একথা জিজ্ঞেস করার সুযোগ পেলাম না যে, আব্বাজান! আমি কি ধরনের পদক্ষেপ নিব। এর কিছুদিন

পর রুকাইয়ার আম্মা হঠাৎ ইন্তেকাল করেন। এই দু'ব্যক্তির মৃত্যুতে আমি একেবারে ভেঙ্গে পরি। কোন কাজেই মন বসাতে পারছিলাম না।' মেজর সাহেব ধারাবাহিকভাবে বলেই চলছেন আর সালমান, রুকাইয়ার ও মুয়াজ নির্বাক হয়ে শুনছে। খাওয়ার লোকমা কারও মুখেই উঠছেনা।

মেজর সাহেব সর্বমহলেই স্বল্পভাষী মানুষ হিসেবে পরিচিত। যে কোন কথা সংক্ষেপে সারাই তাঁর অভ্যাস। কিন্তু এই মেহমানের সাথে যেভাবে তিনি দীর্ঘ আলোচনা করে চলছেন তাতে রুকাইয়া আশ্চার্যান্বিত হল বটে, কিন্তু কিছু বলল না। আজ তার পিতা এই মেহমানের কাছে এমন কিছু অজানা কথা বলছেন, যা তারও জানা নেই। তাই সে পিতাকে কথা বলতে বারণ না করে সেও বরং রীতিমত শ্রোতা বনে গেলো। সালমানের উছিলায় এসব জানতে পেরে মনে মনে ধন্যবাদ দিল তাকে।

মেজর সাহেব বলে চলছেন–'এরই কোন এক বিকালে মনের বিষন্নতা কাটাতে চলে গেলাম দজলা নদীর তীরে। নল খাগড়ার পাশে ঘন ঘাসে আচ্ছাদিত একস্থানে বসে পড়লাম একা একা। এভাবে অনেক সময় অতিবাহিত হল। দিনমনিটা পশ্চিমাকাশে লালিমা ছড়িয়ে গোধূলীর কোলে মুখ লুকানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে তখন। সূর্যের রক্তরাঙা কিরণমালা দজলার পানিতে দোল খাচ্ছে। আমি পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছিলাম সেই মৃদু ঢেউয়ের উপর আছড়িয়ে পরা গোধূলীবেলার সূর্যের রক্তিমাভা। নদীর দোল খাওয়া পানি এবং সূর্যের রক্তিমাভ কিরণের সংমিশ্রণে আমার মনে হল যেন পুরা দজলায় রক্তধারা প্রবাহিত হচ্ছে! আমি শিউরে উঠলাম। মনটা হায় হায় করে উঠল। কল্পনার পাখায় ভর দিয়ে চলে গেলাম শত শত বছর পূর্বে, ১২৫৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারীর বাগদাদে। যখন মোঙ্গলরা হামলা করে বাগদাদের পাঁচশ' বছরের প্রাচীন নিদর্শনাবলী ধ্বংস করেছিল। লক্ষ লক্ষ মুসলমানকে হত্যা করে দজলার পানিকে রক্তে একাকার করেছিল। ভাবলাম, বাগদাদের কি পুনরায় সেই পরিণতি ঘনিয়ে আসছে। আব্বাজানের কথা এবং আমেরিকার ভাবসাবে তো তাই মনে হয়। তবে কি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বুশ হবে নব্য যুগের হালাকু খান। আব্বাজান তো মৃত্যুর পূর্বে সেরকম ইঙ্গিতই দিয়েছিলেন।

আমি সেখানে বসে এসব কথাই ভাবছিলাম। হঠাৎ কারো হাতের আলতো ছোয়ায় চমকে উঠলাম। ঘার ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখি, আমার বাল্যবন্ধু সাবের আহমেদ দাঁড়িয়ে। তাকে দেখে অন্য কোন কথা না বলে নদীর দিকে ইশারা করে বললাম, 'দেখ সাবের দেখ! দজলায় আজ রক্তধারা প্রবাহিত হচ্ছে।' আমার একথা শুনে সে হাসতে লাগল। আমাকে বলল– 'আসাদ! তোর মাথাটি ঠিক আছে তো! কোথায় রক্ত? কিসের রক্ত?' ততক্ষণে সূর্য অস্তাচলে হারিয়ে গিয়েছিল তাই তাকে আর কিছু বললাম না। দুই বন্ধু একত্রে সেখান থেকে চলে আসলাম। বাড়িতে এসেও কিছু ভাল লাগছিল না। চোখের তারায় শুধু বার বার ভেসে উঠছিল দজলায় দেখা সেই রক্ত প্রবাহের কাল্পনিক প্রতিচ্ছবি।

অন্যান্য রাতের তুলনায় সেদিন রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমাতে গেলাম। ভাবছিলাম ঘুমালে হয়তো একটু শান্তি পাবো। কিন্তু বার বার চেষ্টা সত্ত্বেও ঘুমাতে পারলাম না। ঘুম নামক

শান্তির পরশ আমার সাথে যেন লুকোচুরি খেলছিল। শত চেষ্টায়ও তাকে ধরতে পারছিলাম না। আমার জীবনে এরকম অস্বস্তি না এর পূর্বে কখনো লেগেছে না এর পরে আর লেগেছে। শেষতক বিছানা ত্যাগ করে বাইরে চলে গেলাম কিছুক্ষণ খেজুর বাগানে পায়চারি করলাম। এতে কিছুটা ভাল লাগল। তাই ঘরে এসে ওজু করে দু'রাকাআত নামায পড়লাম। অতঃপর কিছুক্ষণ পবিত্র কুরআন পাক তিলাওয়াত করলাম। মনটা প্রশান্তিতে ভরে গেল। ঘুমে চক্ষু ভেঙ্গে আসল। কোরআন রেখে বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই গভীর নিদ্রায় হারিয়ে গেলাম।

ঘুমের মধ্যে এক আশ্চার্য স্বপ্ন দেখলাম। যে স্বপ্নের বাস্তবরূপ হল আমার এই ভূগর্ভস্থ বাংকার। এর নির্মাণ কাঠামো এবং নকসা সবই স্বপ্নে দেখা। যা বাস্তবায়ন করতে আমাকে একশ' ভাগ গোপনীয়তা রক্ষা করতে হয়েছে। অবশ্য বন্ধু সাবের আহমেদের কাছে এ ব্যাপারে আমি কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ। কেননা বিদেশী নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের এক কর্মকর্তার সাথে সাদ্দামের দুর্ভেদ্য বাংকার তৈরীর সময় তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়। আমি যখন সাবেরের সাথে দজলায় দেখা রক্তস্রোতের ব্যাপারটি এবং সেই রাতে স্বপ্নে দেখা পাতাল কক্ষের নকসা সম্বন্ধে আলোচনা করলাম তখন সে তার সেই বিদেশী ইঞ্জিনিয়ার বন্ধুর কথা আমাকে বলল। অবশেষে সেই ইঞ্জিনিয়ারের সহায়তায় কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা হয়।

এ পর্যন্ত বলে মেজর সাহেব থেমে গেলেন। সালমান জানতে চাইল 'আচ্ছা চাচাজান! কি উদ্দেশ্য আপনি এই দুর্ভেদ্য বাংকার তৈরী করলেন? এখানে তো শুধু লুকিয়ে থাকা যেতে পারে। শত্রুর মোকাবেলা তো এখানে বসে করা সম্ভব নয়।'

সালমানের একথায় মেজর সাহেব বললেন 'দেখো বেটা! রাত এখন একটা বেজে ত্রিশ মিনিট। কথা বলতে বলতে এখনও আমাদের খাওয়া শেষ হলনা। জলদি খাওয়া শেষ করো। তোমার এখনকার প্রশ্নের উত্তর দিনের বেলা আমার মা-মনির কাছ থেকে জেনে নিবে। এর পরের সব কিছুই তার জানা আছে। আমাকে এখন ঘুমাতে হবে। ভোর পাঁচটায় আবার ডিউটিতে যেতে হবে। তুমি রাগ করো না কেমন?'

সালমানও তাকে আর কিছু জিজ্ঞেস না করে তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে শুয়ে পড়ল। মেজর সাহেব রুকাইয়া ও মুয়াজকে নিয়ে ঘরে ফিরতে উদ্যত হলে মুয়াজ বেকে বসল। সে মেহমানের সাথে এখানে থাকবে। মেজর সাহেবও চিন্তা করলেন সালমান রাতে একা থাকতে ভয় পেতে পারে। তাই তিনি মুয়াজকে তার কাছে রেখে রুকাইয়াকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে চলে গেলেন।

বিভিন্ন চিন্তার কারণে সামলমানের চোখে আজ ঘুম আসছেনা। কল্পানায় তার মন ছুটে চলে গেল পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে। সেখানে পত্রিকা অফিসে তার সহকর্মীদের সাথে কাজ করা, সংবাদে সংগ্রহের জন্য বিভিন্নস্থানে ছুটোছুটি ইত্যাদি স্মৃতি মনে জাগে তার। আরো মনে পরে বাড়িতে থাকা মা-বাবা, ভাই এবং ছোট বোন ফাহিমার কথা। এসব চিন্তার মাঝে এক সময় সে ঘুমিয়ে পরে।

দুই

রাজায়-রাজায় যুদ্ধ, রাজ্য দখলের লড়াই, সম্রাজ্য বিস্তারের আগ্রাসন প্রায় প্রত্যেক যুগেই পরিলক্ষিত হয়। মানুষের ওপর মানুষের প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠার চিরায়ত সংগ্রামই তো সত্য-মিথ্যার এবং জালিম-মজলুমের লড়াইয়ের আদি ইতিহাস। কিন্তু এই সময়ের মত দাজ্জালের প্রতিকীরূপ নিয়ে বুশ চক্রের মত এতটা ভয়ঙ্কর ও বীভৎসরূপে আর কোন দানবীয় শক্তির উপস্থিতির কথা ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়না। পৃথিবীজুড়ে মানুষের আবেদন-নিবেদন উপেক্ষিত হলো। ধৃষ্টতার সাথে পদদলিত হলো জাতিসংঘসহ নানা ধরনের আন্তর্জাতিক সংগঠন-সংস্থার দাবি, সনদ এবং অধিকারমালার সকল নীতিমালা। মানবতা, মানবাধিকার, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে মানুষের সৃষ্ট নীতিগুলো পদতলে পিষ্ট হলো। মানবতার এমন বিপর্যয় ও হাহাকার এর আগে এমন উৎকণ্ঠভাবে আর কখনো ধরা পড়েনি কখনও।

রাষ্ট্রের স্বাধীনতা, জাতি-রাষ্ট্রগুলোর অহংকারের সার্বভৌমত্ব বর্বরতার কাছে আর কখনো কি এতটা অসহায়ভাবে পিষ্ট হয়েছে? মানুষের মৃত্যু নিয়ে, শিশু-নারী-বৃদ্ধ আর নিরস্ত্র অসহায় মানুষের মাতম-হাহাকার আর আহাজারীর ভেতর নরপশুদের উল্লাস আর কখনো এতটা ভয়াবহরূপে প্রত্যক্ষ করা গেছে কি? এক কথায় উত্তর 'না'। আফগানিস্তানের মানচিত্র জুড়ে অজস্র শহীদের লাশ, লাশের হাড়গোড় আর রক্তের রেখাগুলোর মাতম বন্ধ হবার আগেই কুঁকিয়ে উঠলো সমগ্র ইরাক, তথা আরব জাহান।' ২০ মার্চ ইঙ্গ-মার্কিন দানবীয় বাহিনী ইরাকে আগ্রাসন শুরুর পর অবিরাম ধারায় অসংখ্য নাপাম, ক্লাষ্টার বোমা এবং নিষিদ্ধ সব বোমা বর্ষণ করে যাচ্ছে বাগদাদ, কারবালা, মশুল, তিকরিত, কিরকুক, বসরা, নাসিরিয়া, নাজাফসহ প্রতিটি শহর-বন্দরে। এতে ইরাকের বিভিন্ন সরকারী- বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং ঘর-বাড়ি ধ্বংস হলেও হানাদাররা তেমন কোন সুবিধা করতে পারছেনা। বরং তুলনামূলক ক্ষতিটা তাদেরই বেশী হচ্ছে। স্বধীনতা প্রিয় ইরাকীরা লাঠি-ছোটা নিয়ে আগ্রাসীদের বিরুদ্ধে দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। তাদের হাতে এ পর্যন্ত বহু বিমান, হেলিকপ্টার, ট্যাঙ্ক এবং বিপুল সংখ্যক সৈন্য হারিয়ে আমেরিকা তার ইরাক আক্রমণের ভুল বুঝতে পারছে। তবে ঐ যে কথায় বলে না! 'মানুষ একটা ভুলের মাশুল দিতে আরো দশটা ভুল করে থাকে!' আমেরিকার অবস্থাও হয়েছে ঠিক তাই। আফগান-ইরাকে হামলা করে সে যে মারাত্মক ভুল করেছে, তার মাশুল অবশ্যই তাকে দিতে হবে।

জোট বাহিনীর ইরাক আক্রমণের আজ ১২তম দিন। এর মধ্যে ইরাকী বাহিনীকে তারা পরাজিত করতে পারেনি। পারেনি বাগদাদের পতন ঘটাতে। আমেরিকা এবার হয়তো তার পূর্বসুরীদের বাতলানো ঘৃণ্য, শঠ এবং প্রতারণার পথ অনুস্মরণ করবে। ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে অর্থ ও ক্ষমতার টোপ ফেলবে ইরাকী বাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মধ্যে। তারপরও কি তারা পারবে ইরাক দখল করতে? হয়তো পারবে! কিন্তু দখলী ইরাক

হবে আমেরিকার জন্য 'গলায় আটকানো কাটার মত।' তখন না পারবে দখলে রাখতে আর না পারবে ছেড়ে দিতে।' এই কথাগুলিই বসে বসে চিন্তা করছিল সালমান। তার মুখোমুখি বসে ছবক পড়ছে মুয়াজ। হঠাৎ একটি ছায়া এসে পড়ল তার সম্মুখে। সে চমকে পিছনে তাকিয়ে দেখল রুকাইয়া এসেছে। তার হাতে একটি টিফিন ক্যারিয়ার।

'ভিতরে আসতে পারি জনাব মেহমান?' দরজায় দাঁড়িয়েই অনুমতি চাইল রুকাইয়া।

'কেন নয়? অবশ্যই আসবে!' দৃষ্টি নিম্নগামী রেখেই সালমান বলল–'এখানে আসতে অনুমতির প্রয়োজন কি!'

'জি, অবশ্যই প্রয়োজন আছে' বলল রুকাইয়া–'যেখানে হোক, যে কারও নিকট হোক, ঘরে-রুমে প্রবেশের পূর্বে অনুমতি নিতে হবে। এটাই আমাদের মহান রাসূলের শিক্ষা।'

'আসলেই তো! বিষয়টি আমার স্মরণ ছিল না।' লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল সালমান।

তা দেখে রুকাইয়া বলল 'এতে লজ্জিত হওয়ার কিছু নেই জনাব। সব বিষয় সব সময় মানুষের মনে থাকেনা। তবে বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি, যাকে ভুল ধরিয়ে দিলে তা শোধরে নেয়। সে যাক, সকালের নাস্তাটা সেরে নিন। মুয়াজ তুমি এখন পড়া বন্ধ রাখ ভাইয়া।'

রুকাইয়া দরস্তখান বিছিয়ে তাদের দু'জনের সামনে নাস্তা সাজিয়ে দিল। সালমান তাকে তাদের সাথে বসতে বললে, সে নাস্তা খেয়েছে বলে জানাল। তারা দু'জন নাস্তা খাওয়া শুরু করল। রুকাইয়া বুক সেলফ থেকে "ইরাকের প্রাচীন ইতিহাস এবং মুসলমনদের আগমন" নামক বইটি এনে একটি চেয়ারে বসে পড়তে লাগল। সালমান তাকে উদ্দেশ্য করে বলল 'রুকাইয়া! তোমার আব্বাজান বলেছিলেন তুমি তাঁর বাংকার নির্মাণের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবগত। তাই সে সম্বন্ধে কিছু বললে খুশি হতাম।'

'আপনি আমাদের মেহমান। আপনি একটি বিষয় জানতে চাইলে সেটা আপনাকে অবগত করানো আমাদের কর্তব্য' –বলল রুকাইয়া– 'ইরাকের ভূ-খন্ডে পাহাড় নেই বললেই চলে, তা অবশ্যই আপনার জানা আছে। এখানে যখন বিদেশী বাহিনী হামলা চালাবে তখন হয়তো ইরাকীদের গেরিলা যুদ্ধে নামতে হবে। আর গেরিলা লড়াইয়ের জন্য পাহাড়ের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। ইরাকে যেহেতু তা কম তাই এই বাংকারের আয়োজন। আর বিদেশী শক্রুরা যে এখানে আগ্রাসন চালাবে তা এক যুগ আগ থেকে তাদের নর্দন-কুর্দনেই বুঝা যাচ্ছিল। উপসাগরীয় যুদ্ধ শেষ হলেও মার্কিনীদের ইরাকের প্রতি আক্রোশ শেষ হয়নি। ফলে গত এক যুগ ধরে তারা ইরাকের উপর হামলা অভ্যাহত রাখে। যার সংক্ষিপ্ত পরিসংখ্যান হল–

* যুদ্ধ শেষে নিরাপত্তা পরিষদের ৬৬১ নং প্রস্তাব অনুযায়ী জাতিসংঘ কর্তৃক ইরাকের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ।

* ১৯৯২ সালের ২ আগস্ট নিরাপত্তা পরিষদের ৬৮৮ নং প্রস্তাব অনুযায়ী ইরাকের উত্তরাঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করা হয় 'নো ফ্লাই জোন'।

* ১৯৯২ সালের ২৮ ডিসেম্বর অপারেশন সাউদার্ন ওয়ার নামে ইরাকী মিগ-২৯ ঘাটিতে মার্কিন বিমান হামলা।

* ১৯৯৩ সালের ১৩ জানুয়ারী যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ফ্রান্সের ইরাকী বিমান ঘাটিতে মিসাইল আক্রমণ।

* ১৯৯৩ সালের ১৭ জানুয়ারী জাফরানিইয়াই পরমাণু কেন্দ্রের ওপর ৪২টি টমাহক ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ।

* ১৯৯৩ সালের ২৭ জুন ইরাকী গোয়েন্দা সংস্থা প্রধান কার্যালয়ে মার্কিন মিসাইল আক্রমণ।

* ১৯৯৬ সালের ৩ ও ৪ সেপ্টেম্বর ইরাকী ঘাঁটিতে মার্কিন আক্রমণ।

* ১৯৯৮ সালের ১৬-২০ ডিসেম্বর ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর, ইরাকের পারমাণবিক, রাসায়নিক, জীবাণু অস্ত্র তৈরী কেন্দ্রগুলোতে হামলা।

* ১৯৯৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর হামলা-পাল্টা হামলায় ইরাকের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্থ।

* ১৯৯৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর থেকে ২০০৩ পর্যন্ত যৌথবাহিনীর ডেজার্ট ফক্সের প্রায় প্রতিদিনই ইরাকের বিভিন্ন স্থানে বিমান আক্রমণ অব্যাহত ছিল।'

'আচ্ছা তা বুঝলাম গেরিলা লড়াইয়ের জন্য তৈরী করা হয়েছে এই বাংকার'– বলল সালমান– 'কিন্তু এখানে আর ক'জন গেরিলা যোদ্ধা থাকতে পারবে?'

সালমানের একথা শুনে রুকাইয়া একটু মুচকি হেসে বলল, 'আপনি আমাদের বাংকারে প্রবেশের পর আব্বাজানকে যখন বললেন 'আমি বাংকার দেখে আশ্চার্য হয়েছি।' তখন তিনি আপনাকে বলেছিলেন "আরো আশ্চার্য লুকিয়ে আছে এখানে"। সে কথাটি মনে আছে আপনার?'

'জি, অবশ্যই মনে আছে!' বলল সালমান।

'তবে প্রথমে আপনার সেই লুকায়িত আশ্চার্য দেখতে হবে। এরপর বলব এখানে ক'জন যোদ্ধা থাকতে পারবে।' বলল রুকাইয়া।

'ঠিক আছে চল! তবে আগে লুকায়িত আশ্চার্যটাই দেখি' সালমান বলল।

'চলতে পারবেন তো?' জিজ্ঞাসা রুকাইয়ার।

'ইনশাআল্লাহ! পারবো বৈকি!' সংক্ষিপ্ত উত্তর সালমানের।

সালমান খাট থেকে নেমে মুয়াজের হাত দরে হাটা শুরু করল। রুকাইয়া সামনে হাটছে। তারা যখন কক্ষের উত্তর পাশের দেয়ালের কাছে গেল তখন রুকাইয়া একটি গোপন সুইস টিপে দিল। অমনি দেয়ালে অবস্থিত দরজা খুলে গেল। সাথে সাথে সেখানে

আবিষ্কৃত হল সুবিশাল আয়তনের একটি কক্ষ। সালমানের বিস্ময়ের অন্ত রইল না। তবে এই বাড়িতে আসার পর থেকে একটির পর একটি অত্যাশ্চর্য বিষয় অবলোকন করে এখন এ আশ্চার্যজনক সুবিশাল কক্ষটি দেখে সে কিছুই জিজ্ঞেস করল না। শুধু মনে মনে ভাবল 'এও কি সম্ভব, মাটির নীচে এত বিশালাকায় কক্ষ!' আবার নিজে নিজেই সমাধান খুঁজে পেল এই ভেবে যে, মানুষ যখন কয়েক শ' মন ওজনের একখন্ড লোহাকে বুদ্ধির কৌশল খাটিয়ে বাতাসে উড়িয়ে দেশ থেকে দেশান্তরে, শত শত লোক নিয়ে ঘুরতে পারে এবং হাজার হাজার মাইলের পথ অতিক্রম করতে পারে মাত্র কয়েক ঘণ্টায়, তখন সেই মানুষের দ্বারা এরকম পাতাল কক্ষ নির্মিত হওয়া কোন ব্যাপারই নয়।

সালমানের এই ভাবলেশহীন অবস্থা দেখে রুকাইয়া হেসে খুন। সে বলল 'এখানের আশ্চার্য পর্বের সবেমাত্র শুরু, তা দেখেই আপনি স্তম্ভিত হচ্ছেন? সেগুলো দেখলে কি করবেন! সে যাক, আপনাকে আমি এখানকার বিবরণ শুনছি এবং বলছি যে ইরাকে গেরিলা যুদ্ধ শুরু হলে এখানে কতজন আশ্রয় নিতে পারবে।'

'এখন তুমি এই বাংকার সম্বন্ধে যত অবিশ্বাস্য বর্ণনাই দাওনা কেন, তা বিশ্বাস করতে আমার মোটেই কষ্ট হবেনা'–বলল সালমান– 'তাই সম্মুখে আর না গেলেও চলবে। কেননা আমার মাথাটা কেমন ঝিম্ ঝিম্ করছে।'

রুকাইয়া তাকে বিশাল রুমের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত ছোট খাটটিতে বসতে বলল। ইতিপূর্বে সালমানের ভাবলেশহীন অবস্থা দেখে যখন সে হাসছিল, তখন সালমানের মনে হল যেন এইমাত্র মেঘের আবরণ ছিন্ন করে দ্বাদশীর চন্দ্র আকাশে উদিত হয়েছে। এতে তাঁর গোলাপীবরণ মুখমন্ডলের সৌন্দর্য আরো কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ভূগর্ভস্থ এই কক্ষটি যেন বৈদ্যুতিক আলো ছাড়া এই আরবকুমারী, সৌন্দর্যের রানীর রূপের আলোতেই আলোকিত হতে পারে। ওই রূপে এমন যাদু মাখা যে, সালমানের ইচ্ছা হয় শত জনম চেয়ে থাকে। কিন্তু তাতে এমন তেজ যে সালমান এক পলকের বেশী চাইতে পারেনা। তাছাড়া শরীয়তও তাকে ওরকম দেখতে অনুমতি দেয় না।

সালমান রুকাইয়ার কথামত খাটের উপর গিয়ে বসল। এবার রুকাইয়া বলতে শুরু করল, 'এই বাংকারে কমপক্ষে ৫০০ জন লোক থাকতে পারবে। এখানে পানির ট্যাংক, বিদ্যুত সরবরাহের জেনারেটর, এয়ার ফিল্টার, ৬০ বর্গ মিটারের কমান্ড সেন্টার ছাড়াও বিস্ফোরণের হাত থেকে ইলেট্রিক্যাল সার্কিট রক্ষা করতে ইলেকট্রো ম্যাগনেটিক পালস প্রটেকশন সিস্টেমও রয়েছে। বাংকার থেকে বের হওয়ার জন্য রয়েছে কয়েকটি বিকল্প পথ রয়েছে। যার একটি দজলা নদীর তীরে গিয়ে ঠেকেছে। অপর একটি চলে গেছে বাড়ির গেটে দারোয়ান রুমের তলদেশে। বাকী পথটি গেছে এর চেয়ে তুলনামূলক ছোট অন্য একটি বাংকারে। এই বিকল্প পথগুলি জরুরী অবস্থার জন্য তৈরী। যদি মূল দরজা কখনও অবরুদ্ধ হয়ে যায়, তখন এ পথগুলো ব্যবহার করা যাবে। এ দরজাগুলো কেবল ভেতর থেকেই খোলা সম্ভব, তবে ব্যতিক্রম শুধু দরজার তীরেরটা।

'কেন সেটায় আবার কি রহস্য?' জানতে চাইল সালমান।

'সেটা ভিতর-বাহির উভয় দিক দিয়েই খোলা যায়' বলল রুকাইয়া–যাতে বিপদ মুহূর্তে বাহির থেকেও ভিতরে প্রবেশ করা যায়।'

'রুকাইয়া তোমাদের এই বাংকার অনেকটা পৌরাণিক গল্প কাহিনীর মতোই' সালমান বলল– 'যেমন দুর্ভেদ্য তেমন রহস্যময়।'

রুকাইয়া মৃদু হেসে বলল 'তার চেয়েও আশ্চর্যজনক!'

'আমার তো মনে হয় তোমাদের বাংকারের ন্যায় দুর্ভেদ্য বাংকার আর কোথাও নেই!' বলল সালমান।

'আপনার ধারণা সঠিক নয় জনাব! বলল রুকাইয়া– 'প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন এরকম এক ডজনের মতো সুরক্ষিত বাংকার তৈরী করিয়েছেন। অবশ্য তাঁরগুলো আমাদেরটার মতো এতো বিস্তৃত নয়। শুধু আমাদের এবং প্রেসিডেন্টেরই নয়, এছাড়াও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন আত্মমর্যাদাশীল অনেক ইরাকীই ছোট-বড় অনেক বাংকার ও সুরঙ্গ পথ তৈরী করে রেখেছেন।'

সালমান এ সমস্ত দেখে এবং শুনে বলল 'আল্লাহ তা'য়ালা এসকল অকল্পনীয় বিষয়াবলি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করাতেই বুঝি আমাকে ইরাক এনেছেন এবং আহত করে এখানে পৌঁছে দিয়েছেন।'

রুকাইয়া যেন একটা সুযোগ পেয়ে গেলো সালমানের এই কথায়। কেননা তাঁর কথা-বার্তা এবং চালচলনে রুকাইয়ার কাছে তাঁকে ইরাকী বলে মনে হচ্ছিল না। সে অনেকবার ভেবেছে সালমানের কাছে তাঁর দেশ সম্বন্ধে প্রশ্ন করবে। কিন্তু সে প্রসঙ্গ বা সুযোগ না আসায় তা জিজ্ঞেস করা হয়নি। এবার যখন প্রসঙ্গ উঠল, তখন সে জিজ্ঞেস করল 'কেন জনাব! আপনার বাড়ি কি ইরাকে নয়?'

'জি না, আমার বাড়ি ইরাকে নয়; –বলল সালমান –'তোমার আব্বাজান কি আমার পরিচয় বলেননি তোমাকে।'

'তবে আপনার বাড়ি কোন দেশে জনাব' –রুকাইয়া বলল –'আব্বাজান তো এ ব্যাপারে আমাকে কিছুই বলেননি।'

'হয়তো বলার প্রসঙ্গ আসেনি তাই বলেন নি–বলল সালমান– 'আমার বাড়ি পাকিস্তান। যার অবস্থান দক্ষিণ এশিয়ায়।'

'যখন রাত্রে আপনি আব্বাজানের নিকট প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন সম্পর্কে প্রশ্ন করছিলেন, তখন আমি আপনার প্রতি বিরক্ত হয়েছিলাম' –রুকাইয়া বলল– 'তা এই ভেবে যে, একজন ইরাকী হয়ে তার দেশের প্রেসিডেন্টের চরিত্র সম্বন্ধে অবগত নয়, এ কমন কথা। কিন্তু যখন আব্বাজান বললেন, 'তুমি একজন সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিক হিসেবে...।' তখন ভাবছিলাম সাংবাদিকরা তো অনেক সময় জানা বিষয়েও খুটিয়ে খুটিয়ে

প্রশ্ন করে থাকে। এখন বুঝলাম যে আপনি একজন একজন বিদেশী। অবশ্য ইতিপূর্বেও আপনার ইরাকী হওয়া সম্বন্ধে আমার কিছুটা সন্দেহ ছিল। সে যাহোক, আপনার বাড়ি যখন পাকিস্তান, তখন সেখানের অনেক না জানা বিষয় আপনার নিকট জানা যাবে। আপনি কি কষ্ট করে পাকিস্তান সম্বন্ধে আমাকে অবগত করাবেন? কেননা পাকিস্তানের প্রতি আমার হৃদয়ে টইটুম্বর ভালবাসা এবং সীমাহীন অনুপ্রেরণা সর্বদা বিরাজমান।'

রুকাইয়ার কথা শুনে সালমান আশ্চার্যান্বিত হয়ে বলল, 'কোন কারণে পাকিস্তানের প্রতি তোমার হৃদয়ে এত টান, রুকাইয়া?'

'এজন্য যে, মুসলিম বিশ্বের একমাত্র আত্মমর্যাদাশীল দেশ আফগানিস্তানে যখন রাশিয়ার কমিউনিস্ট নরপশুরা আগ্রাসন শুরু করে তখন আফগান মুজাহিদদের সর্বাত্মক সহযোগীতা করেছিল যে দেশটি, সে হল পাকিস্তান'– বলল রুকাইয়া– 'তাছাড়া এ দেশটি মুসলিম বিশ্বের অহংকারও বটে। কেননা যখন মুসলিম বিশ্বের দেশগুলি সামরিক ও প্রতিরক্ষার দিক দিয়ে পরনির্ভরশীল এবং দুর্বল-নিস্তেজ হয়ে ধ্বংসের পথে অগ্রসর হচ্ছিল, ঠিক সে মুহূর্তে এই অনাগ্রসরতা ও দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার জন্য যে দেশটি প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল, সে দেশটির নাম পাকিস্তান। এজন্য উদ্যমী মুসলিম যুব মানষে হতাশার মাঝেও পাকিস্তান প্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করে। তাছাড়া আমার জানা মতে মুসলিম বিশ্বের মধ্যে আপনাদের পাকিস্তানই একমাত্র দেশ যে পারমাণবিক শক্তি অর্জনে সক্ষম হয়েছে এ সকল কারণে পাকিস্তানের প্রতি আমার হৃদয় বিশেষভাবে টানে।'

সালমান এই ইরাকী মেয়ের পাকিস্তানের প্রতি অতুলনীয় হৃদ্যতা দেখে বিস্মিত হল। সে জিজ্ঞেস করল 'রুকাইয়া! তুমি পাকিস্তান সম্বন্ধে এতসব জানলে কি করে?'

'আমি আমার মরহুম দাদাজানের নিকট থেকে এসব জেনেছি। তবে এই সামান্য জানায় আমি পরিতৃপ্ত নই। পাকিস্তান সম্বন্ধে আরও জানার আকাংখা আমার ছিল, কিন্তু ইতিমধ্যে দাদার ইন্তেকালে তা পূরণ হলনা। আপনি যদি আমার সে তামান্না পূরণ করেন তবে অত্যন্ত খুশী হব।'

সালমান সংক্ষেপে উপমহাদেশে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাস, তার প্রভাবের বিপক্ষে দ্বীন সংরক্ষণের জন্য উলামায়ে কেরামের ভূমিকা, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট এবং তা প্রতিষ্ঠার লক্ষসমূহ, পরবর্তীতে সে লক্ষসমূহ পূরণে ব্যর্থতার কারণ। সেকুলার রাষ্ট্র প্রধানদের খামখেয়ালী এবং ভারতের হিন্দুদের চক্রান্তে পাকিস্তান ভেঙ্গে যাওয়া। কাশ্মীর নিয়ে দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দীর বিরোধ। পারমাণবিক শক্তি অর্জনে পাকিস্তানের কৃতিত্বসমূহ বর্ণনা করল। অতঃপর সেখানে ইসলামী শরীয়া আইন বাস্তবায়নের প্রবক্তাদের ও ধর্ম নিরপেক্ষবাদীদের মাঝে যে সংঘর্ষ হয়েছিল এবং ১৯৭৭ খৃষ্টাব্দের পর থেকে দেশে শরীয়তী আইন প্রবর্তন করা হয় তা আলোচনা করল। রুকাইয়া এ সকল আলোচনা শ্রবণ করে অত্যন্ত আনন্দিত হল। সাথে সাথে একটা মুসলিম রাষ্ট্র ভেঙ্গে দু'টুকরা হওয়ায় দুঃখিত হল।

রুকাইয়া এবার পুরোপুরিভাবে জানতে পারল সালমান একজন বিদেশী। সে এখানে ক্ষণিকের মেহমান মাত্র। পেশাদার সাংবাদিক। সংবাদ সংগ্রহের জন্য ইরাকে এসেছে। যুদ্ধ শেষে চলে যাবে নিজ দেশে। তার প্রিয় পাকিস্তানে। এত কিছু জানা সত্ত্বেও রুকাইয়া কেন যেন তার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ছে। পাকিস্তানের প্রতি তার ভালবাসার অন্যান্য কারণের মধ্যে নতুন একটা কারণ যোগ হল, তা হচ্ছে সেটা সালমানের দেশ। নিজের মনের অজান্তেই সে সালমানকে ভালবেসে ফেলেছে। রুকাইয়া ভাবে 'কিন্তু কেন এমন হল! আমি একজন বিদেশীকে কেন ভালবাসলাম, তাকে কি কোন দিন আপন করে পাব?' আসলে ভালবাসা এমন এক জিনিস, যা মানে না কোন জাত-গোত্র, দেশ-বিদেশ, সাদা-কাল, ধনী-গরীবের ব্যবধান। পাহাড়-পর্বতের বাধাও সে অতিক্রম করতে চায়, যদি তা সাধ্যে কুলায়। সে ভাবে না সফলতা-ব্যর্থতার কথা। পাওয়া-না পাওয়ার হিসাব কষতে জানেনা প্রকৃত প্রেম। কিন্তু আজকাল আমাদের সমাজে প্রেম-ভালবাসার নামে চলছে কতিপয় উদ্ভট-উদভ্রান্ত যুবক-যুবতীল বিকৃত মানসিকতার নির্লজ্জ মাতামাতি। প্রেম মানেই যেন এক পাগল আর এক পাগলীর হাতে হাত রেখে গলায় গলা মিলিয়ে দিন-রাত রাস্তায়, হোটেলে, পার্কে ঘুরে বেড়ানো। ভালবাসা অর্থই যেন এক জোড়া কপোত-কপোতীর নির্লজ্জভাবে যত্রতত্র বাকবাকুম বাকবাকুম করে বেড়ানো। আর চাওয়া পাওয়ায় কোন রকম হের-ফের হলেই প্রাণের বান্ধবীর (?) মুখে ভালবাসার নিদর্শন স্বরূপ, অত্যন্ত যত্নের সাথে মেখে দেয়া এক বোতল এসিড। হায়রে প্রেম! হায়রে ভালবাসা!! হায়রে প্রগতিবাদীদের দুর্গতি!!! তবুও কি হুশ হবে না?

রুকাইয়াকে নিশ্চপ বসে থাকতে দেখে সালমান বলল, 'কি হল! তুমি যে একেবারে চুপটি মেরে গেলে?' কোন কথাই বলছ না যে!'

সালমানের কথায় রুকাইয়া যেন সম্বিৎ ফিরে পেলো। সে বলল 'কই, না মানে আপনি কি যেন বলছিলেন!' তার এমন কথায় সালমান ও মুয়াজ একত্রে হেসে দিল। রুকাইয়া তাতে কিছুটা লজ্জা পেল। মুয়াজ বলল, 'আপু তুমি পাকিস্তানের কথা শুনতে শুনতে কল্পনায় সেখানেই চলে গিয়েছিলে নাকি?' মুয়াজের কথা শুনে তারা তিনজনেই হাসতে লাগল।

সালমান বলল, 'আচ্ছা রুকাইয়া! বর্তমানে তোমাদের দেশে যুদ্ধ চলছে। হানাদার জোট বাহিনী ইরাকের হাজার বছরের ঐতিহ্য ধুলোয় মিশিয়ে দিচ্ছে। এমতাবস্থায় তোমার অনুভূতি কি? ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী কি তোমাদের দেশ দখল করতে পারবে?'

'দেখুন সালমান সাহেব! আমরা বর্তমানে এক ভয়াবহ জটিল ট্রাজেটির মুখোমুখি'– বলল রুকাইয়া–'ইরাকে যে যুদ্ধ চলছে সমরশক্তি ও প্রযুক্তি বিবেচনায় এটি একটি অসম যুদ্ধ। অধুনা বিশ্বে যুদ্ধের ইতিহাসে এ রকম প্রতিদ্বন্দ্বী হয়তো আর খুঁজে পাওয়া যাবেনা। প্রথম মহাযুদ্ধ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে লড়াইরত দু'পক্ষেরই যথেষ্ট সমরশক্তি ছিল। ভিয়েতনাম, আফগান যুদ্ধের ক্ষেত্রেও পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। ঐ দু'টি যুদ্ধে আগ্রাসী শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

ও সোভিয়েত রাশিয়া হলেও স্বাধীনতাকামীদের পক্ষে ছিল প্রতিপক্ষ পরাশক্তিসহ অসংখ্য দেশের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সমর্থন। সে সময় বিশ্বে দু'টি পরাশক্তি কেন্দ্রিক ক্ষমতাবলয় থাকায় ভিয়েতনাম যুদ্ধে ভিয়েতকংদের সহায়তায় প্রত্যক্ষভাবে সোভিয়েত রাশিয়া ও চীন এগিয়ে এসেছিল। তারা এক পর্যায়ে সে যুগের আধুনিক জঙ্গী বিমান, ট্যাঙ্ক, কামান সরবরাহ করে উত্তর ভিয়েতনামকে। ঐসব সমরাস্ত্র না হলে ভিয়েতকংরা কোনদিনই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে উক্ত যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারতো না। আফগান যুদ্ধেও একইভাবে 'শত্রুর শত্রু, শত্রুর বন্ধু' নীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চাত্য জগত আফগান মুজাহিদদের বিভিন্ন উপায়ে সহায়তা করেছিল। ঐ যুদ্ধে মার্কিন অত্যাধুনিক বিমান বিধ্বংসী ক্ষেপনাস্ত্র-স্টিঙ্গার আফগানদের জয়ী হওয়ায় বিশেষ অবদান রাখে। কিন্তু আমাদের সাথে এই যুদ্ধে সবকিছুই একতরফাভাবে হচ্ছে। অনেক দেশ আমাদের পক্ষে প্রকাশ্য সমর্থন দিলেও কোন দেশই প্রত্যক্ষভাবে সমর সরঞ্জাম দিয়ে আমাদের সহায়তায় এগিয়ে আসেনি।'

একটু থেমে সে আবার বলতে লাগল–'এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধের পূর্বে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী ছিল পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী বাহিনী। সে সময় আমাদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ১০ লাখের উপরে। ট্যাঙ্ক ছিল পাঁচ হাজারের চেয়ে বেশী, জঙ্গী বিমান ছিল এক হাজারের মত। এসব জঙ্গী বিমানের মধ্যে ছিল ফরাসী মিরেজ, সুপার এনতেরাদ, রাশিয়ার মিগ-২১, মিগ-২৩, মিগ-২৪ হিন্দ-এর মত এ্যাটাক হেলিকপ্টারসহ অসংখ্য পরিবহন বিমান। এমনকি ইরাকী বিমান বাহিনী আকাশে জঙ্গী বিমানকে রিফুয়েলিং করার প্রযুক্তিও হস্তগত করেছিল। এছাড়া ক্ষেপণাস্ত্র, বিমান বিধ্বংসী ব্যবস্থা, ইলেকট্রনিক সরঞ্জামাদিতেও ইরাকের অবস্থান ছিল অনেক উঁচুতে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ ও আক্ষেপের সাথে বলতে হয়, সাদ্দাম হোসেন আমেরিকার ইশারায় কুয়েত আক্রমণ করায় উপসাগরীয় যুদ্ধ বেধে যায়, সে যুদ্ধে ইরাকের অনেক ট্যাঙ্ক, বিমান ও অন্যান্য সরঞ্জাম ধ্বংশ বা অকেজো হয়ে যায়। এরপর দীর্ঘ বার বছর তথাকথিত জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা থাকায় আমরা কোন নতুন সরঞ্জাম যেমন সংগ্রহ করতে পারিনি তেমনি স্পেয়ার পার্টসের অভাবে অকেজো সরঞ্জামও সচল করা যায়নি। তাই এই যুদ্ধে আমাদের বাহিনী কার্যকরভাবে হানাদারদের বিমান আক্রমণ প্রতিহত করতে পারছে না এবং তাদেরকে যুদ্ধে লড়তে হচ্ছে বিমান ও নৌ বাহিনীর সহায়তা ছাড়াই। রাডার, এয়ারফিল্ড ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় আমাদের যেসব জঙ্গী বিমান, হেলিকপ্টার আছে সেগুলোও এ যাবত উড়াতে পারেনি আমাদের বাহিনী। ট্যাঙ্কের ক্ষেত্রেও একই কথা, আমাদের সৈন্যরা লড়ছে সেকেলে টি-৫৫ ট্যাঙ্ক দিয়ে। কিছু আধুনিক টি-৭২ ট্যাঙ্ক থাকলেও এখনো সেগুলো ব্যবহার করা হয়নি। অবশ্য তা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল বলে সামনের দিনের জন্য রাখা হয়েছে। অপরদিকে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী শুরু থেকেই উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সমরাস্ত্র দিয়ে লড়াই

চালিয়ে যাচ্ছে। এতে এমন কোন সর্বাধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন সরঞ্জামাদি নেই যা ব্যবহার করা হচ্ছে না। বি-৫২ স্ট্র্যাটেজিক বোমারু মিমান, এফ-১১৭ স্টিলথ এ্যাটক ফাইটার সহ টর্নেডো, এফ-১৪ টমক্যাট, এফ-১৫ ফ্লাইং ঈগল, এফ-১৬ ফ্যালকন, হ্যারিয়ার-এর মত সফল আধুনিক যুদ্ধ বিমান দিয়েই হানাদার বাহিনী আক্রমণ পরিচালনা করছে। হেলিকপ্টার বহরে রয়েছে বিশাল চিনুক, সীকিং-এর মত সৈন্য পরিবাহী এবং এ্যাপাচী এ্যাটাক হেলিকপ্টার। এর সবই বর্তমান বিশ্বের সর্বাধুনিক, ভয়ঙ্কর সমর সরঞ্জাম।

এদিকে স্থলে যুদ্ধে হানাদাররা ব্যবহার করছে আব্রাহাম ও চ্যালেঞ্জোর ব্যাটল ট্যাঙ্ক, ব্রাডলি ফাইটিং ভেহিকল, হামভী জীপ। টমাহক-এর মত গাইডেড ক্রুজ মিসাইল, বাংকার বাস্টার ও ক্লাস্টার বোমাসহ যাবতীয় মারণাস্ত্রও নির্বিচারে ব্যবহার করা হচ্ছে ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালনায়। এছাড়া স্যাটেলাইট নিয়ন্ত্রিত যুদ্ধ ব্যবস্থায় হানাদাররা মুহূর্তের মধ্যেই জেনে যাচ্ছে আমাদের পরিকল্পনা, সমর সরঞ্জাম ও অবস্থানের কথা। ফলে আমাদের বাহিনী কোন বড় ধরনের আক্রমণ পরিচালনা করতে পারছে না। বলা চলে তাদের লড়তে হচ্ছে অনেকটা অন্ধের মত, নিতান্ত সাহস ও দেশপ্রেমে ভর করে এবং আমরা তা বেশ ভালভাবেই করীছ। যুদ্ধ এখন চলছে তুমুল বেগে। অকল্পনীয় হাইটেক-এর সাথে আমাদের বাহিনী যে কিভাবে 'নো টেক' নিয়ে লড়ে যাচ্ছে তা সামরিক বিবেচনায় অপ্রত্যাশিত, বিস্ময়কর না বলে উপায় নেই। জয়-পরাজয়ের ব্যাপারে কিছুই বলা যাচ্ছে না।

'আমাদের শত্রুরা সারাবিশ্বের শান্তি প্রিয় মানুষের যুদ্ধের বিরুদ্ধে আবেদন-নিবেদনকে উপেক্ষা করে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে নিষিদ্ধ অস্ত্রের ধুয়া তুলে আমাদের দেশে হামলা করেছে। এই সভ্যতার মুখোশধারী, নিষ্ঠুর নরপিচাশের গোষ্ঠীরা কোন প্রমাণিত কারণ ছাড়াই আফগানিস্তানে হামলা চালিয়ে দেশটি দখল করে নিল মাত্র ক'দিন পূর্বে। জনাব সালমান সাহেব! একজন পাকিস্তানী সাংবাদিক হিসেবে আপনি অবশ্যই অবগত আছেন আফগানিস্তান দখলের জন্য আমেরিকা সবচেয়ে বেশী সহায়তা কোত্থেকে পেয়েছিল?

'হ্যাঁ, এক্ষেত্রে নর্দাণ এ্যালয়েন্স-এর স্বদেশ-স্বজাতী বিরোধী গাদ্দারই মার্কিনীদের আফগান দখলে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল।'

'আপনি ঠিক বলেছেন সালমান সাহেব–বলল রুকাইয়া–ইরাকের ব্যাপারেও আমার এই একই আশঙ্কা। ইরাকের কিছু গাদ্দারের গাদ্দারীর কারণেই ইরাক তার স্বাধীনতা হারাবে। আমার বেশী ভয় হয় যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী আইএনসি নেতা আহমেদ চালাবির ব্যাপারে। হয়তো একে ইরাকের হামিদ কারজাঈ বানাবার জন্যই আমেরিকা দুধ-কলা দিয়ে পুষছে।'

'হয়তো তাই হবে- বলল সালমান–কিন্তু আল্লাহ না করুন! তোমাদের দেশ যদি আমেরিকা দখল করেই নেয়, তখন তুমি কি করবে?

'তখন আমি মাথায় কাপনের কাপড়ের নেকাব পড়ে, হাতে শত্রু বিধ্বংশী হাতিয়ার নিয়ে দখলদারদের দখলীর স্বাদ আস্বাদন করাতে বের হব- বলে চলল রুকাইয়া-ততক্ষণ পর্যন্ত ময়দান ত্যাগ করবো না যতক্ষন পর্যন্ত আমার শরীরে এক বিন্দু রক্ত প্রবাহিত থাকে। জীবন বিলিয়ে দিয়ে প্রমাণ করে দিবো যে, বাগদাদ তথা ইরাকের পুরুষরা গাদ্দারী করলেও বাগদাদের কন্যারা এখনো সব মরে যায়নি।' বলতে বলতে রুকাইয়া উত্তেজিত হয়ে উঠলো, তার চেহারা রক্তিমাভা ধারণ করেছে। চোখ থেকে ঠিকরে বের হচ্ছে মার্কিনীদের প্রতি ঘৃণা ও ক্ষোভ। কে বলবে এই মেয়ে কিছুক্ষণ পূর্বে বিদেশী সাংবাদিক সালমানের প্রেমে পড়ে এক দুর্বলতায় ভুগছিল। তার শরীর থর থর করে কাপছে। সালমান তাকে বলতে নিষেধ করল না। কারণ তার দেশে শত্রু হামলা করেছে, তাই তার মনের ভিতর চেপে আছে অনেক ক্ষোভ-অনেক দুঃখ। তা প্রকাশ করলে হয়তো কিছুটা হাল্কা হবে। সে অবিরাম গতিতে বলে চলল, 'জালিম বুশ ইরাকীদের চিনতে ভুল করেছে। সে সাদ্দাম উৎখাতের কথা বলে মিথ্যা অভিযোগে ইরাক আক্রমণ করেছে। তার খায়েশ সে আমাদের সকল তেল সম্পদ লুণ্ঠন করে নিবে। আমরাও শপথ করেছি-চোর-ডাকু আর লুটেরা, লম্পট বুশসহ তার সকল সাঙ্গ-পাঙ্গদের আমাদের তেলের কুপেই ডুবিয়ে মারব। তখন লোভী লুটেরারা বুঝবে ইরাকের 'তরল স্বর্ণ'-এর স্বাদ কতটা মজাদার।'

'ধন্যবাদ হে বাগদাদ কন্যা! ধন্যবাদ হে ইরাকী বীর বাহাদুরা!! ধন্যবাদ তোমার দেশ প্রেম!!! বলল সালমান, আমেরিকা কখনও তোমাদের সাথে পেরে উঠবে না। পারবেনা তোমাদের স্বাধীনতার চেতনাকে অবদমন করতে।'

'আমিও তখন তোমার সাথে যুদ্ধে যাব আপু'- বলল মুয়াজ- 'আমিও মার্কিন শয়তানদের কতল করে তেল কুপে নিক্ষেপ করব।'

সালমান এই ইরাকী তরুণী এবং এই নাবালক ইরাকী বালকের দীপ্ত কঠিন মনোভাব প্রত্যক্ষ করে মনে মনে ভাবল 'আজ যদি উম্মাহর প্রতিটি সদস্য এভাবে শত্রু মিত্র চিহ্নিত করতে শিখতো এবং শত্রুর মোকাবেলায় হাতিয়ার হাতে নিতে এভাবে সংকল্পবদ্ধ হতো, তবে আর আকাশে-বাতাসে মজলুম উম্মাহর ক্রন্দন রোল ধ্বনিত হত না। শিশুদের আর্ত চিৎকারে আল্লাহর আরশ প্রকম্পিত হয়ে উঠত না। মা-বোনের ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলতো না।'

নতুন ব্যাংকার পরিদর্শন শেষে তারা পূর্বের স্থানে চলে আসলো। মুয়াজ তার ছবক আদায়ে মনোনিবেশ করল। রুকাইয়া ঘরে চলে গেল। আর সালমান খাটের উপর শুয়ে মুয়াজের পড়া শুনতে লাগল। রুকাইয়া চলে যাওয়ায় সালমানের মনে হল, ভূগর্ভস্থ কক্ষটি যেন এখন অন্ধকার হয়ে গেছে। যুবকদের মন কাড়ার মত সকল বৈশিষ্ট্যই যে তার মধ্যে বিদ্যমান আছে, তা হয়তো তার জানা নেই। থাকলে মুখখোলা রেখে এভাবে চলতো না। তার পটলচেড়া কাজলকাল আঁখি যুগল শত প্রেমিকের প্রেম পিপাসা নিবারণের জন্য

যথেষ্ট। কিন্তু তাতে যখন মার্কিনীদের বিরুদ্ধে ঘৃণা উথলে উঠে, তখন মনে হয় নীল সাগরে প্রলংঙ্করী সাইক্লোন ডেকেছে, যা মার্কিন হানাদারদের রণতরীগুলো ভেঙ্গে-চুড়ে মিছমার করে দিবে। তখন সালমানের কাছে রুকাইয়াকে আরও আকর্ষণীয় লাগে। তার রক্তরাঙ্গা ওষ্ঠদ্বয় যেন ফুটন্ত গোলাপের পাপড়ি সদৃশ; যা অপেক্ষা করছে কোন ভ্রমরের পরশ পাওয়ার জন্য। সে যখন উত্তেজিত হয়ে মার্কিনীদের বিরুদ্ধে কথা বলছিল, সে সময় তার কপালের উপরিভাগে হাল্কা ঘাম চিকচিক করছিল, তা দেখে সালমানের মনে হল, যেন কতগুলো মুক্তারদানা ছড়িয়ে আছে পুরো কপাল জুরে।

সালমান শুয়ে লক্ষ্য করল খাটের পাশে চেয়ারের উপর বড় আকারের একটি বই রাখা। মুয়াজকে বলল বইটি তাকে দেওয়ার জন্য। মুয়াজ বইটি এনে তার হাতে দিয়ে পুনরায় 'আয়ুজু বিল্লাহ মিনাশ শায়তনির রাজীম' 'বিসমিল্লাহির...' বলে পড়া শুরু করল। সালমান বইটি হাতে নিয়ে শুয়ে শুয়েই খুলল। অনেক বড় বই এটি। যা শুয়ে পড়তে অসুবিধা হওয়ায় সে শোয়া থেকে উঠে বসল। প্রথমে সে বইটির সূচি দেখল। এতে ইরাকের প্রাচীন থেকে নিয়ে বর্তমান পর্যন্ত ইতিহাস ও ঘটনাবলী সন্নিবেশ করা হয়েছে অত্যন্ত সুন্দর ও প্রাঞ্জলভাবে।

বাগদাদ সম্বন্ধে বইটিতে লেখা হয়েছে–"মুসলমানরা যখন ইরাক জয় করে বাগদাদ তখন উল্লেখযোগ্য কোন নগরী ছিল না। পারস্য সম্রাট কিসরার রাজত্বকালে দজলা নদীর পশ্চিম তীরে এটি ছোট একটি বসতি ছিল। কথিত আছে পারস্য সম্রাট কিসরা এক প্রতিমাপূজারী ক্রীতদাসকে জায়গীর স্বরূপ এ অঞ্চলটি প্রদান করেন। সেই ক্রীতদাস যে প্রতিমার পূজা করত তার নাম ছিল 'বাগ'। তাই জায়গীর প্রাপ্ত হয়ে সে বলল বাগদাদ (বাগপ্রদত্ত)। অর্থাৎ বাগ প্রতিমা আমাকে এ অঞ্চল প্রদান করেছেন। এ কারণে অনেক আলেম 'বাগদাদ' বলতে পছন্দ করতেন না।

হযরত উমর (রাঃ)-এর খেলাফতকালে কুফা এবং বসরার মত নগরীসমূহ প্রতিষ্ঠা করা হলেও এ অঞ্চল পূর্বের মতই থেকে যায়। বনু আব্বাসের শাসনামলে খলীফা মনসুর কুফা এবং হায়রার মাঝামাঝি 'হাশেমিয়া নামে একটি নগরী প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু রাবেন্দীদের বিদ্রোহের কারণে সেখানে নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করতে পারেননি। কুফার বিদ্রোহ তো পূর্ব থেকেই প্রসিদ্ধ ছিল। তাই কুফাকেও দারুল হুকুমত বানানো তার পছন্দ ছিল না। পরিশেষে তিনি কুফা থেকে মু'সিল পর্যন্ত ভ্রমন করে দেখে দজলা নদীর তীরের এ স্থানকে পছন্দ করে বলেন ঃ 'এ স্থানের একদিকে দজলা নদী অবস্থিত। এখান থেকে এই নদীপথে আমাদের এবং চীন দেশের মাঝে যোগাযোগ স্থাপনে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। অপরদিকে ফুরাত নদী অবস্থিত। সেখান থেকে সিরিয়া এবং মক্কার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করাও সম্ভব হবে।'

সুতরাং খলীফা মুনসুরের সৈন্যবাহিনী দজলা নদীর পশ্চিম তীরে শিবির স্থাপন করে এবং তারই নির্দেশে ১৪০ হিজরীতে বাগদাদ নগরীর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়। খলীফা

মনসুরই এই নগরীর 'মদীনাতুস সালাম' নামকরণ করেন। কারণ বাগদাদ নামে শিরকের গন্ধ রয়েছে (যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে)। এটাও এক বিস্ময়কর ব্যাপার যে, এই 'মদীনাতুস সালাম' নগরী বহু শতাব্দী মুসলিম খলিফাদের রাজধানী ছিল। কিন্তু তাদের একজনেরও এ নগরীতে মৃত্যু হয়নি। শুধুমাত্র বাদশাহ হারুনুর রশীদের পুত্র আমীন সম্পর্কে প্রসিদ্ধ আছে যে, তিনি বাগদাদে নিহত হয়েছেন। কিন্তু খতীবে বাগদাদী (রঃ) বর্ণনা করেন, প্রকৃতপক্ষে তিনিও বাগদাদে নিহত হননি। বরং বিনোদনের লক্ষ্যে দজলায় নৌকা ভাসিয়ে শহর থেকে দূরে চলে যান। সেখানেই তাকে বন্দী করে হত্যা করা হয়।

ক্রমান্বয়ে বাগদাদ মুসলমানদের সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন এক কেন্দ্রে পরিণত হয় যে, তৎকালীন পৃথিবীতে এর তুলনা মেলা দুস্কর ছিল। রূপলাবণ্য, নিয়ম-শৃঙ্খলা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা সংস্কৃতির দিক দিয়ে এই নগরী মনভুলানো ছিল।

খলীফা মনসুর যখন এই নগরী প্রতিষ্ঠা করেন, তখন এ নগরী দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে উভয় দিকে দুই মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং এটিই দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে সমানভাবে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বের প্রথম নগরী। আর বর্তমানে তার এক একটি মহল্লাই কয়েক মাইল ব্যাপী বিস্তৃত।'

বইটিতে ইরাকের ইতিহাস সম্বন্ধে লেখা হয়েছে "আজ থেকে ছ' হাজার বছরেরও আগে সুমেরীয় সভ্যতার বীজ বপিত হয়েছিল দজলা-ফোরাতের মধ্যবর্তী ভূ-ভাগে। গড়ে উঠেছিল মানব সভ্যতার প্রাচীন চারণক্ষেত্র। ইতিহাসে যা মেসোপটেমিয় সভ্যতা নামে সুবিদিত। মেসোপটেমিয়দের প্রজ্বলিত দ্বীপশিখায় আলোকিত হয়েছিল সারা পৃথিবী। একাধিক সভ্যতার স্ফুরণ ঘটেছে এখানে; ধ্বংস হয়েছে, আবার জেগেছে ফিনিক্স পাখির মতো। সভ্যতার এ ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়ে এ অঞ্চলের মানুষের সমন্বিত প্রজ্ঞা মানবজাতিকে যেন ঠেলে দিয়েছিল প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ইতিহাসের সোনালী পর্বে। মিসর, গ্রীক ও রোমান সভ্যতার অনেক আগেই মেসোপটেমীয় জনপদ তৈরী করেছিল মানুষের উত্তরণের অক্ষয় সোপান। দজলা-ফোরাতের পূণ্যতোয়া জলপ্রবাহকে কাজে লাগিয়ে যে অন্ন-কৃষি সভ্যতার জন্ম হয়েছিল এখানে, তার দৃষ্টান্ত দ্বিতীয়টি নেই। মেসোপটেমীয় সভ্যতার লীলাক্ষেত্র ইরাকই বিশ্বের প্রথম দেশ, যারা উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্যের ভান্ডার হিসেবে পরিচিত ছিল। তারা নদীর প্লাবনকে শাসন করার জ্ঞান অর্জন করেছিল। মানবিক মূল্যবোধকে উচ্চকিত করেছিল, সর্বোপরি মানুষের জীবনধারাকে গ্রন্থিত করেছিল সংস্কৃতিচর্চার মাধ্যমে। শুধু তাই নয়, মেসোপটেমীয় সভ্যতার এই আলোকিত-উত্থানে আকর্ষিত হয়ে সেখানে ছুটে এসেছিল প্রতিবেশী ভূ-ভাগে র মানুষ। ইতিহাসের এই ঘটনা ঘটেছে এখানে, প্রথমবারের মতো। অর্থাৎ মানুষ প্রথম অভিবাসী হয়েছে এখানে ভালভাবে বাঁচার প্রেরণায়। মেসোপটেমীয়রা মানুষকে প্রথম উপহার দিয়েছে অক্ষর, হাতে তুলে দিয়েছিল কলম ও জ্ঞানের প্রদীপ, উন্নত জীবন যাপনের চাবিকাঠি। তারাই প্রথম প্রকৃতি থেকে আহরিত পানি সম্পদকে পানযোগ্য করে তুলেছিল। ধূ-ধূ মরুতে চাষ করেছিল সুরভিত রক্তগোলাপ, রচনা করেছিল সুশোভিত বাগিচা-ব্যাবিলনের শূন্যেদ্যান

তার একটি অনন্য উপহার। খ্রিষ্টান, ইহুদী এবং মুসলমানদের অসংখ্য ধর্মীয় ইতিহাস ও উপাখ্যান এখানে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। অসংখ্য পূণ্যবান মানুষের কর্মময় জীবন ও স্মৃতি ভাস্বর হয়ে রয়েছে এ মাটিতে। নবী (আঃ), আওলাদে রাসূল (সাঃ) সাহাবায়ে রাসূল (সাঃ) তাবেয়ী ও অলীয়ে কামেল যথাক্রমে হযরত আদম (আঃ), হযরত নূহ (আঃ), হযরত ইব্রাহীম (আঃ), হযরত ইউনুছ (আঃ), হযরত শীষ (আঃ), হযরত আইয়ুব (আঃ), হযরত দানেহ (আঃ), হযরত ইউশা ইবনে নুন (আঃ), হযরত হুদ (আঃ), হযরত সালেহ (আঃ), চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রাঃ), ইমামে আকবর হয়রত হুসাইন (রাঃ), হযরত মুসলিম বিন আকিল (রাঃ), হযরত সালমান ফারেসী (রাঃ), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে যাবের আনছারী (রাঃ), হযরত আব্বাস (রাঃ), হযরত হুযায়ফা (রাঃ), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবি আউফা (রাঃ), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল হারিছ (রাঃ), হযরত মুগীরা বিন শু'বা (রাঃ), হযরত আবকর (রঃ), হযরত আসগর (রঃ), হযরত ইমাম নকী (রঃ), হযরত ইমাম আসকরী (রঃ), হযরত মুসলিম (রঃ), হযরত হানি বিন আরওয়াহ (রঃ), হযরত ইমাম মোখতার সাইফী (রঃ), হযরত ইমাম হোসাইন ও তাঁর ৭২ জন সঙ্গী, বড়পীর হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ), হযরত ইমাম আবু হানিফা (রঃ), হযরত ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ), হযরত সৈয়দ ইব্রাহীম (রঃ), হযরত ইমাম শিবলী (রঃ), হযরত ইমাম বাউয়াদ (রঃ), হযরত মূসা কাজেমী (রঃ), হযরত মারুফে কারখী (রঃ), হযরত জুনায়েদ বোগদাদী (রঃ), হযরত সিররি-উস-সিকতি (রঃ), হযরত জুবায়ের (রঃ), হযরত ইমাম গাজ্জালী (রঃ), হযরত বাহলুল দানাহ (রঃ), হযরত আব্দুল জব্বার জিলানী (রঃ), হযরত সালেহ বিন আব্দুল কাদের (রঃ), হযরত মুহাম্মদ বাকের ইবনে আল ইমাম আলী ইবনে আল ইমাম হুসাইন ইবনে আল ইমাম আলী ইবনে আবি তালিব (রঃ), হযরত আব্দুল্লাহ আবু আহমদ (রঃ), হযরত আব্দুল্লাহ্ আবু যয়নব (রঃ), হযরত মনসুর হাল্লাজ (রঃ), হযরত শায়খ ফাতহী কুদ্দুসুল্লাহ সিররুহ (রঃ), হযরত হাসান আসকরী (রঃ), হযরত নার্গিস খাতুন আসকারী (রঃ), হযরত হাকিমা খাতুন আসকারী (রঃ), হযরত রাবেয়া বসরী (রঃ), হযরত ইমাম মুহাম্মদ আল জাওয়ান্দ (রঃ), হযরত আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইব্রাহীম ইবনে হাবিব ইবনে সায়েদ ইবনে যাবের ইবনে আব্দুল্লাহ আনছারী (রঃ), হযরত আল ইমাম আবি ইউসুফ আল আনছারী (রঃ), হযরত শায়েখ বশর হাফি (রঃ), হযরত কুতুবুল আরেফীন আবু বকর শিবলী (রঃ), হযরত ওমর সরওয়াদী (রঃ), হযরত মুস্তাহাসান (রঃ), হযরত হাসান বসরী (রঃ), খলীফা হযরত হারুনুর-রশীদ (রঃ), বীর মুজাহিদ হযরত নূরউদ্দিন জঙ্গী (রঃ), ইতিহাস শ্রেষ্ঠ ক্রুসেড বিজয়ী বীর মুজাহিদ, যার নামে আজো খ্রীষ্ট জগতের হৃদকম্পন সৃষ্টি হয়, ইসলামের সেই অতন্দ্র প্রহরী সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবী (রঃ) প্রমুখসহ আরও বহু পুণ্যজীবনের স্মৃতি ও তাঁদের সমাধিসৌধ ইরাকের ইতিহাসকে করেছে গরিমাময়! তাদের থেকে প্রাচীন সভ্যতার জননী ইরাক যুগে যুগে পেয়েছে প্রেরণা, পেয়েছে নব উদ্দীপনা।

ইরাকের ইতিহাস পড়তে পড়তে সালমান যখন সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর নামটি পড়ল তখন সে চমকিত হয়ে উঠলো। এতদিনে সবেমাত্র তার খেয়াল হয়েছে যে, সে সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর প্রিয় জন্মস্থান ইরাকে অবস্থান করছে। সে স্বগোতুক্তি করে উঠল–'হে সালাহুদ্দীন! খ্রীষ্ট দুনিয়া আবারও ক্রুসেড ঘোষণা করেছে। কিন্তু আক্ষেপ ও দুঃখ যে, আজ তুমি নেই। তোমার আবর্তমানে তারা একতরফাভাবে মুসলমানদের ধ্বংস করে চলেছে। ইসলামী ইমারত আফগানিস্তান তারা দখল করেছে, এবার তোমার জন্মভূমি দখল করতে চলেছে। তোমার মুক্তকরা সেই ফিলিস্তিন তারা বহু পূর্বেই দখলে নিয়েছে। মসজিদে আকসা আজ অভিশপ্ত ইয়াহুদীদের পদতলে। হেযায ভূমিতে নাপাক নাসারাগোষ্ঠী উলঙ্গ হয়ে ঘোরা-ফিরা করছে। তোমার রাসূলের পবিত্র বাণীকে অপমানিত করছে। তোমার প্রভুর ঘরের ইজ্জত ভূলুণ্ঠিত করছে। শুধু তোমার অভাবে হে সালাহুদ্দীন! তোমার অনুপস্থিতির সুযোগে তারা এ সমস্ত অপকর্ম করে যাচ্ছে! তুমি এসো হে বীর বাহাদুর! মুসলিম বিশ্বে আজ তোমার বড় প্রয়োজন! এসো! একটি বার এসো! বলতে বলতে সালমানের চোখ দিয়ে দু'ফোটা তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে পড়ল। তা দেখে মুয়াজ বলল, 'কি হয়েছে ভাইয়া! আপনি কাঁদছেন কেন? সালাহুদ্দীন কে, যাকে আপনি এই গোপন কক্ষে ডাকছেন? সে কি এখান থেকে আপনার ডাক শুনতে পাবে?'

'কেন ভাইয়া! তুমি কি ইতিহাস বিখ্যাত বীর মুজাহিদ সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর নাম শুননি? যার জন্ম হয়েছিল তোমাদের এই ইরাকেই।' চোখের পানি মুছতে মুছতে বলল সালমান।

'শুনেছি, তবে তাঁর সম্বন্ধে বিস্তারিত আমাকে কেউ জানায়নি–বলল মুয়াজ–আপনি তাঁর সম্বন্ধে আমাকে বলবেন কি ভাইয়া?'

'তুমি জানতে চাইলে আমি কেন জানাবো না ভাইয়া–সালমান আদর করে বলল মুয়াজকে–অবশ্য বিস্তারিত বলতে অনেক সময়ের প্রয়োজন হবে, তাই সংক্ষিপ্ত করে বলছি–সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবী ছিলেন ক্রুসেড বিজয়ী ইতিহাসের এক কিংবদন্তী মহানায়ক। ক্রুসেড হচ্ছে খৃষ্টানদের সম্মিলিত ধর্মযুদ্ধ। অবশ্য খৃষ্টীয় নোংরা ক্রুসেডকে ধর্ম যুদ্ধ বলা যায় না, ক্রুসেডকে রীতিমত রক্তের বন্যা ও বর্বরতার অপর নামই বলতে হয়। ১০৯৫ সাল থেকে ১১৯২ পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় দু'শ বছর পর্যায়ক্রমে তিনটি ক্রুসেড সংঘটিত হয়। খৃষ্টানদের ধর্মগুরু পোপ আবরাসের আহ্বানে খৃষ্টানরা হাঙ্গরের ন্যায় ঝাঁপিয়ে পড়ে মুসলমানদের উপর। মধ্যপ্রাচ্যে বইয়ে দেয় রক্তের বন্যা। দখল করে নেয় পবিত্র ভূমি জেরুজালেম। সেখানে অবস্থিত বায়তুল মুকাদ্দাস। ১৫ জুলাই ১০৯৯ সালে ক্রুসেডাররা সেখানে নির্বিচারে নিরীহ মানুষদের হত্যা করে। শহর ভরে যায় লাশের স্তূপে। রক্তের বন্যায় বায়তুল মোকাদ্দাসে আশ্রয় গ্রহণকারী মানুষের হাটু ডুবে যায়। ৭০ হাজার মানুষকে হত্যা করা হয় এ মসজিদে।

খৃষ্টীয় তৃতীয় ক্রুসেড ঝড়ের মোকাবেলায় অলংঘনীয় পর্বতের ন্যায় শির উঁচু করে রুখে দাঁড়ান ইতিহাস শ্রেষ্ঠ বীর মুজাহিদ গাজী সালাহুদ্দীন আইয়ুবী। তাঁর কাছে খৃষ্টবাদীরা

শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। শেষে বাধ্য হয়ে তৎকালীন পাশ্চাত্য, ইংল্যান্ড, জার্মানী, ফ্রান্সসহ মোট ১১টি রাষ্ট্রের সম্রাটেরা ১১৯২ সালে সন্ধি করে অস্থিত্ব রক্ষা করে। নয়তো সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর হাতে তাদের ইউরোপও খোয়া যেত।

সেই এগারশ' শতাব্দীর পরাজিত শক্তির উত্তরসূরী বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ এর দুর্ঘটনার পর ঘোষনা করে নতুন ক্রুসেড। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ দেশ তার এই ক্রুসেডকে সফল করতে তার সাথে হাত মিলিয়েছে। ইতিমধ্যে খাটি ইসলামী রাষ্ট্র আফগানিস্তান দখলের মধ্যে দিয়ে আমেরিকা তার ঘোষিত সর্বশেষ ক্রুসেডের প্রথম দফা ফল ঘরে তুলেছে। এরপর ইরাক আক্রমণ তার ক্রুসেডের ধারাবাহিকতাই রক্ষা করে চলেছে। কিন্তু আজকের এই ক্রুসেড মোকাবেলাকারী সালাহুদ্দীন নেই। সালাহুদ্দীনের আবর্তমানে নব্য ক্রুসেডাররা যখন ইচ্ছা, যেভাবে ইচ্ছা, যেখানে ইচ্ছা মুসলমানদের উপর হাজার বছর পূর্বের সেই পরাজয়ের প্রতিশোধ নিচ্ছে অত্যন্ত নির্লজ্জভাবে এবং অমানবিক পৈচাশিক পন্থায়। তাই বলছিলাম "বুশের ক্রুসেড মোকাবেলায় সালাহুদ্দীন তুমি একবার হলেও এসো। হে আল্লাহ্! হে সালাহুদ্দীনের রব! তুমি হাজার বছর পূর্বে ক্রুসেড রুখতে যে রকম একজন সালাহুদ্দীনকে পাঠিয়েছিলে তেমনি শেষ জমানার নব্য ক্রুসেড রুখতে আর একজন সালাহুদ্দীন পাঠাও!"

'আমি হব সেই সালাহুদ্দীন, সালমান ভাইয়া! লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে বলল মুয়াজ–এই আমি আমেরিকার ইসলাম বিধ্বংসী ক্রুসেডকে রুখে দেব। আমি আফগানিস্তানকেও মুক্ত করব। আমার দেশের মাটিতেই ওদের ক্রুসেডের স্বপ্ন স্বাদ কবর দিব। মসজিদে আকসাসহ ফিলিস্তিনকেও মুক্ত করব ইনশাআল্লাহ! ভাইয়া তুমি আমাকে দোয়া কর যেন আমি সালাহুদ্দীন আইয়ুবী হতে পারি। তার মতো ক্রুসেড বিজয়ী হতে পারি।'

সালমান মুয়াজের চেতনা দেখে পুলকিত হয়ে বলল 'আমি দোয়া করি আল্লাহ যেন তোমাকেই আমাদের সালাহুদ্দীন বানান। আচ্ছা ভাইয়া! তুমি এখন আমাকে ছবক শুনাও।'

সালমানের কথায় মুয়াজ বসে তাকে ছবক শুনাতে লাগল। মুয়াজ প্রতিদিন সালমানের কাছে তিনপাতা করে অর্থাৎ ছয়ছাপা করে ছবক পড়া দেয়। সালমান তার এরকম ধীশক্তি দেখে বিস্মিত না হয়ে পারলো না।

* * *

মেজর আসাদুল্লাহ সাহেবের ভূগর্ভস্থ বাংকারের যে কক্ষে সালমান অবস্থান করছে, এখানে দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় সকল কিছু থাকলেও একটি জিনিসের সবচেয়ে বেশী অভাব, তাহল সূর্যালোক। সূর্যের আলো পৌছার মতো কোন পথ নেই এখানে। তাই কখন দিন হয়, কখন রাত হয়, তা নির্ণয় করতে হয় ঘড়ির সাহায্যে। নামাযের সময়ও নির্ণয় করে সে একই পন্থায়।

কিছুক্ষণ পূর্বে সালমান ও মুয়াজ একত্রে মাগরিবের নামায পড়েছে। এরপর মুয়াজ তার ছবক ইয়াদ করতে লেগে গেল আর সালমান ইতিহাসের বইটি পড়তে লাগল। দেখতে দেখতে রাত ৮টা বেজে গেল। এদিকে মুয়াজের চোখ ঘুমে টুলুটুলু করছে। ছেলেটি আজ দুপুরে মোটেই ঘুমায়নি। সে দেখল সালমান বই পড়ায় মগ্ন। এই ফাকে সে কোরান শরীফ বন্ধ করে পাশেই শুয়ে পড়ল। সালমান তা টেরই পায়নি। বেশ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর সালমান বইয়ের একটি চাপ্টার শেষ করে মুয়াজের দিকে তাকাল। দেখল সে ঘুমিয়ে পড়েছে। তা দেখে সালমান মুচকি হাসল। 'হায়রে দুষ্ট! আমাকে না বলেই ঘুমিয়ে পরেছে!' মনে মনে বলল সালমান। সে আর তাকে উঠালো না। ঘড়ির কাটার দিকে তাকিয়ে দেখল রাত ৯টা বেজে গেছে। তখন বই রেখে এশার নামায আদায় করল। নামায শেষ করে সে এক দীর্ঘ মুনাজাত করল। তাতে নিজের জানা-অজানা পাপের মার্জনা, শারীরিক সুস্থতা, ইরাকের বিজয় কামনা, আমেরিকা বৃটেন, ভারত-ইসরাঈল, রাশিয়াসহ সকল কুফরী শক্তির ধ্বংস, নিজ দেশের কল্যাণ কামনা, জিহাদের ময়দানে শাহাদাতের তামান্নাসহ বিশ্ব মুসলমানের ঐক্য-সংহতি ও বিজয়-মুক্তির জন্য করুন আকুতি পেশ করল মহান রাব্বুল আলামিনের শাহী দরবারে।

এছাড়া আরও একটি দু'আ করল সে বিশেষভাবে। যেটি এখানে আসার পর মাঝে-মধ্যেই সে করে থাকে। আজও করল। 'হে আল্লাহ্! তুমি আমাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে এখানে পৌছিয়েছো। নতুবা কখনই আমি এখানে আসতে পারতাম না। এখানে না আসলে রুকাইয়াকেও দেখতাম না। আর না দেখলে তার প্রেমেও পরতাম না। হে মহান করুণার আধার! আমিতো বার বার তাকে ভুলতে চাই, কিন্তু কেন যে হৃদয় তার জন্য কাঁদে বুঝতে পারিনা। তুমি আমার অন্তর থেকে তার চিন্তা দূর করে দাও নতুবা তাকে আপন করে পাওয়ার ব্যবস্থা করে দাও!' সালমান দু'আ করে সারতে পারল না। এরই মধ্যে পিছন দিক থেকে ভেসে আসল একটি নারীকণ্ঠ 'আমীন ছুম্মা আমীন!' সালমান আওয়াজ শুনে চমকে উঠল। চেয়ে দেখল রুকাইয়া। তাকে দেখে সে একেবারে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেল। লজ্জায় তার মাথা নিচু হয়ে গেলো। মনে মনে ভাবল 'হায়! আমি এমন দু'আ কেন করলাম! সে আমাকে কি ভাববে!' সালমানের নিজের কাছে নিজেকে ছোট মনে হল। সে মুখফুটে কোন কথাই বলল না। কক্ষব্যাপি কবরের নিরবতা বিরাজ করতে লাগল। অবশেষে রুকাইয়া নিবরতা ভঙ্গ করে সালমানকে লক্ষ্য করে বলে উঠল 'আপনি কি মনে করেন, আল্লাহ আপনার এই দু'আ কবুল করবেন?'

'বান্দার কাজ দু'আ করা, কবুল করা না করা আল্লাহর ইচ্ছা–বলল সালমান–তবে তুমিও যখন কবুল করতে বললে, কবুল তো হতেও পারে!' তার কণ্ঠে লজ্জা মিশ্রিত।

'আমি কবুল করতে বললাম কই–হেসেই বলল রুকাইয়া–আমি তো কেবল আপনার দু'আ সমর্থন করলাম।'

রুকাইয়ার মুখে হাসি দেখে সালমান যেন ধারে প্রাণ ফিরে পেল। তার হাসিতে এমনি এক প্রভাব রয়েছে, যা যেকোন মানুষের দুঃখ-দুশ্চিন্তা নিমিষেই দূর করতে সক্ষম। সালমানের লজ্জা ও জড়তা পুরোটাই কেটে গেল তাতে। তবে সে দৃষ্টি নীচু রেখেই বলল, 'রুকাইয়া! আসলেই তুমি অন্যান্য-অতুলনীয়া। তোমার তুলনা শুধুই তুমি। তোমার অপরূপ সৌন্দর্যের সাথে অসাধরণ বুদ্ধিমত্তা বাস্তবে তোমাকে করে তুলেছে প্রিয়ংবদা।'

মুখের উপর নিজের এরূপ প্রশংসা শুনে রুকাইয়া লজ্জাবতী লতার মত আড়ষ্ট হয়ে বলল 'আমি সাধারণ না অসাধারণ তা জানিনা, তবে আমি মানুষকে খুব বেশী ভালবাসি। হোক সে সাদা, হোক কালো। ধনী হোক কিংবা গরীব। আতুল-খোড়া-অন্ধ-অচল। হোক সে হিন্দু-খৃষ্টান, বৌদ্ধ-ইহুদী বা অন্য কিছু। কেননা এরা সবাইতো একই আল্লাহর সৃষ্টি। আমার দুঃখ হয় বিধর্মীদের জন্য, কেননা তারা সত্যধর্ম, স্রষ্টার পছন্দীয় একমাত্র ইসলাম ধর্মের অনুস্বরণ না করে চিরজীবনের জন্য আগুনের খাদ্যে পরিণত হচ্ছে। সে যাহোক, আমি আপনাকে একটি কথা বলতে চাই; যদি অনুমতি পাই।'

'অনুমতির প্রয়োজন নেই, তুমি যত খুশী কথা বলতে পার।' বলল সালমান।

'অপরাধী শুধু আপনি একা নন; আমিও– অত্যন্ত লাজুক ভঙ্গিতে বলল রুকাইয়া– আপনাকে প্রথমবার দেখার পর থেকেই হৃদয়ে আপনার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করছি। ভেবেছি আপনাকে ব্যাপারটা জানাব, কিন্তু সাহসের অভাবে জানানো হয়নি। তাছাড়া বিষয়টি ভাবতেও ভয় পেতাম। কেননা আপনি এখানে আগান্তুক। অসুস্থ, সুস্থ হলেই তো আপনারা চলে যাবেন। তখন আমার কি হবে।

'দেখ রুকাইয়া! প্রেম-ভালবাসা মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি; যদি তা বৈধ পন্থায় হয়–কিছুটা গাম্ভীর্যের সাথে বলল সালমান–এটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। এর বৈধ পন্থা হচ্ছে শরীয়ত সম্মতভাবে পরিণত সূত্রে আবদ্ধ হওয়া। তখন প্রেম হয় পবিত্র। প্রেম হয় স্বর্গীয়-মহৎ। এমন প্রেম-ভালবাসার কারণেই পৃথিবী আজো এত সুন্দর। কিন্তু আজকাল প্রেম-ভালবাসার সেই পবিত্র সংজ্ঞা উল্টে গেছে। কিন্তু আমি তথাকথিত ও সকল প্রেমের ধার ধারিনা। তোমাকে আমার মনে ভাল লেগেছে, তাই তোমাকে পেতে চাই আপন করে। সে জন্য বিষয়টি তোমাকে না বলে সরাসরি তাকে বলেছি, যিনি সবকিছুর ফয়সালা করেন। আর তোমাকে আমার ভাল লাগার কারণ শুধু এটাই নয় যে তুমি সুন্দরী। আমি তোমার ভিতর দেখেছি এক স্বার্থক মুসলিম রমণীর গুণাবলী। যে সকল রমণীদের কোলেই জন্ম নেয় খালিদ বিন ওলিদ, তারিক বিন যিয়াদ, মুহাম্মদ বিন কাসিম, সালাহুদ্দীন আইয়ুবী, নূরুদ্দীন জঙ্গী, সুলতান মাহমুদ গজনবী, ওসামা বিন লাদিন, মোল্লা মোহাম্মদ ওমর এবং মাসউদ আযহারের ন্যায় দিক বিজয়ী বীরেরা। বিশ্ববিখ্যাত রণকুশলী মর্দে মুজাহিদরা। যাদের নাম শুনলেও কাফের গোষ্ঠীর হৃদকম্পন শুরু হয়ে যায়। আরামের ঘুম হারাম হয়ে যায়। এমনকি ভয়ে খাদ্য গলায় আটকে সোফা নিয়ে উল্টে পড়ে মুখ থেতলে যায়।'

সালমান একটু থেমে আবার বলল, 'অবশ্য তোমার কাছে বিষয়টি এভাবে প্রকাশ হওয়া আমার কাম্য ছিলনা। যখন প্রকাশ হয়েই গেছে, তখন তোমাকে আমি এও বলে দিতে চাই যে, যদি আল্লাহ আমাকে বাঁচিয়ে রাখেন, তবে তোমারই হয়ে বেঁচে থাব ইনশাআল্লাহ আর যদি বেঁচে না থাকি অথবা তোমার সাথে আমার মিল হওয়াটা আল্লাহর সিদ্ধান্ত বহির্ভূত হয় তবে সেটা আলাদা কথা।'

'আমিও আল্লাহর সিদ্ধান্ত মানার জন্য তৈরী আছি' বলল রুকাইয়া।'

'আচ্ছা রুকাইয়া! আমার কাছে একটা বিষয় খুব আশ্চার্য লাগে' প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে বলল সালমান।

'কি সেই বিষয়টি?' জিজ্ঞেস করল রুকাইয়া।

'বিষয়টি হচ্ছে পর্দা–বলল সালমান–তোমাদের দেশের মেয়েরা পূর্ণ দেহ এক ঢিলা আবরনীতে আবৃত রাখে এটা ঠিক আছে। মাথা ও গলার উপর ওড়না পেঁচায় যা সাধারণতঃ মাথা থেকে সামনের দিকে অনেক ঝুলানো এতে তাদের মাথার একটি চুলও দেখা যায়না এটাও ঠিক আছে। কিন্তু তাদের মুখমন্ডলে তো নেকাব নেই। এভাবে কি শরঈ পর্দা পালন হয়?

'কেন চেহারা তো পর্দার অন্তর্ভুক্ত নয়!' বলল রুকাইয়া।

'বল কি! চেহারা পর্দার অন্তর্ভুক্ত কেন হবে না?' আশ্চার্য হয়ে বলল সালমান।

'তা এজন্য যে শরীয়তে সতর ঢেকে রাখার হুকুম দেয়া হয়েছে। বলল রুকাইয়া, আর তা হচ্ছে পুরুষের জন্য নাভী থেকে হাটু পর্যন্ত এবং মহিলাদের জন্য চেহারা, কব্জি পর্যন্ত উভয় হাত ও গোড়ালি পর্যন্ত উভয় পা ছাড়া অবশিষ্ট সম্পূর্ণ শরীর সতরের অন্তর্ভুক্ত। অতএব চেহারা ঢাকতে হবে কেন?

'আসলে তোমরা এ ভুলের শিকার হয়েছো ফিক্বাহ শাস্ত্রের নামাযের সতর সংক্রান্ত একটি মাসআলা থেকে–মৃদু হেসে বলল সালমান–যাতে বলা হয়েছে যে, 'মহিলাদের জন্য চেহারা, কব্জি পর্যন্ত উভয় হাত ও গোড়ালি পর্যন্ত উভয় পা ছাড়া অবশিষ্ট সম্পূর্ণ শরীর সতরের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই নামাযে যদি হাত, পা ও চেহারা খোলা থাকে তবে নামায হয়ে যাবে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ মাসআলাটি নামাযের সাথে সম্পৃক্ত, পর্দার সাথে এর কোনই সম্পর্ক নেই। কাজেই এ মাসআলা থেকে পরপুরুষের সামনে বেপর্দা হয়ে মুখমন্ডল খোলার বৈধতা প্রমাণিত করার প্রবণতা ধৃষ্টতা নয় কি?

কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন 'হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রী, কন্যা ও অন্যান্য মু'মিন নারীদের বলে দিন (তারা যখন প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যাবে তখন) যেন নিজ (চেহারার) উপর (ও) চাদরের একটি অংশ ঝুলিয়ে (চেহারার) কাছাকাছি করে নেয়। এতে সহজেই তাদেরকে চেনা যাবে ফলে তাদেরকে আর কষ্ট দেয়া হবে না।' (সূরা আহযাব ঃ আয়াত ঃ ৫৯)

আলোচ্য আয়াতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি এই যে, এখানে পর্দার জন্য মুখের উপর চাদর ঝুলানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। অতএব এখন আর এ কথা বলার অবকাশ-ই থাকেনা যে মহিলাদের জন্য চেহারা ঢাকার নির্দেশ শরীয়তে নেই। তাছাড়া আকল ও যুক্তিরও দাবী এই যে, স্ত্রীলোকদের মুখমন্ডল পর্দার অন্তর্ভুক্ত থাকবে। কেননা নারীর দেহ সৌন্দর্যই পুরুষকে তার প্রতি আকৃষ্ট করে থাকে। আর মুখমন্ডলই হচ্ছে নারী দেহের সুন্দরতম অংশ সুতরাং মুখমন্ডল খোলা রেখে অবশিষ্ট দেহ পর্দাবৃত করার দ্বারা মূলতঃ পর্দার আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হতে বাধ্য। তদুপরি মুখমন্ডল খোলা থাকলে নারীর পরিচয় জানা সহজ হবে এবং ফেতনার সুযোগও হবে অবারিত।'

'আসলে এ বিষয়টি আমি ইতিপূর্বে কখনোই ভাবিনি বা কেউ আমাকে এ ব্যাপারে বলেও নি–অনুতাপের ভঙ্গিতে বলল রুকাইয়া–অন্যান্যদের যেভাবে দেখেছি এবং বান্ধবীদের কাছে যে রকম শুনেছি, আমি সে রকমই এতদিন চলেছি আর আপনাকেও সেই উত্তর দিলাম। কিন্তু এখন আপনার আলোচনার দ্বারা বিষয়টা আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে এবং আমার ভুলও ভেঙ্গেছে।'

'আলহামদুলিল্লাহ! এতটুকুতে বুঝে আসায় তোমাকে মোবারকবাদ–বলল সালমান–সত্য কথা বলতে কি জান! বর্তমান মুসলিম সমাজ কোরান-সুন্নাহর সঠিক শিক্ষা ও ইসলামের আদর্শ থেকে বহু দূরে চলে গেছে। আর এই সুযোগে ইসলামের শত্রুরা একের পর এক ভ্রান্ত বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনা ঢুকিয়ে দিচ্ছে মুসলিম মন-মানষে।'

'বাস্তবেই আমরা আজ বড় আত্মভোলা জাতিতে পরিণত হয়েছি–বলল রুকাইয়া–নতুবা কেন আজ আমরাই শুধু সারা বিশ্বে মার খাচ্ছি।'

'হু, তাই–সালমান মাথা ঝাকিয়ে বলল–আচ্ছা রুকাইয়া! আজ ক'দিন পর্যন্ত তোমার আব্বাজান আসছেন না, তার খবর কি? আর যুদ্ধের অবস্থাই বা কেমন?'

'সে কথা বলার জন্যই এখন আমি এসেছি–বলল রুকাইয়া– আজ সন্ধ্যায় আব্বাজান এসেছিলেন। অল্প সময় থেকেই চলে গেছেন, তাই আপনার সাথে দেখা করতে পারেন নি। তিনি বলে গেলেন শত্রু বাহিনী বাগদাদের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। লড়াই চলছে তুমুল বেগে। ইতিমধ্যে নাজাফ, কারবালা, বসরা ইরাকী বাহিনীর হাতছাড়া হয়ে গেছে। কখন বাগদাদের পতন ঘটে বলা যায়না।

আমাদের বাহিনী প্রতিরোধ করে যাচ্ছে যথাসম্ভব। আব্বাজান এখন আর বাড়িতে আসতে পারবেন না। আমাদের সতর্ক থাকতে বলেছেন। আপনাকে রীতিমত ঔষধ পথ্যাদি ব্যবহার করতে বলেছেন।

'আল্লাহ তাঁকে হেফাজত করুন– বলল সালমান–বেচারা ভয়াবহ যুদ্ধের মুখোমুখি যাওয়ার মুহূর্তেও তার মেহমানের কথা ভুললেন না। আচ্ছা রুকাইয়া! বাগদাদের জনগণের অবস্থা কি? তারা কি ভীত হয়ে পড়েছে? নাকি প্রতিরোধমুখী হচ্ছে?'

'বাগদাদের জনগণ ভীত হয়ে পড়েনি–বলল রুকাইয়া–বরং সাধারণ নাগরিকগণও সিপাহীদের সাথে কাধে কাধ মিলিয়ে দেশ রক্ষার যুদ্ধে শামিল হচ্ছে। হানাদার বাহিনী তাই

সম্মুখ সমরে লড়তে সাহস করছেনা। বরং সিপাহী-জনতার এই যৌথ প্রতিরোধ ব্যুহের উপর একতরফাভাবে বিমানের সাহায্যে বোমা বর্ষণ করে যাচ্ছে। একেবারে ঠান্ডা মাথায় যুদ্ধনীতি লংঘন করে চলছে। হায়! আজ যদি আমাদের বাহিনী আগের মত থাকত।'

শেষের দিকের কথাগুলি বলতে গিয়ে রুকাইয়া কেমন উদাসীন হয়ে গেল। তা দেখে সালমান বলল–রুকাইয়া! তোমার মুখ মলিন দেখাচ্ছে কেন? বাগদাদের পতন হবে, ইরাক মার্কিনীরা দখল করে নিবে, সে জন্য তো মন ভাঙ্গা যাবে না। কারণ মু'মিনের হারাবার মত কিছু নেই। সে মরলেও সফল বাঁচলেও সফল। তাই তোমাকে এখন যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে। এখন প্রতিটি ইরাকী ছোট-বড়, নারী-পুরুষ সবার জন্য যুদ্ধ করা ফরজ। বাগদাদের জন্য এটা বদনসীব যে, সে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে এক স্বৈরশাসক ও তার কতিপয় সহযোগীর পাপের দরুন। কিন্তু বাগদাদের কন্যারা যদি হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে, তবে তো তার এই পতন-চিরদিনের পতনে পরিণত হবে। তোমাদের জন্য আমার দুঃখ হয় এজন্য যে, তোমরা দীর্ঘদিন সাদ্দামের বুটের তলায় পিষ্ট হয়েছো আর এখন মার্কিনীদের বিমান হামলায় হচ্ছো তুলো ধুনো।'

একটু দম নিয়ে সে আবার বলল 'রুকাইয়া! তুমি না বলেছিলে "মার্কিনীরা আমার দেশ দখল করলে আমি মাথায় কাপনের কাপড়ের নেকাব পড়ে ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করবো" সেই তুমি এখন মুখ মলিন করে আছো কেন?'

সালমানের একথা শুনে রুকাইয়া চমকে বলে উঠল– 'হ্যাঁ, আমার শপথ আমি ভুলিনি। আমার দেশ দখলকারীদের সাথে আমার লড়াই হবে অত্যন্ত ভয়াবহ। আমি ওদের হত্যা করবো মনের ঝাল মিটিয়ে।' ওদের একটি সৈন্যও ইরাকের মাটি থেকে জীবিত ফেরত যেতে দিব না। আমেরিকা মুসলমানদের চিনতে ভুল করেছে। মুসলমানরা কেমন জাতি তা এখনও সে বুঝতে পারেনি। আমি আবারও শপথ করছি যে, জীবন যদি দিতে হয় দিব, তবুও আমৃত্যু ওদের সাথে মোকাবেলা করে যাবো। আমরা সেই সুমাইয়া (রাঃ)-এর উত্তরাধীকারী, যিনি শাহাদাতের মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছিলেন হাসিমুখে। আমাদের শিরায় প্রবাহিত সেই বীরঙ্গনা খাওলা (রাঃ)-এর পবিত্র খুন, যুদ্ধের ময়দানে যার দীপ্ত পদচারণা আর অসীম সাহসী আক্রমণ দেখে স্বয়ং সেনাপতি খালিদ বিন ওলিদ (রাঃ) পর্যন্ত বিস্মিত হয়েছিলেন। আমিও সেই খাওলা হব। বাগদাদের ঈগলের মতই আমি দেশ রক্ষার জিহাদে ঝাপিয়ে পরবো জীবনপণ করে।'

রুকাইয়ার বক্তব্য শুনে সালমান বলল, 'তোমার কাছ থেকে আমি সর্বদা এরকম প্রতিক্রিয়াই আশা করি। কিন্তু বাগদাদের ঈগল আবার কে বলতো?'

'আমাদের ঈগলতো বর্তমানে বাগদাদের এক বিস্ময়' – বলল রুকাইয়া–'তাঁর আসল নাম ঈগল নয়। তার নাম ওমর শুজা। তার কর্ম চঞ্চলতার কারণে তাকে এই উপাধি দিয়েছে বাগদাদবাসী। কেননা তার কাজের গতি ঈগলের ন্যায় দ্রুতগতি সম্পন্ন। সে ইরাকী বাহিনীর নিয়মিত কোন সৈনিক নয় অথচ তার অবাধ বিচরণ পুলিশ বাহিনী থেকে নিয়ে সেনাবাহিনীসহ ইরাকের প্রতিটি বাহিনীতে। কেউ কেউ আবার তাকে রহস্য মানব বলেও অভিহিত করে থাকে।

ইরাক যুদ্ধ শুরু থেকেই তাঁর অভূতপূর্ব কর্ম চঞ্চলতা আরম্ভ। প্রথমদিকে প্রায় সকলেই তাকে মার্কিনীদের দালাল কিংবা গুপ্তচর হিসেবে সন্দেহ করত। দিনে দিনে তার উপর সকলের এই কু-ধারণার অপনোদন ঘটায় তার কর্ম কুশলতা। বাগদাদকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে ইরাকী নিয়মিত বাহিনী, রিপাবলিকান গার্ড ও ফেদাইন মিলিশিয়াদের পাশাপাশি সাধারণ জনগণকে নিয়ে যৌথ প্রতিরোধ ব্যূহ রচনা করার কৃতিত্ব বলতে গেলে তার একার। এই প্রতিরোধ বাহিনীর প্রয়োজনীয় রশদপত্র পৌঁছানো, সংবাদ আদান-প্রদান করা, বাগদাদের বাহিরে গিয়ে মার্কিন সৈন্যদের অবস্থানস্থল থেকে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করা, তাদের সাথে বন্ধুত্বের ভান করে সুযোগমত ক্যাম্পের তাবুতে চোরাগুপ্তা হামলা করে নিমিষে উধাও হয়ে যাওয়ার মত কাজে সে এতটা পারঙ্গমতা অর্জন করেছে যে, তাকে ঈগল না বলে অন্যকিছু বললে যথার্থ সাদৃশ্যতা হয় না।

শুধু তাই নয়, মার্কিনীদের বিমান-বোমার অসহায় শিকার সাধারণ মানুষদের হাসপাতালে নেয়া, তাদের সেবা-শুশ্রূষা করা, মৃতদের দাফন-কাফনের কাজেও সে ছুটে ফেরে এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায়। এই হয়তো তাকে দেখা গিয়েছে ফেরদৌস স্কোয়ারের সামনে, কতক্ষণ পর দেখা যাচ্ছে ফিলিস্তিন হোটেলের সামনে কিংবা গ্রীন জোনের সামনে। আবার কিছুক্ষণ পর হয়তো দেখা যাবে কোন আহতকে নিয়ে ছুটছে হাসপাতাল অভিমুখে। হয়তো বা আবার ঘণ্টাখানেক পরে দেখা যাবে বালাদ রুজে অথবা সদরসিটিতে প্রতিরোধ যোদ্ধাদের সাথে জরুরী কথাবার্তা সারছে, তাদের প্রয়োজন মিটিবার ব্যবস্থা করছে। এরই দু'এক ঘণ্টার ব্যবধানে তাকে দেখা যাবে বাগদাদের সীমানা পেড়িয়ে মার্কিন সৈন্যদের অবস্থান স্থলে ঘুরে ফিরছে। তাদের সহযোগীতা করার নাম করে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করছে। তাইতো সকলে তাকে নাম দিয়েছে ঈগল 'বাগদাদের ঈগল।'

রুকাইয়ার মুখে 'বাগদাদের ঈগলের' কাহিনী শুনে তাজ্জব হয়ে গেল সালমান। একজন মানুষের পক্ষে কি এতসব কাজ করা আদৌ সম্ভব! এমন অবিশ্বাস্য কথাও কি বিশ্বাস করতে হবে। তাই সে বলল, 'রুকাইয়া! আমার বুঝে আসছেনা, একা একজন মানুষ কিভাবে এতসব কাজ আঞ্জাম দিতে পারে। তুমি কি ঈগলকে কখনও দেখেছো? নাকি অন্যদের কাছে শুনে শুনেই বলছো এসব কথা, বল তো?'

'এটা অসম্ভবের কিছুই নয় সালমান সাহেব–বলল রুকাইয়া–ঈগল মরুভূমির ছেলে। মরুভূমির উটের ন্যায় দীর্ঘসময় ক্ষুৎ-পিপাসা সহ্য করার ক্ষমতা সে অর্জন করেছে। তাই আহার-বিশ্রামের খুব একটা প্রয়োজন হয়না তাঁর। বাঘের চেয়ে ক্ষীপ্র, ঈগরের মত তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন, হরিণের মত সতর্ক, সিংহের মত সাহসী এই ইরাকী বীর। সর্বোপরি পাক্কা ঈমানদার এবং খাঁটি দেশপ্রেমিক সে।

একটু থেমে পুণরায় বলল রুকাইয়া, আপনি জিজ্ঞেস করছেন তাকে আমি দেখেছি কিনা। এর উত্তর হলো, উক্ত ওমর শুজা ওরফে বাগদাদের ঈগল' আমার আপন মামাতো

ভাই। ১৯৯৫ সালে আমেরিকার বিমান হামলায় আমার মামা-মামী, মামাতো ভাই-বোন সকলে নিহত হয়। ভাগ্যক্রমে ওমর ভাইয়া সেদিন বাড়িতে ছিলেন না, বিধায় তিনি বেঁচে গেছেন। বাড়িতে এসে মা-বাবা, ভাই-বোনদের লাশ দেখে ওমর ভাইয়া শোকে-দুঃখে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। তাদের সকলের দাফন-কাফন সেরে, সে বছরই চলে যান আফগানিস্তানে। সেখানে থেকে ভাইয়া যুদ্ধ করার সকল কলা-কৌশল রপ্ত করেন। ২০০১ সালের ৭ই অক্টোবর আমেরিকার আফগানিস্তানে আগ্রাসনের প্রেক্ষিতে আমিরুল মু'মিনীন মোল্লা মোঃ ওমর যখন কৌশলগত কারণে ক্ষমতা ত্যাগ করেন এবং বিদেশী মুজাহিদদের স্ব স্ব দেশে চলে যাবার নির্দেশ দেন, তখন ওমর ভাইয়াও তার জন্মভূমি ইরাক চলে আসলেন।

'তাই বলো! হ্যাঁ সূচক ভঙ্গিতে মাথা দুলিয়ে বলল সালমান–'সে যদি আফগান মুজাহিদ হয়ে থাকে, তবে তাঁর এই অবিশ্বাস্য কর্ম তৎপরতা বিশ্বাস করতে আমি মোটেই দ্বিধাবোধ করবো না। রুকাইয়া! তুমি কি ঈগলের সাথে আমাকে একটু সাক্ষাৎ করিয়ে দিতে পারবে? এমন একজন ইরাকী বীর মুজাহিদের সাথে পরিচিত হতে আমার খুবই ইচ্ছা করছে।'

রুকাইয়া সালমানের আগ্রহ দেখে বলল, 'দেখুন! আমাদের ঈগল এখন তাঁর মিশন নিয়ে বেজায় ব্যস্ততার মধ্যে আছেন। এমতাবস্থায় তাঁর সাক্ষাৎ পাওয়া খুবই দুস্কর। যুদ্ধ শুরু হবার পর সে মাত্র দু'বার এসেছিল আমাদের বাড়িতে এরপর আর আসেনি। তারপরও আপনি যখন বলছেন, আমি চেষ্টা করব তাঁর সাথে আপনার সাক্ষাৎ করাতে। ভাগ্য ভাল হলে সে নিজেও আসতে পারে, তাঁর এই আদরের বোনটিকে দেখার জন্য। কেননা ওমর ভাইয়া আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। এর কারণ, তাঁর আদরের ছোট বোন রাফিয়া সুলতানা, যে মার্কিনীদের বোমা হামলায় তার মা-বাবার সাথে শহীদ হয়েছিল, সে দেখতে অবিকল আমার মতই ছিল। তাছাড়া রাফিয়া এবং আমি ছিলাম একই শ্রেণীর ছাত্রী-অত্যন্ত ঘনিষ্ট বান্ধবী। এজন্য ঈগল ভাইয়া মাঝে-মধ্যে এসে আমাকে দেখে, তাঁর সেই হারানো বোনের স্মৃতিচারণ করেন।'

তাদের এই দীর্ঘ আলোচনায় বেশ সময় কেটে গেলো। ঘড়ির কাটা রাত ১২টা বাজার সংকেত দিল। তা শুনে সালমান রুকাইয়াকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'মুয়াজ আজ তাড়াতাড়ি ঘুমিয়েছে। ওকে কিছু খাইয়ে শোয়ানো দরকার।'

রুকাইয়া আলতো করে মুয়াজের মাথায় হাত বুলিয়ে নাড়া দিল। তাতে মুয়াজের ঘুম টুটে গেল। চোখ খুলে সে বোনকে সামনে দেখে ভয়াতুর কণ্ঠে বলল, আপু! আজ দুপুরে ঘুমাতে পারিনি তো, তাই পড়ার সময় খুব ঘুম পেয়েছিল; সে জন্য এইমাত্র একটু শুলাম কেবল।' মুয়াজ বুঝতেই পারেনি যে, সে রীতিমত দু'তিন ঘণ্টা ঘুমিয়েছে। তাই বোনকে একথা বলল। রুকাইয়া তার এই মা-মরা ভাইটিকে যেরকম অত্যন্ত আদর-স্নেহ করে, সে রকম শাসনের ক্ষেত্রেও খুব সতর্ক দৃষ্টি রাখে। কেননা, সে জানে শিশুদেরকে

আদর-সোহাগের পাশাপাশি যদি পরিমিত শাসন করা না হয়, তবে তারা সীমা অতিক্রম করে ফেলে অল্পতেই। আবার শাসন যেন এতটা কড়া না হয় যে, তাতে বাচ্চাদের মানসিক বিকাশে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। মোটকথা "শাসন করতে হলে সোহাগ করতে হয়" জ্ঞানীদের এ কথাটি স্মরণ রাখা চাই। তাদের যেহেতু মা নেই তাই মায়ের শাসন এবং বোনের আদর উভয়টিই তার একার করতে হয়। মুয়াজ তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে যে নিয়মের ভঙ্গ করেছে এবং সে নিজেই যখন এ জন্য ভীত, তখন রুকাইয়া তাকে আর কিছু বলল না। বরং ভাইকে কোলের মধ্যে বসিয়ে খানা খাইয়ে পুনরায় ঘুম পাড়িয়ে দিল। এরপর সালমানের সাথে সেও খানাপর্ব শেষ করে ঘরে চলে গেল। সালমান তার বিছানায় শুয়ে পড়ল।

রুকাইয়া ঘরে এসে তার নির্ধারিত বিছানায় শুলো ঠিক, কিন্তু তার চোখে ঘুম আসছে না। হরেক রকম চিন্তা এসে তাকে আজ জেকে ধরছে। সে ভাবছে তাহলে 'সালমান সাহেবও আমাকে ভালবাসতেন যেটা আমি জানতাম না, আর আমি তাকে ভালবাসতাম যেটা তিনি জানতেন না। যাক ভালই হল ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল। কিন্তু আমাদের এই চাওয়া-পাওয়া কি পূরণ হবে কোনদিন! নাকি, এই চিন্তা আসতেই তার মন ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। হানাদারদের গোলার মূহুর্মুহ আওয়াজে তার মনঃবেদনা আরও বৃদ্ধি পেল। সে শুয়ে শুয়ে আমেরিকাকে অভিসম্পাদ দিতে লাগল। 'হায়রে জালিম-পাষন্ড শয়তান। তোরা মানবতার প্রকাশ্য দুশমন। তোরা রক্তচোষা হায়ে না। তোরা দেশে দেশে মানুষ খুনকারী কসাই। তোদের হাত নিরীহ মানুষের খুনে রঞ্জিত। তোরা মানুষের জন্য বিষাক্ত সর্প স্বরূপ। তাই আজ সারা বিশ্বের মযলুম মানবতা তোদেরকে অভিসম্পাদ করছে। তোর অবৈধ মোড়লীপনার বিরুদ্ধে ধিক্কার জানাচ্ছে। বিশ্ববাসী একমত যে, তোরা মিথ্যুক, প্রতারক, মানুষরূপী হায়েনা। সুতরাং হে আমেরিকা তোর কপালে পতনের তিলক লেগে গেছে। বিশ্ব শান্তির জন্য তোর পতন অনিবার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে; অচিরেই রাশিয়ার মত তোর ধ্বংসাত্মক অবয়ব বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করবে, তাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। কারণ খোদায়ী গজবের সকল কারণ তোদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে।'

এভাবে চিন্তা-দুঃশ্চিন্তার দোলাচলে কখন যে সে ঘুমিয়ে পড়েছে তা রুকাইয়া নিজেও জানেনা।

তিন

মার্কিন হানাদার বাহিনী তাদের বাগদাদ অবরোধ আরও শক্তিশালী করেছে। বাগদাদের ১০ কিলোমিটারের মধ্যে তারা পৌঁছে গেছে বলে দাবী করছে। যদিও ইরাকের তথ্যমন্ত্রী সাঈদ আল-সাহাফ তা অস্বীকার করেছেন। এক পক্ষকালের লড়াইয়ে বিগত ২৪ ঘণ্টায় ইরাকের সাফল্য বিস্ময়কর। এ সময়ের মধ্যে ৪৯ জন ইঙ্গ-মার্কিন হানাদার সৈন্য নিহত ১৫ জন নিখোঁজ এবং ১৫০ জন আহত হয়েছে। তাছাড়া দুটি অত্যাধুনিক মার্কিন জঙ্গী বিমান, ৪টি হেলিকপ্টার এবং বেশ কয়েকটি মানুষ্যবিহীন গোয়েন্দা বিমান

ভূপাতিত হয়েছে। একই সময়ে হানাদার বাহিনীর ১১টি ট্যাংক এবং প্রচুর সাজোয়া যানও ধ্বংস হয়েছে। যুদ্ধের এই গতিধারায় হানাদাররা দিশেহারা হয়ে পড়েছে। তাদের সামরিক কমান্ড ভেঙ্গে পড়েছে।

আগ্রাসী ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর মোকাবেলায় এবং রাজধানী বাগদাদ রক্ষায় ইরাকী বাহিনী সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে তাদের এই প্রস্তুতিতে বাগদাদকে এক দুর্ভেদ্য নরগী বলে মনে হচ্ছে। মেজর আসাদুল্লাহ সাহেবও তার বাহিনী নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন। তারা লড়ছেন অকুতোভয় বীরযোদ্ধার মত। আর এজন্য ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী প্রচলিত যুদ্ধে 'নিষিদ্ধ' সবরকম ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করছে অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায়।

ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী কেবল নিষিদ্ধ বাংকার বাস্টার ও ক্লাস্টার বোমাই ফেলছে না, ডিপ্লেটেড ইউরেনিয়াম বোমাও বর্ষণ করছে–যা পারমাণবিক বোমার কাছাকাছি। ক্যামিক্যাল বোমার চেয়ে এটা কম ক্ষতিকর নয়। আগ্রাসী বাহিনী যতই প্রতিরোধের মুখোমুখি হচ্ছে, ততই বেপরোয়া হয়ে উঠছে। ফলে ইরাকী জনগণকে মুক্ত করার তথাকথিত 'মুক্তিযুদ্ধ' এখন ইরাকী অসহায় নারী, পুরুষ ও শিশু হত্যায় রূপ নিয়েছে।

ইতিহাসের কি নির্মম পরিহাস, যে ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্রের অজুজাতে আজ ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী ইরাক আক্রমণ করেছে, তারাই প্রথম ব্যাপক সেই ধ্বংসাত্মক অস্ত্র ব্যবহার করছে। আরো আশ্চার্যের বিষয় হচ্ছে যে, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী হাউস অব কমন্সে বার বার অভিযোগ করেছেন যে, সাদ্দাম হোসেন কেমিক্যাল বোমা আক্রমন চালিয়ে উত্তর ইরাকে কুর্দী হত্যা করেছে, সেই বৃটিশ রাজকীয় বাহিনী প্রথম মহাযুদ্ধকালে ইরাকে আগ্রাসন চালিয়ে সর্ব প্রথম কুর্দীদের উপর বিষাক্ত গ্যাস নিক্ষেপ করছিলো। সেই আগ্রাসন কিন্তু বৃটিশদের জন্য ইতিহাসে এখনো একটি কলংকজনক অধ্যায় হিসেবে বিরাজ করছে।

মেজর আসাদুল্লাহ সাহেবের ডিউটিস্থল বাগদাদের বালাদ রুজ। তিনি টহল দিচ্ছেন খুব সতর্কভাবে। তাঁর সৈন্যরা বিমান বিধ্বংসী কামান নিয়ে পজিশনে বসে আছে। কোনো বিমান রেঞ্জের আওতায় আসলেই তা ঘায়েল করে ফেলে দিচ্ছে। এরই মধ্যে একটি চিনুক হেলিকপ্টার তাদের রেঞ্জের মধ্যে এসে যায়। অমনি আসাদ বাহিনীর এক সদস্য সেটিকে লক্ষ করে কামান ছুড়ে দেয়। এক আঘাতেই কপ্টারটি পরে যায়। আর তাতেই ঘটে মর্মান্তিক এক বিপর্যয়। মেজর আসাদুল্লাহ তখন টহল দিয়ে কেবল ফিরছিলেন অকুস্থলে। তিনি গাড়ি থেকে নামতে যাবেন, সে সময়ই কপ্টারটির ধ্বংসাবশেষের অংশবিশেষ এসে পড়ল তাঁর গাড়ির উপর। তাতে আহত হলেন স্বয়ং মেজর। সাথে সাথে সামরিক এ্যাম্বুলেন্সে করে তাকে নিয়ে যাওয়া হল হাসপাতালে।

বাগদাদের হাসপাতালগুলোর অবস্থা খুবই নাজুক। হাসপাতালগুলোতে দিন দিন চিকিৎসা নিতে আসা আহতদের সংখ্যা বেড়েই চলছে। তীব্র ঔষুধ সংকট চলছে

হাসপাতালগুলোতে এছাড়া পানি ও বিদ্যুৎ নেই বললেই চলে। দ্য ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অব দ্য রেডক্রস (আইসি আরসি) জানায়, রাজধানীতে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ছে এবং তাদের ঔষুধ রয়েছে সীমিত। গড়ে প্রতি ঘণ্টায় রাজধানীর ১০০ লোক হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে। রেডক্রসের কর্মীরা সেখানে অবিরাম কাজ করে যাচ্ছে। শনিবার মার্কিন বাহিনী প্রথম অভিযান শুরু করলে বড় পাঁচটি হাসপাতালের ওয়ার্ডগুলো আহত রোগীতে ভরে যায়। এখন নতুন আসা রোগীদের ভর্তি করা যাচ্ছেনা। হাসপাতালের বারান্দায়, ফ্লোরে এমনকি বহু আহত রোগী হাসপাতালের বাহিরে পড়ে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। এন্টিবাওটিক, আনেসথেটিক এবং ইনসুলিনের মতো ঔষধ হাসপাতালগুলোতে পাওয়া যাচ্ছে না। বেদনার্ত মানুষের আর্তচিৎকারে হাসপাতাল প্রাঙ্গন ভারী হয়ে উঠেছে।

আইসি আরসি'র মুখপাত্র রোনাল্ড হুগোইনিন বেনজামিন বাগদাদের উত্তরাঞ্চলীয় আল-কিনদী হাসপাতালে জানান, গত দু'দিন যাবৎ চিকিৎসকরা দিনরাত কাজ করছেন। ঔষধপত্র শেষ হয়ে গেছে। পরিস্থিতি ভয়ানক হয়ে উঠছে। তিনি বলেন, আপনি ভয়াবহ বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পাবেন। বিস্ফোরণের কারণে ঘরের জানালাগুলো পর্যন্ত কেপে ওঠে।'

হাসপাতালের মর্গের বাইরে প্রতিদিন বোমাবর্ষণে নিহতদের লাশের কফিন স্তূপীকৃত হয়ে আছে। এ্যাম্বুলেন্স আসছে আহতদের নিয়ে। তাদের নামিয়ে আবার ছুটছে। অপরাহ্নে এক দম্পতিকে নিয়ে আসা হল। তাদের বাহু, পা এবং হাতের তালু অগ্নিদগ্ধ। তাদের আনা হয়েছে দক্ষিণাঞ্চলের আল-দাউরা জেলা থেকে।

আলী ইসমাঈল আব্বাস (১২) বোমার আঘাতে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়েছে কিন্তু তার বেঁচে থাকার প্রধান অবলম্বন দুটো হাতই উড়ে গেছে। তাকে হাসপাতালে এনেছে তার প্রতিবেশীরা। আরও সাথে এসেছে মানব দরদী বাগদাদের ঈগল। হানাদারদের ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে তাদের বসতবাড়ি ধ্বংস হয়ে গেছে। প্রাণ হারিয়েছে তার প্রাণপ্রিয় পিতা ও সবচেয়ে আপনজন তার আম্মা, এমনকি প্রাণে রক্ষা পায়নি তার আদরের ভাইটিও। ইঙ্গ-মার্কিন বর্বর ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে আলী ইসমাঈল আব্বাস মুহূর্তের মধ্যে পিতৃ-মাতৃহীন এতিম শিশুতে পরিণত হয়েছে। সে এখন পঙ্গু-অসহায়। তার শরীরের অনেকখানি পুড়েও গেছে। হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে অঝোরে কান্না ছাড়া তার আর কিছুই করার নেই। দেহের পুড়ে যাওয়া অংশ বিছানার কাপড়ের সঙ্গে যাতে লেগে না যায়, সেজন্য তার দেহটিকে বিশেষ এক ধরনের ধাতব খাচার মধ্যে ঢোকানো হয়েছে। এতে নড়াচাড়ায় খুব কষ্ট। কাটা হাতে ও মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা।

এই ইরাকী শিশু বড় হয়ে একজন সেনা অফিসার হতে চেয়েছিল। কিন্তু তা আর হলো না। সে এখন একজন ডাক্তার হতে চায়–কিন্তু সে কি করে তা পারবে? তারতো হাতই নেই। অশ্রুসজল চোখে তার প্রশ্ন বিশ্ববাসীর কাছে, জালিম বুশের কাছে, আপনি কি পারবেন আমার হাত দু'টি ফিরিয়ে দিতে? আপনি কি জানেন, ডাক্তার আমাকে আর

একজোড়া হাত লাগিয়ে দিতে পারবে? আপনি পারবেন আমার মা-বাবা ও ভাই-বোনকে ফিরিয়ে দিতে? তার শেষ কথা ঃ আমি যদি আমার হাত দুটো ফিরে না পাই তাহলে আমি আত্মহত্যা করব।' এই নিষ্পাপ ফুলের মত শিশু ইসমাঈলের ফরিয়াদ কি উম্মাহর সদস্যরা কানে তুলবেন? আমাদের ফুলের মত কচি শিশুরা কি এভাবেই অকালে ঝড়ে যেতে থাকবে? আক্রান্ত মুসলিম বিশ্বের ইসমাঈলেরা কি এভাবেই বুকভরা আশা বুকে নিয়ে পরপারে পারি জমাতে থাকবে? আমাদের কি কিছুই করার নেই?

* * *

মেজর আসাদুল্লাহ সাহেবকে হাসপাতালের জরুরী বিভাগে ভর্তি করা হয়েছে। পঙ্গু ইসমাঈলের পাশের সিটেই শোয়ানো হলো তাঁকে। ওমর শুজা মেজরকে দেখেই আৎকে উঠল। সে ফুফা বলে চিৎকার দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠল–ফুফা আপনার এ অবস্থা হলো কখন? রুকাইয়া-মুয়াজ ভাল আছে তো? কেঁদে কেঁদে জিজ্ঞেস করল ওমর।

'কেঁদোনা ঈগল! তুমি তো বাগদাদের একজন মোহাফেজ'–বললেন মেজর সাহেব–'তোমার একজন আত্মীয়ের আহত হওয়ায় যদি তুমি ভেঙ্গে পরো, পরে পুরো দেশের মানুষকে হানাদারদের কবল থেকে কে রক্ষা করবে বেটা? আমি অল্প আগে আহত হয়েছি। তোমার ভাই-বোনেরা আশা করি ভালই আছে।'

'ফুফা! আমি আম্মাকে হারিয়েছি, আব্বাকে হারিয়েছি, আদরের ভাই-বোনকে হারিয়েছি'–বলল ঈগল–'আমার আপন বলতে আপনারা ব্যতীত আর কে আছে বলুন? তার পরে যদি আবার আপনাকে...।'

তার কথা শেষ করতে না দিয়ে ইসমাঈল আব্বাস বলল–'ঈগল ভাইয়া! তুমি না বীর মুজাহিদ, তুমি না আল্লাহর সৈনিক! তোমার আত্মীয়-স্বজন সকলেও শহীদ হলে তুমি কাঁদবে কেন? আল্লাহ্ এখনো তোমার দুটো হাত, দুটো পা সচল রেখেছেন। তোমাকে না সবাই ঈগল বলে। তুমি তাই ঈগলের মত ছো মেরে মেরে ঐ জালিম-কুজাত, মালউন-শয়তান আমেরিকার সৈন্যদের নিঃশেষ করে দাও। ঈগল ভাইয়া! আমার দুটো হাতের একটিও নেই, কাজেই আমি ওদের মারতে পারবোনা। তাই তুমি আমার পক্ষ থেকে ওদের ওপর প্রতিশোধ নাও। ওদের যেখানে পাও, যেভাবে পাও হত্যা কর। তাহলে আমার আত্মায় একটু হলেও শান্তি পাবো।' বলতে বলতে কেঁদে দিল ইসমাঈল।

বাগদাদের ঈগল ইসমাঈল আব্বাসের নিষ্পাপ চেহারার মধ্যে একটি চুমো দিয়ে বলল 'ঠিক আছে ভাইয়া! তুমি দোয়া কর, ইনশাআল্লাহ! আমি অগণিত কাফেরদের কতল করে তোমার মনোবাসনা পূর্ণ করব।'

ডাক্তার মেজর সাহেবের যখমে দ্রুত অস্ত্রপাচার করে ব্যান্ডেজ করে দিল। তিনি মেজর সাহেবকে বললেন স্যার! আপনার প্রাথমিক চিকিৎসা পর্ব শেষ হয়েছে। হাসপাতালের যা অবস্থা তাতে আপনি এখন রিলিজ হয়ে বাসায় ফিরে গেলেই ভালো হয়। প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র আমি দিয়ে দিচ্ছি।'

'যা ভালো হয়, তাই করুন' বললেন মেজর সাহেব।

কিছুক্ষণের মধ্যেই মেজর সাহেবকে হাসপাতাল থেকে বিদায় দেয়া হল। সেনাবাহিনীর এ্যাম্বুলেন্স তাকে নিয়ে ছুটল তাঁর বাসার দিকে। তার মাথার কাছে বসা বাগদাদের ঈগল। বেলা দু'টোয় তারা বাড়িতে পৌঁছল। এ্যাম্বুলেন্স গেটে আসতেই দারোয়ান গেট খুলে দিল। রুকাইয়া বাড়িতে এ্যাম্বুলেন্স ঢোকার শব্দ শুনে হাতের কাজ ফেলে এক প্রকার দৌড়ে বহির্বাটিতে চলে আসল। এসে দেখল গাড়ি থেকে নামছে ঈগল। সে শশব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ঈগল ভাইয়া! এ্যাম্বুলেন্সে কে? ঈগল বলল, 'তোমার আব্বা! তিনি আহত।' শুনে রুকাইয়া আব্বু বলে চিৎকার দিয়ে গাড়ীর দরজা খুলে পিতার মাথার কাছে ঝুকে দু'হাত দিয়ে তার মুখখানা ধরে জিজ্ঞেস করল, 'আব্বু আপনি কখন আহত হলেন? আমাকে আগে কেন খরব দেন নি?'

মেজর সাহেব ডান হাত দিয়ে কন্যার চোখের পানি মুছে দিয়ে বললেন 'আম্মিজান কেঁদোনা, আমি এখনো পুরোপুরি ঠিক আমি। তুমি গিয়ে আমার বিছানা গুছ কর। ঘরে গিয়েই আমার শুয়ে পড়তে হবে। রুকাইয়া পিতার কথামত চলে গেল বিছানা গুছাতে।

ঈগল, ড্রাইভার সৈনিক এবং দারোয়ান আঃ রহিম মেজর সাহেবকে ঘরে নিয়ে এলো। মেজর সাহেব ঘরে গিয়ে খাটের উপর শুয়ে ড্রাইভার সৈনিককে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'শুয়াইব! তুমি কমান্ডার হাবিবকে আমার বার্তা পৌঁছাবে। আমার আবর্তমানে আমার স্পেশাল ফোর্সের কমান্ডিংয়ের দায়িত্ব আমি তার উপর অর্পণ করলাম। সে যেন সুন্দর সুচারুরূপে দায়িত্বটুকু আঞ্জাম দেয়। সব সময় সৈনিকদের দিকে যেন নজর রাখে। তাদের সুবিধা-অসুবিধার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে বলবে। কোন অবস্থাতেই সৈনিকরা যেন নামায ত্যাগ না করে। শত্রুদের গোয়েন্দাদের থেকে এবং গাদ্দার, ষড়যন্ত্রকারী মুসলমানদের থেকে হুশিয়ার থাকতে বলবে। হাবিবকে আরও বলবে 'আমরা সাদ্দাম হোসেনের বিশ্বাসে বিশ্বাসী নই। আমাদের জীবন সাদ্দামের জন্য উৎসর্গিত নয় বরং আমাদের জীবন আল্লাহ্‌র জন্য, তার দ্বীনের জন্য এবং তাঁর দেয়া এই ভূ-খন্ডের জন্য উৎসর্গিত। একথাটা আমার অনুগত সৈনিকদের ঐ সময় স্মরণ করিয়ে দিতে বলবে, যখন বাথ পার্টির লিডারগণ সৈনিকদেরকে সাদ্দামের জন্য এবং আরব জাতীয়তাবাদের জন্য জীবন উৎসর্গ করার কুফরী সবক ইয়াদ করিয়ে চলে যাবে। কেননা মুসলমানের জীবন একমাত্র আল্লাহর জন্য উৎসর্গিত, অন্য কোন সৃষ্টির জন্য নয়।'

সৈনিক শুয়াইব মেজর সাহেবের এই বার্তা নিয়ে চলে গেল যুদ্ধ ফ্রন্ডে। মেজর সাহেব রুকাইয়াকে কাছে ডেকে বললেন 'আম্মিজান! আমাকে বাংকারে নিয়ে চল। বিমান-বোমার শব্দে আমার মাথা প্রচন্ডভাবে ব্যথা করছে।'

রুকাইয়া সামনের দরজা বন্ধ করে ঈগলের সহায়তায় মেজর সাহেবকে নিয়ে যায় ভূগর্ভস্থ কক্ষে। সালমান ও মুয়াজ তখন দুপুরের খানা খেয়ে ঘুমাচ্ছিল। মেজর সাহেবকে নিয়ে রুকাইয়া চলে গেল ব্যাংকারের পরবর্তী সেই বিশাল কক্ষে। ওমর শুজা এখানটায়

এসে কিছুটা বিস্মিত হল। কেননা সে শুধু জানত যে, তার ফুফার ব্যাংকার আছে, এবং এখন যেখানটায় সালমান ও মুয়াজ ঘুমাচ্ছে, সেখানে তার ফুফার সাথে রুকাইয়া-মুয়াজের সাথে ইতিপূর্বে কয়েকবার এসেছিল। কিন্তু এছাড়াও যে এখানে এত বিশাল রুম আছে তা সে কোনদিনই জানতো না বা সে মাটির নীচে এত বিশাল ব্যাংকার কোনদিন স্বপ্নেও কল্পনা করেনি।

মেজর আসাদুল্লাহ সাহেব খাটের মধ্যে শুয়ে পড়লেন। ঈগল একটি চেয়ার টেনে তাঁর পাশে বসল। মেজর সাহেব শুয়ে শুয়েই ঈগলের সাথে অনুচ্চ কণ্ঠে যুদ্ধ সম্বন্ধে টুকিটাকি আলোচনা করতে লাগলেন। এরই মধ্যে তাঁর কন্যারত্ম তাদের জন্য খানা নিয়ে এল। দু'টি প্লেটে খাবার বণ্টন করে একটি ঈগলকে দিল। অন্যটি নিজ হাতে নিয়ে পিতাকে খাইয়ে দিতে লাগল। যদিও তার পিতার ডান হাতে কোন যখম কোন নেই, তবুও সে তাকে জোরপূর্বক খাইয়ে দিচ্ছে। মেজর সাহেবও তাকে বাধা দিলেন না। কেননা তিনি জানেন, একজন পিতা তার কন্যার কত যে প্রিয়; তা অন্য কেউ বুঝবে না।

ইসলাম পূর্ব যুগে পাষন্ড পিতারা তাদের কন্যা সন্তানদের এত ঘৃণা করত যে, ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে নবজাতকে জীবন্ত কবর দিয়ে দিত। কারণ, তখন মেয়ে সন্তান জন্মকে পাপ বা অভিশাপ মনে করা হত। এজন্য কন্যা সন্তান জন্ম নিলে লজ্জায়, ঘৃণায় পিতা কাউকে চেহারা দেখাত না। কেউ কেউ অযথা বাড়তি খরচের ভয়ে শিশু কন্যাকে নিজ হাতে জবাই করত। অনেকে আবার এ অভিশাপ থেকে বাঁচার জন্য মানুষ্য বিক্রির হাটে নিয়ে নবজাতক কন্যাটিকে বিক্রি করে দিত। বাড়তি কিছু আয় করে নিত।

প্রাক ইসলামী যুগে নারী সমাজের অবমূল্যায়ন শুধু এতটুকুতেই থেমে থাকেনি যে, শুধু কন্যা সন্তান জীবন্ত প্রোথিত করণেই তা সীমাবদ্ধ। বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারীকে ভাবা হত এক অপাংতেয় সত্বা হিসেবে। নারীর কোন সামাজিক মূল্য ছিল না। একজন পুরুষ যতজন ইচ্ছা বিবাহ করতে পারত। যখন তখন ইচ্ছা তালাক দিতে পারত। বিবাহ ছাড়াও যাকে খুশী তার সাথে সহযাপন করতে পারত। পিতার সম্পত্তিতে কন্যার কোন অংশ ছিল না। বৈবাহিক জীবনে নারী তার সংসারে কোন কর্তৃত্ব করতে পারত না। স্বামীর সিদ্ধান্তই ছিল চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। মোটকথা, "ইসমাল পূর্ব জাহিলিয়াতের যুগে আরবসহ গোটা বিশ্বে ধর্মে-কর্মে, আচার-অনুষ্ঠানে, বিচার কার্যে, আইন-আদালতে, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে নারী জাতির কোন কথা বা কাজের কোন মূল্য বা গ্রহণযোগ্যতাই ছিল না। বরং নারী সত্বাটাকেই তারা পরিবারের জন্য, সমাজের জন্য, বংশের জন্য কলঙ্ক, অপমান ও অভিশাপ মনে করত। সমাজের মোড়লরা, ধনকুবেররা, জমিদাররা নারীদেরকে উপপত্নী, দাসী ও গণিকা ইত্যাদি হিসেবে অযাচিত কাজে নিয়োজিত থাকতে বাধ্য করত। কিন্তু বিশ্বের বুকে নারী মুক্তির অগ্রদূতরূপে, মানবতার মুক্তির দিশারীরূপে মহানবী (সাঃ) আবির্ভূত হয়ে নারী জাতিকে দিলেন তার লুপ্ত মান-সম্মান, মর্যাদা অধিকার ও ফযীলত।"

আইয়ামে জাহেলিয়ার সেই যুগ এখন আর নেই। বর্তমান যুগ সভ্যতার যুগ। আগের তুলনায় মানুষ এখন অনেক বেশী বিবেকবান, চিন্তাশীল ও জ্ঞানবান। তথাপি সেই জাহেলী ধ্যান-ধারণা এখনও সমূলে উৎপাটিত হয়নি। এখনও সেরকম নোংরা চরিত্র ও পাষন্ড হৃদয়ের পিতারা সমাজে বহাল তবিয়তে আছেন। যারা তাদের সন্তান মেয়ে হলে মুখখানা একেবারে আমাবশ্যার রাতের মতো কালো করে ফেলে। অথচ নবী করিম (সাঃ) ইরশাদ করেন–'যে ব্যক্তি দু'টি মেয়েকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করল, সে কিয়ামতের দিন এরূপ অবস্থায় আসবে যে, আমি আর সে এরকম হব। এ বলে তিনি স্বীয় আঙ্গুলসমূহ মিলিয়ে দেখালেন।–মুসলিম শরীফ। তিনি (সাঃ) আরও ইরশাদ করেন, "তোমরা কন্যা সন্তান অপছন্দ করোনা। কারণ, আমিও কন্যা সন্তানের পিতা। নিশ্চয়ই কন্যাগণ (অনেক গুণের অধিকারী হয়, যেমন–তারা) বিনয়ী, নম্র, ভদ্র, মায়াময়ী, স্নেহময়ী হয়। তারা পিতামাতার সেবা-যত্নের জন্য সদা প্রস্তুত থাকে।–আল ফিরদাউস ৫ ঃ ৩৭

আবার কোন কোন পুরুষ কন্যা সন্তান প্রসব করার দরুন স্ত্রীর উপর চড়াও হন; এমন কি তালাক পর্যন্ত দিয়ে দেয়। অথচ এই গন্ড মূর্খের দলেরা, এই জাহিলিয়া যুগের অসভ্যরা তলিয়ে দেখে না যে, এজন্য স্ত্রীকে দোষী নয় বরং পুরস্কৃত করা দরকার। মেজর আসাদুল্লাহ সাহেব সে ধরনের পিতা নন, বরং তাঁর প্রথম সন্তান কন্যা হওয়ায় তিনি দারুন খুশী। শুধু কি খুশী? উপরন্তু শুকরিয়া স্বরূপ ১০টি উট মেয়ের নামে আল্লাহর পথে সদকা করেছিলেন।

যাহোক ওমরও তার ফুফার সাথে খানা খেতে বসল। ছোট বোন রুকাইয়ার হাতের রান্না করা দুম্বার গোশত এবং ময়দার রুটির মজাই আলাদা। তার ফুফিও ঠিক এরকমই রাধত। মেয়েটি যেন তার মায়ের গুণ পুরোপুরি নকল করেছে। ওমর আজ বহুদিন পর পেট পুরে, তৃপ্তিসহকারে আহার করতে লাগল। বলা চলে যুদ্ধ শুরুর পর এই প্রথম সে খানা খাচ্ছে। কেননা যুদ্ধের প্রথম দিন থেকে সে এত ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছে যে, কখন খেল আর কখন খেল না, তা ভাববারও সময় পায় না। সময়মত আহার, নিদ্রা এবং বিশ্রাম নিতে সে ভুলেই গেছে যেন।

খাওয়া-দাওয়া শেষে মেজর সাহেব বিশ্রাম নিতে শুয়ে পড়লেন। ঈগল তার কাছে বিদায় চাইল চলে যাবে বলে। তিনি বললেন, 'বাবা! তুমি ওপাশের রুমে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে তারপর যেও।' ঈগল ফুফার কথামত সাময়িক বিশ্রাম নিতে পাশের রুমে আসল।

বাগদাদের ঈগল পার্শ্বের কামরায় এসে সালমানকে দেখে কিছুটা বিস্মিত হলো। সালমান তখনও ঘুমিয়ে আছে। মুয়াজ তার গলা জড়িয়ে ধরে ঘুমাচ্ছে, যেন দু'জন আপন ভাই। ঈগল রুকাইয়াকে জিজ্ঞেস করল, 'এ লোকটি কে আপামণি?' তাঁর জিজ্ঞেস করার মধ্যে একটা দুষ্টমির আভা মিশ্রিত। সে যেন রুকাইয়াকে বুঝাতে চাচ্ছে, আমাদের না জানিয়েই গোপনে গোপনে সাথী জোগার করে ফেলেছে।'

রুকাইয়া ঈগলের এমন দুষ্টমিপূর্ণ প্রশ্নে ভীষণ লজ্জা পেল। সে বলল, 'ঈগল ভাইয়া! আজো তোমার খেয়ালী কথাবার্তা গেলনা!'

'না, বোন! মশকারী নয় সত্যি করে বলতো, লোকটি আসলে কে? মৃদু হাসি মুখে ঈগল বলল, আমাদের দুলাভাই নাতো!'

'ঈগল ভাইয়া!' রুকাইয়া লজ্জাবতী লতার মত আড়ষ্ট হয়ে বলল।

'আহা! তবে বলনা কে এই সুপুরুষ?'– বলল ঈগল– 'যে একেবারে আমার মিষ্টি বোনটির রহস্যময় ব্যাংকারে অবস্থান করছে।

এবার রুকাইয়া অনেকটা গাম্ভীর্যের সাথে বলল, 'ভাইয়া! তোমার ধারণা পুরোপুরি সঠিক নয়। এ লোক একজন বিদেশী মানুষ। আমাদের এখানে আছেন মেহমান হিসেবে। নাম সালমান কোরেশী। বাড়ি পাকিস্তান। পেশায় সাংবাদিক। অত্যন্ত ভাল মানুষ। দেখছেন তো মুয়াজ তার সাথে কেমন গভীর ঘনিষ্ঠতা গড়ে তুলেছে।'

'হ্যাঁ, দেখেছি বোন! বড় ভাল মানুষ আমাদের সালমান ভাই। সে জন্য আমার ধারণা পুরোপুরি না হলে ও কিছুটা অবশ্য সত্যি। রহস্যময় হাসি হেসে বলল ঈগল আচ্ছা, সে যা হোক, তার সাথে কিভাবে পরিচয় হল, তা বল? আমার আবার সময় কম।'

সালমান কিভাবে আহত হল। কিভাবে মেজর সাহেব তাকে উদ্ধার করে হাসপাতাল নিলেন। সেখান থেকে ডাক্তার আবু সাঈদের পরামর্শক্রমে কি কারণে তাকে এ বাড়িতে আনা হয়েছে, রুকাইয়া সবই ঈগলকে বলল। এও বলল যে, সালমান তার সাথে দেখা করতে খুবই উদগ্রীব।

ইতিমধ্যে সালমানের ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ায় সে উঠে বসল। ঈগলকে সম্মুখে দেখে প্রথমেই সে তাকে সালাম দিল। রুকাইয়া বলল, 'সালমান সাহেব! এই যে আমাদের "বাগদাদের ঈগল।" রুকাইয়ার একথা শুনে সালমান অপলক নেত্রে বাগদাদের ঈগলের দিকে তাকিয়ে রইলো। ঈগল সালমানের দিকে এগিয়ে তার প্রতি হাত বাড়িয়ে দিয়ে হেসে বলল, 'সালমান সাহেব! আপনি আমার দিকে এভাবে তাকিয়ে আছেন কেন? আমাকে দেখে আশ্চার্যান্বিত হচ্ছেন বুঝি?'

'আমি দেখছি বাগদাদের ঈগলকে। ইরাকী জনগণ সত্যিই তাদের ঈগলকে চিনতে ভুল করেনি। ভাই ওমর! সত্যিকারেই তুমি বাগদাদের ঈগল। তোমার চোখে আমি দেখছি ঈগলের সেই সূক্ষ্ম দৃষ্টি, যে দৃষ্টি বহুদূর থেকে জলে-স্থলে তার কাংখিত শিকার খুঁজে নেয়। আমি দেখছি তোমার পায়ে ঈগলের ডানার সেই ক্ষীপ্রতা, যা মুহূর্তের মধ্যে তার শিকারের কাছে তাকে পৌঁছতে সাহায্য করে। আমি আরও দেখছি তোমার বাহুতে ঈগলের সেই তীক্ষ্নতা, যা অতি দ্রুত তার শিকারকে ঘায়েল করে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌছে দেয়।' হাস্যোজ্জ্বল অবয়বে ঈগলের দিকে দু' হাত বাড়িয়ে মুছাফাহা করতে করতে বলল সালমান।

এবার ঈগল সালমানকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'হে সম্মানিত মেহমান! আপনাকে অসংখ্য মোবারকবাদ। আচ্ছা বলুন তো, আমার সাথে দেখা করতে আপনি উদগ্রবি কেন?'

'তা বলার পূর্বে অন্য একটি কথা বলতে চাই'–হেসে বলল সালমান–'আমি তোমার আদরের বোন রুকাইয়ার নিকট তোমার এত অধিক প্রশংসা শুনেছি এবং তোমাকে বাস্তবে দেখেও মনে হল, আসলেই তুমি এই পরিমাণ প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য। তাই আমি তোমাকে ভেবেছি একান্ত আপনজন। সে কারণে তোমাকে শুরুতেই সম্বোধন করলাম 'তুমি' বলে। কিন্তু তুমি আমাকে 'আপনি' বলে সম্বোধন করায় আমি লজ্জা পাচ্ছি। তাই তুমিও আমাকে 'তুমি' বলেই সম্বোধন করবে কেমন? যেহেতু আমরা উভয়েই সমবয়সী।'

'আচ্ছা ঠিক আছে ভাই! তা না হয় করব'–বলল ঈগল–'কিন্তু তুমি আমার সাথে দেখা করতে উদগ্রীব কেন, তা বল?'

মাত্র ক'মিনিটের আলোচনায় তারা একে অপরের একেবারে ঘনিষ্ট বনে গেল। এর প্রথম কারণ সাংবাদিক সালমানের অন্যান্য সুন্দর মার্জিত আচরণ এবং কথাবার্তা। দ্বিতীয়তঃ মুহাম্মাদে আরাবী (সাঃ)-এর গড়া ভ্রাতৃত্ব অর্থাৎ মুসলমান পরস্পর ভাই-এর সুন্দরতম শিক্ষা। যাহোক, সালমান ঈগলকে বলল 'ভাই ঈগল আমি তোমার সাথে সাক্ষাৎ করতে এজন্য উদগ্রীব যে, আমি একজন সাংবাদিক। সংবাদ সংগ্রহের নিমিত্তে ইরাক এসেছি। ভাগ্যের চক্রে এখানে আটকে পড়ে আছি। এখানে এসে যখন রুকাইয়ার কাছে তোমার কথা শুনলাম যে, বাগদাদের ঈগল হানাদারদের বিরুদ্ধে রহস্য মানুষের মত কাজ করছে, তখন মনে মনে আমি একটি বিষয় ঠিক করে রেখেছি। তাহল, যেভাবে হোক তোমার সাথে সাক্ষাৎ করে তোমার কর্ম পদ্ধতি জেনে নিব। তার উপর একটি প্রতিবেদন তৈরী করে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে প্রচার করব। যাতে মুসলিম বিশ্বে জেকে বসা মার্কিন ও অন্যান্য সম্রাজ্যবাদী দোসরদেরকে মুসলিম তরুণরা তোমার মত ঈগল হয়ে উড়ে উড়ে, ঘুরে ঘুরে, খুঁজে খুঁজে মার লাগাতে পারে, শিক্ষা দিতে পারে।'

'আমার কর্মপদ্ধতি একেবারে সহজ-বলল ঈগল–'সর্ব প্রথম এর জন্য প্রয়োজন উচ্চসাহসীকতা সৃষ্টি করা। এবং উন্নততর সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা। সালমান ভাই! তুমি যদি এই বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরী কর, তবে সেটা একটা সুন্দর উদ্যোগ হবে। কেননা আজ মুসলিম উম্মাহর প্রতিটি সদস্যের জন্য সামরিক শক্তি অর্জন এখন সময়ের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। অবশ্য এ কথা তোমার অজানা নয় যে, 'ইসলামের মর্যাদা, সমুন্নতি ও অস্তিত্ব জিহাদের উপর নির্ভরশীল। আর জিহাদের জন্য প্রয়োজন এমন একদল মর্দে মুমিন, যাঁরা জীবন বাজি রেখে ইসলাম ও মুসলমানের শত্রুদের বিরুদ্ধে বুক পেতে দাঁড়াবে। আরো প্রয়োজন এমন অস্ত্রের, যা দেখে শত্রুপক্ষ যুদ্ধের আগেই ভীত সন্ত্রস্ত হবে এবং যার মাধ্যমে যুদ্ধের ময়দানে তাদেরকে পরাজিত করে ইসলামের বিজয় সুনিশ্চিত

করা হবে। জিহাদ ইসলামের ঐসব গুরুত্বপূর্ণ বিধানের একটি, যার উপর ইসলামের বিজয় ও মুসলমানদের অস্তিত্বের সুরক্ষা নির্ভরশীল। এ কারণেই নবী করিম (সাঃ) বলেছেন–

"জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।"

জিহাদের এই নিঃসীম গুরুত্বের কারণেই ইসলাম জিহাদের উদ্দেশ্যে দক্ষ জনশক্তি ও সামরিক সরঞ্জাম সংগ্রহের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে এবং এতবিষয়ে বিশেষ বিশেষ কতগুলো বিধান জারী করেছে। জিহাদের জন্য দক্ষ জনশক্তি গঠন করা এতই গুরুত্বপূর্ণ কাজ যে, ইসলাম প্রত্যেক মুসলমানকে মুজাহিদ হওয়ার আদেশ দিয়েছে।'

ঈগল একটু থেমে আবার বলতে লাগল 'কিন্তু বর্তমানে সামরিক ক্ষেত্রে মুসলমানরা সবার চেয়ে বেশী পিছনে পড়ে আছে। এককালে মুসলমানদেরই আবিষ্কার করা অস্ত্রকে আধুনিক রূপ দিয়ে এখন মুসলমানদের বিরুদ্ধেই তা ব্যবহার করা হচ্ছে। মুসলমানরা এখন চতুর্দিক থেকে চরমভাবে কোনঠাসা। কিন্তু তারা নির্বিকার।'

'হায়! যদি মুসলমানরা আজো জাগ্রত হতো! আজো যদি তারা কুরআনের ঐসব শিক্ষাকে বুকে ধারণ করে আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত আগুন ও লোহাকে কাজে লাগিয়ে যথাযথ শক্তি অর্জন করে হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হতো!

'সালমান ভাই! আমাদের হাতে বর্তমানে যেহেতু অত্যাধুনিক সব অস্ত্র নেই, তাই দুঃসাহসিকতার সাথে হালকা অস্ত্র দিয়েই ওদের উপর হামলা করে, সাথে সাথে সেখান থেকে সঙ্গোপনে সরে আসতে হবে। আমি এভাবেই আমার কর্ম পদ্ধতি চালিয়ে যাচ্ছি।'

'আচ্ছা ঈগল! বাগদাদ তো হানাদাররা অবরোধ করে রেখেছে। ইরাকী বাহিনী কি পারবে তাদের হটিয়ে দিতে?' জিজ্ঞেস করল সালমান।

'আমার মনে হয় না যে, তারা মার্কিনীদের বিতারিত করতে পারবে, কিংবা তাদের হাত থেকে বাগদাদকে রক্ষা করতে পারবে!'

'তার কারণ?' জিজ্ঞাসা সালমানের।

'এর পিছনে অনেক কারণের মধ্যে এটি একটি বিশেষ কারণ যে, আমেরিকা ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করছে উপগ্রহের মাধ্যমে। ৮৪টি উপগ্রহ ইরাকের আকাশে মোতায়েন রেখে গোয়েন্দাবৃত্তি, নজরদারী ও সুনির্দিষ্ট টার্গেটে নির্ভুল আঘাত হানছে স্টিলথ বিমান ও টমাহক মিসাইলের মাধ্যমে। ওদের বোমারু বিমানগুলো পাইলট বিহীন; লেসার গাইডেড এবং প্রতি মিনিটে ক্ষয়-ক্ষতির বিবরণ সম্বলিত স্বয়ংক্রিয় ৬০টি ফটো পাঠাতে সক্ষম এসব অত্যাধুনিক বিমান। অংকিত ম্যাপ অনুযায়ী নির্ধারিত টার্গেটে আঘাত হেনে শত্রু পক্ষকে ঘায়েল করতে খুবই পারঙ্গম এগুলো। এসব অত্যাধুনিক প্রযুক্তি নির্ভর সমরাস্ত্রের মোকাবেলা করার মত শক্তি বর্তমানে ইরাকের নেই। ইরাকের পদাধিক বাহিনী চৌকস ও শক্তিশালী, তার সাথে আমি সাধারণ নাগরিকদেরও এনে দাঁড়

করিয়েছি তাদের পাশে। কিন্তু আমেরিকা আকাশ যুদ্ধের মাধ্যমে আমাদের পরাজিত করবে। ইতিহাসে দেখা যায় উন্নত যুদ্ধাস্ত্র ও নিপুণ সমর কৌশলের মাধ্যমে এক পক্ষ অপর পক্ষের উপর বিজয়ী হয় অধিকাংশ যুদ্ধক্ষেত্রে ইরাকেও তার ব্যতিক্রম হবে বলে মনে হয় না।'

'কেন ঈগল ভাই, সাদ্দাম হোসেনের রিপাবলিকান গার্ড নাকি খুবই দুর্ধর্ষ!' বলল সালমান– 'তারা কি মার্কিনী সয়লাব প্রতিরোধ করতে পারবে না?'

'সালমান ভাই, সত্যি কথা কি জানো!' –উপহাসের হাসি হেসে বলল ঈগল– 'সাদ্দাম হোসেনের এ গার্ড বাহিনী কখনোই কোনো যুদ্ধ অভিযানে অংশগ্রহণ করেনি। ইরাক-ইরান যুদ্ধের সময় এদের একমাত্র কাজ ছিল যুদ্ধের মাঠ থেকে যাতে ইরাকী বাহিনী পালাতে না পারে তার জন্য পেছনে বন্দুক উচিয়ে বসে থাকা। পালাতে চেষ্টা করলেই গুলি করা। বাকি সময় তারা কাটিয়েছে সাদ্দামের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার কাজে। আসলে সাদ্দামের রিপাবলিকান গার্ড ও ফেদাইন বাহিনী পেশাদার কোন সেনাবাহিনী নয়। এরা হচ্ছে হিটলারের 'গোষ্টাপো', ইরানের রেজা শাহের 'সাভাক', বাংলাদেশের শেখ মুজিবের 'রক্ষী বাহিনী' এবং উসমানীয় তুর্কী খলিফাদের 'জেনিসারী' বাহিনীর মত নিয়মিত সেনাবাহিনীর বিকল্প আরেকটি ব্যক্তিগত পেটোয়া বাহিনী। এরা মার্কিনীদের প্রতিরোধ করবে, নাকি তাদের সাথে গোপনে হাত মিলিয়ে দেশ-জাতি ও ধর্মের সাথে গাদ্দারী করবে সেটাই এখন আমার নিকট সবচেয়ে বড় আশঙ্কার বিষয়! কিন্তু হ্যাঁ তারপরও আমি হতাশ নই।'

'ধর, রিপাবলিকান গার্ড গাদ্দারী করল আর বাগদাদেরও পতন হলো–বলল সালমান–তখন তোমরা কি করবে?'

'পরিস্থিতি অনুযায়ী কাজ করে যাবো, সময়ই বলে দিবে তখন আমরা কি করবো।' একথা বলে ঈগল কিছুক্ষণ মৌন থেকে কি যেন চিন্তা করে পুনরায় বলল, সালমান ভাই! আমি তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করি, মনে কিছু করবে না। তাহল, তুমি আমাকে যেভাবে প্রশ্নবানে জর্জরিত করছ তাতে আমি তোমাকে গোয়েন্দা ভাবলে কি ভুল করব? আমার সে ভাবনাটা কি অন্যায় হবে?'

ঈগলের এমন কথায় সালমান কিছুটা কম্পিত হল। সে গাম্ভীর্যের সাথে বলল 'ঈগল! তোমার সে সন্দেহ করা একেবারে অন্যায় নয় এবং এমন সন্দেহ করার যথেষ্ট অবকাশও রয়েছে। যেহেতু চারিদিকে যুদ্ধের দাবানল ছড়ানো, আর গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ যুদ্ধের একটি বিশেষ অংশ। কিন্তু তুমি আমার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পার, আমি গোয়েন্দা নই–সাংবাদিক। আমি তোমার স্বজাতীয় ভাই। ধর্মীয় আকর্ষণ আমাকে সুদূর পাকিস্তান থেকে ইরাক টেনে এনেছে। আমি মনে করি সমগ্র মুসলিম যেমন একটি দেহের মত, তেমনি পৃথিবীর সকল মুসলিম রাষ্ট্রগুলোও আমি একটি রাষ্ট্র বলে মনে করি।

পাকিস্তান-ভারত-বাংলাদেশ আমার দেশ। ইরাক-আফগান-কাশ্মীর সেও আমার দেশ। সৌদি আরব, মিশর, সুদান, সিরিয়া, লিবিয়া, তিউনিসিয়া, ফিলিস্তিন, চেচনিয়া, বসনিয়া, কুয়েত, কাতার, জর্ডান, ওমান সেও আমার দেশ। আমি কোনো ভৌগলিক সীমারেখায় মুসলিম বিশ্বকে বিভক্ত করতে চাই না। আমার মতে সমস্ত মুসলমানের এটাই ভাবা উচিত।

এরপরও যদি তোমার সন্দেহ দূর না হয়, তাহলে এই নাও আমার রুমের চাবি। হোটেল আর রশীদের ৬ষ্ঠ তলার ২০৩ নম্বর রুটিই আমার। সেখানে আমার কাগজপত্র সবই আছে তুমি সেগুলো তল্লাশি করে দেখতে পার!'

'সালমান ভাই! তোমার প্রতি ভুল ধারনা করার জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থী' বলল ঈগল।

'এজন্য ক্ষমা চাওয়ার কিছু নেই ভাই ঈগল! মুচকি হেসে বলল সালমান– 'তোমার স্থলে আমি হলে, আমিও তখন এরকম সন্দেহই করতাম। কিন্তু আমি তোমাকে প্রশ্নগুলো করছিলাম এজন্য যে, নাপাক নাসারা সম্প্রদায় আমাদের পবিত্র এই ইরাক দখল করে নিলে, সেটা কি আমরা ভাগ্যের লিখন বলে মেনে নিবো নাকি ওদের তারাবার জন্য কোন বাস্তব সম্মত পদক্ষেপ নিবো সেটা তোমার কাছ থেকে শুনবো বলে।'

'আচ্ছা সালমান ভাই! তুমি তো একজন সাংবাদিক, উপরন্তু পাকিস্তানী মানুষ। আফগানে আমেরিকার হামলা পরবর্তী দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে তালেবান মুজাহিদদের সেখানকার প্রতিরোধ পদ্ধতি সম্বন্ধে নিশ্চয়ই অবগত আছ। সে সকল অভিজ্ঞতার আলোকে তুমিই বলতো, আমাদের তখন করণীয় কি হবে?

ঈগল এ প্রশ্ন দ্বারা কি জানতে চাইছে সালমান তা বুঝতে পারল। অতএব সেভাবেই সে বলল, 'অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে অচিরেই বাগদাদের পতন ঘটবে এবং মার্কিনীরা পুরা ইরাক দকল করে নিবে।'–বলল সালমান– 'তাই যদি হয় তবে তোমাদের প্রথম কর্তব্য হবে গেরিলা হামলা চালু করা। যেটা তালেবান মুজাহিদরা এখন করে যাচ্ছেন। তখন এই হামলার কৌশল শিখাতে হবে প্রতিটি স্বাধীনতা প্রিয় ইরাকীকে। তৈবী করতে হবে তোমার মত হাজার হাজার বাগদাদের ঈগল। কেননা, তুমি নিজেও একজন আফগান গেরিলা মুজাহিদ।'

একটু দম নিয়ে সালমান পুনরায় বললো–এর সাথে যদি আত্মঘাতি হামলা চালানো যায়, তবে তা হবে অধিক ফলপ্রসূ। আমেরিকার কাছে এ্যাটমিক পাওয়ার, পারমাণবিক শক্তি থাকতে পারে, কিন্তু আত্মঘাতি হামলা এমন এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি যা মোকাবেলা করার মত অস্ত্র পেন্টাগণ এখনও আবিষ্কার করতে পারেনি।'

সালমানের এমন যুক্তিপূর্ণ পরামর্শে ঈগল উল্লসিত হয়ে বলল, 'সঠিক পরামর্শ তোমার সালমান ভাই! তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমি এরকমই ভাবছিলাম। ইরাকে এমনও হাজার হাজার যুবক আছে, যারা স্বদেশ-স্বধর্মের স্বাধীনতা ও ইজ্জতের

হেফাযতের জন্য আত্মঘাতি হামলা চালাতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হবেনা।'

তাদের আলোচনার সূত্র ধরে রুকাইয়া বলে উঠল 'কিন্তু ঈগল ভাইয়া! আমাকে আমাদের ক্লাসের মাওলানা সাহেব আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিল, "বর্তমানে অনেক দেশে অনেক মুজাহিদ ইয়াহুদী খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে গিয়ে নিজের দেহে বোমা স্থাপন করে নিজেকে মানব বোমায় পরিণত করে মারা যাচ্ছে। এরূপ আত্মঘাতি বোমা হামলা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়িয নয়। তা সম্পূর্ণ হারাম। আত্মঘাতি বোমায় নিহত ব্যক্তি অবশ্যই আত্মহত্যাকারী গণ্য হবে।' তাহলে এই অবৈধ পন্থায় আমাদের যুবকদেরকে ধ্বংস করে লাভ কি হবে?'

'রুকাইয়া! তোমাকে যে মাওলানা বলেছেন, আত্মঘাতি হামলা জায়েজ নয়, সে হয়তো বিষয়টি পুরোপুরিভাবে তাহকীক করেনি–বলল সালমান–করলেও হয়তোবা সে ইচ্ছা করেই সত্যটিকে চাপা দিয়েছে। হয়তো সে হতে পারে সিআইএ কিংবা মোসাদের দালাল; আলেম নামের কলংক। এ সকল মুখোশধারী আলেমদের অপরিনামদর্শী বক্তব্যের জন্যই ইসলামের আজ এ করুন দশা। মুসলিম মার খাচ্ছে দেশে দেশে। দ্বীনের ভালবাসায় এই আত্মঘাতি হামলা অবশ্যই জায়েজ। শুধু জায়েজ নয় বরং এটা দ্বীনের জন্য আত্মত্যাগের সর্বোচ্চ নিদর্শনও বটে। কেননা যে মুজাহিদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে সে নিশ্চিতভাবে জানেনা যে, এই যুদ্ধেই সে শহীদ হবে। আর যে ব্যক্তি আত্মঘাতি হামলায় অংশ নেয় সে নিশ্চিত যে, এখনই সে এই দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবে; শহীদ হবে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে তার ত্যাগের মাত্রাটা কত একনিষ্ঠ এবং স্পর্শকাতর তা অনুধাবন করার মত হৃদয়ও ঐ সকল নাম সর্বস্ব আলেমদের নেই।'

তাছাড়া 'আত্মহত্যা' আর 'আত্মঘাতী হামলা' এ দু'টি বিষয় শাব্দিকভাবে যেমন দু'রকম, তেমনি অর্থ ও উদ্দেশ্যের দিক থেকেও সম্পূর্ণ ভিন্ন। দু'টির শরঈ হুকুমও বিপরীতমুখী। আত্মহত্যা হলো, জীবনের উপর অতিষ্ঠ হয়ে (অথবা কোন কারণ ছাড়াই) উদ্দেশ্যহীনভাবে নিজের জন্য মৃত্যুকে বেছে নেয়া। পক্ষান্তরে 'আত্মঘাতী হামলা' হচ্ছে শত্রু পক্ষকে ঘায়েল করার এমন একটি কৌশল, যা অবলম্বন করলে হামলাকারীর জীবনও হুমকির মুখে পতিত হয় এবং তার মৃত্যুও অনিবার্য হয়ে উঠে। অতএব প্রথমে জানতে হবে যে, আত্মঘাতি বোমা হামলার বিষয়টি নতুন হলেও, আত্মঘাতী হামলার কৌশল কিন্তু নতুন নয়। বরং ইসলামের শুরুর যুগেও এর নজীর রয়েছে। কুরআনুল কারীমের নির্ভরযোগ্য তাফসীরসমূহ, এ বিষয়ের হাদীস এবং ফিক্হ ও ফাতাওয়া গ্রন্থগুলোর সংশ্লিষ্ট অংশ যারা গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছেন, তাদের ভালভাবেই জানা থাকবে যে, ইসলামের শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করা, শত্রু শিবিরে আতংক সৃষ্টি করা অথবা অন্য কোনভাবে মুসলমানদের বিশেষ উপকার সাধনের লক্ষে মৃত্যু অনিবার্য জেনেও এককভাবে শত্রুর উপর হামলা করে জীবন বিসর্জন দেয়া শুধু জায়েযই নয় বরং বিরাট ফজিলত ও সওয়াবের কাজও বটে। এ বিষয়ের দলীল থেকে কয়েকটি তোমাকে শুনাচ্ছি।

সূরা বাকারার ১৯৫নং আয়াতের তাফসীরে ইমাম বুখারী সাহাবী হযরত হুযায়ফা (রাঃ)-এর বর্ণনা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, আয়াতটি সদকার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। ইমাম কুরতুবী বলেন, আলইয়াযিদ ইবনে আবু হাবীব আসলামের মাধ্যমে আবু ইমরান থেকে বর্ণনা করেন যে, আমরা কুস্তুন তুনিয়ার যুদ্ধে ছিলাম। আবদুর রহমান ইবনুল ওয়ালীদ দলের আমীর ছিলেন। রোম সেনাদল (শত্রুপক্ষ) শহরের দেয়ালকে পিছনে রেখে প্রস্তুত ছিলো। এরই মধ্যে একজন মুসলমান শত্রুপক্ষের উপর একা অতর্কিত হামলা করে বসলো। তা দেখে কিছু লোক বলে উঠল, হায় হায়! লোকটা কি করলো? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্! নিজেকে ধ্বংসে পতিত করলো (অর্থাৎ আত্মহত্যা করলো?) তখন সাহাবী হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) বলেন, সুবহানাল্লাহ।... 'তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের মুখে পতিত করনা।' এ আয়াতটি আমাদের আনসারদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। (তিনি বলেন) ধ্বংসের মুখে নিজেকে নিক্ষেপ করার মানে হলো, ধন-সম্পদ নিয়ে ব্যস্ত থাকা ও জিহাদ না করা। (তাফসীরুল কুরতুবী-২/৩৬১)।

উপরোক্ত রেওয়ায়েতটি তিরমিযি শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। এ রেওয়ায়েতে একজন মুজাহিদের একটি শত্রুদলের ভিতর হামলা করতে যাওয়াকে যেখানে তার কিছু সহযোদ্ধা আত্মঘাতী হামলা মনে করে চিন্তিত হয়েছেন, তার জবাবে প্রখ্যাত সাহাবী আবু আইয়ুব আনসারী সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, এটিও জিহাদের অংশ।'

ইয়ামামার যুদ্ধে হযরত আনাস ইবনে মালেকের ভাই বারা ইবনে মালেক (রাঃ) তাঁর সহযোদ্ধাদের বললেন, আমাকে তোমরা চমড়ার থলেতে ঢুকিয়ে শত্রু দলের ভিতরে ফেলে আসো, তাঁরা তাই করল। হযরত বারা একাই তাদের সাথে লড়াই করলেন এবং দুর্গের গেট খুলে দিলেন। (তারীখে তাবারী ও তাফসীরে কুরতুবী-২/৩৬৪)।

তাফসীরে কুরতুবীতে এই মাসআলাটি এভাবে বলা হয়েছে, কোন ব্যক্তি যদি নিশ্চিত হয় যে, শত্রুপক্ষের উপর হামলা করতে গেলে সে নিহত হবে, কিন্তু এর দ্বারা শত্রু ক্ষতিগ্রস্থ হবে অথবা তাদের মধ্যে এমন প্রভাব পড়বে, যার দ্বারা মুসলসমানগণ উপকৃত হবে–একথা ভেবে যদি সে দুশমনের দলের ভিতর একাই হামলা করে বসে, তবুও তা জায়েজ। (ইমাম কুরতুবী এ বক্তব্যের দলীলস্বরূপ বলেন) বর্ণিত আছে যে, এক সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বললেন, আমি যদি আল্লাহর রাস্তায় সওয়াবের উদ্দেশ্যে সবর করে নিহত হই, তবে আমার হুকুম কি হবে? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) জবাবে বললেন, 'এর বিনিময়ে তুমি জান্নাত পাবে।' একথা শুনে লোকটি শত্রুদলের ভিতরে ঢুকে পড়লেন এবং শহীদ হয়ে গেলেন। (তাফসীরুল কুরতুবী-২/৩৬৪)।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর প্রখ্যাত শাগরেদ, হানাফী মাজহাবের মৌলিক ছয়টি কিতাবের রচয়িতা ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান (রহঃ) তাঁর কিতাব আসসিয়ারুল কাবীরে এ ধরনের হামলার সুস্পষ্ট অনুমোদন দিয়েছেন। (আহকামুল কুরআন (জদর)-১১/২৯০)।

আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত ফকীহ ও মুহাদ্দিস, সুবিখ্যাত হাদীস ভাষ্য ই'লাউস্‌সুনানের রচয়িতা আল্লামা জাফর আহমদ উসমানী (রঃ) তাঁর কিতাবে (আহকামুল কুরআন) বহু আয়াত, হাদীস এবং ইমামদের বক্তব্য উল্লেখ করে এ ধরনের হামলা (মুসলমানদের উপকারের স্বার্থে আত্মঘাতি হামলা)-কে শুধু জায়েজই বলেননি বরং হামলাকারী শাহাদাতের সুউচ্চ মরতবা পাবেন এ কথাও সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। (দ্রষ্টব্য ঃ আহকামুল কুরআন-১১/২৯০-২৯২)

'সালমান সাহেব! আপনার বক্তব্যের দ্বারা তো বুঝা যাচ্ছে, আত্মঘাতি হামলা জায়েজ-বলল রুকাইয়া-কিন্তু সে মাওলানার না জায়েজ বলার পর আমি আরো ক'জন আলেমের নিকট গিয়েছিলাম বিষয়টির সমাধানের জন্য। তারা বলেছেন 'বিষয়টি বিতর্কিত' এ ব্যাপারে আপনি কি বলবেন।'

'তোমার সংশয় দূর করার জন্য আমি মিসর জামেয়া আল-আজহারের ফতোয়া তোমাকে শুনাচ্ছি'–বলল সালমান–'জামেয়া আল আজহারের শেখ মোহাম্মদ সায়্যেদ তানতাবী বলেছেন, আত্মঘাতি হামলাকারী ফিলিস্তিনিরা শহীদ। তিনি বলেন, যারা মুসলমানদের ঘরবাড়ি ধ্বংস করছে ও নির্বিচারে মুসলিম নারী, পুরুষ ও শিশুদের হত্যা করছে, সেই হানাদার জালিমের উপর আত্মঘাতী হামলাকারী মুসলমান শহীদ বলে পরিগণিত হবে। কারণ, দুশমন তাদের ভূখন্ড দখল করেছে, তাদের ইজ্জত হরণ করছে, তাদের লোকদের হত্যা করছে। তিনি বলেন, এরূপ আক্রমণে যদি নির্দোষ নারীপুরুষ কিংবা কোন শিশুও মারা যায় তবুও আক্রমণকারী শহীদ বলে গণ্য হবে। কারণ, সে নিরুপায়, দোষী-নির্দোষ বিবেচনা করে আক্রমণ করা তো আর সম্ভব নয়। শেখ মুহাম্মদ সায়্যেদের মতে, এ পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পেতে হলে জালিমদের জুলুমের হাত গুটিয়ে নিতে হবে এবং বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে।"

"রুকাইয়া! ফিলিস্তিনী মুসলমানরা আত্মঘাতি হামলার পথ তখনই বেছে নেয়, যখন ইসরাঈল তার আন্তর্জাতিক মদদদাতাদের নেপথ্য সাহায্যে তাদেরকে ধীরে ধীরে নিরস্ত্র ও নিঃসন্তান করে দেয়। যখন ইসরাঈল ফিলিস্তিনী মুসলমানদেরকে নিজ ভূমে পরবাসী বানায় এবং তাদের স্বাধীন জীবনের সব পথ বন্ধ করে দেয়। নিরস্ত্র, নিরীহ, মজলুম ফিলিস্তিনীরা তাদের বিজ্ঞ আলিমদের থেকে ফতোয়া নিয়েই শেষ অবলম্বন হিসেবে শত্রুর বিরুদ্ধে আত্মঘাতি হামলার পথ বেছে নেয়। আরব বিশ্ব তথা সমগ্র ইসলামী দুনিয়ায় বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-গবেষণা হয়েছে। পরিশেষে ওলামায়ে কেরাম এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে ফিলিস্তিনী, আফগানী তথা সারা বিশ্বের মজলুম অথচ নিরীহ-নিরস্ত্র মুসলমানদের জন্য শত্রুর উপর আত্মঘাতী হামলা শুধু জায়েজই নয়, উত্তম বটে। এটিও শাহাদাত লাভের একটি সোপান। তাঁরা আত্মঘাতি হামলাকে 'আত্মহত্যা' থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন আখ্যা দিয়ে একে 'অতি উত্তম শাহাদাত' বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আর সর্বশেষ কিছুটা বিলম্বে হলেও মিসর জামেয়া আযহার থেকে এই ফতোয়ার পক্ষে সমর্থন পাওয়া গেল।

সুতরাং এখন বুঝতেই পারছো যে, দখলীকৃত ইরাকের মুসলমানদের জন্য হানাদার ইঙ্গ-মার্কিন বর্গীদের বিতারিত করতে আত্মঘাতি হামলা পরিচালনা করা কোন অবস্থাতেই নাজায়েজ হবে না। উপরন্ত তখন এছাড়া তোমাদের অন্য কোন উপায়ও থাকবে না।

'ধন্যবাদ আপনাকে জনাব সালমান সাহেব! বলল রুকাইয়া–বিষয়টি প্রমাণ সহকারে বিস্তারিত বুঝিয়ে দেয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য মোবারকবাদ জানাচ্ছি। শুরু থেকেই আমার মন আত্মঘাতি হামলাকে জায়েজ বলে সাক্ষ্য দিচ্ছিল, সে জন্যই বিভিন্নজনের কাছে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলাম। কিন্তু সকলেই নেতিবাচক জওয়াব দেয়ায়, এ ব্যাপারে নিরুৎসাহিত হয়ে পরি। কিন্তু আজ আপনার আলোচনা দ্বারা আমার সব সন্দেহ সংশয় দূর হয়েছে। ইনশাআল্লাহ্! আমিও মার্কিনীদের বিরুদ্ধে আত্মঘাতি হামলায় অংশ নেব। আল্লাহর দেয়া জান তারই পথে উৎসর্গ করে দিব। ঈগল ভাইয়া! তুমি যখন আত্মঘাতি স্কোয়াড গঠন করবে, তখন সকলের প্রথমে সেই তালিকায় আমার নাম লিখবে!'

রুকাইয়ার চেতনা দেখে ঈগল আশ্চার্য হলো। সে ইতিপূর্বে কোনদিন জানতেও পারেনি, তার ফুফুর এই এতিম কন্যার ভিতর জাতীয় এবং ধর্মীয় চেতনা এতটা প্রবল। সে সর্বদা দেখেছে রুকাইয়া একটি শান্ত শিষ্ট লাজুক প্রকৃতির মেয়ে। কিন্তু সে এত তেজ পেল কোথায়? হ্যাঁ আমেরিকাই মুসলিম বিশ্বের শান্তশিষ্ট, নিরীহ মানুষগুলিকে অকথ্য যুলুম নির্যাতন করে প্রতিবাদী-প্রতিরোধী বানিয়েছে। যেমন এই আমি ছিলাম কত শান্ত স্বভাবের ছেলে। আমেরিকার জুলুমই আমাকে বানিয়েছে দুর্ধর্ষ। আজ আমি পরিচিতি লাভ করেছি অতিকায় রহস্য মানব হিসেবে। তাই হে আমেরিকা! তুমি সন্ত্রাস নির্মূলের অজুহাতে বিশ্ব ব্যাপী মুসলিম জাতির উপর নির্যাতনের যে খড়গ চালাচ্ছো, অন্যায় মাতুব্বরী দ্বারা আমাদের মনে প্রতিশোধের যে অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত করেছো, সেই আগুন প্রলম্বিত হয়ে মুসলিম বিশ্ব অতিক্রম করে পুরো-ইউরোপ-আমেরিকাকেও গ্রাস করবে। তোমার হোয়াইট হাউসকে ব্লাক হাউসে পরিণত করবে।

এরপর ঈগল সালমানকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'মার্কিনীরা যখন সম্পূর্ণ দেশ দখল করে নিবে, নিশ্চয়ই তখন সেনাবাহিনী, পুলিশ বাহিনী এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক সরকারী কর্মচারীদের বরখাস্ত করবে, তখন তারা অসহায় ও নিরুপায় হয়ে নিজ গরজেই হাতিয়ার তুলে নিবে, গেড়িলা যুদ্ধ করবে। তখন এদের দ্বারাই আত্মঘাতি স্কোয়াড গঠন করা যাবে, তুমি কি বল?'

'তোমার চিন্তা সঠিক,–বলল সালমান– 'তবে আত্মঘাতী স্কোয়াড গঠনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে সেই সকল স্বেচ্ছাসেক বাহিনী যারা বিভিন্ন আরব দেশ এবং অন্যান্য মুসলিম দেশ থেকে এসেছে তাদের ইরাকী ভাইদের সহযোগীতার জন্য। এদেরকে যদি তোমরা সংগঠিত করে কাজে লাগাতে পারো, তবে এরা এক মুহূর্তের জন্যও আমেরিকার সৈন্য জোটকে স্বস্তিতে নিঃশ্বাস ফেলতে দিবে না। কারণ এসকল মুজাহিদরা মৃত্যুকে পরোয়া করে না। তাঁরা বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময়ই শাহাদাতের তামান্না নিয়ে বের হয়েছে। এই আমিও ইরাক এসেছি শাহাদাতের নিয়তে।'

'কিন্তু সালমান ভাই! স্বেচ্ছাসেবক মুজাহিদগণ সাদ্দাম বাহিনীর ব্যবহারে দারুণ অসন্তুষ্ট–বলল ঈগল–তাদেরকে বিভিন্ন স্থানে ইরাকের সরকারী বাহিনী অপমাণিত করেছে।'

'মানুষের যখন পতন ঘনিয়ে আসে তখন সে বন্ধু-দুশমন চিনতেও ভুল করে–বলল সালমান–ঈগল ভাই! আজ থেকেই তুমি স্বেচ্ছাসেবকদের সংগঠিত করার চেষ্টা কর। তাদের বলবে, ভাইয়েরা! তোমরা তো সাদ্দামের জন্য যুদ্ধ করতে আসনি। তোমরা এসেছো ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করতে। সুতরাং তোমরা সাদ্দাম বাহিনীর দুর্ব্যবহারকে গুরুত্ব দিওনা। তোমরা ইরাকেই অবস্থান করো। ইরাক সাদ্দামের একার নয়। এদেশ আমাদের সকলের। প্রতিটি মুসলমানের প্রাণের স্পন্দন এই ইরাক।'

'ঠিক আছে সালমান ভাই। আমি তাহলে এখনই বেড়িয়ে পড়ি।' এই বলে তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে নতুন মিশন সফলের উদ্দেশ্যে উড়াল দিল ঈগল।

চার

মেজর আসাদুল্লাহ সাহেব আহত হয়েছেন আজ ক'দিন হলো। এর মধ্যে বাহিরের অবস্থা কেমন হয়েছে, যুদ্ধের গতিধারা কেমন চলছে, কিছুই জানতে পারছেন না তিনি। তাঁর শারীরিক অবস্থা এখন অনেকটা উন্নত। ময়দানে যাওয়ার জন্য তাঁর মন আনচান করছে। কিন্তু তিনি ভালো করেই জানেন, তিনি ময়দানে গেলে শুধু বসে থাকা ছাড়া আর কিছুই করতে পারবেন না।

এতক্ষণ খাটে শুয়ে তিনি বই পড়ছিলেন। হঠাৎ কি মনে করে যেন খাট থেকে নেমে সালমানের রুমে আসলেন। সালমান তখন ঘুমে ছিল মুয়াজ তার পাশে বসে ছবক ইয়াদ করছে একনিষ্ঠভাবে। মেজর সাহেব পুত্রের কাছটিতে বসলেন। মুয়াজ পিতাকে দেখে তিলাওয়াত বন্ধ করে বলল, 'আব্বু! আপনার কি কোন কিছু প্রয়োজন?'

'না আব্বু! কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। এমনিতেই এলাম। তুমি তোমার ছবক ইক্বরার করতে থাকো।'

মুয়াজ পুনরায় তিলাওয়াতের প্রতি মনোনিবেশ করল। মেজর সাহেব পুত্রধনের কচি মুখে পাঠ করা কালামে এলাহীর মধু মাখা অমৃত সুধা উপভোগ করতে লাগলেন একাগ্রচিত্তে। আহা! মন যেন তৃপ্ত হতে চায়না। যতই শুনেন ততই যেন শ্রবণ পিপাসা বৃদ্ধি পায়। মহান আল্লাহ্ তাঁর এই পবিত্র কালামে পাকের মধ্যে এমনই এক সম্মোহনী শক্তি দিয়ে রেখেছেন, যা সর্বযুগের, সর্বশ্রেণীর মানুষকে সমানভাবে আকৃষ্ট করতে সক্ষম। এর ভিতরেই আল্লাহ মানুষকে বাতলে দিয়েছেন হিদায়েতের পথ। বলে দিয়েছেন দুনিয়াতে শান্তি-সুখে বসবাস করার সকল নিয়ম-নীতি, আইন-কানুন। ইতিহাস সাক্ষী, যখন মুসলমানরা কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁদের জীবনকে পরিচালনা করেছিল, তখন

তাঁরা ছিল পৃথিবীতে এক সম্মানিত জাতি হিসেবে পরিচিত। তাঁরা খেতাব পেয়েছিলেন "স্বর্ণ যুগের সোনার মানুষ" হিসেবে। কিন্তু বর্তমানের মুসলমানরা কোরানের শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাওয়ায় এবং কুরআনের আইনকে উপেক্ষা করায়, সারাবিশ্বে তারা আজ লাঞ্ছিত-অপমানিত এক জাতি হিসেবে পরিচিত।' এই কথাগুলিই চিন্তা করছিলেন মেজর সাহেব পুত্রের কোরান তিলাওয়াত শ্রবণ করে। মুহূর্তে তার মন ছুটে যায় খোলাফায়ে রাশেদ্বীনের সেই সোনালী যুগে। যেখানে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ জীবন যাপন করত নিরাপদ ও স্বাধীনচিত্তে। বাঘ এবং ছাগল একই ঘাটে পানি পান করত অথচ বাঘ ছাগলকে আক্রমণ করত না।

এরই মধ্যে সালমানের ঘুম ভেঙ্গে যায়। সে চোখ মেলে মেজর সাহেবকে খাটের পার্শ্বে দেখে তড়াক করে উঠে বসল। বিনয়ের সাথে সালাম দিল। তাকে জিজ্ঞেস করল 'চাচাজান কোন সমস্যা নয় তো?'

'সমস্যা কিছুই নয় বাবাজি! তবে ঘরে বসে থাকাটা আমার এক ঘেয়েমি লাগছে। যুদ্ধের অবস্থা কি তাও জানতে পারছিনা। বেচারা ঈগলও সেই যে গেল আর আসলো না।'

'আমি আপনার মনের অবস্থাটা আঁচ করতে পারছি' –বলল সালমান– 'দায়িত্ব থেকে অবসর হয়ে নির্জীব পরে থাকা কত কষ্টদায়ক ব্যাপার তা আমি হাড়ে হাড়ে অনুভব করছি। আজ ৯দিন যাবৎ আমি কাজ করতে পারছিনা, আমার মনে হচ্ছে ৯ বছর আমি এখানে বসে আছি। চাচাজান! আমার শারীরিক অবস্থা এখন বেশ ভালই লাগছে। আমি বাহির থেকে কিছু সময় ঘুরে বর্তমান যুদ্ধের পরিস্থিতিটা অবলোকন করে আসি? আর সে সাথে দেখি ঈগল ভাইয়ের কোন সন্ধান পাই কিনা।'

সালমানের এ কথা শুনে মুয়াজ বলে উঠল 'ভাইয়া! আপনার সাথে আমিও যাবো বাহিরের অবস্থা দেখতে।'

'তা হয়না ভাইয়া! সালমান মুয়াজকে কোলে তুলে আদর করে বলল, বাহিরে তুমুল যুদ্ধ চলছে এ অবস্থায় তোমাকে সাথে নেয়া যাবেনা।'

'কেন ভাইয়া! আপনিই তো বলেছিলেন, যখন যাবেন আমাকে নিয়ে যাবেন।'

'তাতো যখন যুদ্ধে যাবো তখন। এখন তো যাচ্ছি শুধু বাহিরের অবস্থাটা দেখার জন্য।' এভাবে অনেক বুঝানোর পর তাকে নিবৃত্ত করে সালমান ব্যাংকার থেকে বেড়িয়ে এলো। ঘর থেকে বেরুনোর সময় দেখা হলো রুকাইয়ার সাথে। সে তার পথ আগলে দাঁড়াল। 'কোথায় যাওয়া হচ্ছে?' জিজ্ঞেস করল সালমানের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

'এই একটু বাহির থেকে আসছি।' উত্তর দিল সালমান।

'কেন? আপনার শরীর কি পুরোপুরি সুস্থ হয়েছে।'

'বাহিরে যাচ্ছি যুদ্ধের পরিস্থিতিটা একটু দেখতে' –বলল সালমান– 'তাছাড়া আজ ক'টা দিন যাবৎ ব্যাংকারে থাকতে থাকতে মন কেমন বিষিয়ে উঠেছে। আর শরীর

আলহামদুলিল্লাহ এখন প্রায় পুরোপুরি সুস্থ্ই বলতে পার। শুধু বাম বাহুর যখমটা সম্পূর্ণ সারেনি, এই যা!'

'তবে বুঝি আমাকে ফেলে রেখে চলে যাবার সময়ও হয়ে এলো, তাই না!' রুকাইয়ার চোখে পানি টলমল করতে লাগল।

'কই, তোমাকে ফেলে চলে যাবো এমন কথাতো কখনও বলিনি আমি! সালমান রুকাইয়ার মানসিক অবস্থাটা আঁচ করতে পেরে তাকে শান্তনা দিল।

'বলেন নি ঠিক, কিন্তু আপনাকে বাইরে যেতে দিতে...আর বলতে পারল না রুকাইয়া। লজ্জায় তার কণ্ঠ আড়ষ্ট হয়ে এলো। সে দৃষ্টি নিম্নগামী করে নিরব দাঁড়িয়ে রইল। ঘটনার আকস্মিকতায় সালমানও নিরুত্তর দাঁড়িয়ে। কক্ষের ভিতর বিরাজ করছে পিনপতন নিরবতা। কারও মুখেই কোন কথা নেই। একবার শুধু রুকইয়া মাথা তুলে তাকাল সালমানের দিকে। নিরুত্তর সে চাহনীতে এমন এক আবেদনময়ী ভাষা বিদ্যমান, যা সালমানকে লক্ষ করে বলছে "হে প্রিয়তম! তুমি যদি চলে যাও বাহিরে, আমার মনও ছুটে চলে যাবে তোমার সাথী হয়ে। আমার তখন ঘরে থাকা হবে অসম্ভব। তার চেয়ে আমাকেও নিয়ে যাও সাথে। মরণ আসিলেও দু'জনে থাকব একই সাথে, হই এবং পর জীবনে।"

এভাবে কিছু সময় পার হবার পর নিরবতা ভঙ্গ করে সালমান বলল, 'রুকাইয়া! তুমি কি বলতে চাও খুলে বল। আমি অল্প সময় বাহিরে কাটিয়েই ফিরে আসব। এতে তোমার ঘাবরে যাওয়ার কিছু নেই।'

'সে অল্প সময় কি আমাকে সাথে নেয়া যায় না! ভাংগা ভাংগা কণ্ঠে বলল রুকাইয়া–আমিও তবে কাছ থেকে দুশমনের আক্রমণের ভয়াবহ তান্ডব দেখার সুযোগ পেতাম। পাশাপাশি আপনার শারীরিক কোন সমস্যা কিংবা অন্যকোন অসুবিধা হলেও আমি তা দেখতে পারতাম।'

'তুমি যদি ভাল মনে কর, যেতে পারো'–বলল সালমান–'তাতে আমার সুবিধাও হবে অনেকটা। কেননা গাড়ি সাথে নিলে অল্প সময়ে অনেক কাজ সারা যাবে। আর আমার বাম বাহুতে ব্যথা থাকায় আমি ড্রাইভ করতে পারব না। সেক্ষেত্রে তুমি ড্রাইভ করলে মন্দ হয় না; তবে তা অবশ্যই তোমার আব্বাজানের অনুমতি সাপেক্ষে হতে হবে।'

রুকাইয়া সাথে সাথে ব্যাংকারে চলে গেল পিতার অনুমতি আনতে। দু'তিন মিনিটের ব্যবধানে সে অনুমতি নিয়ে সালমানের সম্মুখে হাজির হল। অতঃপর সে সালমানকে গাড়িতে গিয়ে বসতে বললে সে তৎক্ষণাৎ গিয়ে গাড়ির সিটে আসন নিল। অল্প সময়ের ব্যবধানে রুকাইয়াও গাড়ির নিকট চলে এল। কিন্তু এখন তাকে দেখে চিনার কোন উপায় নেই যে, সেই রুকাইয়া।

রুকাইয়াকে দেখে সালমানের মনে হলো, যেন এক তরুণ সমরকুশলী বীর পিসাহসালার। গায়ে পড়নে সামরিক উর্দি। কোমরে বাধা শক্ত বেল্ট। মাথায় লোহার

হেলমেট। কাঁধে ঝুলান স্বয়ংক্রিয় অগ্নেয়াস্ত্র। ফিল্ড মার্শালের ন্যায় হেটে এসে গাড়ির ড্রাইভিং সিটে বসল। চাবি দিয়ে গাড়ি স্টার্ড দিল। সালমান মনে করলো কোন সেপাইকে বুঝি রুকাইয়া ড্রাইভিং করার জন্য ডেকে এনেছে। কেননা মেজরের বাড়ির নিরাপত্তার জন্য সার্বক্ষণিক চারজন সিপাহী বাড়িতে অবস্থান করে; অবশ্য এরা যুদ্ধের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়। তাই সে ড্রাইভিং সিটে বসা সিপাহীরূপী রুকাইয়াকে বলল 'এই যে ভাই! তোমাদের ম্যাডামও বাহিরে যাবেন, তার জন্য একটু অপেক্ষা কর।'

রুকাইয়া বুঝতে পেরেছে, সালমান তাকে চিনতে পারেনি। তাই হেলমেটটা সরিয়ে পিছনের দিকে এক নজর তাকালো। সালমান রুকাইয়াকে এই সাজে দেখে তাজ্জব বনে গেল। সে তাকে আর কোন কিছু জিজ্ঞেস করল না।

রুকাইয়া বাড়ির বাইরে গাড়ি বের করে সোজা উত্তরের রাস্তা ধরে চালাতে লাগল। খুব দ্রুতগতিতে গাড়ি ধেয়ে চলছে শহরের কেন্দ্রস্থলের দিকে। অত্যন্ত ভয়াবহ থমথমে পরিবেশ বিরাজ করছে পুরো শহরময়। কোন ইরাকী সৈন্যদের দেখা যাচ্ছেনা কোথাও। ইরাকের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং যোগাযোগ মন্ত্রণালয়সহ বেশ কয়েকটি মন্ত্রণালয় কমপ্লেক্সে আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে ইরাকের অলিম্পিক সদর দফতরের ভবনগুলোতেও। রুকাইয়া আগুনের পাশ দিয়েই চালিয়ে গেল গাড়ি। কিছু সামনে গিয়ে দেখল, আগুন জ্বলছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভবনসমূহেও। তাদের আর বুঝতে বাকী রইল না যে, হানাদাররা বাগদাদের দখল নিয়ে ফেলেছে। তাই সালমান রুকাইয়াকে দ্রুত হোটেল আর রশিদের দিকে গাড়ি ছুটাতে বলল।

হোটেল আর-রশিদে পৌছে তারা দু'জন হোটেলের ৬ই তলার ২০৩ নম্বর রুমে গেল। এখানে আসার উদ্দেশ্য হল সালমানের কাগজ পত্র এবং অন্যান্য মালামালগুলি নিয়ে যাওয়া। কিন্তু যখন রুম খুলল, দেখা গেল রুমের মধ্যে কোন মালামাল অবশিষ্ট নেই। এ অবস্থা দেখে সালমান খুবই মর্মাহত হল। মালামালের জন্য তার কোন দুঃখ নেই, কিন্তু কাগজপত্র গুলোর জন্য তার পেরেশানির অন্ত রইল না। রুম থেকে বেড়িয়ে তারা হোটেলের অফিস কক্ষে গেল। ম্যানেজারকে তাঁর রুমের অবস্থা বললে তিনি জানালেন, "কিছুদিন আগে সন্ধ্যায় একদল বিদেশী সাংবাদিক হোটেলে এসে আপনার রুমের চাবি চাইল। আমি বললাম, 'কেন তার রুমের চাবি আপনাদের দেব?' তারা বলল, 'সালমান নিহত হয়েছে তাই আমরা তার মালামালগুলো তার দেশের বাড়িতে পাঠাতে চাই'। আমি তাদের কথায় চাবি দিতে রাজি না হওয়ায় তারা আমাকে হত্যার হুমকি দেয়। আমি তাদের কথায় কর্ণপাত না করে বললাম যদি আপনারা আমাকে সালমানের লাশ দেখাতে পারেন অথবা তার নিহত হওয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ তবেই কেবল তার মালামাল দিতে পারি, অন্যথায় নয়। আমি একথা বলার সাথে সাথে তাদের একজন অস্ত্র ঠেকিয়ে আমাকে জিম্মি করে ফেলে। এরপর বাধ্য হয়ে আমি বললাম, ঠিক আছে আপনারা আমার সাথে চলুন। তারা বলল, আমরা এখানেই বসব, তুমি সব মালামাল এখানে এনে জমা

কর। আমাকে আরও শাসিয়ে বলল, দেখ! কোনরূপ চালাকির আশ্রয় নিলে, আমাদের মার্কিন জেট বিমান সংবাদ দিব। বিমান এসে তোমাদের হোটেলটি বোমা মেরে উড়িয়ে দিবে। আমি বললাম, ঠিক আছে আমি তার মালামাল নিয়ে আসছি আপনারা বসুন। এরপর আমি দু'জন হোটেল বয়কে নিয়ে চলে গেলাম আপনার রুমে। আমি সমস্ত মালামাল বয় দু'জনের মাধ্যমে তাদের সম্মুখে এনে হাজির করলাম। ফাকে আপনার ব্রিফকেসটা অন্যরুমে লুকিয়ে রাখলাম।'

ম্যানেজারের শেষের কথাটি শুনে সালমান উল্লসিত হয়ে বলল 'তাহলে আমার কাগজপত্রগুলো আপনি হেফাযত করেছেন ম্যানেজার সাব! আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ!'

হোটেল ম্যানেজার আইয়ুব সাবেরী স্টীল আলমাড়ী থেকে ব্রিফকেসটি বের করে সালমানের সামনে রাখলেন। সালমান সেটি খুলে দেখল ভিতরের সবকিছু ঠিকঠাক আছে। এর ভিতর রাখা প্রায় লক্ষাধিক পাকিস্তানী রূপী স্বস্থানে আছে। এর দ্বারা ম্যানেজার আইয়ুব সাবেরীর বিশ্বস্ততা এবং আমানতদারীর স্বচ্ছ প্রমাণ পাওয়া গেল। সালমান খুশী হয়ে তাঁকে ২০ হাজার রূপী পুরস্কার দিতে চাইলে সে তা নিতে অস্বীকৃতি জানায়। অবশেষে তারা দু'জন ম্যানেজারের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলো গাড়িতে।

রুকাইয়া এবার গাড়ি ছুটালো বাড়ির দিকে। পথে যেতে যেতে তারা দেখল জনপ্রিয় আরবী টেলিভিশন চ্যানেল আল-জাজিরার বাগদাদের স্টেশনটিকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়া হয়েছে। বোমা মারা হয়েছে আবুধারীর টেলিভিশন অফিসেও। সেখানে এখনও জ্বলছে আগুন। আগুন জ্বলছে আরও বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, আবাসিক ঘর-বাড়ি এবং অনেক মসজিদেও। হানাদার বর্বর ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর এই পৈচাশিক ধ্বংসযজ্ঞ, মধ্যযুগের তাতারীদের বর্বরতাকেও হার মানিয়ে ছেড়েছে যেন।

রুকাইয়া গাড়ির গতি আরও বাড়িয়ে দিল। হানাদারদের হাতে ধরা পড়ার ভয় আছে। সালমান বসে বসে চারিদিকে মার্কিনীদের এসকল অসভ্যতাসুলভ কার্যাবলী ব্যথিত দহৃদয়ে অবলোকন করছে। তার মনে চায় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জংলী বুশকে জংগলে পাঠিয়ে, সভ্যতার প্রজননকেন্দ্র ঐতিহ্যবাহী এই ইরাককে ধ্বংসযজ্ঞের হাত থেকে রক্ষা করতে। সহসাই সালমানের নজরে পড়ল একটি দৃশ্য। তাহল, একটি লোককে ধাওয়া করছে তিন চারজন মার্কিন সৈন্য। খুব সম্ভব সৈন্যরা লোকটিকে জীবিত ধরতে চাচ্ছে। নতুবা সৈন্যরা যে দূরত্বে আছে তাতে গুলি ছুড়ে অনায়াসে লোকটিকে মারা যায়। লোকটি দৌড়াচ্ছে প্রাণপণে। খুব দ্রুত বেগে। মার্কিন সৈন্যরা তার সাথে দৌড়িয়ে পারছে না। সে যেন দৌড়াচ্ছেনা, বাতাসের সাথে উড়ে যাচ্ছে। সালমান রুকাইয়াকে বলল, 'দেখ রুকাইয়া! একজন লোককে ধাওয়া করছে দখলদার সৈন্যরা। সে যেই হোক তাকে সাহায্য করা দরকার। তুমি গাড়ি আরও জোরে চালাও, কুইক!'

রুকাইয়া গাড়ির গতি আরও বাড়িয়ে দিল। বাম হাত দিয়ে পকেট থেকে একটি হ্যান্ড গ্রেনেড বের করে সালমানকে দিয়ে বলল, এটি ওদের দিকে ছুড়ে মারুন।' তার

সাথে আরও ৩টি গ্রেনেড আছে। এগুলো বাসা থেকে বের হওয়ার সময় সাথে নিয়েছিল সে। যদি প্রয়োজন হয় এই ভেবে। এখন সত্যি সত্যিই এর প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল।

সালমান গাড়ির গ্লাস ফাক করে গ্রেনেডটি ঠিক তখন ফিকল, যখন গাড়িটি সৈন্যদের বরাবর আসল। গ্রেনেডটি তার দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করল। বিস্ফোরিত হয়ে দু'জন সৈন্যকে সাথে নিয়ে জমিনে শুয়ে পড়ল। প্রথম গ্রেনেডের কৃতিত্ব দেখে রুকাইয়া সাথে সাথে গাড়ির ব্রেক কষে আরও একটি গ্রেনেডকে পাঠালো বাগদাদের অতিথি (!) সৈন্যদের খেদমতে। এই গ্রেনেডও তাদের মেহমানদের খেদমতে কোনরূপ গড়িমসি করল না। তবে সে জীবিত দু'জনের সাথে মৃত্যু একজনকেও বুকে টেনে নিল। যেন এরা তার কত আপন! কত প্রিয়জন!!

পিছনে বিস্ফোরণের শব্দ শুনে ধাওয়াকৃত লোকটি থমকে দাঁড়িয়ে গেল। তাকিয়ে ঘটনাস্থলে মার্কিন সৈন্যদের তফরাতে দেখে, সে পিছনে এগিয়ে আসল। সালমান দেখল সে অন্য কেউ নয়–ঈগল, বাগদাদের ঈগল। সে চিৎকার দিয়ে বলল, 'রুকাইয়া এযে আমাদের ঈগল ভাই! ঈগল দূর থেকেই সালমানকে চিনতে পেরে দৌড়ে অকুস্থলে পৌঁছল। সালমান ঈগলকে পেয়ে বুকে জড়িয়ে ধরল। ঈগল বলল, সালমান ভাই! দ্রুত আমাদের এ স্থান ত্যাগ করতে হবে, নতুবা বিমান হামলার শিকার হতে হবে।'

সালমান বলল, 'ঈগল! আমরা গণিমাতের মাল ফেলে যাবো কেন? এস! জলদি সৈনিকদের অস্ত্র, ঘড়ি, হেলমেট, গ্যাস মাস্ক ও বুট খুলে নাও; প্রয়োজনের সময় কাজে লাগবে।' বলে সে নিজেও খুলল একজনেরটা। চার সৈনিকের ৪টি একে-৪৭ অ্যাসল্ট রাইফেল, ৪টি ঘড়ি, ৪ জোড়া বুট, ৪টি হেলমেট এবং গ্যাস মাস্ক ৪টি নিয়ে তারা গাড়িতে আসল। রুকাইয়া ড্রাইভিং সিটে বসে ফুলস্পিরিটে গাড়ি চালিয়ে দিল। ঈগল ড্রাইভারের গাড়ি চালনা দেখে অবাক হল। গাড়িটি যেন হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে। সে সালমানকে জিজ্ঞেস করল, 'সালমান ভাই এমন দক্ষ ড্রাইভার পেলে কোথায়?'

সালমান মুচকি হেসে বলল 'যে দেশে তোমার মত ঈগল বাস করে, সে দেশে এমন দক্ষ ড্রাইভারের অভাব হওয়ার কথা নয়! বাগদাদের ড্রাইভাররাও আজকাল বাগদাদের ঈগল হওয়াল কোশেষ করছে বৈকি!'

'এ ড্রাইভার তো সামরিক পোষাক পরিহিত। সে কি ইরাকী বাহিনীর কোন সৈনিক, নাকি বিদেশী কোন আরব মুজাহিদ!' পুনরায় জিজ্ঞেস করল ঈগল।

রুকাইয়া এতক্ষণ কোন কথা বলেনি। এবার ঈগলের কথা শুনে গাড়ি চালানো অবস্থায়ই মুখ খুলল, 'ঈগল ভাইয়া! আজকাল তুমি বড় বেখেয়াল হয়ে গেছো; নিজের বোনকেও চিনতে পারছো না!'

রুকাইয়ার কণ্ঠ শুনে ঈগল ভ্যাবাচ্যাগা খেয়ে গেল। 'আরে রুকাইয়া তুমি! আমি তো মনে করেছিলাম এ ড্রাইভার সৈনিক ইরাকী বাহিনীর কোন উচ্চপদস্থ কমান্ডার' ততোধিক বিস্ময়ের সাথে বলল ঈগল। এরপর কেউ আর কোন কথা বলল না।

কিছুক্ষণের মধ্যে গাড়ি তারা গন্তব্যে পৌঁছে গেল। ঈগল ও রুকাইয়া গণিমাতের মালামালগুলো বাংকারে নিয়ে এলো। সালমানের বাম বাহুতে ব্যথা থাকায় সে শুধু নিজের ব্রিফকেসটি নিলো সাথে।

* * *

মেজর আসাদুল্লাহ সাহেব রুকাইয়াকে সালমানের সাথে বাহিরে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে চিন্তিত মনে বাংকারের মধ্যে সময় অতিবাহিত করছিলেন। তিনি ভাবছেন, এই ঘোরতর যুদ্ধের মধ্যে একজন অসুস্থ ছেলে, আর তার দেখাশুনার জন্য একটা মেয়েকে বাইরে যেতে আমি কেন অনুমতি দিলাম? আল্লাহ্ই ভাল জানেন তারা ফিরে আসতে পারবে কিনা! তাদের ভাগ্যে কি ঘটে, এই চিন্তায় তিনি এখন পেরেশান। কিছু সময় পরপরই তিনি মুয়াজকে বাহির্বাটীতে পাঠান, তারা এলো কিনা সে খোঁজ নিতে।

অল্প আগে মুয়াজ এসে তাঁকে জানাল যে, তারা এসে গেছে। যখন তারা ব্যাংকারে প্রবেশ করল মেজর সাহেব দাঁড়িয়ে সালমান ও ঈগলকে বুকে টেনে নিলেন। অতঃপর রুকাইয়ার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, তোমরা সহীসালেমভাবে ফিরে আসতে পেরেছো এজন্য আমি মহান আল্লাহর দরবারে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। একথা বলে তিনি কিছুটা বিস্মিত হলেন। 'কি হলো এদের, এরা কেউ কোন কথা বলছে না কেন! সবার মুখেই বিষাদের ছাপ লক্ষ করা যাচ্ছে যে!'

অবশেষে মেজর সাহেব নিজেই সালমানকে জিজ্ঞেস করলেন 'সালমান! কি হয়েছে তোমাদের? বাহিরের কি অবস্থা আমাকে খুলে বল?'

বলার জন্য সালমান মুখ খোলার চেষ্টা করল। কিন্তু কে যেন তার কণ্ঠটা টিপে ধরছে। কিভাবে সে বলবে মেজর সাহেবকে যে, আপনার দেশ মার্কিনীরা দখল করে নিয়েছে। তিনি কি এই সংবাদ শুনে নিজেকে সামলে রাখতে পারবেন?' এই চিন্তা করতে লাগল সে।

সালমানেরও এই নির্লিপ্ততা দেখে মেজর সাহেব চিৎকার দিয়ে বললেন, 'আল্লাহর কসম লাগে! কি হয়েছে আমাকে খুলে বল? তোমাদের এই নির্লিপ্ততা আমার অন্তর ভেঙ্গে চৌচির করে দিচ্ছে। তোমরা যদি আমাকে এ মুহূর্তে এই সংবাদ শুনাও যে, বাগদাদের পতন হয়েছে আর ইরাক সম্পূর্ণ মার্কিনীরা দখল করে নিয়েছে, তাতেও আমি ঘাবরে যাবো না। আমি পূর্বেই ধারণা করতে পেরেছি, পতন এখন বাগদাদের ভাগ্য লিখন হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

তাঁর এই কথা শুনে ঈগল বলল, 'ফুফাজান! আপনার ধারণাই বাস্তবায়িত হয়েছে। বাগদাদের পতন হয়ে গেছে। আমাদের ইরাক এখন ইঙ্গ-মার্কিন হানাদারদের কব্জায় চলে গেছে।'

ঈগলের এ কথা শুনে মেজর সাহেবও ক্ষণকাল নিষ্প্রভ হয়ে রইলেন। তাঁরও যেন বাকরোধ ঘটেছে। তিনি আপন কল্পপাখায় ভর করে পুরো ইরাক একবার ঘুরে এলেন।

দেখলেন সাজানো সুন্দর ইরাককে। কিন্তু এখন তো আর অক্ষুণ্ণ থাকবে না তাঁর এই সৌন্দর্য। মুছে যাবে, ধ্বংস হয়ে যাবে ইরাকের সকল রূপ-সৌন্দর্য, ইতিহাস-ঐতিহ্য। তথাকথিত সভ্যতার দাবীদারদের হাতে ম্লান হয়ে যাবে সভ্যতার আদি মতার ইজ্জত আব্রু। ওরা খাবলে ছিড়ে খাবে সভ্যতার হৃদপিন্ডকে। এদের হাত থেকে রক্ষা পাবে না অসংখ্য নবী-রাসূল, সাহাবা, তাবেয়ী, ওলি-আওলিয়াদের স্মৃতিধন্য এই পবিত্র ইরাক। আর ফুটবে না সৌন্দর্যের সুষমা নিয়ে বসরাই সেই গোলাপ। কারণ ওরা চতুষ্পদ জানোয়ার। ওরা লতা-পাতা শুদ্ধ খেয়ে ফেলবে সৌন্দর্য-সুরভী প্রসবিনী এই গোলাপ চারাগুলোকে।

অবশ্য ওদের কাছ থেকে এগুলোর নিরাপত্তা আশা করা মানে হিংস্র বাঘের খাঁচায় ছোট্ট খরগোশের নিরাপত্তা আশা করা; যা কোন দিনই সম্ভব নয়। এ আশা দুরাশা বৈ কিছু নয়।

এইতো সেই আমেরিকা যে, হিরোশিমা-নাগাসিতে আনবিক বোমা হামলা করে জাপানের দু'টো শহর ধ্বংশের মাধ্যমে মূলত মানবতাকে গলা টিপে হত্যা করেছিল। এরাই ভিয়েতনামে পোড়ামাটি নীতি গ্রহণ করে আবাল-বৃদ্ধি-বণিতাসহ এক কোটিরও বেশী মানুষ হত্যা করেছিল। নির্বিচারে বোমা মেরে বাঁধ, হাসপাতাল, শিশুদের স্কুল, ধর্মীয় উপাসনালয় ধ্বংস করেছিল। জালিম সেখানে ৭০ লাখ টনেরও বেশী বোমা ফেলেছিল, যা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত বোমার তিনগুণেরও বেশী।

কম্বোডিয়ার অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগে মার্কিন সৈন্য সেখানে প্রবেশ করে এবং মার্কিন বিরোধীদের উপর পাইকারী হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে লাখ লাখ কম্বোডিয় জনগণকে হত্যা করেছিল এরা। এই তথাকথিত বিশ্বমোড়লেরা কোরিয়াকে বিভক্তি করারও নাটের গুরু। এদেরই কলকাঠি নাড়ানোতে কোরিয়ার লাখ লাখ নিরপরাধ মানুষ অকাতরে প্রাণ হারিয়েছিল।

ইন্দোনেশিয়ায় কমিউনিস্ট বিপ্লব ঠেকানোর নামে মার্কিনীরা সেখানে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে সুহার্তোকে ক্ষমতায় বসায়। সুহার্তো নিষ্ঠুরতার সাথে মার্কিন বিরোধী হিসেবে পরিচিত লাখ লাখ মানুষকে হত্যা করে। এই দস্যুরা শ্রীলংকায়ও কথিত কমিউনিস্ট বিপ্লব ঠেকাতে সেখানে এক সামরিক অভ্যুত্থান ঘটায়। সে সামরিক সরকার কমিউনিস্ট দমনের নামে মূলত নিরপরাধ মার্কিন বিরোধী জনগণকে ব্যাপকভাবে হত্যা করে। এ সময় লাখ লাখ লোক প্রাণ হারিয়েছিল।

মুসলিম উম্মাহর উপর বুশ-ব্লেয়ার চক্র ক্রুসেড চাপিয়ে দিয়েছে ইহুদী-খৃষ্টানরা আজ একাট্টা হয়ে লড়ছে। তাদের এই লড়াই শুধু একটা দেশের বিরুদ্ধে নয়, ইসলামী আদর্শের বিরুদ্ধে। সঙ্গত কারণেই দুনিয়ার মুসলিম আজ আক্রান্ত। মুসলিম বিশ্ব আজ ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম ও ভয়াবহ নিপীড়ন-নির্যাতনের শিকার। আফগানিস্তান-ইরাকসহ সমগ্র মুসলিম জাতির উপর মানবতার দুশমন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও বৃটেনের নেতৃত্বে এক

দুঃসহ অমানবিক যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে। কার্যত বিশ্বের তাবৎ মুসলমানদের বিরুদ্ধে ইহুদী-খৃষ্টান-মোনাফেক-মোশরেক চক্রের আরোপিত এই ক্রুসেড সমগ্র মানবতার বিরুদ্ধে, দুনিয়ার সমস্ত শান্তিপ্রিয় মানুষদের বিরুদ্ধে।

যে সন্ত্রাসের কথা বলে, মানবতার কথা বলে, নিষিদ্ধ অস্ত্রের ধুয়া তুলে আমেরিকার নেতৃত্বে সমগ্র কুফর এক সাথে মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নেমেছে, বাস্তবতা হচ্ছে ইতিহাসের আদিপট থেকেই এরা মুসলমানদের দুশমন। ঈমানদারের প্রতিপক্ষে শয়তানি শক্তির প্রতিভূ। এরা মজলুমের বিরুদ্ধে জালেম হিসেবে বারবার বর্বরতার ও নিষ্ঠুরতার প্রতীকী দাজ্জাল রূপে আবির্ভূত হয়েছে। অথচ ইতিহাসের কি নির্মম পরিহাস, এরাই প্রকৃত সত্যকে আড়াল করে মিথ্যার বেসাতি চালিয়ে মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী আখ্যায়িত করছে। পৃথিবীর মানচিত্র জুড়ে এদের দস্যুবৃত্তি, আগ্রাসী নীতি মানবতাকে বিপর্যয়ের শেষ প্রান্তে নিয়ে গেছে। যে আমেরিকা আজ সন্ত্রাসের কথা বলে মজলুমের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে, এতো সেই আমেরিকা যারা দস্যুবৃত্তি ও জোর-জবরদস্তির মাধ্যমে আদবিাসী রেড ইন্ডিয়ানদের হটিয়ে হাজার হাজার নিরীহ-নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে মার্কিন সমাজ ও রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করেছে।

এইতো সেই আমেরিকা, যারা দু' দুটি বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ বিভীষিকা সৃষ্টি করে এক কোটির ওপরে মানুষ হত্যা করেছে। জাপানের হিরোশিমা-নাগাসাকিতে এটম বোমা মেরে শুধু উড়িয়েই দেয়নি, লক্ষ কোটি মানুষকে মৃত্যুর কোলে ঠেলে দেয়ার সাথে সাথে পঙ্গু-অসহায়-বিকলাঙ্গ করেছে অগণিত মানুষকে, যা আজও বিশ্ব বিবেককে ব্যথাতুর করে তোলে।

এতো সেই আমেরিকা-ইউরোপ, যারা তেল সম্পদ লুণ্ঠনের জন্য সমগ্র আরব জাহানের উপর জবরদস্তির মাধ্যমে এক আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছে। অনুগত দাসের মত ব্যবহার করছে মোনাফেক শাসক-রাজা-বাদশা-শেখ নামক মেরুদন্ডহীন মুসলিম নামধারী জাতির কুলাঙ্গারদের।

সাদ্দাম সৃষ্টি করেছিল তো আমেরিকা। তাকে লেলিয়ে দিয়েছিল ইরানকে নিঃশেষ করে দেয়ার জন্য। ইরাক-ইরান যুদ্ধের প্রত্যক্ষ মদদদাতা খোদ আমেরিকাই আবার কুয়েত দখলের নাটক করাল। সেই দখল মুক্তির কথা বলে তারাই আবার সাদ্দাম ধ্বংসের নামে কুয়েত ও ইরাকে নারী-শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ বনি আদমকে বর্বরোচিত ও ইতিহাসের নিষ্ঠুরতম কায়দায় দিনের পর দিন হত্যা করেছিল। এর মধ্যে দু'লাখ শুধু ইরাকী সৈন্যকেই ট্যাংকের নিচে পিশে মেরেছিল। ইরানকে ধ্বংসের জন্য তারা জীবন-বিধ্বংসী রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করেই ক্ষান্ত হয়নি, বেসামরিক বিমান ধ্বংস করেছিল, বোমা মেরে এক সাথে ৭২ জন নেতাকে হত্যা করেছিল।

ইসরাঈল নামক অবৈধ ইহুদী রাষ্ট্রটির জন্মদাতাও তো এই আমেরিকা ও ইউরোপ। আমেরিকার অস্ত্র, গোপন গোয়েন্দা সংস্থা ও সৈন্য বাহিনী দিয়ে ইতিহাসের ট্রাজেডিখ্যাত

দীর্ঘ পঞ্চান্ন বছর যাবৎ আরব ইসরাঈল যুদ্ধের নামে আমেরিকা আরব মুসলিম তথা মানবতার বিরুদ্ধে জঘন্যতম সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। এমন দিন নেই যেদিন দু'চারজন ফিলিস্তিনী মুক্তিযোদ্ধা ও শিশু-নারীকে হত্যা করা হচ্ছে না। তারাই আমার শান্তির ললিতবাণী শুনিয়ে ক্যাম্প ডেবিড চুক্তি করে। তারাই যুদ্ধ বিরতির নামে ইসরাঈলকে শক্তি সঞ্চয়ের সুযোগ করে দেয়। তাদের ইশারায় ইসরাঈল কোন প্রকার ঘোষণা ছাড়াই ইরাকের পারমাণবিক চুল্লির উপর হামলা চালায় এবং তা ধ্বংস করে দেয়।

নাইজেরিয়াকে দেউলে করে দিয়েছে আমেরিকা। আলজেরিয়া, সুদানকে অস্থিতিশীল করে রাখার একক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ। লিবিয়া ও সিরিযার উপর আক্রমণের প্রেক্ষিতে রচনা করেছে খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্ণেল গাদ্দাফীকে হত্যার পরিকল্পনা, বোমা হামলা, ইদি আমিনকে পাগল বলে প্রচারণা, নরিয়েগাকে তুলে আনা, লেবাননে প্রতিনিয়ত রক্ত ঝড়াবার ফন্দি আটা সবইতো অসুর দানব আমেরিকার দম্ভ ও অহমিকার ঘৃণ্য ফসল।

এই আমেরিকাই তো রুশ আগ্রাসনের সময় আফগানদের প্রতি মায়াকান্না দেখিয়েছিল। তারাই আবার আক্রমণ করছে আফগানের নিরপরাধ মানুষের উপর। এরাই দুনিয়াজুড়ে স্বঘোষিত দারোগার মত ফেরাউনী আচরণ করে। আবার শান্তির দূত সেজে খোদ শয়তনা-প্রেত হয়ে দানবের বেশে আক্রমণ করে। একদিকে তারা সাপ হয়ে দুশমনি করে, অপরদিকে ওজা হয়ে ঝাড়ার ভান করে।'

বিগত একশ' বছরের পৃথিবীর এমন কোন রাজনৈতিক হত্যাকান্ড ঘটেনি, যেখানে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের হাত নেই। এমন কোন সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ঘটেনি, যেখানে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ ভাবে আমেরিকা জড়িত নয়। অথচ তারাই দুনিয়ার সকল সম্পদ লুণ্ঠন করছে। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসকে ছড়িয়ে দিয়েছে বিশ্বজুড়ে। খবরদারী করে জাতিসংঘসহ বিশ্বের সকল আন্তর্জাতিক ফোরামকে দখল করে রেখেছে; দুনিয়ার সমস্ত শাসকদের উপর সৃষ্টি করে রেখেছে এমন এক ধরনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক চাপ, যার কাছে নতি স্বীকার করে টিকে আছে অনুগত রাষ্ট্রের শাসকরা। আমেরিকা হচ্ছে সেই রাষ্ট্র, যাদের জন্মটাই আজন্ম পাপের ওপর, দস্যুবৃত্তি ও সন্ত্রাসের ওপর, জবর-দখল ও হত্যা-লুণ্ঠনের মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদী নীতি বাস্তবায়নের ওপর।

এই শয়তানী চক্র ও দাজ্জাল পৃথিবীর জনপদগুলোকে তাদের চরণভূমি বিবেচনা করছে। সমগ্র মানুষকে ভাবছে দাস আর রাষ্ট্রগুলোর শাসকদের ভাবছে ক্রীড়নক। আমাদের সম্পদকে লুণ্ঠন করছে দস্যুর মত। মানুষের উপর চাপাচ্ছে স্নায়ু, রাসায়নিক ও আণবিক যুদ্ধ। একইভাবে তারা উম্মাহর হৃদপিন্ড মক্কা-মদীনা-বায়তুল মোকাদ্দাসকে আজদাহার মত ছোবলের মধ্যে রেখেছে। সৌদি আরবকে অক্টোপাসের মত গিলে ধরে আছে। মার্কিন অস্ত্র বাজার চাঙ্গা রাখার জন্য আমেরিকা আরব, ইসরাইল, চেচনিয়া, বলকান, সুদান, কুর্দী, কাশ্মীর, আফগান, আরাকান, মিন্দানাও, বসনিয়া, সবশেষ ইরাক

সংকটের স্থায়ী রূপ দিতে চায়। আমেরিকা বিশ্বজুড়ে একক আধিপত্য বিস্তার করেও সন্তুষ্ট হতে পারছে না। সে বিশ্বকে মুষ্টিবদ্ধ করে রাখতে চায়। একাই সব গিলে খেতে চায়। এদের মত প্রতারক, শঠ, নিষ্ঠুর-পাষন্ড ও মিথ্যুকে অবয়বে, অন্যকোন সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ইতিপূর্বে বিশ্বের ইতিহাসে আবির্ভূত হয়নি।'

এসকল কথা ভাবতে ভাবতে মেজর সাহেব স্বগোতুক্তি করলেন 'হে আমাদের পবিত্র ইরাক! আমরা তোমার পবিত্রতাকে পাপিষ্ঠ জালিমের বিষাক্ত-অপবিত্র নখরের ছোবল থেকে রক্ষা করতে পারলাম না। তুমি আমাদের ক্ষাম করো, আমরা তোমার অযোগ্য সন্তান। তবে এই বেদনার মুহূর্তে তোমাকে একটি আনন্দের সংবাদও জানিয়ে দেই–তোমার এই অপমান আমরা অবনত মস্তকে মেনে নেবোনা। আমরা এর প্রতিশোধ নেবোই নেবো। হানাদার গোষ্ঠীকে এক মুহূর্তের জন্য স্বস্তিতে নিঃশ্বাস ফেলতে দিব না। ওদেরকে মেরে, প্যাকেট করে সাত সমুদ্রের ওপর পাঠিয়ে দিয়ে, তোমার ঐতিহ্যমন্ডিত মস্তকে আবার পড়িয়ে দিব খেলাফতের সেই সুষমাংকিত রাজতোরণ। এক্ষেত্রে তোমার কাছে আমাদের চাওয়া, আমাদেরকে আর একটি সালাহুদ্দীন আইয়ুবী দান করো। আর একজন নূরুদ্দীন জঙ্গী উপহার দাও।' এই বলে তিনি ঈগলকে জিজ্ঞেস করলেন 'ঈগল! তুমি তো রণাঙ্গনে ছিলে, আমাকে একটু শুনাও তো কি প্রকারে হানাদাররা বাগদাদের পতন ঘটালো আর এখন শহরের অবস্থাইবা কেমন? প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম, তার সাধের রিপাবলিকান গার্ড-ফেদাইন মিলিশিয়া এবং সেনাবাহিনী ও আমাদের স্পেশাল ফোর্স এখন কোথায় কি অবস্থায় আছে? আরব ও অন্যান্য দেশ থেকে আগত স্বেচ্ছাসেবক মুজাহিদরাই বা এখন কি করছে?

মেজর সাহেবের এসকল প্রশ্নের এক এক করে উত্তর দিতে লাগল ঈগল'–ফুফাজান অবশেষে ইঙ্গ-মার্কিন জোট, প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি এবং ইসলামী দুনিয়ার সাবেক খেলাফতের কেন্দ্রভূমি, বাগদাদ তথা ইরাককে দখল করে নিল। তবে তা যুদ্ধ করে নয়, প্রতারণা করে, গাদ্দার-মোনাফেকের সহায়তায়। প্রেসিডেন্ট সাদ্দামের অতি আদরের রিপাবলিকান গার্ড ও ফেদাইন কমান্ডারদের বিশ্বাস ঘাতকতাই বাগদাদের পতনকে ত্বরান্বিত করেছে।

যেখানে হানাদাররা অন্যান্য শহরে ১৫/১৬ দিন যুদ্ধ করেও তা দখল করতে পারলোনা, সেখানে মাত্র ক' দিনের মধ্যে বিনা প্রতিরোধে আগ্রাসী মার্কিন বাহিনী বাগদাদ দখল করে ফেলল। এর পেছনে রয়েছে চঞ্চল্যকর রহস্য। আমরা ভেবেছিলাম বাগদাদ দখলের সময় মার্কিনীরা প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হবে। বাগদাদের সদর দরজায় হবে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ, উভয় পক্ষের হাজার হাজার লাশের স্তূপ পরে যাবে। বাস্তবে হতোও তাই। কেননা বাগদাদের সৈন্যদের সাথে যোগ দিয়েছিল বিদেশী সেচ্ছাসেবক মুজাহিদ বাহিনী এবং সাধারণ নাগরিকগণ; তাতো আপনিও জানেন। এই সম্মিলিত প্রতিরোধ ব্যূহটি এতই মজবুত হয়েছিল যে, সে ব্যূহ ভাংগতে মার্কিন বাহিনীকে অবশ্যই কঠিন লড়াই লড়তে হতো। কিন্তু...। বলে ঈগল চুপ হয়ে গেল।

'কিন্তু কি ঈগল?' প্রশ্ন সালমানের। তুমি খুলে বল, কি কারণে এত সুন্দর মজবুত, যৌথ প্রতিরোধ ব্যুহটি বাগদাদের হেফাযতের কাজ আঞ্জাম দিতে ব্যর্থ হল?'

'তা এজন্য যে, রাতের আধারে কোটি কোটি ডলারের বিনিময়ে চুক্তির মাধ্যমে রিপাবলিকান গার্ড ও ফেদাইন কমান্ডারগণ ইরাকের স্বাধীনতা বিকিয়ে দিল বিদেশী প্রভুদের হাতে' –বলল ঈগল– 'তাছাড়া সেনাবাহিনীর কিছু কিছু স্বার্থবাদী-গাদ্দারও মার্কিনীদের কাছে নিজেদের দেশ ও ঈমান বিক্রি করে দিয়েছে। যে কারণে সাধারণ জনগণ, স্বেচ্ছাসেবক মুজাহিদ বাহিনী এবং স্পেশাল বাহিনীর নওযোয়ানরা মনবল হারিয়ে ফেলে। শক্তিশালী প্রতিরোধ ব্যুহটি নিমিষেই ফুটো বেলুনের মত চুপষে যায়। প্রতিরোধের সব আয়োজন ধুলিসাৎ হয়ে যায়।

ভোরের আলো ফোটার পর দেখা গেল, রিপাবলিকান গার্ড, ফেদাইন মিলিশিয়া ও সেনাবাহিনীর এক বিরাট অংশ ময়দান থেকে উধাও, এ অবস্থায় ময়দানের অন্যান্যরা পিছু সরে আসতে বাধ্য হয়। ফলে মার্কিন বাহিনী এক প্রকার বিনা বাধায়ই বাগদাদ দখল করে নেয়। বাগদাদের উপর প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম এর প্রশাসনের আর কোন নিয়ন্ত্রণ নেই।

যা ঘটবার তাই ঘটেছে। অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিমান শক্তি ব্যবহার করে উম কসর, নাজাফ, কারবালা এবং বসরায় গণহত্যা চালিয়ে, বাগদাদে অসংখ্য বেসামরিক নাগরিকসহ ১০-১৫ জন সাংবাদিককে খুন করে হানাদার মার্কিন বাহিনী বাগদাদে প্রবেশ করেছে। বাগদাদে প্রবেশ করার কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তাদের দখলদারী চরিত্র এবং বাগদাদের লাখ লাখ মানুষের জনসমর্থনহীনতা উৎকটভাবে প্রকাশ পেয়েছে। কিছু লোক ভাড়া করেও হানাদার বাহিনীর দখলদার এবং লুটেরা চরিত্র ঢেকে রাখা সম্ভব হয়নি। শহরের লুটেরা ডাকু ও মাস্তান চরিত্রের কিছু লোককে চুরি-ডাকাতি এবং লুটপাটের ওপেন জেনারেল লাইসেন্স দিয়েছে হানাদাররা। পাশবিক শক্তি নিয়ে বাগদাদে প্রবেশ করার পূর্বেই তাদের মনে ছিল ঘৃণ্য দুরভিসন্ধি। বাগদাদে তারা যেসব অপকর্ম করবে সেসব অপকর্ম যেন দুনিয়াবাসী দেখতে না পারে তার জন্য আগের দিন থেকেই তারা বাগদাদে অবস্থিত বিভিন্ন টেলিভিশন কেন্দ্রগুলোতে হামলা চালাতে শুরু করে।

কিন্তু সত্যকে চিরদিন চেপে রাখা যায় না। সিএনএন, বিবিসি নির্লজ্জভাবে দালালী করে মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করলেও এবং আবুধাবী ও আল-জাজিরা টিভি সম্প্রচার বন্ধ করতে বাধ্য হলেও পাকিস্তানের 'জিও টিভি' তাদের সীমাবদ্ধ শক্তি নিয়ে, সারাক্ষণ তাদের ক্যামেরা বাগদাদের কয়েকটি রাস্তার ওপর নিবন্ধ রেখেছিল। এর মাধ্যমে বিশ্ববাসী দেখতে পেয়েছে, মার্কিন বাহিনী হাতে গোনা কয়েকজন লোককে ট্যাংক ও সাজোয়া যানের ছত্রছায়ায় লুটপাট করতে সাহায্য করছে। এর আড়ালে তারা নিজেদের অপকর্মের দৃশ্যকে ঢেকে ফেলার চেষ্টা করছে।

মার্কিন সৈন্যরা শহরের বাড়ি-ঘরে ঢুকে মা-বোনদের ইজ্জত হরণ করছে। এ কাজে বাধাপ্রাপ্ত হলে বাড়ী-ঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে। এরকমই এক ঘটনায় আজ আমি ধরা পড়তে

গেছিলাম। শহরের গোলচত্বরের পাশে রাহাদের বাসা। তাদের বাসার পূর্ব পার্শ্বে হাদীদ কামালের বাসা। হাদীদ কামাল একজন দেশপ্রেমিক মুজাহিদ। আমার বন্ধু মানুষ। আমি তখন তাঁর বাসায় অবস্থান করছিলাম। হঠাৎ পাশের বাসার ছোট্ট ছেলে, নয় বছর বয়স্ক রাহাদ দৌড়ে হাদীদের বাসায় আসল। সে হাফাতেও ছিল। হাদীদ তাকে কোলে নিয়ে আদর করে বলল, কি হয়েছে রাহাদ, তুমি হাফাচ্ছো কেন ভাইয়া?'

ততক্ষণে রাহাদ হাউমাউ করে কেঁদে দিল এবং কান্নাজড়িত কণ্ঠেই বলল, "ভাইয়া! আমেরিকার সৈন্যরা একটু পূর্বে আমাদের ঘরে প্রবেশ করে। ঘরে তখন ছিলাম আমি, আম্মু এবং আপু। সৈন্যরা আমাদেরকে একটি রুমের মধ্যে বসিয়ে রেখে বলল, এখান থেকে কেউ বের হবার চেষ্টা করবে না। এরপর তারা আমাদের ঘরের সমস্ত মালামাল লুট করতে লাগল। এমনকি থালা-বাটি, জগ-গ্লাস থেকে বাথরুমের বালতি-মগটি পর্যন্ত রেখে দিল না। খবর পেয়ে আব্বু ও ভাইয়া এসে তাদেরকে মালামালগুলো নিতে বাধা দিল। তখন সৈন্যরা আব্বু ও ভাইয়াকে মারতে শুরু করল। ভাইয়ার চিৎকার শুনে আমি, আম্মু এবং আপু দৌড়ে এলাম ঘর থেকে। আম্মু সৈনিকদের অনুরোধ করলেন, আব্বু এবং ভাইয়াকে ছেড়ে দেয়ার জন্য। আপুও অনেক অনুরোধ করে তাদেরকে। কিন্তু সৈন্যরা তাদের অনুরোধ না শুনে বরং আব্বু এবং ভাইয়াকে তারের খুটির সাথে বেঁধে রেখে, আম্মু এবং আপুকে গাড়িতে তুলে নিয়েছে।" এতটুকু বলে রাহাদ আরও জোরে কান্নাজুরে দিল।

রাহাদের মুখে একথা শুনে হাদীদ আমাকে বলল, 'ঈগল" জলদি চল ওদেরকে বাঁচাতে হবে মার্কিনী দানবদের হাত থেকে। আমরা দ্রুত চলে এলাম রাহাদদের আঙ্গিনায়। কিন্তু সেখানে এসে যে দৃশ্য দেখলাম তাতে আমার পা'র রক্ত মাথায় উঠে গেল। রাহাদের পিতা ও ভাই লাশ হয়ে ঝুলে আছে তারের খুটির সাথে। তাদের বাড়িটিতে জ্বলছে লেলিহান অগ্নিশিখা। বাড়ির সামনে পড়ে আছে রাহাদের আম্মু এবং বোনের বিবস্ত্র লাশ। রাহাদ তার আম্মুর লাশের কাছে বসে এমন কান্না শুরু করল, সে কান্না দেখলে পাথর ফেটেও অশ্রু ঝড়ে। গলে যায় কঠিন হৃদয়সম্পন্ন মানুষের মন, কিন্তু গলে না বা আচম্বিত হয় না বুশ নামের ওই জংলী প্রাণীটির এবং ওর সাঙ্গ-পাঙ্গ শয়তানগুলোর।

হাদিদ দৌড় দিয়ে তাঁর ঘরে চলে গেল। ঘর থেকে দু'টি কাপড় এনে লাশগুলো এক জায়গায় রেখে ঢেকে দিতে লাগল। আমিও তাকে সহযোগীতা করলাম। এরই মধ্যে সেই সৈন্যরা আমাদের অতিক্রম করে যাচ্ছিল লুটপাট করবে বলে। হয়তো অন্য কোন বাড়িতে আমাদেরকে লাশের কাছে দেখে গাড়ি থামাল। তা দেখে আমি সাথে সাথে গাড়ির দিকে এগুলাম। আমাকে গাড়ির নিকট আসতে দেখে দু'জন সৈন্য গাড়ি থেকে নেমে এলো। আমি তাদের জিজ্ঞেস করলাম, তোমরা এই নিষ্পাপ শিশুটিকে অসহায় এতিম করে কি লাভ পেলে? আমার কথায় তারা হো হো করে হেসে উঠল। হাদিদ

চিৎকার দিয়ে বলল, 'ঈগল! আজ ওদের একজনকেও ছাড়া যাবে না।' এই বলেই সে দৌড়ে এসে এক সৈনিকের মুখে কষে এক ঘুষি লাগালো। তা দেখে সাথের সৈনিকটি ভ্যাবাচ্যাগা খেয়ে গেল। গাড়ির মধ্যে থেকে কমান্ডার বলল, ও যদি 'বাগদাদের ঈগল' হয়, তবে ওকে গ্রেফতার করে গাড়িতে উঠাও। সম্ভবত, আমার সম্বন্ধে তারা তথ্য পেয়েছিল যে, আমি তাদের নয় বরং ইরাকী বাহিনীর সহযোগী। হাদীদের ঘুশি খাওয়া সৈনিকটি আমাকে গ্রেফতার করতে অগ্রসর হল। আমি তাকে ধরে জাগিয়ে দিলাম এক আছাড়। এই সৈনিকটির বেহাল অবস্থা দেখে, অন্য সৈন্যরা দ্রুতগাড়ী থেকে নেমে এলো। তাদের সাথে আমাদের দু'জনের রীতিমত হাতাহাতি লড়াই শুরু হয়ে গেল। সে এক উপভোগ্য দৃশ্য ছিল।

আমি আশ্চার্য হয়ে গেলাম মার্কিন সৈন্যদের অবস্থা দেখে। তারা এত ভীত এবং কাপুরুষ যে,৮-১০ জন সৈনিক আমাদের দু'জনের সাথে পেরে উঠল না। ওরা শুধু বিমান আর অত্যাধুনিক যুদ্ধ সরঞ্জামের ওপরই নির্ভরশীল। এমন বিড়ালের ছানাগুলি নিয়ে আবার আমেরিকা পররাজ্য দখলের অভিযানে নালম, যা দেখলে আসলেই হাসি পায় হাতাহাতির এক পর্যায়ে হাদীদ মার্কিন সৈন্যদের দু'জনকে টেনে নিয়ে রাহাদদের ঘরের জ্বলন্ত আগুনের মধ্যে ফেলল। সে দুইটা ওখানেই পুরে খাক হলো। মার্কিন সৈন্যরা তখন যেন গুলি করতে ভুলেই গিয়েছিল। আমি হত্যা করলাম একটাকে গলা টিপে। অন্য একটির পিঠে বসিয়ে দিলাম বেয়নেটের মাথা। এসময় হাদিদ চিৎকার দিয়ে বলল, ঈগল তুমি এখান থেকে পালাও, আমি একাই এদের শায়েস্তা করছি। আমি তার কথায় কর্ণপাত না করে লড়াই করতে থাকলাম। কিন্তু সে আঁমাকে কসম দিয়ে বলল, ঈগল! আল্লাহর দোহাই তুমি নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাও! আমার চিন্তা করনা। আমি শহীদ হওয়ার কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। তোমাকে বাগদাদের স্বার্থেই বেঁচে থাকতে হবে। তুমি এখান থেকে পালিয়ে যাও ঈগল।'

হাদিদের একথা শুনে লড়াইরত অবস্থায়ই আমি তার দিকে তাকালাম, দেখলাম এক সৈনিক তার বুক বরাবর বেয়নেটের আঘাত বসিয়েছে। রক্তে তার শরীর ভিজে গেছে। তবুও সে লড়াই বন্ধ করেনি। এদিকে মার্কিন কমান্ডার সৈন্যদের নির্দেশ দিল, আমাকে জীবিত ধরার জন্য। তাই আমি হাদিদের অন্তিম ইচ্ছা পূরণ এবং অন্যান্য দিক চিন্তা করে, হাতে ধরা সৈন্যটিকে জাগিয়ে গাড়ির দরজায় বসে থাকা কমান্ডারের মাথার উপর নিক্ষেপ করে দিলাম দৌঁড়। আমার বিশ্বাস ছিল, ওরা দৌঁড়িয়ে আমাকে ধরতে পারবে না। আর যদি গুলি ছুড়ে সে জন্য দৌড়াচ্ছিলাম বাসাবাড়ির মধ্যে দিয়ে। একটা ঘরে ঢুকতে যাবো, এরই মধ্যে পিছনে তাকিয়ে দেখি চারজন সৈন্য তেড়ে আসছে এদিকে। তাই ঘরে না ঢুকে পুনরায় দৌড়াতে লাগলাম, আর মনে মনে আল্লাহর সাহায্য কামনা করতে থাকলাম।

ঠিক সে মুহূর্তেই সালমান ভাই ও প্রিয় বোন রুকাইয়া গাড়ি নিয়ে আল্লাহর সাহায্য হয়ে,' আমাকে উদ্ধার করে।'

'আল্লাহর শুকুর যে, তিনি তোমাকে বাঁচিয়ে এনেছেন–বললেন মেজর সাহেব–তুমি তাড়াতাড়ি আমাকে অন্যান্য অবস্থার বর্ণনা দাও। তোমাকে একটি জরুরী কাজে পাঠাবো আমি। এক্ষুণি তোমাকে যেতে হবে সেখানে।'

'আমি বলছিলাম, বাগদাদ ইতিপূর্বেও বহুবার আকান্ত হয়েছে–বলল ঈগল– কিন্তু হালাকু খানের পর বাগদাদ এতবেশী অপদস্ত হয়নি। মার্কিনীরা ইরাকের সার্বভৌমত্বের প্রতীক মহান আল্লাহর নামাংকিত পতাকাকে অবনমিত করে ফেলেছে তার বদলে ইরাকের বুকে উড়িয়েছে সারাবিশ্বের মজলুম মানুষের রক্তচোষা আমেরিকার সেই অপবিত্র পতাকা। ট্যাঙ্কের চাকায় পিষ্ঠ করল হাজারো সাজানো বাগান। জালিয়ে দিল 'বায়তুল হিকমাহ'। বাগদাদের প্রতিষ্ঠাতা খলিফা আল মনসুরের অমর কীর্তির বুকের ওপর অগ্নিসংযোগ করল মুর্খের সৈন্যরা। ভস্মিভূত হলো প্রাচীন পুস্তকের সংগ্রহশালা, হাজার হাজার বছরের সভ্যতা ও শিল্পকলার ইতিহাস, মানব সভ্যতার বিরল দলিল। এমনকি ছাই হয়ে গেল বিশ্ববিশ্রুত কুরআন লাইব্রেরী। রক্তের সঙ্গে সেই ভস্মরাশি বাগদাদের আকাশ আচ্ছন্ন করে পতিত হল দজলার পানিতে। একবিংশ শতকের সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতার ধারক পরদেশ দখলকারী মার্কিন বাহিনীর এই নির্মম অগ্নিসংযোগের ভয়ংকর দৃশ্য দেখে ইতিহাসের কুখ্যাত খলনায়ক হালাকু খানের পুনরাবির্ভাবের আতংকে শিহরিত আজ বাগদাদ নগরবাসী। ত্রয়োদশ শতকে বাগদাদ অভিযানে এসে আজকের হানাদার মার্কিন বাহিনীর মতই নির্বিচারে গণহত্যা চালিয়েছিল, তারা পুড়িয়ে ভস্ম করে দিয়েছিল বাগদাদের বিশ্বখ্যাত গ্রন্থাগার। একইভাবে মার্কিন বাহিনীও বেপরোয়া গণহত্যার পর এখন আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে প্রাচীন সভ্যতার স্মৃতিবাহী ঐতিহাসিক নগরী বাগদাদের সমৃদ্ধ স্থাপনগুলো।

মার্কিন সৈন্যদের নির্দয় ধ্বংসযজ্ঞ এবং নির্লজ্জ লুটপাটে সাধারণ মানুষ তো সর্বস্ব হারাচ্ছেই এমনকি হাসপাতালগুলোও রেহাই পাচ্ছেনা। ঔষধপত্র, এক্স-রে মেশিন, রোগীদের বিছানাপত্র সবই লুট হচ্ছে। সরকারী ভবন ও সম্পদগুলো গণিমতের মাল হিসেবে গণ্য করা হচ্ছে। প্রতিটি পরিবারের নারী-শিশুসহ প্রত্যেকে তাদের যা কিছু আছে সেগুলো গাধার পিঠে চাপিয়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিচ্ছে। দজলা নদীর পশ্চিম তীরে লুটেরারা আল-সালাম প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের দেয়াল থেকে মার্বেল পাথরগুলো পর্যন্ত খুলে নিয়ে গেছে। কৃষি মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য না জ্বালানো সরকারী স্থাপনা ভাঙচুর করা হয়েছে। শহরের ফিলিস্তিন স্ট্রীটে একটি সামরিক ইন্সটিটিউটে লুটপাট শেষে আগুন ধরিয়ে দেয়া হচ্ছে। বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়েছে বিদ্যুৎ ও পানির লাইন। আলোকিত বাগদাদ এবং অন্যান্য অনেক শহর এখন বিদ্যুৎ বিহীন, ভুতুড়ে নগরী। পানির অভাবে ছটফট করছে শহরের বাসিন্দারা। বিশেষ করে শিশুদের অবস্থা খুবই শোচনীয়। দেখা গেছে মার্কিনীদের বোমার আঘাতে বিশাল গর্ত হয়ে পানি উঠেছে, আর পিপাসা কাতর অবুঝ শিশুরা সেই বিষাক্ত পানি পান করে তাদের পিপাসা মিটানোর চেষ্টা করছে। এ যেন নব্য ইয়াযীদ গোষ্ঠী

আগমণ করেছে ইরাকে। ওরা শহরের পানির রিজার্ভারগুলো বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়েছে। বোমা মেরেছে খাদ্যগুদামগুলোতেও।

'ভাইয়া! তুমি এ অবস্থার বিবরণ আর দিওনা–কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলল রুকাইয়া–আমি নিজ চোখে যা দেখেছি এবং তুমি যা বলেছো তাতেই অনুমান করতে পারছি, কি পরিমাণ নৃশংসতা ইরাক বাসীদের ওপর চালাচ্ছে ওরা। আব্বাজানও এতেই বুঝতে পেরেছেন। তুমি আমাদের বল, সাদ্দাম প্রশাসন এবং বিদেশী সেচ্ছাসেবক মুজাহিদ ভাইদের হালত কি?'

'হ্যাঁ বোন! আজ প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন পালিয়েছেন তার সাধের বালাখানা আর বিলাশবহুল প্রাসাদ-অট্টালিকা ছেড়ে। তিনি কোথায়? তিনি কি জীবিত না মৃত তা বলা কঠিন' –বলতে লাগল ঈগল– 'হয়তো তিনি কোন বাংকারে আত্মগোপন করে আছেন বা রাতের আধারে বাগদাদ ছেড়ে অন্যকোন শহরে চলে গেছেন। তার মত আর মন্ত্রীপরিষদের সদস্যরাও প্রেসিডেন্ট ভবন ছেড়ে নিরুদ্দেশ আত্মগোপন করেছেন।

সাদ্দামের অতি সাধের রিপাবলিকান গার্ড ও ফেদাইন মিলিশিয়ারা তাকে শত্রুর কবলে রেখে, ভেগে গেছে দেশ-জাতি এমনকি তার সাথেও গাদ্দারী করে। হায়! মানুষ এত নিমক হারাম হতে পারে? আর তা হবেই না বা কেন? সাদ্দাম যদি রিপাবলিকান গার্ড ও ফেদাইনদেরকে তার নিজের জন্য আত্ম উৎসর্গী না বানিয়ে, ইসলামী আদর্শে উজ্জীবিত করে শাহাদাতের জযবায় গড়ে তুলতে পারতো, তাহলে অর্থের বিনিময়ে তারা বিদেশী হানাদারদের কাছে দেশের স্বাধীনতা বিকিয়ে দিত না। যেমন আমেরিকা কোটি কোটি কড়কড়ে ডলারের প্রলোভন দেখিয়ে আফগানিস্তানের যুদ্ধের সময় তালেবানদের হাত করতে পারেনি। মার্কিন বিমান হামলার মুখে যদিও তালেবান মুজাহিদরা টিকে থাকতে পারেনি, তবুও জীবনের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে মুকাবেলা করে গেছেন ও যাচ্ছেন। ভবিষ্যতেও তালেবানদের হাতে আমেরিকা নাজেহাল হতে থাকবে। কারণ তালেবানরা লড়াই করে জীবন দেয় একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। আর যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মারে এবং মরে, তারা জয়-পরাজয়ের পরোয়া না করে লড়াই করে যায় নিঃস্বার্থভাবে। একান্তই শাহাদাতের তামান্না বুকে লালন করে।

মার্কিন বাহিনী রাজধানীর কেন্দ্রীয় এলাকায় দখল প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলেও মনসুর এলাকাসহ নগরীর বহু এলাকা এখনো তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে রয়ে গেছে। দজলার পশ্চিম তীরে বাগদাদের বেশ কয়েকটি এলাকা নিয়ন্ত্রণ করছে আরব যোদ্ধারা। মার্কিন সৈন্যরা তাদের অবস্থান লক্ষ্য করে কয়েক দফা বোমা বর্ষণও করেছে। *মুসলিম ভ্রাতৃত্বের টানে মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ এবং অন্যান্য মুসলিম দেশ থেকে শত-সহস্র যুবক-তরুণ যারা হানাদার ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করা রজন্য ইরাকে এসেছিল; বাগদাদের পতন এবং ইরাকী নেতৃবৃন্দের আত্মগোপনের পর তাদের একটি বড় অংশ হতাশাও ভগ্নহৃদয় নিয়ে দেশে....

ঈগলের কথা শেষ করতে না দিয়ে রুকাইয়া বলল, 'তারা স্ব স্ব দেশে ফিরে যাচ্ছে এইতো বলবে! কিন্তু তুমিতো সেদিন তাদেরকে একত্রিত করে, সংগঠিত করার মিশন নিয়ে আমাদের এখান থেকে বেড়িয়েছিলে। তোমার মিশন কি তবে ব্যর্থ হল ঈগল ভাইয়া?

'আমার মিশন ব্যর্থ হয়নি বোন'-বলল ঈগল স্বেচ্ছাসেবক মুজাহিদ ভাইয়েরা একদিকে যেমন জিহাদে জীবন উৎসর্গ করতে না পারার জন্য ক্ষুব্ধ, তেমনি ইরাকী শিয়া সম্প্রদায় ও কুর্দীদের আচরণও তাদের ক্ষোভের অন্যতম কারণ। তাদেরকে যখন আমি বলেছি বুঝিয়েছি সাদ্দাম প্রশাসনের ব্যবহারে তোমরা...। তখন তারা বিষয়টি বুঝেছে এবং মেনে নিয়েছে। তাঁরা যার যা হাতিয়ার ছিল তা দিয়েই শত্রুর মোকাবেলা করে যাচ্ছিল। কিন্তু তার ওপর তাদেরকে মার্কিন বাহিনী এবং এই দুই শ্রেণীর ইরাকী জনগণ, উভয়ের মোকাবেলা করতে হয়েছে। পেছন থেকে এই ইরাকীরা আর সামনে থেকে মার্কিন বাহিনী উভয়ই তাদের ওপর একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ে, এতে স্বেচ্ছাসেবক মুজাহিদরা ক্ষোভে ফেটে পড়ে। তারা দেশে ফিরে যেতে থাকে। তাদের বক্তব্য–আমরা বাগদাদ তথা ইরাক রক্ষার জন্য শত বাধা, শত প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা উপেক্ষা করে এসেছিলাম। অথচ ইরাকী নেতৃবৃন্দ আমাদের অস্ত্রশস্ত্র দেয়ার পরিবর্তে মানবঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে, উপরন্তু খোদ ইরাকীরাই আমাদের ওপর হামলা করছে এবং আমাদেরকে যুদ্ধ ছেড়ে-ইরাক ছেড়ে বাড়ি ফিরে যেতে চাপ সৃষ্টি করছে সুতরাং এ কারণেই আমরা বাড়ি ফিরে যাচ্ছি।'

ঈগলের মুখে একথা শুনে মেজর আসাদুল্লাহ সাহেব যেন ইরাকের ভবিষ্যৎ অন্ধকার দেখতে লাগলেন। এমন অন্ধকার যেখানে কখনও আলো জ্বলার ক্ষীণ সম্ভাবনাও নেই। তিনি আশাহতভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'তবে কি সমস্ত স্বেচ্ছাসেবক মুজাহিদরা ইরাক তাগ করেছে ঈগল?'

'জিনা, ফুফাজান! সকলেই চলে যায়নি'–বলল ঈগল–'আর তা আল্লাহর খাছ মেহেরবাণী এবং বর্তমান বিশ্বে মুসলমানদের হৃদয়ে আশার আলো প্রজ্জলনকারী শায়খ ওসামান বিন লাদেনের একটি ঘোষণা কারণে। তিনি ইঙ্গ-মার্কিন হানাদারদের ওপর আত্মঘাতী হামলা চালাতে স্বেচ্ছাসেবক মুজাহিদদের এবং সমস্ত মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছেন। তাই বিপুল সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবক মুজাহিদ দজলার পশ্চিম তীরে অবস্থান নিয়ে প্রতিরোধ লড়াই করে যাচ্ছে।

আরও আশা এবং খুশীর সংবাদ হলো, ইতিমধ্যে শায়খ ওসামা বিন লাদেনের প্রতিনিধি ইরাক এসে পৌঁছে গেছেন। তার নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবক আরব মুজাহিদ এবং অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবক মুজাহিদরা আত্মঘাতি হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

এদিকে বাগদাদের নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দিয়ে ইরাকী বাহিনীর দেশ প্রেমিক সৈনিকরা উত্তর ইরাকের তিকরিত এবং ইরাকের তৃতীয় বৃহত্তম শহর মসুলে জড়ো হয়ে প্রতিরোধ যুদ্ধের

জন্য জোর প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানা গেছে। আর স্পেশাল ফোর্স অধিকাংশই বাগদাদের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করছে। তারা সাধারণ ইরাকী জনগণের সাথে মিশে গেছে। মাঝে মাঝে সুযোগ পেলেই হানাদারদের ঘায়েল করছে।'

বাগদাদের ঈগল এ পর্যন্ত বলে তার আলোচনায় ক্ষান্ত দিল। মেজর সাহেব তাকে বললেন, 'ঈগল! বাগদাদের পতন হয়েছে। ইরাক এখন মার্কিনী শকুনীর ছোবলে রক্তাক্ত। এটা আমাদের দুর্ভাগ্য। কিন্তু তাই বলে আমাদের নির্জীব বসে থাকা চলবে না। বাগদাদের পতনের পরও তুমি যে আশার নতুন বাণী শুনালে, সে আলো জ্বালতে হলে প্রদ্বীপের সলতে তৈলের যোগান দিতে হবে পর্যাপ্ত পরিমাণে। নয়তো হানাদারদের বিষাক্ত নিঃশ্বাসে নিভে যাবে সে আলোর মশাল। বিন লাদেনের যে প্রতিনিধি এসেছে আমাদের সহযোগীতার জন্য, তার পরিপূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে আমাদেরকেই। সে লক্ষ্যে তোমাকে কাজ করতে হবে প্রাণচাঞ্চল্য নিয়ে আরও দ্রুত গতিতে।'

'আমি যে কোন অবস্থায়, যে কোন কঠিন কাজ করতে প্রস্তুত আছি ইনশাআল্লাহ! বলল ঈগল–আপনি বলুন আমাকে কি কাজ করতে হবে।'

'শাবাস ঈগল! বললেন মেজর সাহেব–আমি এরকম উত্তরের প্রত্যাশাই করেছিলাম তোমার নিকটে। তুমি এখন সরাসরি চলে যাবে কমান্ডার হাবিব বসরীর বাসায়। 'বালাদ রুজ-এর পাশেই তার বাসা। 'বায়তুল হাবিব' নামক পাঁচতলা বিল্ডিং। তার কাছে আমার চিঠি দিবে। সেখান থেকে চলে যাবে সীমান্ত এলাকায়। যে সমস্ত স্বেচ্ছাসেবক মুজাহিদ ইরাক ত্যাগ করছে তাদের ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। দজলার তীরে। বিন লাদের প্রতিনিধিকেও সংবাদ দিয়ে আসবে যদিও এ কাজে সময় একটু বেশী লাগবে এবং পরিশ্রমও হবে অনেক বেশী, তথাপি তাড়াতাড়ি করার চেষ্টা করবে। তোমার এই কাজটি এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মনে করতে পার, এর উপরই নির্ভর করছে ইরাকের ভবিষ্যৎ ভাগ্য। ইরাকের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব হানাদারদের কবল থেকে উদ্ধার করার মিশন এটি। এই নাও গাড়ির চাবি এবং হাবিবের চিঠি। যাও বেটা! তোমাকে আল্লাহর জিম্মায় ছেড়ে দিলাম। আল্লাহ হাফিজ।' সাথে সাথেই ঈগল উড়াল দিল ইরাকের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধারের এই গুরুত্বপূর্ণ মিশন সফল করতে।

* * *

বিকাল তিনটা। মেজর আসাদুল্লাহ সাহেবের বাংকারের বিশাল কক্ষে বসা পাঁচ পাচ জন তাগড়া নওযোজন। তাদের শিড়ায় খুন টগবগ করছে। গাম্ভীর্যের সাথে বসে আছে তারা। মেজর সাহেবও তাদের সম্মুখে বসা। এদের মধ্যে অন্যতম কমান্ডার হাবিব বসরী। শশ্রুমন্ডিত ৩০ বছর বয়স্ক এক দীপ্ত তরুণ সিপাহসালার। মেজর আসাদুল্লাহর আহত হবার পর বাগদাদের স্পেশাল ফোর্সের সিপাহসালার নিযুক্ত হয়েছিল এই যুবক।

কমান্ডার হাবিব বসরীর জন্ম যদিও বসরা নগরীতে কিন্তু এখন সে বাগদাদের স্থায়ী বাসিন্দা। তার পিতা বাগদাদের একজন প্রতিষ্ঠিত তৈল ব্যবসায়ী। বিশাল প্রজেক্ট তাঁর।

মাসে প্রায় কোটি দিনারের উপরে তার আয়। এমন ধনীর দুলাল কেন এলো সিপাহীর চাকরী করতে? তা এক জটিল প্রশ্নই বটে।

প্রশ্ন জটিল হলেও উত্তর অত্যন্ত সহজ। কেননা যে যুবক দেখেছে তার ভাইকে শত্রুর হাতে নির্মমভাবে খুন হতে। দেখেছে তার মা-বোনকে নির্যাতিত-অপমানিত হতে। তার দেশকে দেখেছে অচল পঙ্গু হয়ে যেতে। সে যে বিবেকের তারনায় অস্ত্র হাতে তুলে নিবে, এটা অত্যন্ত সহজ বিষয়। এর বিপরীতে যদি সে, নিজ দেশকে শত্রু কবলিত দেখে, আপন মা-বোন-ভাইয়ের বেইজ্জতী, বেহুরমতী এবং নৃসংশ হত্যাযজ্ঞ স্বচক্ষে অবলোকন করেও নির্জীব-নিথর হয়ে বসে থাকে। অস্ত্র হাতে তুলে না নেয়, প্রতিশোধ নিতে অগ্রসর না হয়, তবে এটাকেই বলতে হবে জটিল ব্যাপার অস্বাভাবিক ঘটনা।

কমান্ডার হাবিবের সিপাহীর জিন্দেগী বেছে নেয়ার পশ্চাতে আছে এরকম মর্মান্তিক একটি ঘটনা! তাহল হাবিবেরা ছিল দুই ভাই। ছোট ভাইয়ের নাম ওসমান। বয়স ছয় বছর। অত্যন্ত শান্তশিষ্ট ও ভদ্র ছেলে ওসমান। গোলগাল চেহারার ছেলেটি কথা বলত খুবই মিষ্টি করে। তার কথা যে কেউ শুনলে মনে হত, সারাদিনই এই কচি খোকার ছোট্ট মুখের মিষ্টি কথা বসে বসে শুনি। ভাইয়ে ভাইয়ে ছিল যেন মানিক জোড়া। ওসমান ভাইকে ছাড়া খাবেনা, নাবে না এমনকি ঘুমাবেও না। হাবিবও ছোট ভাইকে ভালবাসত হৃদয় দিয়ে। আদরে, সোহাগে সবসময় জড়িয়ে রাখত প্রাণধিক প্রিয় ছোট ভাইটিকে। মোট কথা ভাইয়ে ভাইয়ে এমন হৃদ্যতা, এমন মধুর আকুলতা আসলেই খুব কম চোখে পড়ে।

১৯৯৫ সালের মার্চ মাসের কোন এক বিকালে ওসমান অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে খেলাধুলা করছিল তাদের বাড়ির আঙ্গিনায় বসে। এমন সময় উত্তর দিক থেকে একঝাক বিমান, প্রলংকরী গর্জন করে উড়ে আসলো। সেগুলো ইঙ্গ-মার্কিন যৌথ বাহিনীর বিমান, ছিল। ওসমান তার খেলার সাথী হাসানকে নিয়ে বিমান দেখে আনন্দে চেচামেচি শুরু করে ছিল। তাদের এ আনন্দ ধ্বনি নিমিষেই ম্লান হয়ে গেল হানাদার বাহনীর পৈচাশিক থাবায়। সহসাই বিমানগুলো থেকে বোমা বর্ষণ শুরু হল। এতে মুহূর্তের মধ্যে ঝড়ে গেল দু'টি আধফোটা গোলাপ কলি। ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল ওসমান ও তার খেলার সাথী হাসানের দেহ। ক্ষতিগ্রস্ত হল তাদের বাসাবাড়ি। শুধু তাদেরটাই নয়, আশপাশের বাড়ি-ঘর, দোকানপাট ও হল ধ্বংস-বিধ্বস্ত। নিহত হল আরও অনেকে। আহত হল অসংখ্য-অগণিত। মোটকথা মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যবধানে হাবিবদের এলাকটি ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল।

হাবিব কলেজ থেকে বাড়ি ফিরে এ দৃশ্য দেখে অত্যন্ত মর্মাহত হল। আদরের ছোট ভাইয়ের ছিন্নভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখে শোকে-দুঃখে পাথর হয়ে গেল। নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ভাইয়ের লাশের দিকে। তার চেতনা নাড়া দিয়ে উঠল। কেন এই বর্বরতা? কেন এই নৃশংসতা? কেন এই জুলুম? কি অপরাধ ছিল নিষ্পাপ এই শিশুদের? কেন

স্বাধীন-সার্বভৌম একটি দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এই পশু সুলভ আচরণ? তার মনে উত্থিত হওয়া এই প্রশ্নগুলোর কোন সদুত্তর পেল না সে।

হাবিব আরো দশজন ধনীর দুলালের মতই আয়েশী জীবন-যাপন করত। ছোট ভাই ওসমানের মৃত্যু তাকে বাস্তবতার মুখোমুখি এনে দাঁড় করিয়ে দিল। সে নিজেকে নিয়ে ভাবতে শুরু করল। তার ভাবনা তাকে ইতিহাসের কাঠগড়ায় নিয়ে দ্বার করালো। সেখানে সে দেখতে পেল তার জাতির বীর বাহাদুরদের দিক বিজয়ী সেই সৌর্য-বীর্য। তাদের হাতে গড়া সেই সুবিশাল সম্রাজ্য, যা ছিল পৃথিবী নামক গ্রহের অর্ধেকটা জুড়ে। কই তারাতো এত বিশাল সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে কখনও অন্যায়ভাবে কোন মানুষ খুন করেনি! অযথা কোন মানুষকে ভুলেও কষ্ট দেননি। শুধু শুধু কোন মায়ের বুকের আদরের ধনকে ছিনিয়ে নেননি! বরং জালিমের নির্যাতনের যাতা কলে নিষ্পিষ্ট মজলুম মানবতা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করত সেই মুক্তির দূতদের, শান্তির সেনাদের।

হাবিব আরো ভাবে সেই বীর সেনাদের বিশ্বজয়ী বীরদের সন্তান-সন্তুদিই তো আজ আমরা মার খাচ্ছি দেশে দেশে। কেন আমরা আজ মার খাচ্ছি এভাবে? সে নিজেই আবার এই প্রশ্নের উত্তর খুজে পেল, হ্যাঁ মার তো খাবই। আমরা তো আমাদের পূর্বসুরীদের পদাঙ্ক অনুস্মরণ করা ত্যাগ করেছি। সে কারণেই আজ এই দুর্দশা, এই লাঞ্ছনা আমাদেরকে অক্টোপাশের মত আঁকড়ে ধরেছে। এর থেকে মুক্তির একটাই মাত্র উপায় বা পথ তা হচ্ছে, পূর্ব সুরী সেই বীরদের পদাংক অনুস্মরণ করা। তাদের চলা পথে আমাদের চলা। এই ভাবনা থেকেই হাবিব সিপাহী হওয়ার অনুপ্রেরণা পায়। যোগ দেয় বাগদাদের স্পেশাল বাহিনীতে। নিজ যোগ্যতা বলে সে কিছুদিনের মধ্যেই একজন কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পায়।

মেজর আসাদুল্লাহ সাহেবের পাশে এসে বসল সালমান ও মুয়াজ মেজর সাহেব সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন–হে আমার প্রাণপ্রিয় সৈনিক ভাইয়েরা! আমি জানি তোমরা এখন অত্যন্ত দুশ্চিন্তা গ্রস্থ। তোমাদের মনের অবস্থা আমি বুঝি, সে জন্যই তোমাদেরকে আমি জরুরী ভিত্তিতে সংবাদ দিয়ে এনেছি। এ মুহূর্তে আমরা কি করতে পারি, কি আমাদের করণীয় তা বলার জন্যই তোমাদের এই তলব করা। যদিও এ মুহূর্ত বক্তৃতা দেয়া বা শোনার সময় নয়, তথাপি আমাদের দেশের স্বীনতা-সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধারের জন্য কিছুকথা অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে। বিশ্ব সভ্যতার মাঝে আমাদের ইরাক হচ্ছে প্রাচীন সভ্যতার দেশ। বর্তমান আধুনিক সভ্যতা ইরাকের কাছে চিরঋণী। কেননা ইরাকই হল প্রাচীন সভ্যতার পাদপীঠ। প্রাচীনকালেই এখানে গড়ে ওঠে সুমেরীয় ও ব্যবিলনীয় সভ্যতা। লিখন পদ্ধতি সর্বপ্রথম আবিষ্কার হয় এখানে। কৃষিকাজের সেচ ও গণিত চর্চাও এখানে প্রথম শুরু হয়। আমাদের গৌরাবান্বিত ইসলামী সালতানাতের কেন্দ্রীয় রাজধানী ছিল এই ইরাকেই।

তাই এ দেশ আমাদের। এদেশের নাগরিক হতে পেরে আমরা গর্ববোধ করি। এ দেশের মাটির নীচে ঘুমিয়ে আছেন অসংখ্য নবী-রাসূল, সাহাবায়ে কেরাম,

ওলি-আওলিয়াগণ। সুতরাং এ দেশের পবিত্র জমিন আমরা কারো দখলী হিসেবে দেখতে চাইনা। আমাদের শরীরে একবিন্দু রক্ত থাকতে আমরা সভ্যতার জননী, এই ইরাকের বেহুরমতী বরদাশত করব না। সে জন্য এই মুহূর্তেই আমাদের দীপ্ত কঠিন শপথে আবদ্ধ হতে হবে।

হে ইরাকী আত্মমর্যাদাবান নওয়োয়ানেরা! আমেরিকা ইরাকে হামলা করেছে তেল চুরি করার অসৎ উদ্দেশ্যে; কিন্তু তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে, ইরাকের এই তেল সম্পদ মহান রাব্বুল আলামিনের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি তাঁর এক বিশেষ দান। সুতরাং আল্লাহর এই নেয়ামতের যথাযথ হেফাযত করার দায়িত্বও তোমাদের।

যে জমিনে তোমরা বসবাস করছো, এই দেশ এই শহরও তোমাদের জন্য আল্লাহ তা'য়ালার এক বিশেষ দান। এই দান তোমরা পেয়েছো আকায়ে মদীনা, রাসূলে আরাবী (সাঃ)-এর একদল সিংহ হৃদয় সাহাবায়ে কেরামের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা, ত্যাগ ও কোরবাণীর বদৌলতে। তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন, রাসূলে খোদা (সাঃ)-এর বিখ্যাত সাহাবী, সেনাপতি সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রাঃ)। তাই তোমরা হচ্ছো সেই মহাবীব সাদ (রাঃ)-এর উত্তরসূরী।

অতএব তোমাদের কাছে আমার জিজ্ঞাসা এই যে, তোমরা কি এই পবিত্র মাটিতে ঘৃণ্য হানাদার মার্কিন বাহিনীর দাসত্ব মেনে নেবে, নাকি তোমাদের পূর্বসুরী সেনাপতি সা'দ বিন ওয়াক্কাসের পদাংক অনুস্বরণ করে এই দেশ এই মাটিকে অপবিত্র ফিরিঙ্গীদের দখল মুক্ত করতে দীপ্ত শপথ গ্রহণ করবে?'

মেজর সাহেবের এই প্রশ্নে সিপাহী খালেদ, যে কমান্ডার হাবিবের সাথে আগতদের একজন, সে গর্জে উঠে বলল, মেজর সাহেব! আমরা আরবী। আমরা ভুলে যাইনি আমাদের পূর্বসূরী সেই ওমর, আলী, হামজা, খালিদ, সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস, হুযায়ফতুল ইয়ামানী, হুসাইন রাজিআল্লাহু তায়ালা আনহুমদের বীরত্ব-সাহসিকতার কথা। আমাদের ধমনীতে এসকল বীর বাহাদুরদের রক্তধারা প্রবাহমান। আমরা মুহূর্তের জন্যও আমাদের এই পবিত্র ভূমিতে অবৈধ দখলদারদের উপস্থিতি মেনে নেবোনা। আপনি নির্দেশ করুন, আমরা যে কোন কঠিন থেকে কঠিনতর দায়িত্ব পালনের জন্য তৈরী আছি।' অন্যরাও সিপাহী খালেদের মতামতকে সমর্থন করল।

মেজর সাহেব তাদের উত্তরে সন্তোষ প্রকাশ করে বললেন, 'আমি তোমাদের থেকে এরকম প্রতিক্রিয়াই প্রত্যাশা করেছিলাম। আমাদের দেশ এখন এক দুষ্কৃতিকারী অসূরের দখলে। দেশকে এই অসূরের রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত করতে গেড়িলা লড়াই চালাতে হবে। আর সে জন্য প্রয়োজন আত্মত্যাগী মুজাহিদের। সেই মুজাহিদ সংগ্রহ করাই এখন তোমাদের প্রধান কাজ। তোমরা এই মুহূর্তে চলে যাবে শহরে। যে সমস্ত সৈনিক এখনও শহরে অবস্থান করছে তাদের এবং সে সমস্ত আত্মর্যাদা সম্পন্ন ইরাকীদের একত্রিত করবে

যারা দ্বীনের জন্য, দেশের জন্য সর্বোপরি আপন ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে গোলামী থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য আমরণ লড়াই করে যাবে নিঃস্বার্থভাবে। প্রয়োজনে আত্মঘাতি হামলা চালাতেও দ্বিধাবোধ করবে না।' এভাবে আরো কিছু জরুরী দিক নির্দেশনা ও পরামর্শ দিয়ে তাদের বিদায় করে দিলেন মেজর সাহেব।

পাঁচ

ইরাকের ইতিহাস ঘাত-প্রতিঘাতের ইতিহাস। কারবালার দুঃখজনক ঘটনা, তাতারীদের বর্বরতম হত্যাযজ্ঞ, বৃটিশ বেনিয়া গোষ্ঠীর আগ্রাসন, ইঙ্গ-মার্কিন যৌথ বাহিনীর প্রথম আক্রমণ সর্বশেস ২০০৩ সালে ইঙ্গ-মার্কিন যৌথ বাহিনীর ইরাক দখল। অতঃপর প্রতিটি শহরে কারবালার পৈচাশিক ঘটনার পুনরাবৃত্তি কাদাচ্ছে উম্মাহর সকল সদস্যকে। এ সকল বেদনা-কান্নার সদা সর্বক্ষণের সাক্ষী হয়ে প্রবাহিত হচ্ছে দজলা-ফোরাত নদী।

দজলা নদীর উৎসস্থল তুরস্কে। তবে বেশী অংশ প্রবাহিত ইরাকের ভূ-খন্ডে। ইরাকের উপর দিয়ে ১১৫০ মাইল বয়ে গিয়ে ফোরাতের সাথে মিশেছে। বাণিজ্যিক দিক থেকে ফোরাতের চেয়ে এর গুরুত্ব বেশী। দজলার রয়েছে দু'টি উপনদী-গ্রেট যাব ও লিটল যাব। নীলনদের অবদান যেমন মিসর, তেমন দজলার অবদান পৃথিবীর আদিম সভ্যতার পীঠস্থান মেসোপটেমিয়া তথা ইরাক। ঐতিহ্যবাহী মহানগরী বাগদাদ গড়ে ওঠার পিছনেও দজলার একই ভূমিকা। দজলার এক সময় ছিল উন্মত্তা। ভাসিয়ে নিয়ে যেত জনপদ, শস্যক্ষেত। একে বাগে আনতে গিয়েই প্রাচীন ইরাক অর্জন করেছিল নদী-শাসনের জ্ঞান ও নৌবিজ্ঞান। এখন আর দজলা আগের মত উত্তাল তরঙ্গ রঙ্গে দুইকুল ভাসাইয়া ফুলিয়া ফাঁপিয়া ছুটিয়া চলে না।

আজকের দজলা এক শান্ত-সুবোধ নদী। এরই কোল ঘেসে রচিত হয়েছে খেজুর ও ফলফলাদির এক মনোরম সুন্দর বাগান। বাগানের চতুর্দিকে উঁচু দেয়াল ঘেরা প্রাচীর। দেয়ালের উপর কাটা তারের মজবুত আচ্ছাদন। এ বাগান তৈরী হয়েছে অল্প ক'বছর আগে। অন্যান্য বাগান থেকে এ বাগানের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট এই যে, এটি শুধু বাগানই নয়, এর কোলে লুকায়িত আছে এক জীবন্ত রহস্য। যে রহস্য জানেনা বাগদাদের সাধারণ মানুষেরা।

বাগানের মধ্যবর্তীস্থলে বড় সড় একটি কুড়ে ঘর। বাগান পরিদর্শক দু'জন বয়স্ক লোক থাকেন এটিতে। কুড়ে ঘরের নীচ দিয়ে চলে গেছে চার চারটি সুরঙ্গ পথ। এখানে হলো সুরঙ্গের শেষ মাথা। এর শুরু শহরের কিছুটা ভিতরে কয়েকটি সাধারণ বাড়ি এবং সবচেয়ে দীর্ঘ সুরঙ্গ পথটির শুরুস্থল হচ্ছে মেজর আসাদুল্লাহ সাহেবের বাড়ির সেই বৃহৎ ব্যাংকার। এছাড়া অন্য বাড়ি তিনটি সাধারণ এবং নিম্নমানের হলেও এর প্রত্যেকটিতে রয়েছে বড় মাপের একাধিক ব্যাংকার। নল খাগড়ায় পরিপূর্ণ দজলা নদীর তীরে এ ধরনের

আরও বহু ভূগর্ভস্থ ব্যাংকার রয়েছে। ফার্ণ গাছের ঘন সারির আড়ালে ছোট ছোট অসংখ্য নৌকা বাঁধা। সম্ভবত বিপদ মুহূর্তে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার জন্যই এই আয়োজন। এ সকল নৌকার পাশাপাশি কিছু জেলেদের নৌকাও বাঁধা আছে।

উক্ত বাগানের কুড়ে ঘরটির মধ্যেই অবস্থান করছেন মেজর আসাদুল্লাহ এবং পাকিস্তানী সাংবাদিক সালমান কোরেশী। তারা বাগদাদের ঈগলের ইনতেজার করছিলেন। ইতিমধ্যেই কমান্ডার হাবিবের নেতৃত্বে বাগদাদের স্পেশাল ফোর্সের অধিকাংশ সৈনিকগণ এবং আত্মমর্যাবোধ সম্পন্ন বহু ইরাকী এসে পৌঁছে গেছে এখানে। এসে গেছেন অনেক স্বেচ্ছাসেবক, আরব ও বিদেশী মুজাহিদও কিন্তু ফিরে আসেনি ঈগল। 'সে কোথায়? এত দেরী করছে কেন সে?' অধৈর্য্য হয়ে সালমানকে জিজ্ঞেস করলেন মেজর সাহবে।

'ঈগল হয়তো জরুরী কোন কাজে ব্যস্ত আছে'–বলল সালমান–'নতুবা অযথা সময় নষ্ট করার ছেলে সে নয়।'

এর অল্প সময় পরেই ফিরে এল ঈগলের গাড়ি। বাগানের গেট পেড়িয়ে ভিতরে প্রবেশ করল সেটি। গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল ড্রাইভারসহ চারজন লোক। সকলের হাতেই ভাড়ি অস্ত্র শস্ত্র দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ঈগল কোথায়? এদের মধ্যে তো ঈগল নেই। ঈগলের অকল্যাণ চিন্তায় শংকিত হলেন মেজর সাহেব।

প্রথমে তিনি আগত চারজনের সাথে পরিচিত হলেন। এদের মধ্যে সবুজ পাগরীধারী ব্যক্তি বিন লাদেনের প্রতিনিধি। সৌম্য কান্তি চেহারা। মুখে চাপ দাড়ি। সাথের অন্য তিনজন তাঁর দেহরক্ষী। তাঁর নাম ফাদেল নজল আল-খালিলেহ। উপনাম মুসাব আল-জারকাবি। বিন লাদেরর প্রতিনিধি মেজর সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন 'আপনিই কি মেজর আসাদুল্লাহ?'

'জি আমিই মেজর আসাদুল্লাহ' বললেন মেজর সাহেব।

'তবে এই যুবক নিশ্চয়ই পাকিস্তানী সাংবাদিক সালমান কোরেশী?' সালমানকে লক্ষ্য করে বললেন আল-খালিলেহ।

'হ্যাঁ, জনাব! আমি পাকিস্তানী সাংবাদিক সালমান কোরেশী।' সালমান বলল।

'তবে আপনাদের শান্তনা দানের জন্য বলছি, ঈগল এক গুরুত্বপূর্ণ অপারেশনে গেছে। তার আসতে হয়তো আরো কয়েক ঘণ্টা বা তার চেয়েও বেশী সময় লাগবে। এদিকের সকল কাজ দ্রুত সেরে ফেলতে হবে।' বললেন খালিলেহ।

'ঠিক আছে, চলুন! আমরা আমাদের সৈনিকদের দিক নির্দেশনা দিয়ে কাজে লাগিয়ে দেই। তারা সকলে প্রতিশোধ নিতে ব্যাকুল হয়ে আছে।' বললেন মেজর সাহেব।

মেজর আসাদুল্লাহ, সাংবাদিক সালমান, ফাদেল নজল আল-খালিলেহ ওরফে মুসাব আল-জারকাবি, তাঁর দেহরক্ষী তিনজনসহ সকলে ঢুকলেন কুড়ে ঘরটির মধ্যে। ঘরের মেঝেতে একটি জীর্ণশীর্ণ চাটাই বিছানো। মেজর সাহেবের নির্দেশে সালমান চাটাই

সরিয়ে ফেলল। তিনি হাতে রাখা রিমোট চেপে দিলেন। সাথে সাথে ফ্লোরের ছোট একটি অংশ দু'দিকে সরে গেল। সেখান থেকে নিচের দিকে চলে গেছে সিঁড়ি। তারা সকলে সিড়ি বেয়ে নিচে নামলেন।

এখানটায় চতুষ্কোন বিশিষ্ট একটি কক্ষ। এখান দিয়েই চারটি সুরঙ্গ পথ চলে গেছে চার দিকে শহরের মধ্যে। মেজর সাহেব উত্তর দিকের সুরঙ্গে রিমোট চাপলেন। সহসাই খুলে গেল সুরঙ্গের দরজা। তারা দরজা পেড়িয়ে ভিতরে প্রবেশ করতেই পুনরায় দরজা লেগে গেল। সকলে সামনের দিকে হাটতে লাগলেন। মিনিট পাঁচেক চলার পর তারা পৌঁছে গেলেন কাংখিত কক্ষে। ভূগর্ভস্থ এই কক্ষ তথা বাংকার মেজর আসাদুল্লাহর বাড়ির বিশাল বাংকারের তুলনায় কিছুটা ছোট হলেও দু'তিনশ'র মত লোক এখানে অবস্থান করতে পারবে অনায়াসে। এই বাংকার এবং অন্য দুটি বাংকার মেজর সাহেব তৈরী করিয়েছিলেন কমান্ডার হাবিব বসরী ও বাগদাদের বিশিষ্ট শিল্পপতি দানবীর হাজী মোছাদ্দেক আল-মুসান্না এর আর্থিক সহযোগিতায়। হাজী মেছাদ্দেক আল-মুসান্না যেদিন বাংকার পরিদর্শন করেন, সেদিন তিনি মেজর আসাদুল্লার দূরদর্শিতা এবং সূক্ষ্মবুদ্ধিতা দেখে অত্যন্ত খুশী হয়ে বলেছিলেন–মেজর আসাদ! তোমার মত যদি মুসলিম জাতির প্রতিটি সদস্য দূরদর্শিতার সাথে কাজ করত, তবে বিশ্বের সিংহদ্বার থেকে মুসলমানদের গৌরবের যে পতাকাকে ইসলামের শত্রুরা নামিয়ে ফেলেছিল, তা পুনরায় উড্ডীন করতে বেশী সময় লাগত না। কিন্তু আফসোস! মুসলমানরা তা নিয়ে কোন চিন্তা-ভাবনাই করছে না। তার চেয়েও পরিতাপের বিষয় হলো আমাদের নব প্রজন্ম জানেই না যে, ইসলাম ও মুসলমানদের গৌরব ও বিজয়ের পতাকা কোনদিন বিশ্বের সিংহদ্বারে উড়েছিল। তাই তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে, তুমি সেই পতাকাকে পুনরায় উড্ডীনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছো।'

মেজর সাহেব মেহমানদের নিয়ে কক্ষে ঢুকলেন। কক্ষে অবস্থানরত মুজাহিদ-সৈনিকরা তাঁদের সালাম দিন। মেজর সাহেব দেখলেন অধিকাংশ সৈনিকের চোখে-মুখে মলিনতার ছাপ। তিনি তাদের চাঙ্গা করার নিমিত্তে বললেন–আমার প্রাণপ্রিয় মুজাহিদ ভাইয়েরা! তোমরা ভেঙ্গে পড়োনা, হতাশ হয়োনা। তোমরা যদি সচেতনার সাথে তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব আদায় করতে পারো, তবে বিজয় তোমাদের অতি নিকটে। তোমাদের জন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রথম দফা সাহায্য এসে গেছে।' তাঁর একথা শুনে সৈনিকদের মাঝে প্রাণ চাঞ্চল্য শুরু হল। তারা উৎকর্ণ হয়ে রইলো, আল্লাহর পক্ষ থেকে কি সাহায্য এসেছে তা শোনার জন্য। তারা বলল, ম'াননীয় মেজর সাহেব! আমাদের জন্য আল্লাহ পাক কি সাহায্য পাঠিয়েছেন তা জলদি করে বলুন।'

'তোমরা আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় কর যে, বর্তমান বিশ্ব মুসলমানদের ত্রাণকর্তা হিসেবে পরিচিত, সারা বিশ্বের তাগুতী শক্তির একমাত্র ত্রাস, মজলুম মানবতার নয়নের মণি, শায়খ ওসামা বিন লাদেন এর প্রতিনিধি আমাদের সাহায্যার্থে এসে গেছেন। তিনি

এখন তোমাদের উদ্দেশ্যে কিছু দিক নির্দেশনা মূলক...। এরপর মেজর সাহেব তাঁর কথা শেষ করতে পারলেন না। এরই মধ্যে সৈনিক-মুজাহিদরা খুশীতে তাকবীর ধ্বনি দিতে লাগল। তাদের সমন্বিত কণ্ঠের 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনিতে ভূগর্ভস্থ কক্ষটি কেঁপে উঠল। সালমান তাদেরকে শান্ত হওয়ার জন্য অনুরোধ করল। তাও কিছু সময় কেটে গেল। এরপর তারা শান্ত হয়ে বসল। নজল আল-খালিলেহ দাঁড়ালেন কথা বলার জন্য।

শায়খ ওসামা বিন লাদেনের প্রতিনিধি জনাব মুসাব আল-জারকাবি দাঁড়িয়ে প্রথমে আল্লাহ তা'য়ালার হাম্দ-সানা এবং মুহাম্মাদে আরাবী (সাঃ) এর উদ্দেশ্যে দরুদ ও সালাম পেশ করলেন। অতঃপর উপস্থিত সৈনিক ও মুজাহিদদের উদ্দেশ্যে বললেন–'আমার সম্মানিত মু'মিন মুসলমান ভাইয়েরা! এক দুঃখজনক অনাকাংখিত পরিস্থিতির শিকার হয়ে আজ আমরা এখানে একত্রিত হয়েছি। কিন্তু তাই বলে আমাদের আশাহত হলে চলবে না। হিমৎ হারিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে, নিরাশ হয়ে বসে পড়লে চলবে না। এই নিরাশার মাঝেও আমরা ইরাক নিয়ে দুটো কারণে আশাবাদী, ১. ইরাক নিয়ে বুশ ব্লেয়ার-শ্যারনরা যে পরিকল্পনা এঁটেছিল, তার ষোল আনাই মার খাবার পথে। তারা দখলের সময় সাধারণ প্রতিরোধ আশংকা করেছিল। যে জন্য কোটি কোটি ডলার বিলিয়ে সেই আশংকার অপনোদন ঘটিয়েছে, কোন প্রতিরোধ ছাড়াই দখলদারী প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু নতুন করে গেড়িলা যুদ্ধের কোন আশংকাই তারা করেনি। অথচ তাদের প্রচন্ড গেড়িলা যুদ্ধের মুখোমুখি হতে হবে অকল্পনীয়ভাবে। ২. ইরাক আক্রমণের আগে বুশের সামনে তথ্য ছিল কুয়েত দখলের অভিজ্ঞতা, ধীরে ধীরে আরবীয় শোষক শ্রেণীর উপর আধিপত্য বিস্তারের অভিজ্ঞতা। বস্তুবাদী, হারামখোর, রাজা, বাদশা, শেখ, আমীর, ওমরাহ এবং সুবিধাভোগী তেলের টাকায় তেলতেলে এক শ্রেণীর ধনকুবের নিয়ন্ত্রণের অভিজ্ঞতা। তারা শুধু মুদ্রার একপিঠ দেখছিল। তারা পশ্চিমা লেখকদের 'বিয়ন্ড দ্য ভেইল', 'দি ম্যাসেজ', 'দি কিংডম' পড়েছে। হেরেমের রোমাঞ্চকর কাহিনী জেনেছে। মরু বেদুইন, মরুবাসী আরবীয় ঐতিহ্যের পরীক্ষিত মানুষগুলি দেখেনি।

ভাইয়েরা আমার! তারা সাদ্দাম, উদে, কুশে আর রামাজান ও তারিক আজিজদের সাক্ষাত পেয়েছিল। তারা জানত, এরা সউদ ও শরীফ হুসাইনের মতো ক্ষমতা পাগল। ডলার-পাউন্ডের গোলাম, তাবেদার। এর বাইরে আমরা জনগণ নামক শাসক শ্রেণীর চৌহদ্দীর বাইরে আরবীয় মুসলমান। স্বাধীনচেতা বেদুঈন এবং সুন্নাহ অনুস্বরণকারী মানুষগুলোর সাক্ষাৎ তারা পায়নি। তবে হ্যাঁ, এখন থেকে পাবে। কি, আপনারা পারবেন না তাদেরকে সেই সাক্ষাত দিতে?'

সকলে চিৎকার দিয়ে বলে উঠল, অবশ্যই পারব ইনশা...নজল আল-খালিলেহ পুনরায় বলতে শুরু করলেন, 'হে আরবের বীর সন্তানেরা! হে আমার প্রাণপ্রিয় মুসলিম নওযোয়ানেরা! আপনাদের মনে হয়তো বা এই সন্দেহ দোলা দিতে পারে যে, আমরা এই অল্পসংখ্যক মানুষ কিভাবে তাদের মোকাবেলা করব? সেই চিন্তা করার আগে আমি

আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আপনারা এমন এক জাতির গর্বিত সন্তান, এমন এক বীর বাহুদুর সিংহপুরুষদের উত্তোরাধিকারী যাদের জিন্দেগীর ইতিহাসে সংখ্যাধিক্যে বিজয়ের কোন নজীর নেই। ইসলামের চৌদ্দশ' বছরের ইতিহাসে প্রকাশ্য রণাঙ্গনে, সম্মুখ সমরে আপনাদের জাতিকে কোনদিন, কোন অপশক্তি পরাজিত করতে পারেনি; যদিও প্রতিটি যুদ্ধে, প্রতিটি রণক্ষেত্রে শত্রু পক্ষই ছিল সংখ্যায় অসম্ভব ভাড়ি। দেখুন, ইসলামের সর্ব প্রথম যুদ্ধ বদরে মুসলিম সৈন্যসংখ্যা ছিল মাত্র ৩১৩ জন, অপরদিকে শত্রুদের সৈন্য সংখা ছিল ১০০০ জন। ওহুদ যুদ্ধে মুসলিম সৈন্য সংখ্যা ছিল ৭০০ জন, অপরদিকে কাফেরগোষ্ঠীর সৈন্য সংখ্যা ছিল ৩০০০ জন। খন্দক যুদ্ধে মুসলিম সৈন্য ছিল ৩০০০ জন, অপরদিকে শত্রুপক্ষের সম্মিলিত জোট সৈন্য ১০,০০০ জন। খায়বর যুদ্ধে মুসলিম সৈন্য ছিল মাত্র ১৬০০ জন, অপরদিকে ইয়াহুদী সৈন্য ছিল ২০,০০০ জন। মুতার যুদ্ধে মুসলিম সৈন্য ছিল মাত্র ৩০০০ জন, অপরদিকে রোমক বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল ১,০০,০০০ জন। হুনাইনের যুদ্ধে মুসলিম সৈন্যে ছিল ১২০০০ জন। অপরদিকে শত্রু বাহিনী ছিল ২০,০০০ জন। কাদেসিয়ার যুদ্ধে মুসলিম সৈন্য ছিল ৩০,০০০ জন, অপরদিকে খৃষ্টান বাহিনীর সংখ্যা ছিল ১,২০,০০০ জন। ইয়ামুকের যুদ্ধে মুসলিম সৈন্য ছিল ৩৬,০০০ জন, অপদিকে শত্রুবাহিনীর সংখ্যা ছিল ২,৫০,০০০ জন। জাবালার সাথে যুদ্ধে মুসলিম সৈন্য ছিল মাত্র ৬০ জন, অপরদিকে জাবালার সৈন্য ছিল ৬০,০০০ জন। আফ্রিকা অভিযানে মুসলিম সৈন্য ছিল প্রথমে ৩০০০০ পরে সাহায্যকারী ১০ হাজার মোট ৪০,০০০ জন, অপরদিকে খৃষ্টান সৈন্য ছিল ১,২০,০০০ জন। স্পেন অভিযানে মুসলিম সৈন্য ছিল মাত্র ৫০০০ জন, অপরদিকে শত্রুবাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ছিল ৬০,০০০ জন। ভারত অভিযানে মুসলিম সৈন্য ছিল ১২০০০ জন, অপরদিকে হিন্দু সৈন্য ছিল অসংখ্য অগণিত। অতএব ভীত বা আশাহত হবার কোন কারণ নেই। জয় হবে মু'মিনদেরই।

আরো লক্ষ করুন, বিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে পৃথিবীর একমাত্র সুপার পাওয়ার সোভিয়েত ইউনিয়ন তথা রাশিয়া সম্পূর্ণ গায়ে পড়ে আফগানিস্তানে যুদ্ধ বাজিয়ে গুটি কয়েক আফগান বীর জনতার হাতে এমনভাবে পরাজয় বরণ করল যে, তার সেই বিশাল বপু সোভিয়েট ইউনিয়ন ভেঙ্গে চুরে খান খান হয়ে গেল। নিঃশেষ হয়ে গেল তার মাতুব্বরী আর মোড়লীপনা। এরপর সুপাওয়ার হয়ে দাঁড়াল হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্ত্রাসী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা আমেরিকা। এক বিংশ শতাব্দীর শুরু লগ্নে বর্তমান সুপার পাওয়ার দাবীদার আমেরিকা, রাশিয়ার সেই বদ্ধভূমিতে এসে নিজের পতন ঘণ্টা বাজিয়ে দিল। কিন্তু যখন দেখল, সেখানে তার পতন বিলম্বিত হচ্ছে, আর এই বিলম্ব তার সহ্য হচ্ছেনা; তাই সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে হামলে পড়ল হাজার বছরের ঐতিহ্য মন্ডিত, সভ্যতার সূতিকাগার এই ইরাকে। আশা করা যায়, এখন তার পতন হতে খুববেশী দেরী হবেনা। আজ এক যুগেরও বেশী সময় ধরে তারা শুধু আপনাদের উপর বর্গীদের ন্যায় হামলা করে পালিয়ে গেছে আপনারা তাদের কিছুই করতে পারেন নি।

ইরাক দখলের মাধ্যমে তারা আপনাদের নাগালে এসেছে। আপনাদের উপর এতদিনের হামলার প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ করে দিতে তারা স্বেচ্ছায় আপনাদের হাতের কাছে এসে ধরা দিয়েছে। এখন আপনাদের কাজ কি হবে তা আর নিশ্চয়ই ব্যাখ্যা করে বুঝান লাগবে না!'

সভার মধ্য থেকে একজন বলে উঠল, সে ব্যাখ্যা আমরা জানি হে সম্মানিত মেহমান! আমরা এখন ওদের ধরে ধরে সাইজ করে, প্যাকেটে ভরে দজলার জলে বাসিয়ে দিব।' আমাদের এত সাধের মেহমানদের (?) যথাযথ খিদমত আঞ্জাম দিতে মোটেই ত্রুটি করব না।'

'হে আমার মুজাহিদ ভাইয়েরা! সারা বিশ্বে পুলিশী ভূমিকায় অবতীর্ণ আমেরিকা এতদিন সবাইকে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভয় দেখিয়ে স্বার্থ হাসিলে মত্ত ছিল। কোন দেশে রাষ্ট্রীয় অসন্তোষ দেখা দিলে গায়ে পড়ে পরামর্শ দিত, তোমাদের উপর সোভিয়েত ইউনিয়নের হস্তক্ষেপ ও আগ্রাসন পরিচালনার আশংকা রয়েছে। অতএব সাবধান হও! এমনই এক জুজুর ভয় দেখিয়ে সে মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলোকে বলেছে, তোমরা আমাকে পেট্রোল দাও, আমিই ওদের মুকাবিলা করব। আমাকে এইসব মাল দিলে, সাহায্য করলে আমিই ওদের ঠেকিয়ে রাখব। এসব বলে প্রবঞ্চনা করে এতদিন সে মুসলিম বিশ্ব থেকে খয়রাত কুড়িয়েছে। মুসলিম দেশের সরকারগণ দেরিতে হলেও এখন আমেরিকার ভন্ডামি কিছুটা বুঝতে পেড়েছে। দিন দিন পৃথিবী আমেরিকার জন্য সংকীর্ণ হয়ে আসছে। বিশ্বের বিবেকবান মানুষ আমেরিকার প্রতি চরম বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছে। আজ বিশ্ব নেতৃবৃন্দ আমেরিকার অযাচিত মাতুব্বরীর সমালোচনা করছে, ধিক্কার জানাচ্ছে। আমেরিকার এই অন্যায় যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিশ্বের তাবৎ শান্তিকামী মানুষ। বিশ্বের হেন কোন দেশ নেই, যুদ্ধের প্রাক্কালে এবং আক্রমণের পর যেখানে বিক্ষোভ প্রতিবাদে মানুষ ফেটে পড়েনি। স্মরণকালের বৃহত্তম প্রতিবাদ সভা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, জার্মান, ফ্রান্স, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারতসহ বিভিন্ন দেশে। সর্বত্র ধ্বনিত হয়েছে একই স্লোগান 'তেলের জন্য যুদ্ধ নয়; জংলী বুশ মানুষ নয়।'

আমেরিকার ইরাক আক্রমণের পিছনে মূলত তেল-ই ছিল অন্যতম লক্ষ্য। শুধু ইরাক নয় ইতিপূর্বে আফগানিস্তান আক্রমণের পিছনেও মূলত একই লক্ষ্য ছিল। আফগানিস্তান পতনের মধ্য দিয়ে সে আজারবাইজান, কাজাখস্থান ও তুর্কমেনিস্তানের তেল-গ্যাসের দখল নিশ্চিত করেছে এবং কাসপিয়ান সাগর পর্যন্ত তেলের পাইপ লাইন বসানোর পরিকল্পনাও নিশ্চিত করতে পেরেছে। এর দীর্ঘ মেয়াদী নিরাপত্তার জন্যই মার্কিন বিদ্বেষী ইসলামী আফগান শাসনকে উৎখাত করা তার দরকার ছিল।

হে আমার মুসলিম বীর সিপাহীরা! হে বিশ্ববিজয়ী মুজাহিদদের সন্তানেরা! ইসলামের দুশমনেরা একটি বিষয়ে সব সময়ই একমত। তা হল, ইসলামের ক্ষতি করা, মুসলিম

জাতিকে ধ্বংস করা। ইসলামের সূচনাকাল থেকেই কাফির-মুশরিক-মুনাফিক চক্র এ ব্যাপারে জোটবদ্ধ ইসলাম ও মুসলমানের প্রশ্নে সব কাফির একজাত।

এ ঘৃণিত অবিশ্বাসী শক্তিকে পদানত করে রাখা, বাতিলের আওয়াজকে মাটিতে মিশিয়ে রাখা আর আল্লাহর বাণীকে সর্বোচ্চে তুলে ধরাই ছিল মুসলমানদের প্রধান কাজ। দুনিয়ার রাজপথের মাঝ দিয়ে, বুক ফুলিয়ে, মাথা উঁচু করে হাঁটার কথা মুমিনের-মুজাহিদের। আর শিরক ও কুফরের পাপে নিমজ্জিত অপরাধী চক্রের চলার কথা রাস্তার পাশের নালা-নর্দমা দিয়ে। এ মর্যাদাপূর্ণ জীবন লাভ করা যায় যে আমল দ্বারা, তা হল 'জিহাদ'। যে জাতি জিহাদ ত্যাগ করে তারা লাঞ্ছিত হয়। ইসলামের পূর্ণতা ও উৎকর্ষের সর্বোচ্চ শিকর (চূড়া) হচ্ছে জিহাদ।'

পরিত্যক্ত অনাবাদী জমিতে ফসল উৎপাদন করতে হলে তিনটি কাজ করতে হয়। সর্বপ্রথম জমি উত্তমরূপে চাষ দিতে হয়; আগাছা দূর করে জমিকে পরিষ্কার করতে হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে জমিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ সার ছিটাতে হয়। সবশেষে বপন করতে হয় বীজ। ক'দিন পর বীজ অংকুরিত হয়ে ধীরে ধীরে জমিন সবুজ-শ্যামল হয়ে ওঠে এবং ফসল উৎপন্ন হয়। ঠিক তেমনি আল্লাহর এই পৃথিবীতে যখন কুফর শিরক ও অন্যায় অবিচারের আগাছা ব্যাপক আকার ধারণ করে, তখন পৃথিবীতে প্রথমে জিহাদ ও কিতালের হাল দিতে হয়। তারপর সার হিসেবে কাফিরদের বিষাক্ত ও অপবিত্র রক্ত প্রবাহিত করতে হয়। জমিতে যে সার ব্যবহার করা হয়, তা যত বিষাক্ত হয় জমির উর্বরতা তত বৃদ্ধি পায়। তেমনি পৃথিবীতে ইসলাম ও মুসলমানের যত বেশী ভয়ংকর শত্রুর রক্ত ঝড়ানো যায়, সত্য ও শান্তির ফসল উৎপণ্যের জন্য পৃথিবী তত অধিক উপযোগী হয়। সবশেষে বীজ হিসেবে ছিটাতে হয় কিছু সংখ্যক মুসলমানের পবিত্র রক্ত। অর্থাৎ শহীদের পবিত্র খুনের বদৌলতে ইসলামের বিস্তার ঘটে এবং ঈমানের পবিত্র বৃক্ষ ফল-ফুলে পল্লবিত হয়ে ওঠে। সুতরাং হে মুজাহিদ ভাইয়েরা বর্তমানে ইসলামের সবচেয়ে ভয়ংকর শত্রু আমেরিকা। আপনারা পৃথিবীকে শান্তির নিবাস হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে, আমেরিকাকে চূড়ান্ত আঘাত হানতে মানকিভাবে তৈরী হয়ে যান।

হে মুসলিম জাতির গর্বিত তরুণগণ! শুনুন স্বয়ং আল্লাহ ও আপনাদের নির্দেশ দিচ্ছেন 'তোমাদের উপর যুদ্ধকে ফরজ করা হল অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। আর হয়তো বা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে অপছন্দনীয় কিন্তু বিষয়টি তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তো বা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় কিন্তু সে বিষয়টি তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। বস্তুত আল্লাহই অধিক জানেন, তোমরা কিছুই জান না। (আল-কোরআন) মহান আল্লাহ আরও বলেন, 'হে নবী, আপনি মু'মিনদিগকে যুদ্ধের প্রতি উৎসাহিত করুন। তোমাদের মধ্যে যদি ২০ জন দৃঢ়পদ ব্যক্তি থাকে, তবে জয়ী হবে দু'শর মোকাবেলায়। আর যদি তাদের মধ্যে থাকে একশ' লোক, তবে জয়ী হবে হাজার কাফেরের উপর থেকে। তার কারণ, ওরা জ্ঞানহীন। (আল-কুরআন)

এছাড়া আল্লাহর সতর্কবাণী হল আমাদের প্রতি, 'আর তোমাদের কি হল যে, তোমরা যুদ্ধ করছো না? ঐ সমস্ত দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা আর্তনাদ করে বলছে– হে আল্লাহ আমাদেরকে এই জনপদ থেকে বের করে নাও যার অধিবাসীরা জালিম। আর আমাদের জন্য তোমার পক্ষ থেকে বন্ধু ও সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও। (আল-কুরআন) "তোমরা কি মনে করেছো যে, এমনিই জান্নাতে চলে যাবে? অথচ আল্লাহ এখনো দেখেন নি, তোমাদের মধ্যে কে এমন আছে যে, আল্লাহর পথে প্রাণপণে লড়াই করতে প্রস্তুত এবং তাঁর জন্যই ধৈর্য্যশীল।" (আল-কোরআন)

এই জিহাদ সম্বন্ধে নবীয়ে আরাবী (সাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি মারা গেল, অথচ সে জিহাদ করেনি। কিংবা জিহাদ করার তামান্নাও অন্তরে পোষণ করেনি, সে এক প্রকার মুনাফিক অবস্থায় মারা গেল। (আল-হাদিস)

তিনি আরও বলেন 'সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন, আমার ইচ্ছা হয়, আমি আল্লাহর পথে নিহত হই, পুনরায় জীবিত হই, আবার নিহত হই, আবার জীবিত হই, আবার নিহত হই, আবার জীবিত হই, আবার নিহত হই। (আল-হাদিস)

সুতরাং জিহাদ ইসলামের এমন একটি বিষয়, যে সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। কোন কোন মুফাস্‌সির ও তাফসীর লেখক বলেছেন, কুরআন পড়লে মনে হয় জিহাদই এর প্রধান আলোচ্য বিষয়। কোন মুফাস্‌সির একথা লিখেছেন, পবিত্র কুরআনে তাওহীদ বিষয়ক আলোচনার পরে জিহাদ নিয়ে সবচেয়ে বেশী আলোচনা করা হয়েছে।'

হে যুবক বীর মুজাহিদ ভাইয়েরা! কুফরী শক্তির পতন ও ইসলামী বিধানের স্থিতি, প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণের জন্য পবিত্র মক্কা মোকাররমা থেকে শায়খ উসামা বিন লাদেন এখন ইসলামী আফগানিস্তানের পর্বতঘেরা দুর্ভেদ্য উপত্যকায় কর্মব্যস্ততার মাঝে দিন অতিবাহিত করছেন। এটি এমন এক নিরাপদ পর্বতচূড়া, যার পদতলে নিষ্পেষিত হয়ে গেছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কুফরী শক্তি রাশিয়া ও আমেরিকার সকল দম্ভ ও অহংকার। আফগানিস্তানের সেই হিন্দুকুশ পর্বমালার চূড়া থেকে বিন লাদিন আপনাদের উদ্দেশ্যে, বিশেষত হারামাইনের দেশের এবং ইরাকের যুবক ভাইদের উদ্দেশ্যে এই পয়গাম পাঠিয়েছেন– আপনারাই এই জাতির কান্ডারী, আশা-আকাংখার কেন্দ্রস্থল। ইসলামের এ দুর্দিনে, এ ভয়াবহ পরিস্থিতিতে ইসলামও মুসলিমদের হিফাজতের কঠিন ও গুরু-দায়িত্ব আপনাদেরই বহন করতে হবে। ইহুদী-খৃষ্টানদের সকল ষড়যন্ত্রের নীল-নকশা আপনাদেরই প্রতিহত করতে হবে। হারামাইন তথা পবিত্র মক্কা-মদীনাকে এবং অসংখ্য নবী-সাহাবার স্মৃতিধন্য পবিত্র ইরাককে তাদের হিংস্র থাবা থেকে আপনাদেরকেই উদ্ধার করতে হবে। যখন বিশ্ব মুসলিম দেখবে যে আপনারা পবিত্র জন্মভূমি রক্ষার্থে, বাইতুল্লাহর হিফাজতের জন্য ইহুদী-খৃষ্টান চক্রের বিরুদ্ধে জিহাদের পতাকা উত্তোলন করে জীবন নেয়া

দেয়ার খেলায় ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। ঠিক তখনই বিশ্ব মুসলিম এসে আপনাদের পাশে দাঁড়াবে। সাহায্য-সহযোগিতা নিয়ে ছুটে আসবে।

রণাঙ্গনে একই সারিতে দাঁড়াতে উড়ে আসবে। এটা শুধু আবেগ নয়। এটা তাদের দায়িত্ব, এটা তাদের উপর ওয়াজিব।

কেননা, যে দেশ ইসলামের কেন্দ্রভূমি, যে পবিত্র ভূমিতে রাসূলের আগমন হয়েছে, যে দেশের মাটি অহীর আগমনে ধন্য হয়েছে, যে দেশের বুকে মুসলিমদের কিবলা বাইতুল্লাহ বিদ্যমান। যে দেশের প্রতিটি ধূলিকণা আর অনুপরমাণুর সাথে মুসলিম জাতির হৃদয়-প্রেম মিশে আছে এবং যে দেশের পবিত্র মাটিতে শুয়ে আছেন হযরত ইউনুছ, শীষ, আইয়ুব, দানেহ, সালেহ ও ইব্রাহীম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামদের মত নবী-রাসূলগণ আজ সে দেশ দু'টির বুকেই জেকে বসে আছে আমেরিকা ও তার দোসর ইহুদী-খৃষ্টান বাহিনী; আল্লাহ্-রাসূল ও দ্বীন-ইসলামের সবচেয়ে বড় দুশমনরা।

কিন্তু মুসলমানরা যদি এগিয়ে না আসে, আর আপনারাও যদি তাদের মুকাবিলায় যথাযথ পদক্ষেপ নিতে অলসতা কিংবা অযোগ্যতার পরিচয় দেন, তবে আল্লাহর আযাব ও গজব আপনাদের ও তাদের ধ্বংস-নিশ্চিহ্ন করে দেবে। আল্লাহ তাঁর দ্বীন ও ইসলামের ভালোর জন্যই অন্যকোন জাতিকে মনোনীত করবেন। আল্লাহ বলেন–'যদি জিহাদে বের না হও (যুদ্ধ না কর) তবে আল্লাহ তোমাদের মর্মন্তুদ আযাব দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন।' (সূরা তওবাহ আয়াত ৩৯)

এমনও হতে পারে, যেই বর্বর-জালিম আমেরিকা আজ ইসলামের ঘোরতর দুশমন, মুসলমানদের গাফলত ও বুঝাদিলীর কারণে ইসলামের সংরক্ষণ–উন্নতির জন্য, আল্লাহ পাক তাদেরকেই মনোনীত করবেন। যে রকম করেছিলেন সে কালের ইসলামের নিকৃষ্টতম দুশমন তাতারীদের নেতা চেঙ্গিস খানের নাতী হালাকু খানের বংশধরদের ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে। 'ইসলাম চায় এমন সিপাহী, যারা আল্লাহর রাহে জয় পরাজয়ের পরোয়া না করে লড়াই করতে পারে অবিরাম গতিতে। ইসলামচায় এমন দিল, যে দিল একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন শক্তিকে ভয় করেনা।'

উপস্থিত সকলে বলে উঠল, 'আমরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য শায়খ ওসামা বিন লাদেনের পয়গাম মনে-প্রাণে মেনে নিলাম। ইনশাআল্লাহ শুধু হারামাইন আর ইরাক নয়, প্রতিটি মুসলিম দেশ থেকে আমেরিকার শেষ সৈন্যটি না তারানো পর্যন্ত আমাদের এই অভিযান, এই এ্যাকশন চলবে দুর্বার-অপ্রতিরোধ্য গতিতে।'

'আলহামদুল্লিাহ! আল্লাহ আপনাদের এই শপথ কবুল করুন। বললেন খালিলেহ–সম্মানিত ভাইয়েরা আমার! আমেরিকা সম্পূর্ণ মিথ্যা অজুহাতে ইরাকে আগ্রাসন চালিয়ে এই অভিযানকে বৈধতা দানের জন্য দু'টি প্রধান যুক্তি প্রদর্শন করছে। ১. ইরাকের কাছে গণবিধ্বংসী অস্ত্র আছে। ২. আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী ওসামান বিন লাদেনের আল-কায়েদার সাথে ইরাকের গভীর সম্পর্ক আছে।

আমেরিকার এই অভিযোগের সত্যতা কতটুকু? জাতিসংঘের অস্ত্র পরিদর্শক দল দফায় দফায় তল্লাশী করেও ইরাকে আপত্তিকর কোন অস্ত্র পায়নি। আমেরিকা তাদের কথা আমলে না এনে জাতিসংঘের কাছে ইরাক আক্রমণের অনুমতি চাইল। শেষ পর্যন্ত জানিয়ে দিল জাতিসংঘের অনুমতি ছাড়াই ইরাকে আক্রমণ করবে তারা। করেছেও তাই। এই আক্রমণের দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হলো জাতিসংঘ প্রকৃতপক্ষে ইহুদী-খৃষ্টানদের হাতের খেলার পুতুল। ১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর বিশ্বশান্তির লক্ষ্যে, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ক্ষুধা-দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানোর জন্য গঠিত হয় জাতিসংঘ; যার প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ ছিল—আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা, বিভিন্ন জাতিসমূহের মাঝে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক জোরদার করা এবং পরস্পর আক্রমণাত্মক তৎপরতা বন্ধের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করাসহ আরও কিছু শান্তির বুলি। কিন্তু জাতিসংঘের মুখে মধু অন্তরে বিষ। শান্তি প্রতিষ্ঠায় কোন আন্তরিকতা নেই। আছে মুসলিম নিধনের অপকৌশল।

আফগান-ইরাকে আমেরিকার অবৈধ আগ্রাসনের সময় জাতিসংঘের ভূমিকা দেখে বলতে হয়, এটি এখন তাৎপর্যহীন একটি কুটনৈতিক ক্লাবে রূপান্তরিত হয়েছে। সাফল্য-ব্যর্থতা নিয়ে প্রশ্ন তুললে এর জন্মটাই যেন আজন্ম পাপের ফসল। বস্তুতঃ পক্ষে এই সংস্থাটি ইহুদী-খৃষ্টানরা প্রতিষ্ঠা করেছিলই মূলত নিরাপদে মুসলমানদের হত্যা ও নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে। তাই যদি না হবে, তবে আমেরিকা-ইসরাঈল সুস্পষ্টভাবে জাতিসংঘ সনদ লংঘন করে আফগান- ইরাক-ফিলিস্তিন দখল করার পরও জাতিসংঘ কেন আমেরিকা- ইসরাঈলের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না? কেন তাদের ওপর অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা, অর্থনৈতিক অবরোধ এবং অন্যান্য নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছে না? জাতিসংঘের এই অর্ধ শতাব্দীর ঘটনাবলী ও দৃষ্টিভঙ্গিই প্রমাণ করে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করতে, আন্তর্জাতিক কোন সমস্যা সমাধান করতে সে সম্পূর্ণ ব্যর্থ এবং অক্ষম। সুতরাং জাতিসংঘ নামের এই ইহুদী-খৃষ্টান সংঘের কবল থেকে মুসলিম বিশ্বকে বাঁচাতে হবে। আমাদের কোন ব্যাপারে তারা যেন নাক গলাতে না পারে, সেই ব্যবস্থাই করতে হবে আপনাদের আমাদের।'

'আমেরিকার ইরাক আক্রমণের দ্বিতীয় অন্যতম অভিযোগ ছিল, 'আল কায়েদার সাথে ইরাকের গভীর সম্পর্ক। কিন্তু বাস্তব সত্য হচ্ছে প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের সাথে আমাদের আদৌ কোন সম্পর্ক সৃষ্টি তো হয়ইনি বরং সে বেসরকারীভাবেও ইরাকে আমাদের কোন প্রকার কাজ করতে দেয়নি। বস্তুতঃ সাদ্দাম আমেরিকার সৃষ্ট কাগুজে বাঘ। এ ক্ষেত্রে আমেরিকার সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ হেনরী কিসিঞ্জারের মন্তব্য প্রতিধানযোগ্য। তিনি বলেন, "আমেরিকার নিজের স্বার্থে একজন সাদ্দামের বড্ড বেশী প্রয়োজন ছিল। মিসরের আনোয়ার সাদাতকে সাদ্দাম বানানোর চেষ্টা চলেছিল। ঘাতকের বুলেটে সে প্রাণ দেয়ায় তা সম্ভব হয়নি। ভাগ্য ভাল ইরাকে সাদ্দামকে পাওয়া গেল।"

সাদ্দাম হোসেনকে আমরা বুঝাতে চেষ্টা করেছিলাম, 'কাফির কখনও মুসলমানের বন্ধু হতে পারেনা। মু'মিনরাই একে অপরের বন্ধু। আপনি আসুন! আমরা কাফেরদের মোকাবেলা করার জন্য মুসলমানদের প্রশিক্ষিত করে তুলি। আপনার অন্য কোন সহায়তার প্রয়োজন নেই, শুধুমাত্র আমাদেরকে প্রশিক্ষণ ক্যাম্প স্থাপনের অনুমতি দিন। কিন্তু তিনি আমাদের কথা শুনলেন না। আমাদের আবেদনের কোন মূল্যায়নই করলেন না। শুধু তাই নয়, এর চেয়েও দুঃখ এবং আক্ষেপের বিষয় হল, সে সময় ইরাকে অবস্থানরত মুজাহিদদের তিনি গ্রেফতার করে জেলে পুড়লেন অনেককে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করলেন। আপনাদের প্রেসিডেন্ট তখন ক্ষমতার দাপটে ইসলামকেই বলতে গেলে ইরাক থেকে বিতারিত করেছিলেন। তারপর আবার আমাদের সাথে সম্পর্ক? যার চিন্তা করাও হাস্যকর!

অতএব ইরাকে আমেরিকার হামলা ছিল সম্পূর্ণ মিথ্যা অজুহাতে। তখন জাতিসংঘের কোন খবর ছিল না। তথাকথিত এই বিশ্ব সংস্থাটি তখন জীবিত ছিল না মৃত ছিল–বিশ্ববাসী তা জানতে পারেনি। অথচ এখন আমেরিকা অবৈধভাবে ইরাক দখল করার পর শুনা যাচ্ছে–জাতিসংঘ ইরাকের পুনর্গঠন কাজের দায়িত্ব নিবে। ইরাকীদের ক্ষুধা নিবারণ ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করবে।' জাতিসংঘের এই দ্বৈত আচরণে বিশ্ব বিবেক লজ্জায় মাথা তুলতেও ইতস্ততবোধ করছে। আপনারা কি ইরাকে জাতিসংঘের কোন কার্যক্রম মেনে নিবেন?'

'কখনই আমরা এই বিশ্ব মুনাফেক সংঘের উপস্থিতি ইরাকের পবিত্র ভূমিতে মেনে নেবো না।' সভার মধ্যে থেকে সিপাহী খালেদ দাঁড়িয়ে জলদগম্ভীর কণ্ঠে বলল–'যে জাতি সংঘকে আমরা বিপদ মুহূর্তে পাইনি, যুদ্ধের পরে তাদের উপস্থিতি শহীদদের দেশে, ইরাকের ভূমিতে দেখতে চাইনা। তারা এখন কেন আসবে তা আমরা ভালভাবেই বুঝতে পারছি। আমেরিকার এই দখল দারিত্বের বৈধতা দান এবং মার্কিন সৈন্যদের হেফাযতের জন্য প্রতিরক্ষা ঢাল হওয়াই মূলত তাদের ইরাক আগমনের উদ্দেশ্য। যদি সত্যি সত্যি সে ইরাক আসে, তবে মুসলিম নিধনের কসাইখানা-জাতিসংঘের মৃত্যু ঘণ্টাও আমেরিকার সৈনস্যদের সাথে ইরাকের এই পবিত্র মাটি থেকে বাজিয়ে দেয়া হবে।'

খালিদের এই কথায় সমর্থন জানিয়ে উপস্থিত সিপাহী মুজাহিদরা শ্লোগান দিয়ে উঠল, ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক! নিপাত যাক! জাতিসংঘের কালো হাত ভেঙ্গে দাও! গুড়িয়ে দাও! মুসলিম হত্যার কসাইখানা জালিয়ে দাও! পুড়িয়ে দাও! মুসলমানদের রক্ত নিয়ে হোলি খেলা, চলবেনা-চলবেনা। ইরাক-আফগানের জিহাদ, মার্কিনীদের মরণ ফাঁদ। চলছে লড়াই চলবে, মুজাহিদরা লড়বে।' এমনতর অংসখ্য স্লোগানে ভূগর্ভস্থ কক্ষটি প্রকম্পিত তুলল তারা।

স্লোগান শেষ হলে বীর মুজাহিদ মুসাব আল-জারকাবি পুনরায় বলতে শুরু করলেন, 'হে যুগ সচেতন মুজাহিদবৃন্দ। নির্ভরযোগ্য গোপন সূত্রে জানা গেছে ইঙ্গ-মার্কিন

দানবীয়চক্র যুদ্ধোত্তর ইরাককে তিন খন্ডে খন্ডিত করার তৎপরতা চালারে। এক ইরানের উপকূলবর্তী বসরাকে রাজধানী করে শিয়াদের জন্য ২১ হাজার বর্গ কিলোমিটার আয়তন বিশিষ্ট একটি স্বাধীন রাষ্ট্র।

দুই. ইরাকের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত শহর টাইগ্রিস নদীর তীরবর্তী মসুলকে রাজধানী করে তুরস্ক ও ইরানের কিছু অংশ নিয়ে এক লাখ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় স্বাধীন কুর্দিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা।

তিন. ইরাকের মধ্যাঞ্চলকে নিয়ে বাগদাদকে রাজধানী ঠিক রেখে সুন্নী প্রধান একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। এ চক্রান্ত যদি তারা বাস্তবায়ন করতে পারে, তবে বিশ্বের ইতিহাস থেকে 'ইরাক' নামক রাষ্ট্রটির নাম-চিহ্ন পর্যন্ত চিরতরে মুছে যাবে। সেটা কি আপনারা মেনে নিবেন?'

'কক্ষনই নয়–চিৎকার দিয়ে বলে উঠল সকলে–আমেরিকার এই হীন ষড়যন্ত্র কখনই বাস্তবায়ন করতে দেয়া হবেনা।'

এ পর্যায়ে মুসাব আল-জারকাবি বললেন–বীর মুজাহিদ ভাইয়েরা আমার! আমি আপনাদেরকে আমার শেষ কথা বলে যাচ্ছি, আপনারা একতাবদ্ধভাবে শক্রর উপর আঘাত হানুন। সিআইএ-মোসাদের গোয়েন্দাদের বেশী বেশী সাইচ করুন। আত্মঘাতি হামলা-গাড়িবোমা হামলা অব্যাহত ভাবে চালাতে থাকুন ওদের সৈন্যদের আস্তানায়, অস্ত্রাগারে, রণতরীতে, প্রহসনের পুতুল সরকারের দফতরে, তেল পাইপ লাইনে। ওদেরকে এক মুহূর্তের জন্যও ইরাকের মাটিতে স্বস্তিতে নিঃশ্বাস ফেলতে দেয়া যাবে না। ওদের দখলদারিত্ব কিছুতেই মেনে নেয়া যাবে না।'

'অন্য একটি জরুরী বিষয় সম্পর্কে আপনাদেরকে সতর্ক করছি, তাহল ইসলামের আরেক দুশমন শিয়াদের ব্যাপারে। শিয়ারা ইহুদী ও আমেরিকানদের মিত্র। মুসলমানদের হত্যাকান্ডে তারা ওদের সহায়তা করবে। এরা কিন্তু আপন ঘরের পোষা নাগিনী। সুযোগ পেলেই ছোবল মারবে পিছন থেকে। ১২৫৮ সাথে তাতারীদের বাগদাদ তথা ইরাক আক্রমণের পিছনে যেমন প্রধান হাত ছিল তৎকালীন খলিফা মুতাসিম বিল্লাহর উজিরে আজম, শিয়া ইবনে আলকামীর ষড়যন্ত্র এবং ক্ষমতা দখলের অসৎ উদ্দেশ্য। তেমনি এই ২০০৩ সালে শিয়ারা ইরাকের ক্ষমতা হস্তগত করার অসৎ উদ্দেশ্যে হানাদার-দখলদারদের সমর্থন ও সহযোগিতা দিয়ে যাবে। তাই এদের ব্যাপারেও খুব সতর্ক থাকতে হবে। আর হ্যাঁ, এখনই আপনাদের গ্রুপ গ্রুপ ভাগ হয়ে আক্রমণের উদ্দেশ্যে বের হতে হবে, হালকা অস্ত্র যা যা আপনাদের আছে তা নিয়েই।' এই বলে মুসাব আল-জারকাবি তার বক্তব্য সমাপ্ত করলেন।

তাঁর বক্তব্য শেষ হলে সমস্ত মুজাহিদরা এসে পর্যায়ক্রমে দ্বীনের পথের এই মহান খাদেমের পবিত্র হাতে হাত মিলাতে লাগল। কেউ কেউ আবার মুয়ানাকাও করল।

মুছাফাহা ও মুয়ানাকা পর্ব শেষ হলে তিনি এদেরকে ৬জন, ৮জন করে গ্রুপে ভাগ করলেন। এরপর কিভাবে গেড়িলা হামলা চালাতে হবে, শত্রুর অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাদের অস্ত্র দিয়ে তাদেরকেই কিভাবে জাহান্নামে পাঠাতে হবে, ঘেড়াওয়ে পড়লে কিভাবে বের হতে হবে ইত্যাদি কলা-কৌশল শিখিয়ে দিলেন। গেড়িলা লড়াইয়ে সাফল্যের রহস্য কোনখানে বুঝিয়ে দিলেন তাও। মেজর আসাদুল্লাহ সাহেবকে নিযুক্ত করলেন এদের আমীর। অতঃপর তাকে ডেকে এক পার্শ্বে নিয়ে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা দিলেন এবং অভিযান পরিচালনার জন্য এখনই এই গ্রুপগুলিকে বাগদাদের অলিতে-গলিতে সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে বললেন। এরপর সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, সঙ্গী তিনজনকে সাথে নিয়ে বের হয়ে গেলেন বাংকার থেকে। ছুটে চললেন আপন গন্তব্য পানে।

মেজর সাহেব জনাব মুসাব আল-জারকাবির পরামর্শানুযায়ী মুজাহিদদেরকে ভূগর্ভস্থ বাংকারের তিনটি পয়েন্ট দিয়ে বের করে দিলেন হানাদারদের ওপর আঘাত হানার নিমিত্তে। সালমানকে রেখে দিলেন নিজের কাছে।

ছয়

হায় হায় রব উঠেছে মার্কিন ক্যাম্পে। সৈন্যদের দৌড়াদৌড়ি, ছুটাছুটি আহাজারি আর গর্দভের মত চিৎকার ধ্বনি লক্ষ করা যাচ্ছে বেশ দূর থেকেও। বিস্ফোরণ এতটা শক্তিশালী হয়েছে যে, পুরো ক্যাম্পটিই বলতে গেলে তছনছ হয়ে গেছে। ঘটনার আকস্মিকতায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় মার্কিন বাহিনী। প্রচন্ড ধুমোয় তারা শুধু দু'চোখে অন্ধকার দেখছে। তাদের এই লবেজান দশা দেখে বাগদাদের আকাশ-বাতাস যেন কুটি কুটি হাসছে। কারণ এরাই মুহূর্ত কয়েক পূর্বে সাধারণ ইরাকী নাগরিকদের বন্দী করে কষ্টদায়ক শাস্তি দিয়ে উল্লাস করছিল।

কৃতিত্বটা বাগদাদের ঈগলের। মার্কিন সৈন্যদের ধোকা দিয়ে এমন বোকা বানিয়েছে সে। এখন গর্দভগুলো হারে হারে টের পাচ্ছে যে, ইরাকীরা কোনদিনই তাদেরকে আপন মনে করে বুকে ঠাই দিবে না। তাদের গোলামী মেনে নেবে না মুহূর্তের জন্যও।

ঈগল কমান্ডার হাবিবের নিকট মেজর আসাদুল্লাহ সাহেবের চিঠি পৌঁছিয়ে ছুটে যায় সীমান্ত এলাকায়। ইরাক ত্যাগরত স্বেচ্ছাসেবক মুজাহিদ ভাইদেরকে যথাসম্ভব নিবৃত করতে লাগল। এক্ষেত্রে তার মেগা ফোনটি দারুন কাজ দিল। ভাগ্য ভাল যে ফোনটি গাড়িতেই ছিল। সে এটার মাধ্যমে মুজাহিদদের উদ্দেশ্য করে বলল, 'হে আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গ করতে আসা নির্ভীক বীর মুজাহিদ ভাইয়েরা! তোমরা কেন ইরাক ত্যাগ করছো? তোমরা কি শত্রুকে পিঠ দেখিয়ে আল্লাহর গজবকে সাথে করে ইরাক ত্যাগ করছো না? কেন তোমরা ইরাক ত্যাগ করছো? এখনই তো সময় শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ

করে শহীদ হয়ে চিরস্থায়ী জান্নাতে নিজেদের আবাস গড়ে নেয়ার! সুতরাং জিহাদের এই ফ্রন্ট ত্যাগ করে তোমরা চলে যেওনা।'

অধিকাংশ স্বেচ্ছাসেবক মুজাহিদ ঈগলের এই আহ্বানে সাড়া দিল। ঈগল তাদেরকে একটি ট্রাক যোগে দজলার তীরে মেজর আসাদুল্লাহ সাহেবের বাগানবাড়ীতে পাঠিয়ে দিল। ইতিমধ্যে সেখানে মানুষের জটলা দেখে একটি পুলিশ ভ্যান এগিয়ে এলো। গাড়ি থেকে পুলিশ অফিসার জনাব ইউসুফ আদনান নেমে এলেন। তিনি ঈগলকে জিজ্ঞেস করলেন–ঈগল তুমি কি করছ এখানে?'

'আমি যা খুশি তাই করছি, তাতে আপনার প্রয়োজন কি? বলল ঈগল–আপনি মার্কিনীদের গোলামী মেনে নিয়ে, আপন দেশের স্বাধীনতা বিক্রয়কারীদের খাতায় নাম লিখিয়েছেন আর আমি সেই খাতাটিকে জ্বালিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছি। এখন আপনার মতলব কি? আমাকে গ্রেফতার করবেন? তবে করুন! স্বেচ্ছায় আমি আপনার সম্মুখে হাত বাড়িয়ে দিলাম। আমাকে নিয়ে বিদেশী প্রভূদের হাতে তুলে দিন আর কর্তব্য পালনের তৃপ্তির ঢেকুর তুলুন।'

পুলিশ অফিসার ইউসুফ সাহেব ঈগলের হাত দুটি ধরে চুমু দিয়ে বললেন 'বাবা ঈগল! আমাকে আর লজ্জা দিওনা! আমি আর এক মুহূর্তও মার্কিনীদের দালালী করবো না। আমি আজ থেকে তোমাদের সাথে কাজ করবো। বল আমাকে কি করতে হবে? আমার এই সঙ্গীরাও আমাকে অনেকবার নিষেধ করেছিল মার্কিনীদের দালালী করতে। এদের মন-মানসিকতাও তোমার মত। এরা দেশের জন্য, ধর্মের জন্য জান কোরবান করতে চায়।'

পুলিশ অফিসারের এই বেদোধায় হওয়ায় ঈগল খুশি হল। সে বলল 'আপনার সুমতি হওয়ায় আপনাকে অসংখ্য মোবারকবাদ। আপনার ছেলে বাশির আমার সাথেই কাজ করছে। আপনি যদি আমাদের সহযোগিতা করতে চান, তবে চাকুরি ছাড়ার প্রয়োজন নেই। চাকরিতে বহাল থাকলেই বরং আমাদের বেশী সহযোগিতা করতে পারবেন। আপাদত আপনি আপনার বাহিনীকে নিয়ে এই এলাকায়ই পূর্বের মত টহল দিতে থাকুন। যে সকল স্বেচ্ছাসেবক বিদেশী মুজাহিদরা ইরাক ত্যাগ করে চলে যেতে চাইবে তাদের বুঝিয়ে আমার এই ঠিকানায় পাটিয়ে দিবেন।' বলে একটি কাগজে লিখিত ঠিকানাটি পুলিশ অফিসারের প্রতি বাড়িয়ে দিল। শেষে আরও বলল, এবং যাদেরকে আপনি পাঠাবেন তাদেরকে আপনার সহিযুক্ত এক টুকরা কাগজ দিয়ে দিবেন।'

পুলিশ অফিসারকে সীমান্ত এলাকার দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে ঈগল গাড়ি ছুটালো বিন লাদেনের প্রতিনিধির সন্ধান করার নিমিত্তে। সে ইতিপূর্বে একটি ঠিকানা জেনেছিল যেখানে বিন লাদেনের প্রতিনিধির বর্তমানে অবস্থান করার কথা। ঈগল গাড়ি নিয়ে সরাসরি সেখানেই চলে আসল। গাড়ি রাস্তার পার্শ্বে পার্ক করে ঢুকে পড়ল বাড়ির ভিতর। সহসাই তার কর্ণগোচর হল একটি শব্দ 'থামুন।' হঠাৎ এ শব্দ শুনে ঈগল থমকে দাঁড়াল।

চারিদিকে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল না। পরক্ষণেই একটি কোড সংকেত ভেসে আসল। এ সেই কোড, যা কোন আফগান মুজাহিদই কেবল বুঝতে পারে। এবার ঈগল অনেকটা আশান্বিত হয়ে প্রতিউত্তর করল। সাথে সাথে তার পিছন দিক থেকে একজোড়া হাত চলে এসে তার চোখ দুটি বেঁধে ফেলল কালো কাপড় দিয়ে। ঈগল ঠাঁয় দাঁড়িয়ে রইল। অতঃপর কে যেন তার হাত ধরে বলল, আমার সাথে হাটুন। ঈগল যন্ত্রচালিত পুতুলের মত তার সাথে হাটতে লাগল। অল্প সময় সম্মুখে হাটার পর, সে ব্যক্তি তাকে নিয়ে একটি ছয়তলা বিল্ডিংয়ের ৪র্থ তলায় আসল। দুটি কক্ষ পিছনে ফেলে তৃতীয় কক্ষটিতে তাকে নিয়ে বসাল। লোকটি রুম থেকে বেড়িয়ে গেল। সাথে সাথে রুমে প্রবেশ করল একজন মধ্যবয়সী লোক। তিনি ঈগলের চোখের বাঁধন খুলে দিলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন 'বেটা! তোমার নাম কি?'

'আমার নাম ওমর শুজা। কিন্তু এখন বাগদাদের ঈগল বলেই সবে ডাকে।'

'তাই বল! তোমার কথাই আমরা এতক্ষণ আলোচনা করছিলাম। তো বেটা! তুমি এখানে এলে কি মনে করে, আর এখানকার ঠিকানাইবা পেলে কোথায়, কার কাছে?'

'আমি এসেছি জনাব মুসাব আল-জারকাবির সঙ্গে সাক্ষাত করতে। আর তিনি যে এখানে আছেন, তা আমাকে বলেছে ইয়াকুব হোসাইন আল-নজদী।'

'হ্যাঁ, ইয়াকুব তোমাকে সঠিক ঠিকানাই দিয়েছে এবং তুমিও সঠিক স্থানেই এসেছো। তবে জারকাবি সাহেব একানে নেই। তাঁর সাথে দেখা করতে হলে আমার সঙ্গে চলো।' এই বলে মধ্যবয়সী লোকটি ঈগলকে নিয়ে রুম থেকে বেড়িয়ে সিঁড়ি পেড়িয়ে নিচে নেমে আসলেন। সেখান থেকে পূর্ব দিকে দু'তিনটা বাড়ি পেড়িয়ে এক তলা বিশিষ্ট একটা বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়লেন তারা। দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকলেন–হে আবু সুলাইম!'

ভিতর থেকে দরজা খুলে বেরুলো সাত-আট বছরের একটি ফুটফুটে বালক। এর নামই সুলাইম। সে বলল, 'আব্বু বাড়িতে নেই, আপনারা ভিতরে আসুন।' তারা ঘরে প্রবেশ করলেন। মধ্যবয়সী লোকটি সুলাইমকে জিজ্ঞেস করলেন, 'মেহমান কি করছেন? এখন কি দেখা করা যাবে তাঁর সাথে?'

'তিনি কোরআন তিলাওয়াত করছেন। অবশ্যই দেখা করা যাবে। আপনার কথা কিছুক্ষণ পূর্বে তিনি জিজ্ঞেসও করেছিলেন।' বলল সুলাইম।

'তবে আর এখানে দেরী করা নয়, চল তাঁর সাথে সাক্ষাত করি।' বলেই তিনি দাঁড়ালেন। সুলাইম আগে হাটল। ঈগল তাদের অনুগমন করল। ঈগল লক্ষ্য করল, ছোট বাচ্চাটি কিছু সামনে গিয়েই দেয়ালে সাটানো একটি সুইস চাপল। সহসাই ভূগর্ভস্থ কক্ষের প্রবেশ পথ তাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হলো। একে একে তিনজনই ঢুকে পড়ল ভিতরে। চলে গেলেন জারকাবির আস্তানায়।

এই বাংকারটি মধ্যম ধরনের। মেঝের এক পার্শ্বে একটি কার্পেট বিছানো। তাতেই বসে আছেন বিন লাদেনের প্রতিনিধি মুসাব আল-জারকাবি সাহেব। বাকী সম্পূর্ণ কক্ষ বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র-গোলাবারুদ ও নানা রকম যুদ্ধ সামগ্রীতে পরিপূর্ণ। সালমান ও মধ্যবয়সী লোকটি ভিতরে ঢুকে তাঁর পাশে বসে পড়ল। তিনি কুরআন তিলাওয়াত বন্ধ করে তাদের দিকে তাকালেন। সুলাইমকে লক্ষ্য করে বললেন, 'সুলাইম! এইমাত্র তোমার কাছে মনসুর ভাইয়ের কথা জিজ্ঞেস করলাম আর সাথে সাথেই তাকে ধরে নিয়ে এলে? তুমিতো দারুন পটু ছেলে!' বলেই তিনি মুচকি হেসে জনাব মানসুর আহমেদের দিকে মুসাফেহার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন। মুসাফেহা করলেন ঈগলের সাথেও।

সালাম-মুসাফেহার পর জারকাবি সাহেব জিজ্ঞেস করলেন 'মানসুর ভাই! সবদিকের সব কাজ ঠিকভাবে চলছো তো?'

'প্রত্যাশার চেয়েও ভাল কাজ হচ্ছে।' বললেন মানসুর আহমেদ।

'এই যুবক কে?' ঈগলকে ইঙ্গিত করে জানতে চাইলেন জারকাবি সাহেব।

'এই তো সেই ঈগল! যার কথা গতকাল আমি আপনাকে বলেছিলাম।' বললেন মনসুর আহমেদ।

জারকাবি সাহেব আনন্দিত হয়ে ঈগলকে টেনে জড়িয়ে ধরলেন বুকের সাথে। বললেন, 'ঈগল! শেষ পর্যন্ত উড়তে উড়তে তুমি আমার কাছেও এসে পড়লে? বল আমি তোমার কি খেদমত করতে পারি?'

'আমার সুনসীব যে, আপনারা আমার সম্বন্ধে ভাল ধারণা পোষণ করেন'–বলল ঈগল–'আমি তো আশংকায় ছিলাম আপনাকে খুঁজে পাব কিনা! পেলেও আমাকে গ্রহণযোগ্য লোক বিবেচনা করবেন কিনা! আল্লাহর শুকর যে, আমাদের পরিচয় পর্বে অধিক সময় ব্যয় হয়নি। সে যা হোক, এক্ষণে আপনার কাছে আমার নিবেদন, আপনি আমার সাথে একটু যাবেন।'

'কোথায় যাব তোমার সাথে ঈগল!' বললেন জারকাবি– 'কি উদ্দেশ্যেই বা যাব।'

ঈগল তাকে সমস্ত কিছু খুলে বলল, তিনি তার সাথে কোথায় যাবেন, কেন যাবেন। সব শুনে তিনি বললেন, 'তবে তো আমাকে যেতেই হবে। দেরী না করে চল এখনই যাই। মানসুর ভাই! আপনি তালহা, যুবায়ের এবং আব্দুল্লাহকে পাঠিয়ে দিন, ওরা আমার সাথে যাবে।'

নির্দেশ পেয়ে মানসুর আহমেদ তৎক্ষণাৎ ব্যাংকার থেকে বেড়িয়ে গেলেন। জারকাবি সাহেব অস্ত্র ডিপো থেকে চারটি হাতে বহনযোগ্য অস্ত্র এবং কয়েকটি গ্রেনেড এনে একপাশে রাখলেন।

পাঁচ মিনিটের ব্যবধানে সেখানে এসে হাজির হল আব্দুল্লাহ, যুবায়ের এবং তালহা। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাংকার থেকে বেড়িয়ে তারা ঈগলের গাড়িতে এসে বসল। ঈগল ফুলস্পিরিটে গাড়ি চালিয়ে দিল । চলল দজলার তীরে বাগান বাড়ীর উদ্দেশ্যে।

চলন্ত গাড়ি থেকে ঈগল লক্ষ্য করল রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত স্কুলটির মাঠে ৪-৫ জন ইরাকীকে দিগম্বর করে, হাত পিছনে বেধে দাঁড় করিয়ে রেখেছে মার্কিন সৈন্যরা। একটু দূরেই তাবুতে বসে মদ পান করে উল্লাস করছে মার্কিন কমান্ডার। তাবু থেকে ভেসে আসছে নারী কণ্ঠের আর্তনাদ।

নারী কণ্ঠের আর্তনাদ কানে আসতেই ঈগলের মাথায় খুন চেপে গেল। সৈন্যদের ক্যাম্পটির প্রায় ১০০ গজ সামনে গিয়েই গাড়ি থামিয়ে দিল সে। জারকাবি সাহেব জিজ্ঞেস করলেন 'কি হলো ঈগল! হঠাৎ ব্রেক কষলে যে?' সম্ভবত তিনি বিষয়টি লক্ষ্য করেননি। তাই এ প্রশ্ন করলেন।

ঈগল বলল, 'মুহতারাম! আমাদের পিছনেই এক মার্কিন ক্যাম্প। ক্যাম্পের বাইরে ৪-৫ জন ইরাকী নাগরিককে ওরা শাস্তি দিচ্ছে। এবং ক্যাম্পের ভিতরের তাবুতে ইরাকী কন্যাদের ওপর নির্যাতন চালাচ্ছে। আমার কানে নারী কণ্ঠের আর্তনাদ পৌঁছেছে। আমি এর একটা বিহীত না করে এ স্থান ত্যাগ করছি না। আপনাকে আমি ঠিকানা বলে দিচ্ছি সেখানে পৌঁছলেই মেজর আসাদুল্লাহ সাহেব এবং পাকিস্তানী সাংবাদিক সালমান কোরেশীর দেখা পেয়ে যাবেন।' এই বলে ঈগল গাড়ি থেকে নেমে গেল। জারকাবীর সাথে আসা আব্দুল্লাহ ড্রাইভিং সিটে বসে গাড়ি চালিয়ে গেল ঈগলের দেয়া ঠিকানামতে।

ঈগল গাড়ি থেকে নেমে অল্প সময়ের মধ্যে পৌঁছে যায় তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু শহীদ হাদীদ কামালের বাসায়। হাদীদের পিতা আবু বকর সাহেব ছেলের শোকে একেবারে ভেঙ্গে পড়েছেন। ঈগলকে পেয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন অনেকক্ষণ। ঈগল কি বলে যে তাকে সান্তনা দিবে, সে ভাষা সে খুঁজে পাচ্ছেনা। হাদীদের পিতার কান্নায় তারও দু'চোখ পানিতে ভরে গেল বন্ধু বিয়োগের বেদনায়।

অবশেষে ঈগল নিজেকে সামলে নিয়ে হাদীদের পিতাকে শান্তনা দিল এই বলে যে, 'চাচা! কেঁদে আর কি হবে? একদিন আমি-আপনিও চলে যাবো এই দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করে। কি অবস্থায় যাবো জানিনা। কিন্তু আপনার হাদীদ অত্যন্ত ভাগ্যবান যে, সে শহীদ হয়েছে। সে ইরাকী মুসলমানদের ইজ্জত আব্রু হেফাযত করতে গিয়ে আপন জীবন কোরবান করল। আপনার হাদীদ অবশ্যই সৌভাগ্যশালী যে, সে শহীদ হয়ে চিরস্থায়ী জান্নাতে নিজের আবাস তৈরী সুনিশ্চিত করে নিল। কেননা আমাদের সর্দার হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) বলিয়াছেন–শহীদকে সাতটি পুরস্কার দেওয়া হইবে (১) প্রথম ফোটা রক্তপাতের সঙ্গে সঙ্গেই তার সমস্ত পাপ মাফ করে দেয়া হবে এবং মৃত্যুর সময়ই তাকে তার বেহেশতের স্থান দেখিয়ে দেয়া হবে (সেই আনন্দে তার মৃত্যু-যন্ত্রণা আদৌ হবে না) (২) তাকে ঈমানের খালাত (সম্মানের পোষাক) দেয়া হবে। (৩) কবর আজাব হবেনা। (৪) হাশরের ময়দানের ভীষণ অশান্তি ও অস্থিরতার কষ্ট তার ভোগ করতে হবেনা। (৫) তাকে সম্মানের তাজ দান করা হবে; সেই তাজের একটি মতি সারা দুনিয়ার মনিমুক্ত হীরা সোনা অপেক্ষা অধিক মূল্যবান এবং জ্যোতির্ময় হবে। (৬) তাকে ৭২টি হুর দান করা হবে এবং

(৭) তার আত্মীয় স্বজনের মধ্য হতে ৭০ জনের জন্য তার সুপারিশ কবুল করা হবে।' তিনি আরও বলেছেন–বেহেশত এমন চির শান্তির নিকেতন যে, তথায় একবার কেহ প্রবেশাধিকার পেলে সারা দুনিয়ার ধনরত্নের তাকে মালিক করে দিলেও সে আর দুনিয়াতে ফিরে আসতে রাজী হবেনা। কিন্তু শহীদ এত বড় মর্যাদা পাবে যে, সে ঐ মর্তবা আরও বাড়ানোর জন্য দশবার দুনিয়াতে এসে দশবার শহীদ হয়ে সেই মর্যাদা পাবার তামান্না করবে।' সুতরাং ভাই হাদীদের এই উচ্চ মর্যাদা পাওয়াতে আপনাকে দুঃখ না করে বরং খুশী হওয়া উচিত।

'ঈগল! আমার জন্য দোয়া কর'–কান্না জড়িত কণ্ঠেই বললেন আবু বকর সাহেব–'আমি যেন বাবা হাদীদের শহীদ হওয়ার উপর খুশী হতে পারি।'

'বিশ্বজাহানের মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে দোয়া করি, তিনি যেন আপনাকে হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর মত 'সবরে জামিল' দান করেন–বলল ঈগল– কিন্তু চাচাজান! আমি এক্ষণে আপনার সকাশে এসেছি অত্যন্ত জরুরী একটি বিষয়ে আপনার সহযোগীতা পাওয়ার আশায়।'

'বল বাবা ঈগল! আমি তোমার কি সহায়তা করতে পারি? বললেন আবু বকর সাহেব।

'এই মাত্র আমি দেখে আসলাম মার্কিন সৈন্যরা ক্যাম্পের বাইরে ৪-৫ জন ইরাকী পুরুষকে উলংগ করে শাস্তি দিচ্ছে এবং ক্যাম্পের তাবুতে মেয়েদের উপর পাশবিকতার তান্ডব চালাচ্ছে। আমি ইরাকী কন্যাদের আর্ত চিৎকার শুনেছি। তাই এদেরকে উদ্ধার করার শপথ নিয়েছি আমি। এজন্য আমার একটি গাড়ির প্রয়োজন।'

'গাড়ি একটি নয়, তোমার যতটি প্রয়োজন নিয়ে যাও গ্যারেজ থেকে। বললেন আবু বকর সাহেব তবুও ঐ অসহায় বন্দীদের তুমি উদ্ধার কর ঈগল!'

'গাড়ি হলে শুধু বন্দীদের মুক্তই করবনা'–বলল ঈগল–'সে সাথে শয়তানের সৈন্যদেরও খতম করব ইনশাআল্লাহ্! চাচা আপনি শুধু আমার সফলতার জন্য দু'য়া করবেন। কেননা এই অভিযান এতটাই ঝুঁকিপূর্ণ এবং শ্বাসরুদ্ধকর হবে যে, হয়তো বন্দীরা মুক্ত হলেও, আমি শেষ হয়ে যাবো। তবে আমি সে পরোয়া করিনা। কারণ আমার হায়াত যতটুকু আছে আমি ঠিক ততটুকুই বাঁচব; তার বেশী নয়। অবশ্য আমি শহীদ হলে আপনি একটু কষ্ট করে সংবাদটি আমার ফুফা মেজর আসাদুল্লাহ সাহেবের কাছে পৌঁছাবেন।'

'না ঈগল ভাইয়া! এই ঝুঁকিপূর্ণ অভিযানে তোমাকে আমি কিছুতেই একা যেতে দেব না। আমিও যাবো তোমার সাথে।' ঘরের ভিতর থেকে এসে বেদনার্ত কণ্ঠে বলল, হাদীদের বোন সুমাইয়া আফরোজ।

'তবে কি বন্দীদের মুক্ত করানো লাগবে না সুমাইয়া!' বলল ঈগল–'তোমার প্রাণপ্রিয় ভাই হাদীদ কামাল ইরাকী জনতার ইজ্জত-আব্রু হেফাযত করতে গিয়ে জীবন দিল–শহীদ

হলো। আর আমি তাদের বেহুরমতী হতে দেখেও চুপষে যাবো। নীরব থাকবো। প্রতিশোধ নিবো না! তুমি আমাকে সেই কথা বলছো? সেটা কখনই সম্ভব নয়। আমি তোমার কথাটি কিছুতেই মানতে পারবো না। এমনটি হলে আমার শহীদ বন্ধু হাদীদ কামালের আত্মা আমাকে অভিসম্পাদ করবে।'

'আমি তোমাকে যেতে নিষেধও করব না, বাধাও দিবনা বরং আমিও যাবো তোমার সাথে।' বলল সুমাইয়া।

'তুমি আমার সাথে গিয়ে কি করবে সুমাইয়া?

'কিছু করতে না পারলেও তোমার সাথে মরতে তো পার'– বলল সুমাইয়া– 'তুমি জাননা ঈগল ভাইয়া! আমার অন্তরে প্রতিশোধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। যারা আমার প্রাণ প্রিয় ভাইটিকে হত্যা করেছে ওদের দু'চারজনকে হত্যা করতে না পারলে এ আগুন আদৌ প্রশমিত হবেনা। ভাইয়ের শোকে আমার খাওয়া-নাওয়া, আরাম-বিশ্রাম সব হারাম হয়ে গেছে। আমার থেকেও করুন অবস্থা আম্মাজানের। তিনি শোকে তাপে প্রায় শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন। দিন-রাত অনবরত শুধু কাঁদছেন আর কাঁদছেন। সুতরাং প্রতিশোধ আমাকে নিতেই হবে। ভাইয়া! মেহেরবাণী করে তুমি আমাকে সঙ্গে নিয়ে নাও। আমি তোমার কোন ঝামেলা বৃদ্ধি করবনা বরং আমার দৃঢ় বিশ্বাস তোমার সহযোগীতাই করতে পারবো ইনশাআল্লাহ্!'

সুমাইয়া আফরোজের কথা শুনে ঈগল তাকে আর না করতে পারলো না। সে তাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি আমাকে কি ধরনের সহযোগিতা করবে সুমাইয়া?'

'তুমি যদি আমাকে সঙ্গে নেয়ার ওয়াদা করতে পারো, তবেই বলব আমি তোমার অভিযানে কি ধরনের সহযোগিতা করব। আমার কৌশল অনুযায়ী কাজ করলে তোমার জীবনেরও বেশী একটা ঝুঁকি থাকবে না। বন্দীরাও নিরাপদে মুক্ত হতে পারবে এবং ধ্বংস হবে ক্যাম্পসহ মার্কিন সৈন্যও ভাগ্য ভাল হলে গণিমত হাসিলেরও আশা আছে।'

'আমি কথা দিচ্ছি তোমাকে সাথে নিব'–বলল ঈগল–'তুমি এখন বল কিভাবে কি করবো!'

এরই মধ্যে আবু বকর সাহেব কি কাজে যেন বাইরে চলে গেলেন। সুমাইয়া বলল, ভালই হয়েছে আব্বু বাইরে গেলেন। এই পরিকল্পনার কথা তিনি শুনলে হয়তো আমাকে তোমার সাথে যেতে দিতেন না।' এরপর সুমাইয়া তার পরিকল্পনাটি বিস্তারিত বর্ণনা করল ঈগলের নিকট। তা শুনে ঈগল বলল, 'এ জন্যই তো বলে, মেয়েদের হঠাৎ বুদ্ধি। সুমাইয়া! তোমার এই কৌশল যদি সফল হয়, তবে তোমার পূর্বের প্রস্তাবটি আমি বিবেচনা করে দেখব। যাও তুমি সাজ-গোজ করে এসো।'

ঈগল সুমাইয়ার কি প্রস্তাব বিবেচনা করবে? কিসের প্রস্তাব দিয়েছিল ইতিপূর্বে সুমাইয়া তাঁকে? হ্যাঁ, সে এক রোমাঞ্চকর অধ্যায়। আপাদত সে অধ্যায় না বলাই থাকল।

অল্প সময়ের ব্যবধানে সুমাইয়া তৈরী হয়ে বেড়িয়ে এলো ঘর থেকে। সুমাইয়ার মুখে চোখ ফেলে একেবারে থ হয়ে গেল ঈগল। সুমাইয়াকে সে ভালভাবে কখনও দেখেনি। দেখেনি মানে দেখার চেষ্টা করেনি; যেহেতু শরিয়ত নিষেধ, তাই। নতুবা হাদীদ কামালের একনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে বহুবার সে এ বাসায় এসেছে। সুমাইয়া সামনে আসলেও সর্বদা সে দৃষ্টি নীচু রেখেছে। সে জানতো তার বন্ধুর বোন সুমাইয়া অত্যন্ত সুন্দরী। কিন্তু এ মুহূর্তে সাজ-গোজ করা মোহাবিষ্ট সুন্দরী সুমাইয়া তার চোখ ধাধিয়ে দিল। সত্যিই ঈগল পারিপার্শ্বিক সব কিছু ভুলে গেল মুহূর্তের জন্য, এ যেন সেই স্বপ্ন কন্যা, যার কাল্পনিক ছবি হৃদয়পটে শুধু অংকিতই করা যায়; বাস্তবতায় মেলা ভার। আজ তেমন কল্পপরীর সম্মুখেই যেন বসে আছে ঈগল। মেয়েটি সত্যি কি মানুষ, নাকি জান্নাতের হুর-পরী। এমন পবিত্র কান্তিময় মেয়েমুখ ইতিপূর্বে আর দেখিনি সে। তার হৃদয়ের প্রতিটি কোষে ভালো লাগার ইমেজ মিশ্রিত হয়ে গেলো। সে কেমন যেন আনমনা হয়ে গেল। 'এমন তো হয়নি তার আর কোনদিন! আজ কেন এমন হচ্ছে?'

ঈগলকে এভাবে চেয়ে থাকতে দেখে সুমাইয়া লজ্জা পেল। সে বলল, 'কি হলো ঈগল ভাইয়া! তুমি যে একেবারে থ হয়ে বসে আছো? অভিযানে বেরুবে না?' সুমাইয়ার কথায় ঈগল সম্বিৎ ফিরে পেল। অভিযানের কথা স্মরণ হতেই ভালোবাসার অনুভূতি ভুলে গেল সে। বলল, 'হ্যাঁ, জলদি চলো! অনেক দেরী হয়ে যাচ্ছে।'

তারা দু'জন ঘর থেকে বেরিয়ে একটি গাড়ি নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ল। ঈগল ড্রাইভ করছে। সুমাইয়া চুপচাপ বসে আছে পিছনের সিটে। সে মনে মনে তার কৌশল সফলের জন্য মহান আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানাতে লাগল। কেননা সে জানে, তাদের কৌশল যতই সূক্ষ্ম এবং বাস্তবধর্মী হউক না কেন, আল্লাহর সাহায্য ছাড়া শত্রুর উপর বিজয়ী হওয়া কোনদিনই সম্ভব নয়।

ঈগল গাড়ি নিয়ে প্রথমে গেল নিজের আন্ডার গ্রাউন্ড আস্তানায়। সেখান থেকে গাড়ির নির্দিষ্ট স্থানে প্রয়োজনীয় বিস্ফোরক ভর্তি করে নিল। সুমাইয়ার হাতে একটি অত্যাধুনিক মোবাইল ফোন এবং ছোট্ট একটি কৌটা দিল। সুমাইয়া তা লুকিয়ে ফেলল নিজের শরীরের নিরাপদ স্থানে। তারপর নিয়ে গাড়ি ধেয়ে চলল মার্কিন ক্যাম্পের দিকে। ক্যাম্প থেকে নিরাপদ দূরত্বে গাড়ি থামিয়ে সে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। সুমাইয়া বসে রইল গাড়ির ভিতর।

পরিকল্পনা মাফিক ঈগল ঢুকে পড়ল মার্কিন সৈন্যদের ক্যাম্পে। সন্ধ্যা পেড়িয়ে গেছে বেশ সময় হলো। ডিউটিরত পাহারাদার সৈনিক আগলে দাঁড়াল তার পথ। সে সৈনিকের সাথে এমন কিছু কথা বলল, যা সাধারণত মার্কিনীদের দালালেরাই বলে থাকে। তার কথা শুনে এই সৈনিকও তাকে তাদের লোক বলে বিশ্বাস করল। কিন্তু এ মুহূর্তে ক্যাম্পের ভিতরে প্রবেশ করতে দেয়া যাবেনা বলল, আগামীকাল ভোরে আসতে। ঈগল তখন নতুন গুটি চালল। পকেট থেকে ৫০ ডলার বের করে সৈনিকটির হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল,

কামান্ডারের সাথে আমার কিছু জরুরী আলাপ আছে যা সকালে নয় এখনই করতে হবে।' সৈনিকটি বলল, ঠিক আছে তুমি এখানে অপেক্ষা কর, আমি স্যারের কাছে জিজ্ঞেস করে আসি তিনি এখন তোমার সাথে কথা বলবেন কিনা।' বলেই সে ক্যাম্পের তাবুতে চলে গেল।

ঈগল এই ফাকে দেখে নিলো ক্যাম্পের সার্বিক অবস্থা। কোনখানে অস্ত্রের ডিপো, কোনখানে বন্ধীদের রাখা হয়েছে, তা দেখতে লাগল। হঠাৎ কারো বেদনার্ত কণ্ঠস্বর ভেসে এলো তার কানে। ঈগল সে দিকে এগিয়ে দেখল, সংকীর্ণ একটি রুমের মধ্যে বন্দীরা পরে আছে বেহাল অবস্থায়। এই শীতের রাতেও তাদের উলঙ্গ অবস্থায়ই রাখা হয়েছে। শীতে ঠক ঠক করে কাঁপছে তারা। একে অপরের গায়ের সাথে জরাজরি করে শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচার কোশেষ করছে। তাদের এ করুণ অবস্থা দেখে ঈগলের বুক ফেটে কান্না আসল। অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিল সে। এরই মধ্যে প্রহরী সৈনিক এসে পড়ল। ঈগলকে বন্দীদের কক্ষের দিক থেকে আসতে দেখে সে বলে উঠল, ওখানে কি করছিলে তুমি?

'কিছু নয় দোস্ত! দেখছিলাম ওই নির্বোধগুলোর অবস্থা'– বলল ঈগল– 'মার্কিন বাহিনী আমাদের মুক্তি দেয়ার জন্য কত কষ্ট স্বীকার করছে আর এই নির্বোধেরা তাদের বিরোধিতা করছে। এমন অকৃতজ্ঞদের এত অল্প সাজায় হয়না; আরও কঠিন শাস্তি দেয়া দরকার।' ঈগলের বক্তব্যে সৈন্যটি আশ্বস্ত হল, কোনরূপ সন্দেহ করল না তাঁকে। সে ঈগলকে লক্ষ্য করে বলল, 'তোমার সুনসীব যে, স্যার সাক্ষাতের অনুমতি দিয়েছেন। যাও, ভিতরে চলে যাও!'

ঈগল সাথে সাথে কমান্ডারের তাবুর দিকে হাটা দিল। প্রসস্ত তাবু। ভিতরে হাজার পাওয়ারের একটি বাল্ব জ্বলছে। দূর থেকেই তাবুর আলো দৃষ্টিগোচর হয়। সে গিয়ে দরজার পর্দাটি উঠিয়ে ভিতরে তাকাল। ভিতরের চিত্র দেখে তার চোখ তো ছানাবড়া। তিনটি মেয়ে অর্ধনগ্ন পোষাক পরিহিতা। কমান্ডারও রাতের পোষাকে তার বিছানায় আধশোয়া। এরা সেই দুর্ভাগা ইরাকী মেয়ে। তাদেরকে এই পোষাকগুলো পড়ানো হয়েছে জোর করে। তারা এ নোংরা পোষাক পড়ায় আদৌ অভ্যস্ত নয়। একটি মেয়ে তখনও ফুফিয়ে কাঁদছে। অন্য দু'জনের মুখেও মলিনতার ছাপ সুস্পষ্ট। তারা দু'জনে কমান্ডারের শরীর টিপে দিচ্ছে। অন্য মেয়েটি এই দু'জনের চেয়ে বেশী সুন্দরী এবং বয়সও কম বলে মনে হচ্ছে। সে পৃথক এক খাটে বসে কাঁদছে। এ দৃশ্য দেখে ঈগলের পায়ের রক্ত মাথায় উঠে গেল। আত্মনিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলার উপক্রম হলো তার। তবু কোনমতে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে জোরপূর্বক মুখে হাসি টেনে বলল, 'গুড নাইট! মে আই কাম ইন স্যার?'

কমান্ডারের উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে ভিতরে ঢুকে গেল। কমান্ডার হাসি মুখে তাকে স্বাগত জানাল। হ্যান্ডসেকের জন্য হাত বাড়িয়ে দিল। সেও আন্তরিকভাবেই হাত

মিলিয়ে বলল, 'এই অসময় শাহেন শাহের আরামে ব্যাঘাত ঘটায় আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত। কিন্তু শাহেন শাহ যদি শুনেন যে তাকে কেন আমি কষ্ট দিচ্ছি, তবে খুশী না হয়ে পারবেন না। উপরন্তু তখন আমাকে পুরষ্কৃতও করতে পারেন।'

ঈগলের এ কথা শুনে কমান্ডার উৎসুক হয়ে বলল, 'এমন কি কথা বাছা! জলদি তা আমাকে শুনাও।'

'তা বলছি, তবে তার আগে শাহেনশাহের নিকট জানতে চাচ্ছি যে, এই মেয়েগুলোর এ অবস্থা কেন?'– বলল ঈগল – 'একজন কাদছে, অন্য দু'জনের মুখও মলিন দেখাচ্ছে?'

'আর বলনা বেটা! এরা বড় বেয়াড়া মেয়ে। একটুও কথা শুনতে চায় না। এই দু'টোকে ডাণ্ডা মেরে কিছুটা ঠাণ্ডা করা হয়েছে। কিন্তু–

ওটাকে সবেমাত্র আজই আনা হয়েছে। ওর কাছেও যাওয়া যাচ্ছে না। কিছুটা কম বয়সী ছোট মেয়েটির প্রতি ইঙ্গিত করে বলল কমান্ডার, কাছে গেলেই নাগিনীর মত ছো' মারতে চায়। তবে অল্প সময়ের মধ্যে ওর তেজও কমিয়ে ফেলা হবে।' বলেই হো হো করে হেসে উঠল মানবরূপী দানব এই কুলাঙ্গার কমান্ডার।

ঈগলও কমান্ডারের সুরে সুরে মিলিয়ে মেয়েদেরকে লক্ষ করে বলতে লাগল, 'হে ইরাকী কন্যাগণ! তোমরা স্বেচ্ছায় আমাদের এই সম্মানিত মেহমানদের খেদমতে নিজেদের দেহমন নিবেদন করে দাও। কেননা মেহমানের খেদমত করা তোমাদের কর্তব্য; ফরজ। তাছাড়া আমাদের এই মার্কিনী মেহমানরা বড় দয়ালু মানুষ। দেখছোনা! তারা আমাদেরকে জালিম সাদ্দামের জুলুম থেকে মুক্তি দিতে কত কষ্ট করে সাত সাগর, তের নদী পারি দিয়ে ইরাকে এসেছেন। এরা এসেছেন শুধু আমাদের মুক্তি দিতে। সাদ্দামের এক নায়কতান্ত্রিকতার অক্টোপাশ থেকে মুক্ত করে ইরাকীদেরকে তাদের মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকার ফিরিয়ে দেয়াই মূলত আমাদের মার্কিন বন্ধুদের ইরাক আগমনের মূল লক্ষ্য। আমাদের এই সম্মানিত মেহমানরা আমাদের উপকার করতে এসে আজ বহুদিন স্ত্রী-প্রিয়ার প্রেম-ভালবাসা আর আদর সোহাগ থেকে বঞ্চিত। তাদের অন্তরগুলো শুষ্ক মরুভূমির ন্যায় তৃষ্ণার্ত।'

'হে উদার চিত্ত ইরাকী ললনারা! তোমরা তাই আনন্দচিত্তে তাদের একটু ভালবাসা, একটু মধুর ছোয়া দিতে কার্পণ্য করোনা! তোমাদের রূপ-যৌবনের হেবা আর আন্তরিকতাপূর্ণ সেবাই মিটাতে পারে তাদের অপূর্ণ প্রেম পিপাসা। দীর্ঘদিনের বিরহ যাতনা। তাদের সামনে এভাবে...।

ঈগল তার কথা শেষ করতে পারল না। এরই মধ্যে তৃতীয় মেয়ে একটি বালিশ ছুড়ে মারল ঈগলের মুখের উপর। এরপর তার নিজের ভাষায় ঈগলকে গাদ্দার, বেঈমান, মুনাফেক বলে গাল দিতে লাগল। কমান্ডার তা না বুঝলেও ঈগল ঠিকই বুঝল। তাই এ প্রসঙ্গে আর কথা না বলে প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে কমান্ডারকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'স্যার এ

মেয়েগুলি আসলেই জেদী। এদের দিয়ে সেবা নেয়া কঠিন। তাতে মনের তৃপ্তিও পরিপূর্ণভাবে পাবেন না। তবে চিন্তার কোন কারণ নেই। আপনাদের যাতে তৃপ্তি হয়, মন আনন্দে ভরে যায়–এ চিন্তা আমার আছে এরা আর কি সুন্দরী! এদের চেয়ে হাজারগুণ বেশী সুন্দরীদেরকে আমি শাহেন শাহের খেদমতের জন্য তৈরী করে রেখেছি। যারা আপনার সাথে রাত কাটাতে এবং আপানার সেবা করতে পারাকে নিজেদের সৌভাগ্য বিবেচনা করে থাকে। তাদের একজনকে আমি শাহেন শাহের খেদমতে নিয়েও এসেছি।'

একথা শুনে কমান্ডার ব্যাকুল হয়ে বলল, 'কেথায় তোমার সেই সুন্দরী ললনা বাছা!'

'সে কথা জিজ্ঞেস করার জন্যই আমি শাহেন শাহের সকাশে এসেছি–বলল ঈগল–তাকে এ মুহূর্তে নিয়ে আসব কিনা!'

'তা কি আবার জিজ্ঞেস করতে হয়'– বলল কমান্ডার–'এক্ষুণি নিয়ে আসো তাকে।'

ঈগল তখনই তাবু থেকে বের হয়ে গেল। সেখান থেকে সোজা চলে গেল গাড়ির নিকট। অল্প সময়ের ব্যবধানে সুমাইয়াকে নিয়ে পৌঁছে গেল কমান্ডারের তাবুতে। সুমাইয়ার রূপ দেখে কমান্ডার হতভম্ব হয়ে গেল। এমন ভুবন মোহিনী রূপ সে জীবনে দেখেনি। সে ঈগলকে লক্ষ্য করে বলল, 'বেটী! একি মানুষী নাকি স্বর্গের অপ্সরা নিয়ে এসেছো তুমি? আমি জীবনে বহুদেশ ঘুরেছি, ইউরোপ আমেরিকা, প্যারিস, সিঙ্গাপুর কোথাও এমন তুলনাহীন অপরূপা সুন্দরী দেখিনি আমি। বল! এতবড় উপহারের বিনিময়ে তোমাকে আমি কি দিয়ে খুশী করতে পারি?'

'কোন পুরস্কার পাওয়ার আশায় একে আমি শাহেন শাহের খেদমতে আনিনি' –বলল ঈগল– 'শুধুমাত্র শাহেন শাহের মন খুশি করাই আমার উদ্দেশ্য। এতেই আমি সুখী।'

'তুমি যখন আমাকে খুশী করার জন্য এত দামী উপহার পেশ করলে, তখন তোমাকে আমি খালি হাতে ফিরাই কি করে বাছা!' বলেই কমান্ডার মানি ব্যাগ খুলে পাঁচশ' ডলার জোর পূর্বক ঈগলের পকেটে পুড়ে দিল। ঈগল হাসি মুখে কমান্ডারের সাথে হাত মিলিয়ে সেখান থেকে চলে গেল।

ঈগল চলে গেলে কমান্ডার সুমাইয়ার দিকে মনযোগী হল। তাকে বসাল নিজের পাশটিতে। সুমাইয়ার শরীরের কড়া সেন্টের গন্ধে কমান্ডার মাতাল হয়ে গেল। তার চিবুক ধরে উপরের দিকে তুলে জিজ্ঞেস করল, 'বল সুন্দরী! তোমাকে আমি কি দিয়ে খুশী করতে পারি? তুমি চাইলে আকাশের তারকাও এনে আমি তোমার হাতে দিব।'

'এই মেয়েদেরকে এক্ষুণি এখান থেকে বের করে বন্দীদের সাথে আটক করে রাখা হোক তাতেই আমি খুশি হব–বলল সুমাইয়া–মার্কিন কমান্ডারের সাথে বেয়াদবী আচরণকারীনীদের আমি আর এক মুহূর্তের জন্য এইখানে দেখতে চাইনা।'

সুমাইয়ার এ কথা শুনে সাথে সাথে কমান্ডার অনুগত চাকরের মত বিছানা ছেড়ে নেমে কয়েকজন সৈনিককে ডেকে বলল, এদেরকে এক্ষুণি নিয়ে অন্যান্য বন্দীদের সাথে হাত পায়ে শিকল পড়িয়ে ফেলে রাখো।

সৈনিকেরা কথামত কাজ করল। মেয়েদেরকে নিয়ে গেল তাবু থেকে। এবার যেন সুমাইয়া হাফ ছেড়ে বাঁচল এমনভাব করে বলল, 'যখন আমি শুনতে পেলাম আমাদের সম্মানিত মেহমানদের সেবায় এ সকল মেয়েরা আন্তরিক নয়, তখনই এদের প্রতি আমার রাগ চাপে। এখন এদেরকে বন্দী করিয়ে আমার সে রাগ কিছুটা প্রশমিত হয়েছে।'

সুমাইয়ার কথায় কমান্ডার তো খুশীতে বাগ বাগ। তার আনন্দ যেন ঠাঁই দেয়ার জায়গা নেই। এমন হৃদয়কারা ভুবনমোহিনী সুন্দরী তার প্রেমে দিওয়ানা। তার সেবায় সে জান-প্রাণ উজার করে দিতে চায়। এমন সৌভাগ্য ক'জনের আছে। সে আজ প্রেসিডেন্ট বুশের চেয়েও সুখী। এমনই ভাব তার এ মুহূর্তে। তাই সুমাইয়াকে বলল, 'বলনা সুন্দরী! এবার কি তুমি খুশী হয়েছ।'

'আমি এখনও পুরোপুরি খুশী হতে পারিনি' –বলল সুমাইয়া– 'আপনার তাবুটিকে আমার কাছে অরক্ষিত মনে হচ্ছে। আমি আপনার জীবন নাশের আশংকা করছি। তা এজন্য যে, আমি যখন ক্যাম্পের গেট পেড়িয়ে ভিতরে প্রবেশ করি তখন প্রহরী সৈনিক আমাদেরকে সনাক্ত করার জন্য দাঁড় করিয়েছিল। তখন সে আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে ছিল যে, আমার ভয় হয় গভীর রাতে সে তাবুতে ঢুকে আপনাকে হত্যা করে আমাকে ছিনিয়ে নেয় কিনা! সে আমার সাথীকে এ ও বলেছিল, 'মেয়েটিকে আমার নিকট রেখে যাও।' আমার সাথী তাকে বুঝাল 'দেখ এ মেয়েকে এনেছি তোমাদের কমান্ডারের জন্য। এর প্রতি তোমার হাত বাড়ানো অন্যায়।' তখন সে দাতে দাত পিষে বলেছিল 'দেখি কিসে কি হয়।' আপনার জীবন নাশের আশংকাবোধ আমার সে জন্যই।'

সুমাইয়ার বক্তব্য শুনে কমান্ডার কেঁপে উঠল। তার মনে কিছুটা ভয়ের সঞ্চার হল। সে রাগত স্বরে বলল, 'ওর এত বড় সাহস! আমার ওপরে হস্তক্ষেপ করতে চায়। দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজাটা। শালা বেঈমান! ওকে এক্ষুনি আমি হত্যা করব।'

সুমাইয়া বলল, 'উত্তেজিত হবেন না জনাব! মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করুন।' বলেই পাশে রাখা মদের পিপার মুখ খুলে এক গ্লাস তুলে দিল তার হাতে। কমান্ডার ঢগ্ ঢগ্ করে গিলে গ্লাস খালি করে ফেলল। আরো দিতে বলল। সুমাইয়া আর এক গ্লাস ঢেলে দিল। এক নিমিষে এ গ্লাসও গিলে ফেলল। এরপর আরও চাইল। সুমাইয়া বলল এখনিই আর নয়, আগে নিরাপত্তার ব্যবস্থা জোরদার করুন। তারপর প্রাণ উজাড় করে পান করবেন, ফূর্তি করবেন।

কমান্ডার নেশাগ্রস্থ কণ্ঠে বলল, 'তবে আমি কি করবো সুন্দরী! তুমিই বলে দাও ওকে আমি কি শাস্তি দিতে পারি।' এ মুহূর্তে নিজেকে সে মনে করছে সারা দুনিয়ার সম্রাট

আর সুন্দরী সুমাইয়া সেই সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী এবং প্রহরী সৈনিক তার সেই স্বপ্ন রাজ্যের একমাত্র শত্রু; বিঘ্ন সৃষ্টিকারী। তাকে তার প্রতিহত করা চা-ই চাই!

সুমাইয়া বলল 'ওকে শাস্তি দেয়ার দরকার নেই, তাতে অন্য সৈনিকরা ক্ষেপে যেতে পারে। তারচেয়ে বরং ওকে শুধু পাহারায় রেখে বাকী সকল সৈন্যদেরকে আপনার তাবুর চতুর্দিকে ঘেরাও দিয়ে রাত যাপনের ব্যবস্থা করুন। তবে আর আপনার কোন ক্ষতির আশংকা থাকবে না। নিশ্চিন্ত মনে তখন রাত্রি যাপনের সুখ উপভোগ করতে পারবেন।'

সুমাইয়ার পরামর্শানুযায়ী কমান্ডার সকল সৈনিককে তার তাবুর চারপার্শ্বে এনে জমা করল। সৈন্যরা তাকে এর কারণ জিজ্ঞেস করার সাহস পেল না। কারণ লোকটা এমনিতেই বদমেজাজী তার উপর এখন সে নেশাগ্রস্থ। তাই বাহিরের ঠান্ডাকে উপেক্ষা করে তারা তাদের কমান্ডারের তাবু পাহারা দিতে ব্যস্ত রইল। কমান্ডার এবার তাবুতে ঢুকে সুমাইয়াকে লক্ষ্য করে বলল, 'হে রূপসী ললনা এখন তুমি বলনা! মন খুশি কি হল না?

'হ্যাঁ এখন আর চিন্তার কোন কারণ নেই'–বলল সুমাইয়া– 'এবার নিশ্চিন্ত মনে পাণ করুন এবং ফূর্তি করুন। এ দাসী আপনার সেবায় উৎসর্গিত।'

'বিশ্বের সেরা প্রযুক্তিমন্ডিত দেশ আমেরিকা। সে নিত্য নতুন যন্ত্রপাতি আর কল-কব্জা আবিস্কার করে যেমন বিশ্বকে তাক লাগাচ্ছে, তেমনি তার অধিবাসীদের নৈতিক চরিত্রও সাধারণ বিশ্ববাসীকে তাক লাগানোর মত। এ দেশটিতে এমনসব বেল্লাল্লাপনার ঘটনা ঘটে চলছে যা আমাদের গতানুগতিক চিন্তার বাইরে। জেনা বা ব্যাভিচারকে মার্কিনীরা দৈনন্দিন জীবনের অঙ্গ বলে মনে করে। মার্কিনীদের অবাধ যৌনাচার আর ভোগবাদী মানসিকতা নিয়ন্ত্রণহীন পাগলা ঘোড়ার মত ছুটে চলছে ঊর্ধ্বশ্বাসে। পারিবারিক বন্ধনের পবিত্র ধারা একেবারেই ভেঙ্গে পড়েছে বলা চলে। যে কারণে কুমারী মাতাদের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে। এক হিসেবে দেখা গেছে পুরো আমেরিকায় প্রায় ৫০ লক্ষাধিক কিশোরী গর্ভে জারজ সন্তান ধারন করে স্কুলে আসা-যাওয়া করছে। এটা তাদের কাছে নিন্দিত নয়, বরং নন্দিত। সরকার এদেরকে সার্বিক সহযোগিতা দিতে বদ্ধ পরিকর।

সমকামিতা একটি জঘন্য মহাপাপ হলেও সে দেশে তা সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে হোমড়া-চোমড়াসহ সাধারণ দিন মজুর, কুলি মেথর-সবাই অবৈধ যৌনাচারে আক্রান্ত। টপলেসবার, নুড ক্লাব, লিভটুগের প্রভৃতি আদিম উন্মাদনায় তারা দিশেহারা। শুধু এ পর্যন্তই শেষ নয় তাদের নোংরামি বরং পশুর মত পিতা তার আপন কন্যার সাথে, মা ছেলের সাথে, ভাই বোনের সাথে যৌনকর্মে লিপ্ত হচ্ছে অহরহ। এ সকল কারণে আমেরিকা এখন পারিবারিক বন্ধন, এইডস মহামারী, কুমারী মাতা, পিতৃ পরিচয়হীন জারজ সন্তানদের নিয়ে চিন্তিত।

নিজের এই লবেজান দশা সত্ত্বেও আমেরিকা এ সমস্ত নোংরামি মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে চাচ্ছে। ফলত এর মাধ্যমে মুসলমানদের মূল চিন্তাধারাকে ধ্বংস করাই তাদের উদ্দেশ্য। কেননা, তারা জানে "যৌনতার আগুন জালিয়েই কোন জাতিকে নিঃশেষ করতে হয় তিলে তিলে।" তাই মুসলিম জাতির মন-মগজে যৌনতা-অশ্লীলতার বীজ বপন করে মদ-নারী আর কড়ি দিয়ে তাঁদের মাতাল-ব্যাকুল রেখে নিরাপদে মুসলিম বিশ্বকে গ্রাস করাই মূলত তাদের প্রধান লক্ষ্য সে লক্ষ্যে সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং ভিত্তিহীন অজুহাত খাড়া করে দু'দুইটি মুসলিম রাষ্ট্র গলধকরণ করল মাত্র দু'বছরের ব্যবধানে কিন্তু হজম করতে পারছেনা। তাই তাদের হাজার বছরের পরীক্ষীত টেবলেট (যৌনতা-অশ্লীলতা) দিয়ে হজম ক্রিয়া সারতে শুরু করেছে। ইসলামের দুর্ভেদ্য কেল্লাখ্যাত আফগানিস্তানে তাই এখন মার্কিন পর্ণগ্রাফী প্রকাশ্যে বিক্রি হচ্ছে। বিক্রি হচ্ছে বললে ভুল হবে, সেখানে তা ফ্রি বিলি করা হচ্ছে। টিভি, সিনেমায় ব্লু ফিল্মের অবাধ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। রেডিওর মাধ্যমে নোংরা গান-বাজনা, অশ্লীল নাটক, ফিচার, কথিকা প্রচার করে সরল আফগানিদের মধ্যে অবৈধ যৌনতা উস্কে দিচ্ছে। সুন্দরী প্রতিযোগিতার আয়োজন করে 'মিস আফগানিস্তান' নির্বাচিত করে অসূর্যস্পর্শা আফগান নারীদের উলঙ্গ করে ফ্রি সেক্সের সবক দিচ্ছে।

একই ধারাবাহিকতায় মার্কিনীরা সাংস্কৃতিক সন্ত্রাসবাদ চালানোর লক্ষ্যে ইরাকে যুদ্ধের প্রারম্ভেই অস্ত্র-গোলাবারুদের সাথে কার্টনে কার্টনে বোঝাই দিয়ে এনেছে পর্ণগ্রাফী বই-পত্রিকা; আমেরিকা সমাজের যৌনাত, ক্রাইম আর খুনাখুনিতে ভরপুর এ সাহিত্যগুলো। ব্লু ফিল্ম, অশ্লীল গানের অডিও ভিডিও ক্যাসেট ও সিডি। তার একটি চালান আছে মার্কিনীদের এই ক্যাম্পে।

সুমাইয়া যখন কমান্ডারকে উদ্দেশ্য করে বলল, "এবার নিশ্চিন্ত মনে মদ পান করুন আর ফুর্তি করুন; এ দাসী আপনার সেবায় উৎসর্গিত" তখন কমান্ডার উন্মাতাল হয়ে গেল। সে সিডি প্লেয়ারে একটি ব্লু ফিল্ম চালিয়ে দিল। ২৮" রঙ্গিন টেলিভিশনের স্ক্রিনে ভেসে উঠল একদল নারী-পুরুষের সম্পূর্ণ নেংটা ছবি আর...যা ফ্রি সেক্সের দেশ আমেরিকায় ঘটে অহরহ রাস্তাঘাটে, হোটেলে পার্কে-দিনে দুপুরে। টেলিভিশনের দিকে একবার দৃষ্টি দিয়ে সুমাইয়ার মাথা বিগড়ে গেল। তার ইচ্ছে হল মানবরূপী জানোয়ার এই কমান্ডারটাকে এখনই গলাটিপে হত্যা করা। আবার ভাবে, না তাতে সমস্ত পরিকল্পনা ভন্ডুল হয়ে যাবে। বন্দীদের মুক্তি আর হবে না। তাই সে ধৈর্য্যের সাথে পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে লাগল। কমান্ডার যখন তাঁর প্রতি হাত বাড়াল, সে আস্তে করে কমান্ডারের হাতটা নামিয়ে দিয়ে, যতটা সম্ভব সোহাগ ভরা কণ্ঠে বলল, 'আর একটু ধৈর্য্য ধরুন। আমি আপনার জন্য এক মজাদার শরবত তৈরী করে দিচ্ছি যা পান করলে দ্বিগুন রোমান্স অনুভূত হবে।'

'কই সেই শরবত! জলদী দাও সুন্দরী!! আজকে রাত শুধু পান করার আর উপভোগ করার!! এ রাত শুধুই তোমার-আমার!!!' মাতাল-টুলু টুলু চোখে সুমাইয়ার দিকে তাকিয়ে বলল কমান্ডার।

সুমাইয়া বড় একটা গ্লাসে মদ ঢেলে ঈগলের দেয়া সেই ছোট কৌটাটি খুলে ৪-৫ ফোটা ঢেলে দিল তার মধ্যে। কমান্ডার সুমাইয়ার হাত থেকে একপ্রকার ছোঁ মেরে নিল গ্লাসটি। গদ গদ চিত্তে পান করল সবটুকু। এরপর সুমাইয়ার হাত ধরে বলল, 'অপূর্ব সুন্দরী! অপূর্ব তোমার শরবত।' দেখতে দেখতে রাজ্যের ঘুম চেপে ধরল তাকে। আস্তে আস্তে সুমাইয়াকে ধরা হাত আলগা হয়ে এলো। সুমাইয়া খাট থেকে নেমে তাকে শুইয়ে দিল খাটের মধ্যে।

কমান্ডার গভীর ঘুমে অচেতন। সুমাইয়া কয়েকবার তাকে ডাকল, নাড়া দিল। কিন্তু না, উঠছে না সে। সুমাইয়ার শরবত খেয়ে যেন সে কতকালের না ঘুমানো রাতের ঘুম আজ একত্রে ঘুমিয়ে নিচ্ছে। সুমাইয়া রিমোট টিপে সিডিটা বন্ধ করল। অতঃপর মোবাইল সেটটা বের করে ঈগলের নম্বরে রিং করল। ওপাশ থেকে ভেসে এলো ঈগলের কণ্ঠ 'হ্যালো! সুমাইয়া? অবস্থা ভালো তো?'

'আলহামদুলিল্লাহ, সব ভাল।'

'কমান্ডারের কি খবর?'

'আল্লাহর ইচ্ছায় ভাল–বলল সুমাইয়া–বদমাশটাকে ৪-৫ ফোটা খাইয়ে ঘুম পড়িয়ে রেখেছি। সহসা জেগে ওঠার আশংকা নেই। তবে তার আগে মেয়ে তিনটিকে এখান থেকে সরিয়ে বন্দীদের রুমে পাঠিয়েছি এবং সকল সৈন্যদের তাবুর চারপাশে এনে জড়ো করিয়েছি এখন শুধু তুমি আসলেই হয়। আমি কমান্ডারের পকেট থেকে তার গাড়ির চাবি নিয়ে নিয়েছি। তুমি আসার পূর্বেই আমি গাড়ি ও বন্দীদের নিয়ে তৈরী থাকবো।'

'আচ্ছা, ওকে' বলে ঈগল মোবাইল বন্ধ করল।

ঈগলের সাথে কথা সেরে সুমাইয়া খাটের পার্শ্বে রাখা কমান্ডারের পোষাক পরিধান করল। এরপর অতি সন্তর্পনে বিড়ালের মত পা টিপে টিপে বেড়িয়ে পড়ল তাবু থেকে। সোজা চলে গেল বন্দীখানায়। বন্দীরা শীতের প্রকোপে জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে একস্থানে। মেয়ে তিনটি অন্যস্থানে একে অপরের গায়ের সাথে লেগে বসে আছে নির্ঘুম। ছোট মেয়েটি কাঁদছে তখনো। সুমাইয়া দরজা খুলে ভিতরে ঢুকল। পড়নে তার সামরিক উর্দি এবং মাথায় হেলমেট। তাকে ভিতরে প্রবেশ করতে দেখে মেয়েগুলোর ভয়ে কলিজা শুকিয়ে গেল। ছোট মেয়েটি আরও জোরে কাঁদতে লাগল। যেন মৃত্যু এসে ছায়া বিস্তার করেছে তাদের উপর।

সুমাইয়া তাদের নিকট এসে হাটু গেড়ে বসল। কান্নারত মেয়েটি বলল, 'তোমরা তার চেয়ে আমাদের ব্রাশ ফায়ার করে মেরে ফেলো।' সুমাইয়া মেয়েটির মাথায় হাত

বুলিয়ে বলল, 'কাঁদে না বোন! তোমাদের আর মরতে হবে না। আমি তোমাদের উদ্ধার করতে এসেছি। আমিও তোমাদের মত এক ইরাকী কন্যা।' তাঁর কথা শুনে মেয়েরা তার দিকে ফ্যাল ফ্যালিয়ে তাকিয়ে রইল। ছোট মেয়েটির কান্নাও থেমে গেলো ইতিমধ্যে। সে সাথে নিয়ে আসা প্যান্ট আর শার্টগুলি মেয়েদের নিকট দিয়ে বলল এগুলো বন্দীদের পড়তে বল। নিজে চলে গেলো গাড়ির কাছে। দেখল গাড়িটি যে স্থানে আছে সেখানে গিয়ে গাড়িতে উঠতে গেলে সৈন্যদের নজরে পড়ার আশংকা আবার গাড়ি স্টার্ড দিয়ে অন্যত্র সরিয়ে নেয়াও সম্ভব নয়। অবশেষে আল্লাহর ওপর ভরসা করে সেখানেই এক এক করে বন্দীদের গাড়িতে উঠাতে লাগল। বন্দী পুরুষ মোট ছয়জন। মেয়ে পাঁচজন। এই শেষের দুই পুরুষ এবং দুই মেয়ে ছিল অন্য কামরায়। তাদেরও এনে গাড়িতে উঠানো হলো। সবশেষে সে নিজে উঠে বসল ড্রাইভিং সিটে। অতঃপর চাবিতে হাত দিয়ে বসে রইল সতর্কভাবে। যাতে ঈগলের গাড়ি ক্যাম্পে ঢোকার সাথে সাথে গাড়িটিকে টার্ন দিয়ে অন্যত্র সরিয়ে নেয়া যায়, নতুবা তারাও এস্থানে বিস্ফোরণের কবল থেকে রক্ষা পাবে না।

এদিকে ঈগল সুমাইয়ার সাথে মোবাইলে আলাপ সেরে গাড়ি নিয়ে চলে আসল ক্যাম্পের দিকে। ক্যাম্প থেকে ২০-২৫ গজ দূরে গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়ল নিচে। সতর্কভাবে এগিয়ে দেখল পাহারাদার কি করছে তা। পাহারাদার পূর্বদিকে মুখ করে পশ্চিমদিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সম্ভবত সে ক্যাম্পের ভিতরে কোন ঘটনা আঁচ করতে পেরে তা নিরীক্ষা করার চেষ্টা করছে। ভিতরের দিকে উঁকি ঝুঁকি মারছে।

পাহারাদার সৈনিক ঠিকই ক্যাম্পের ভিতরের নড়াচড়ার বিষয়টি লক্ষ্য করেছিল। কিন্তু তাকে ধোকায় ফেলেছে কমান্ডারের পোষাক। কিন্তু সে জানেনা, কমান্ডারের পোষাকে ওখানে হাটাহাটি করছে সেই মেয়েটি, যাকে সে পেতে আবদার করেছিল ঈগলের কাছে। যে মেয়েকে মাত্র এক নজর দেখে সে তাঁর প্রেমে পড়ে গিয়েছিল মুহূর্তের মধ্যে। জানলে হয়তো এখনই দৌড়ে গিয়ে তার কাছে সে প্রেম নিবেদন করতো। পাহারাদার যখন বিষয়টি নিরীক্ষণে ব্যস্ত তখনই পিছন দিক থেকে একজোড়া শক্ত-কঠিন হাত চেপে ধরল তার গলাটি। সে চিৎকার দিবার কিংবা গুলি করার কোন অবকাশই পেলনা। নিমিষেই ঈগল তার ঘারটিকে বা হাত দিয়ে পেচিয়ে মোচড় দিল। তাতে ঘারের হাড্ডি ভাঙ্গার শব্দ হল মড় মড় করে। ডান হাতের সাহায্যে পকেট থেকে ধাড়ালো ছুরিটা বের করে ধমনীটা কেটে দিল। শেষ হয়ে গেল পাহারাদারের জীবন লীলা। ঈগল তার ধরটিকে ধরাস করে ফেলে দিল একদিকে। অতঃপর চলে গেল গাড়ীর নিকট।

গাড়িতে স্টার্ড দিয়ে নিয়ে এলো ক্যাম্পের ভিতর। ভিতরে ঢুকেই দ্রুত ব্রেক কষে নিজে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। অতঃপর গাড়ীর ডান পার্শ্বে দাঁড়িয়ে, রিমোটের সাহায্যে ফুল স্পিরিটে শুধু গাড়িটিকে চালিয়ে দিল তাবুর দিকে। মার্কিন সৈন্যরা প্রথমে গাড়িটি ক্যাম্পের ভিতর ঢুকতে দেখে তারা বিষয়টি বুঝতে চেষ্টা করল যে, কার গাড়ি, কিসের গাড়ি এত রাতে; কিন্তু পরক্ষণেই যখন দেখল গাড়িটি তাদের দিকে ধেয়ে আসছে, তখন

তাদের টনক নড়ল। গাড়ি থামাতে নির্দেশ দিল। কিন্তু কার নির্দেশ কে শুনে! নির্দেশ শোনার মত তো কোন লোকই নেই গাড়িতে। অবশেষে গাড়ি যখন একেবারে তাবুর নিকটবর্তী হল এবং না থেমে বরং আরও অগ্রসর হলো, তখন তারা গাড়িটি লক্ষ্য করে একযোগে ফায়ার শুরু করল।

কিন্তু বিধিবাম! তাদের ফায়ারে গাড়ির সম্মুখের ইঞ্জিন কাবারের ভিতর রক্ষিত বিস্ফোরক দ্রব্য প্রচন্ডভাবে বিস্ফোরিত হল। বিস্ফোরণে পুরো ক্যাম্প কেপে উঠলো। তাবুতে আগুন ধরে গেল। অবস্থানরত সৈন্যদের দেহ ভিন্নভিন্ন হয়ে গেল। তাবুর পার্শ্বে রক্ষিত অস্ত্রের গুদামে আগুন ছড়িয়ে পড়লে প্রচন্ড শব্দে বিস্ফোরিত হতে শুরু করল সেখানে রক্ষিত বোমা-বিস্ফোরকগুলো। পুরে ছাই হতে লাগল অস্ত্রের মওজুদ। এর পাশেই রক্ষিত তৈলের ট্যাঙ্কলরীতেও আগুন ধরে গেল মুহূর্তে। আগুনের লেলিহান শিখায় চারিদিক দিনের মত আলোকিত হয়ে উঠল। সৈনিক যারা পারলো জীবন নিয়ে পালালো। অধিকাংশই জাহান্নামের টিকিট পেয়ে গেলো বিনামূল্যে। যারা পালিয়েছে তারাও অক্ষত যেতে পারেনি একজনও। আর তাদের মহামান্য কমান্ডারতো প্রথমেই সুমাইয়ার মধুর (?) শরবত এবং পরে ঈগলের পাঠানো আগুনফুলের মালা গলায় পড়ে ঘুমাচ্ছে জনমের ঘুম। ইরাকীদের চরিত্র ধ্বংস করতে আনা ব্লু ফিল্মের চালানটিও প্রজ্জ্বলিত অগ্নি সেনারা মন ভরে দেখতে লাগল আফসোস মিটিয়ে।

* * *

ঈগল যখন ক্যাম্পের ভিতর ঢুকে গাড়ি থামিয়ে নেমে এলো নিচে, অমনি সুমাইয়ার গাড়ি চলে এলো তাঁর নিকট। সাথে সাথে ঈগল উঠে বসল সুমাইয়ার পাশের সিটে। সুমাইয়া ফাস্ট গিয়ার দিয়ে গাড়িটি ক্যাম্পের বাইরে নিয়ে এলো। কিছুদূরে গিয়ে তারা গাড়ি থামিয়ে দেখতে লাগলো ক্যাম্পের ধ্বংসযজ্ঞ। সুমাইয়া বলল, 'ঈগল ভাইয়া! আল্লাহ আমার প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন, যে কারণে আমরা দু'জন মাত্র একেবারে খালি হাতে শত্রুদের ধ্বংস করতে পেরেছি এবং আমাদের বন্দী ভাই-বোনদেরও মুক্ত করতে পেরেছি।'

'সুমাইয়া! তুমি ঠিক বলেছো, আল্লাহর সাহায্য না হলে আমরা কিছুই করতে পারতাম না। তবে আল্লাহ তাঁর বান্দাকে তখনই সাহায্য করেন, যখন বান্দা সাহায্য পাওয়ার শর্ত পূরণ করে; আর শর্ত হলো বান্দার সাধ্য অনুযায়ী চেষ্টা করা। আমরা যদি চেষ্টা না করে ঘরে বসে নামাজ-তেলাওয়াত করতে থাকতাম আর তাদের মুক্রিত জন্য দোয়া করতাম। তবে কখনই এই শত্রুও ধ্বংস হতো না এবং বন্দীরাও মুক্তি পেতনা বরং এ জালিম আরও জুলুম চালিয়ে বন্দীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতো।

'এ স্থান এখন আমাদের জন্য মোটেই নিরাপদ নয়। হয়তো এখনই উড়ে আসবে মার্কিনীদের জঙ্গী বিমান। তখন আমাদের আত্মরক্ষার কোন উপায় থাকবে না। তাই দ্রুত আমাদের স্থান ত্যাগ করতে হবে।' প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলল সুমাইয়া।

ঈগলও তার কথা সমর্থন করে বলল, 'হ্যাঁ, চল এখানে সময় নষ্ট করে কোন লাভ নেই।' বলেই তাঁরা গাড়িতে উঠল। এবার ঈগল বসল ড্রাইভিং সিটে আর সুমাইয়া বসল তার পাশের সিটে। সুমাইয়াদের বাড়ীর উদ্দেশ্যে গাড়ি ছুটালো ঈগল।

অল্প সময়ের মধ্যে তারা পৌঁছে গেল গন্তব্যে। সুমাইয়াদের ঘরের দরজায় গিয়ে ঈগল গাড়ি থামাল। প্রথমে সুমাইয়া গাড়ি থেমে নেমে ঘরের দরজায় নক করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই দরজা খুললেন তার বাবা। আবু বকর সাহেব দরজা খুলেই ঘাবরে গেলেন। তার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। দরজায় দাঁড়ানো মার্কিন সৈনিক আর বাড়ির সামনেই তাদের গাড়ি দেখে ভয়, গোস্বা এবং ক্রোধে তার সর্বাঙ্গ কাটা দিয়ে উঠল। তিনি বুকে সাহস সঞ্চয় করে বললেন, 'শুন মার্কিনীরা! তোমরা নাকি এসেছো আমাদের মুক্তি দিতে, অথচ আমার নিরপরাধ ছেলেটিকে হত্যা করলে নৃশংসভাবে। এরপর আবার কেন এসেছো এত রাতে? তোমরা কি আমাদেরকে রাতেও একটু বিশ্রাম নিতে দিবে না? আমাদেরকে কি তোমরা গোলাম ঠাওরাচ্ছো? তবে মনে রেখ আমরাও আরব জাতি, জীবন বিলীন করে দেব তবু স্বাধীনতা-স্বকীয়তা তোমাদের হাতে বিসর্জন হতে দিব না। তোমাদের গোলামী আমরা মেনে নিব না এক মুহূর্তের জন্যও! তোমরা আমাদের শক্তিহীন-অসহায় ভাবলে ভুল করবে। আমরা শক্তিহীন-দুর্বল অসহায় নই। আমাদের সাথে আছেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ যার শক্তির কোন সীমা পরিসীমা নাই। সুতরাং তোমরা মনে যদি কোন দুষ্ট বুদ্ধি নিয়ে এসে থাকো তবে তা ত্যাগ করে এখান থেকে চলে যাও। কিছুতেই আমি তোমাদেরকে ঘরের ভিতর ঢুকতে দিব না।'

সুমাইয়া পিতার কথা শুনে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। কোন কথাই বলছে না সে। তার পিতা তাকে মার্কিন সৈন্য মনে করছে; কেননা তাঁর পড়নে এখন সেই মার্কিন কমান্ডারের উর্দি পরিহিত এবং মাথা হেলমেটে আচ্ছাদিত। তাই তাকে মার্কিন সৈন্য না ভেবে উপায় নেই। তাকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আবু বকর সাহেব বললেন, 'তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ! তোমরা ফিরে যাও। অযথা আমার সময় নষ্ট কর না। আমার ঘরে কোন যুবতী মেয়ে নেই। আমার বয়স্কা স্ত্রী মৃত্যু শয্যায় শায়িত। তাকে একটু সেবা করার সুযোগ দাও আমাকে।' তাঁর এবারের কথায় এতটা আকুতি ঝড়ে পড়ল যে, সুমাইয়া না হয়ে যদি সত্যি সত্যি কোন মার্কিনও হত তবে সেও মনে হয় এই ইরাকীর আকুতিতে সাড়া দিত। (যদিও মার্কিনীদের কাছে এমন মানবিকতার আশা করা অরণ্য রোদন বৈকি!)

সুমাইয়া মায়ের মুমুর্ষতার কথা শুনে সাথে সাথে মাথার হেলমেট খুলে বলল, 'আম্মুর কি হয়েছে আব্বু? কখন থেকে অসুস্থ তিনি।' বলেই পিতার উত্তরের অপেক্ষা না করে তড়িৎ গতিতে সে তার আম্মুর রুমে চলে গেল। আবু বকর সাহেব তাজ্জব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন সেখানেই। ঈগল গাড়ি থেকে বেড়িয়ে এসে দাঁড়াল তার সম্মুখে। তিনি বললেন, 'ঈগল! কেমন নাটকীয় ঘটনা ঘটে গেল বলতো? মার্কিনীদের গাড়ি তোমাদের কাছে, আবার মা সুমাইয়া মার্কিন সৈন্যদের পোষাক পড়া! আমি তো প্রথমে ঘাবরেই

গিয়েছিলাম যে, তোমাদের হয়তো মার্কিনীরা আটক করে অতঃপর বাড়িতে এসে হানা দিয়েছে। আচ্ছা, বন্দীদের মুক্ত করতে পারলে?'

ঈগল তাঁকে তাদের অভিযানের বিস্তারিত রিপোর্ট দিল। কিভাবে সে প্রথমে ক্যাম্পে প্রবেশ করল। প্রবেশে বাঁধা দেয়ায় প্রহরীকে কিভাবে হাত করল। অতঃপর ক্যাম্পে ঢুকে কেমন বক্তব্য দ্বারা কমান্ডারের বিশ্বস্ততা অর্জন করল, সব তাকে খুলে বলল।

সুমাইয়াকে কিভাবে কমান্ডারের সামনে পেশ করল। কমান্ডার তাকে কত পুরস্কার দিল। অতঃপর সুমাইয়া কেমন দক্ষ অভিনয় করে কমান্ডারকে গোলামের মত সব প্লান বাস্তবায়নে বাধ্য করল। সবশেষে সুমাইয়া কিভাবে বন্দীদের বের করল এবং সে নিজে কিভাবে গাড়ীর বিস্ফোরণ ঘটালো বললো তাও। সবশুনে আবু বকর সাহেব খুব খুশী হলেন। মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করলেন, তারা নিরাপদে অভিযান পরিচালনা করে ফিরে আসতে পারায় এবং বন্দীদেরও মুক্ত করে আনায়। তিনি ঈগলকে ধন্যবাদ দিলেন এবং সুমাইয়া যে তার কাছে না বলে গিয়েছিল ঈগলের সাথে এবং তাতে যে তার রাগ জমে ছিল, ঈগলের বক্তব্য শুনে সে রাগও তার উবে গেল নিমিষেই। সুমাইয়াকে বললেন না আর কিছুই।

বন্দীরা গাড়িতেই আছে শুনে আবু বকর সাহেব তাদেরকে গাড়ি থেকে নামিয়ে পূর্বপাশের ঘরে নিয়ে উঠালেন। ঈগলকে গ্যারেজের চাবি দিয়ে বললেন, গাড়িটি গ্যারেজে রেখে আসতে। এরপর বন্দীদের খাইয়ে-দাইয়ে সেখানেই রাত যাপনের ব্যবস্থা করে দিলেন। রাত আর বেশী বাকীও নেই। তারা সবাই ঘুমিয়ে পড়ল।

ঈগল বন্দীদের ঘর থেকে বেরিয়ে আবু বকর সাহেবের সাথে চলে গেল সুমাইয়ার আম্মার অসুস্থতা দেখার জন্য। সুমাইয়ার আম্মা ফাতিমা বেগম এমনিতেই তাঁর আদরের ছেলে হাদীদ কামালের শাহাদাতে ভেঙ্গে পড়েছেন; তার উপর একমাত্র কন্যা সুমাইয়াও চলে গেল শত্রুর কবলে। তাঁর ধারণা সেও মারা পড়বে নিশ্চিত অথবা বেঁচে থাকলেও ফিরে আসবে না কখনও তার কোলে। সুমাইয়ার চিন্তায় তিনি একেবারে মুষড়ে পড়লেন। তাতে হার্ডে প্রচন্ড চোট পান ভদ্র মহিলা। মুহূর্তেই তাঁর অবস্থা সঙ্কটপন্ন হয়ে পরে। তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকেন আবু বকর সাহেব। ততক্ষণে হুশ হারিয়ে ফেলে তিনি। ডাক্তার এসে হুশ ফিরাতে চেষ্টা করেন প্রাণপণে। বহু সময় পড়ে কিছুটা হুশ ফিরে আসে। চোখ দু'টি একটু খুলেই জিজ্ঞেস করেন, আমার সুমাইয়া কোথায়? তাঁকে সন্তোষজনক কোন জবাব না দিতে পারায়। পুনরায় তিনি মুছড়া যান।

এবার আর ডাক্তার শত চেষ্টায়ও হুশ ফেরাতে পারল না। অবশেষে ডাক্তার বললেন, সুমাইয়াকে ছাড়া এর হুশ ফিরানো সম্ভব নয়।' ডাক্তারকে বিদায় দিয়ে আবু বকর সাহেব নিজে লেগে গেলেন স্ত্রীর সেবায়। তাকে সাহায্য করছিল এতিম ছেলে ছোট্ট রাহাত। যার মা-বাবা, ভাই-বোন সকলকে হত্যা করেছে মার্কিন সৈন্যরা।

মায়ের কাছে তার সন্তান যে কত বড় অমূল্য ধন, তা 'মা' ছাড়া আর কেউ বুঝবে না। প্রত্যেক মায়ের প্রত্যেক সন্তান তাঁর কাছে হীরার মানিক সমতুল্য। যে কারণে মা তাঁর সন্তানকে সর্বদা আগলে রাখতে চান আপন আচলের ছায়ায় ঘিরে। পৃথিবীর সকল সম্পদের মোকাবেলায় মা সন্তানকে হারাতে রাজী নন। সন্তানের জন্য মা যতটা কষ্ট স্বীকার করেন ততটা করবে না দুনিয়ার অন্য কেউ, কখনও। একজন মায়ের সমস্ত আশা-আকাংখার প্রতীক হল তাঁর সন্তান। দুঃখ-বেদনার সান্তনা সেও ঐ তার সন্তান। মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালবাসা সর্বক্ষণ বিরাজিত থাকে তার সন্তানের প্রতি। সন্তানের মুখে চেয়ে মা হাজারো বেদনা সয়ে যান অম্লান বদনে।

এত মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালবাসার ধনকে মায়ের বুক থেকে কোন জালিম, পাষন্ড যদি কেড়ে নেয়, ভালবাসার তারকে ছিড়ে ফেলে তবে সে ছেঁড়া তারে-মায়ের হৃদয় ঘরে বেদনার বিষাদ মাখা করুন সুর বাজতে থাকে প্রতিক্ষণে। এমন মুহূর্তে কি করে স্থির থাকতে পারেন একজন মা? তার অন্তর অবয়ব কি ভেঙ্গে চৌচির হয়ে যায়না? এমন বেদনা-বিদুর মর্মান্তিক মুহূর্তে দুমড়ে-মুছড়ে যাওয়া মা জননীর ক্লান্ত-তৃষ্ণার্ত হৃদয় মরুভূমিতে একফোটা শান্তনার বারি বর্ষণ করার মত মেঘ আছে কি বিশ্ববাসীর আকাশে। দানব বুশের পুতিগন্ধময় ঝুলির মধ্যে আছে কি এমন কোন মলম যা দিয়ে ঘুচানো যাবে ইরাক, আফগান, ফিলিস্তিনের হাজার হাজার সন্তান হারা মায়েদের ভেঙ্গে-চুড়ে খান খান হয়ে যাওয়া হৃদয়ের গভীর ক্ষত? আজ লক্ষ কোটি মুসলিম মা-বোন বিশ্বের দিকে দিকে তাদের কলিজার টুকরা, চোখের মনি সন্তানকে হারিয়ে কেবলই চোখের পানি ঝড়াচ্ছে। কেউ বা আবার বাকরুদ্ধ পাগল হয়ে যাচ্ছেন।

এমনই এক হতভাগ্য মা ফাতিমা বেগম। তিনি তার চোখের পুত্তলি হাদিদ কামালকে হারিয়ে শোকে-দুঃখে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। তার মন সর্বদা পুত্র শোকে হাহাকার করছে। ঈগল রুমের ভিতর ঢুকে দেখল, তিনি খাটে শায়িত, তবে অনেকটা সুস্থ মনে হচ্ছে তাঁকে। তাঁর মাথার কাছে বসে আছে সুমাইয়া। ঈগল তাঁকে সালাম দিল। তিনি সালামের উত্তর দিয়ে মৃদু হাসি মুখে বললেন ঃ বাবা ঈগল! তোমার প্রতি আল্লাহ্ তা'য়ালা সর্বদা খাছ মেহেরবাণী নাযিল করুন। আজ তোমার উসিলায় আমার অন্তরের দুঃখ-যাতনা অনেকটা লাঘব হয়েছে। আমি সুমাইয়ার কাছে যখন শুনেছি, তোমরা বেশ কিছু মার্কিন সৈন্য হত্যা করেছো, তখন আমার অন্তরটা যেন শীতল হয়ে গেল।'

'খালাম্মা! আপনি দোয়া করুন আমরা যেন প্রত্যেকটি দখলদার সৈন্যকে খতম করে আপনার আদরের হাদীদের হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারি'–বলল ঈগল–'বন্ধু হাদীদের মৃত্যুতে আমিও কম ব্যথিত নই। সেদিন হাদীদ আমাকে বলেছিল, "ঈগল! তুমি পালিয়ে যাও।" যখন তাকে একা ফেলে আমি পালাতে চাচ্ছিলাম না, তখন সে রক্তাক্ত বদনে আমকে বলেছিল, "ঈগল! বাগদাদের প্রয়োজনেই তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে, তুমি

পালাও।" আমি তখন তার অন্তিম ইচ্ছা পূরণের লক্ষ্যে পালিয়ে যাই। এখন আমি শুধু বেঁচে আছি বন্ধু হাদীদের অন্তিম ইচ্ছা পূরণ করার জন্যই। অর্থাৎ ইরাককে দখলদার মুক্ত করাই এখন আমার জীবনের একমাত্র ব্রত।'

তাদের কথাবার্তার মাঝেই মসজিদের মিনার থেকে ভেসে এলো ফজর নামাযের আযান। আযান শুনেই ঈগল সেখান থেকে উঠে ওজু করার জন্য বের হল। তার পিছন পিছন বের হল সুমাইয়া ও তার পিতা। রুম থেকে বের হয়েই আবু বকর সাহেব বাথরুমে প্রবেশ করলেন। এই ফাকে সুমাইয়া ঈগলকে ডেকে নিয়ে গেল ঘরের বাইরে ফুল বাগানের ভিতর।

'কিছু বলবে বলে মনে হচ্ছে?'–ঈগল জিজ্ঞেস করল।

'বলব তো অবশ্যই–বলল সুমাইয়া–'নতুবা কি এখানে ডেকে আনতাম এই ভোর বিহনে।' তার অধরে মৃদু হাসি সৌন্দর্যের দিপ্তী ছড়াচ্ছিল।

'কিন্তু নামায পড়তে হবে যে।' বলল ঈগল।

'নামায আমিও পড়বো, তুমি একা নয়'–মুচকি হেসে বলল সুমাইয়া– 'সবেমাত্র আযান হয়েছে। নামাযের এখনও বেশ সময় আছে। আমার কথা অনেকগুলি নয়, খুবই অল্প। এখন না বললেও হতো, কিন্তু পরে বলার সুযোগ হয়তো নাও পেতে পারি। তুমি তো মুহূর্তের মধ্যে স্থান পরিবর্তন করে ফেলো। আর এটা তোমার প্রকৃতিও বটে; কারণ ঈগল কি আর স্থির থাকতে পারে এক স্থানে!'

'তুমি এত ভূমিকা না বাড়িয়ে যা বলার জলদি বলে ফেল' মৃদু হেসে বলল ঈগল।

'আমার কথা শোনার আগেই দেখছি ডানা ঝাপটাচ্ছো, কথা শুনেই কি উড়াল দিবে ঈগল ভাইয়া?' বলে একটু জোরেই হাসল সুমাইয়া।

চঞ্চলা-চপলা আরবী তরুণী সুমাইয়া। বাবা-মার একমাত্র মেয়ে এখন একমাত্র সন্তান। বৃত্তশালী পিতার সুন্দরী কন্যা বলে যখন যা চেয়েছে, যেভাবে চেয়েছে, ঠিক তখন তা সেভাবেই পেয়েছে। সাদ্দামের ইসলাম মুক্ত ইরাকের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হওয়ার সুবাদে তথাকথিত আধুনিক স্টাইলে নিজেকে গড়তে শুরু করেছিল সে। মাঝখানে বাঁধ সেধেছিল তার ভাই হাদিদ কামালের একনিষ্ঠ বন্ধু ওমর শুজা, যে এখন ঈগল নামে তার সম্মুখে উপস্থিত। একদা মনের অজান্তেই ভাইয়ের বন্ধুকে ভালবেসে ফেলেছিল সুন্দরী সুমাইয়া। তার কাছে ঈগলকে ভাল লাগার কারণ হলো তার সচ্চরিত্রতা এবং অসম্ভব সাহসীকতা। সুমাইয়া ও হাদীদ ভাই-বোন হিসেবে ছিল অনন্য। দু'জনে একই ক্লাসের ছাত্র-ছাত্রী হওয়ায় অনেকটা ফ্রি ভাবে তারা একে অপরের ভাল লাগা, সুখ-দুঃখের কথা বলত একে অপরের কাছে। একদিন ভাই হাদীদের কাছে সুমাইয়া বলে ফেলে ওমরকে ভাল লাগার বিষয়টি। হাদীদ শুনে বলেছিল, ওমরকে পেতে হলে তোমার অনেক সাধনা করতে হবে। সে তোমাদের মত আধুনিকাদের একদম পছন্দ করে না। সেই থেকেই

সুমাইয়া নিজেকে ওমরের মত করে গড়তে শুরু করে। আস্তে আস্তে সে ইসলামের গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ করতে থাকে। এর মধ্যে কৌশলে সে ওমরকে কয়েকবার জানিয়ে ছিল তার ভাল লাগার কথা, কিন্তু ঈগল তাকে হ্যাঁ/না কিছুই বলেনি; উপরন্তু একটিবার তাকিয়েও দেখল না, যে মেয়েটি তাকে ভালবাসে তার চেহারাখানি কেমন, কত সুন্দর। এতে সুমাইয়া আশাহতও হয়নি কিংবা হালও ছাড়েনি বরং ভেরেছে 'আমি নিজেকে এখনও তাঁর মত করে গড়তে পারিনি।'

অনেকদিনের সাধনার পর গতকাল যখন ওমর বলেছিল, "সুমাইয়া! তোমার এই কৌশল যদি সফল হয়, তবে তোমার পূর্বের প্রস্তাবটি আমি বিবেচনা করে দেখব।" তখন শত দুঃখের মাঝেও সুমাইয়া তার ভাগ্যাকাশে নতুন দিনের প্রভাব গগণে নবীন সূর্যোদয়ের স্বপ্ন দেখেছিল। এখন সে তাকে সেই কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যই ফুল বাগানে ডেকে এনেছে। এসে যখন কথা বলে হাসছিলো তখন তার গালে সুন্দর দু'টি ডোল পড়েছিল। এতে তাকে আরও আকর্ষণীয়, আরও লাবণ্যময়ী অদ্বিতীয় সুন্দরী বলে মনে হচ্ছিল ঈগলের কাছে। সে নিজের ভিতর কেমন যেন দুর্বলতা অনুভব করছিল সুমাইয়ার প্রতি। মেয়েটি যেন চুম্বকের মতই তাকে টানছে নিজের কাছে। ঈগল বলল, আর ভনিতা নয় সুমাইয়া! জলদি করে বলে ফেল তোমার কথা, প্লিজ!'

'কথা আর কিছুই নয় ঈগল! বলল সুমাইয়া–তুমি গতকাল বলেছিলে আমার কৌশল সফল হলে, তুমি আমার পূর্বের প্রস্তাবটি বিবেচনা করে দেখবে। আল্লাহ্ তা'য়ালার প্রত্যক্ষ মদদে আমার কৌশল সফল হয়েছে। এখন তুমি আমার প্রস্তাবটির বিষয়ে কি বিবেচনা করেছো শুধু এতটুকু জানার আকাংখাই এখানে ডেকেছি তোমাকে।'

'সুমাইয়া আমি অনেকবার তোমার বিষয়টি নিয়ে ভেবেছি কিন্তু আমার মনে এখন শুধু যে ভাবনা এসে হোচট খায়, তা হল আমার এখন মধুর বাসর সাজানোর চেয়ে শত্রু নিধন করা, দেশ দখলদার মুক্ত করা অনেক বেশী জরুরী।'

'ঈগলা! তুমি বার বার আমাকে এভাবে ডিনাই করছো কেন? আমি কি তোমার জীবন সঙ্গিনী হবার উপযুক্ত নই? আমি কি নিজেকে তোমার মত করে গড়ে তুলিনি? তুমি যখন দেশে ছিলে না, কোথায় ছিলে তখন তাও জানা ছিল না, তখনও আমি হৃদয় গহীনে তোমার স্মৃতি বহন করে আশার মালা গেঁথেছি তুমি ফিরে আসবে বলে। সেই তুমি এলে, কিন্তু আমার পর হয়েই এলে। তুমি হয়তো ভাবছো আমাকে জীবন সঙ্গিনী করলে, তোমাকে আমার সোনালী চুলের শিকলে বেঁধে রাখব, জিহাদের ময়দান থেকে তোমাকে দূরে রাখব? তোমার এ সন্দেহও আমি দূর করেছি নিজের জীবন-ইজ্জত বিপন্ন অবস্থায় ফেলে। তুমি হয়তো ভাবছো, কেন আমি তোমার এত পাগল? তা এজন্য যে, আমি জীবনে প্রথম তোমাকে ভালবেসেছিলাম তোমার সাহসিকতা ও সচ্চরিত্রতা দেখে। তোমার ভালবাসা আমাকে পাপের অন্ধ গলিতে প্রবেশের পূর্বেই আলোর রাজপথে এনে দাঁড় করিয়েছে। যে কারণে আমি তোমাকে ভুলতে গেলেও ভুলতে পারিনা। ঈগল

ভাইয়া! তুমি আমার জীবনের নিখুঁত যত্নে লালিত ভালোবাসাকে পদদলিত না করে বরং দু'হাত দিয়ে গলা টিপে আমাকে শেষ করে দিয়ে যাও। এর বেশী আর কিছুই বলব না তোমাকে আমি।'

এক সাথে এতগুলো কথা বলে হাপিয়ে উলো মেয়েটি। বুঝা যাচ্ছে ঈগলের কথায় সে দারুন আঘাত পেয়েছে। তার গন্ড বেয়ে গড়িয়ে পড়ল কয়েক ফোটা তপ্ত অশ্রু। ঘটনার আতস্মিকতায় ঈগল হতচকিত হয়ে গেল। মেয়েটি যে তাকে এত ভালবাসে তা সে বুঝতেও পারেনি। সে মনে করেছিল প্রেম-ভালবাসা ধনীর দুলালীদের সাময়িক আবেগ। তরুন-তরুণীদের প্রেমের অভিনয় করা তথাকথিত প্রগতি বাদীদের সাংস্কৃতিক অঙ্গ। সুমাইয়ার দিকটিও সে এতদিন এই দৃষ্টিতেই দেখত। কিন্তু এইক্ষণে সুমাইয়ার কথা শুনে তার কাছে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেল, 'না সুমাইয়া তার সাথে কোন অভিনয় করছেনা বরং বাস্তবেই সে তাকে আন্তরিকভাবে ভালবাসে!' এ মুহূর্তে তাকে সে কি উত্তর দিবে তা ভেবে পেল না। তাই বলল, 'চল সুমাইয়া! নামাযের সময় শেষ হওয়ার পথে। আগে নামায পড়ে নেই, কথা পরেও বলা যাবে।' বলেই ঈগল ঘরের দিকে হাটা দিল। সুমাইয়াও বিষণ্ন মনে ঘরের দিকে চলল। এ মুহূর্তে নিজেকে জনম দুঃখী ভাবছে সে।

* * *

সকাল আটটা। ঈগল বন্দীদের ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলল। তাদেরকে নাস্তা-পানি খাওয়ালো। অতঃপর সকলের পরিচয় পর্ব সেরে তাদের উদ্দেশ্যে ছোট্ট একটি ভাষণ দিল, 'হে ইরাকী ভাগ্যহত ভাই-বোনেরা! আমি জানি আপনদের উপর কেমন কিয়ামতসম বিপদের ঝড় বয়ে গেছে। মার্কিনীরা মুখে মানবাধিকারের শ্লোগান দিলেও সারা বিশ্বে তাদের মত মানবাধিকার লংঘনকারী নেই আর কেউ। বন্দীদের সাথে তারা কত নির্মম-নিষ্ঠুর আচরণ করে তা গুয়ান্তোনামো বের কারাগারে বন্দী মুজাহিদদের সাথে তাদের আচরণেই স্পষ্ট প্রতিভাত হয়ে উঠে।

কিউবার গুয়েনতানামো বে-তে অবস্থিত এ বন্দী শিবির। ১১৬ কিলোমিটারের এক দ্বীপ এটি। যা আমেরিকার মূল ভূ-খন্ড থেকে ১২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। পৃথিবীতে আমেরিকার বাইরে এটিই সর্ব প্রাচীন মার্কিন নৌ ঘাটি। এখানে আমেরিকা ২৫×৪ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে স্থাপন করেছে একটি ক্যাম্প, সেটাই ভয়ংকর বন্দী শিবির। আফগানিস্তান থেকে তালেবান মুজাহিদদের ধরে নিয়ে এই কারাগারে বন্দী করে রেখেছে আমেরিকা। গুয়েনতানামো দ্বীপে পৃথিবীর যাবতীয় আইন-কানুন, সামাজিক সৌজন্য-ভব্যতা, মানবাধিকার, সদাচারণ ও মানবিক নীতি-নৈতিকতা কিছু অবশিষ্ট রাখেনি আমেরিকা।

বন্দীদের মর্মন্তুদ শাস্তি দিতে তাদের পা বেঁধে মুখে টেপ এঁটে দেয় তারা। মুন্ডিয়ে ফেলে চুল-দাড়ি, চোখের ভ্রু। চোখে লাগিয়ে দেয় সীসার কালি। নাকে পড়িয়ে দেয় বিশেষ ধরনের মাস্ক। কানে ফিট করে অত্যাধুনিক যন্ত্র, বিলোপ করে দেয় শ্রবণ শক্তি।

হাতে পড়িয়ে দেয় ভারী জিঞ্জির। এগুলো এমন ধরনের নির্যাতন যন্ত্র, যা বিকল করে দেয় মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে। ফলে বন্দীরা না পারে দেখতে, না পারে কথা বলতে, না পারে শুনতে আর না পারে শুঁকতে। পারে না কিছু স্পর্শ করতেও। দু' দুই মিটার দৈর্ঘ্য একেকটি লোহার খাঁচায় পুরে পায়ের উপর বসিয়ে রাখে সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস।

আজান দেয়া, ওজু করা, নামায পড়া এবং অন্যান্য কোন ইবাদত বন্দেগীর সুযোগ দেয়া হয় না তাদের। উপরন্তু সুন্দরী তরুণীদের লেলিয়ে দেয় তাদের উপর। তরুণীরা উলঙ্গ হয়ে বিভিন্ন অঙ্গ-ভঙ্গি করতে থাকে তাদের সামনে। তাদেরকে আকৃষ্ট করতে চায় তরুণীদের প্রতি। তখন চোখ বন্ধ করে ফেলে বন্দীরা। চুল পরিমাণ নড়াতে পারেনা তারা ঈমানদীপ্ত বন্দীদের মন। নারীদেহের প্রতি কোন লালসা নেই তাঁদের। তাঁদের লালসা কেবল প্রিয় দ্বীনের প্রতি, দ্বীন সুরক্ষার জিহাদের প্রতি।

বন্দীরা পিপাসায় কাতর হয়ে পানি চাইলে মুখে প্রস্রাব করে দেয় মার্কিনী অসভ্য নরপশুগুলো। প্রস্রাব-পায়খানার মত প্রাকৃতিক প্রয়োজনেও যৌক্তিক শিথিলতা পায়না বন্দীরা। এ সকল অমানুষিক নিষ্ঠুর নির্যাতনে বন্দীরা এখন মানষিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে।

এখানেই শেষ নয় ঐ অসভ্য হায়েনাদের নির্যাতনের ধারা, এছাড়াও ব্যাটনের সাহায্যে এলোপাথারি পিটায় বন্দিদেরকে। নাজেহাল করে ফেলে খোজা মেরে মেরে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা হাঁটু গেড়ে মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে থাকতে বাধ্য করা হয় তাদেরকে। অসহ্য যন্ত্রণায় কাতর হয়ে উঠেন তারা। এমতাবস্থায় যদি কোন বন্দী সামান্য মথা তোলে, তবে সাথে সাথে পিছন থেকে এসে পায়ের উপর লাথি মারে পাষণ্ড সার্জেন্ট। তখনই বাইরে নিয়ে আসা হয় সে বন্দীকে। তল্লাশী চালাতে থাকে উলঙ্গ করে। আরেকজন তৎক্ষণাৎ চড়ে বসে তার উপর। মারতে থাকে ঘুষি-লাথি।

এমনিই সব ভয়াবহ নিষ্ঠুর নির্যাতনের ষ্টীম রোলার চালায় মার্কিনীরা সেখানের বন্দীদের ওপর। এখানেও তারা যে সকল ইরাকীকে সন্দেহভাজন হিসেবে গ্রেফতার করবে তাদের সাথেও ওরা একই আচরণ করবে তাতে সন্দেহ নাই। যার কিঞ্চিত তোমাদেরকে এই অল্প সময়ের মধ্যেই আস্বাদন করিয়েছে। সুতরাং হে আমার প্রাণপ্রিয় ভাই-বোনেরা! তোমরা প্রতিবেশীদের বুঝাও যে, তারা যাতে মার্কিনীদের হাতে বন্দী হওয়ার চেয়ে যুদ্ধ করে দখলদার সৈন্য হত্যা করতে অলসতার পরিচয় না দেয়। প্রয়োজনে জীবন বিলায়ে শহীদী জীবনের পথ ইখতিয়ার করতে কুণ্ঠাবোধ না করে। কারণ বন্দী হয়ে ওদের বিষাক্ত খাচায় পরে ধুকে ধুকে মরার চেয়ে এ মৃত্যুতে অনেক শান্তি আছে; আছে নিশ্চিত জান্নাত পাওয়ার গ্যারান্টি।'

ঈগলের বক্তৃতা শুনে বন্দীরা বলল, 'ঈগল ভাই! আমরা আর ঘরে ফিরে যেতে চাইনা। আমরা তোমার সাথে থেকে দেশ মুক্তির লড়াইয়ে শরীক হবো। ইসলাম ও

মুসলিমের শত্রুদের হত্যা করবো। আমাদের উপর এবং এখনও বিভিন্ন কারাগারে বন্দীদের ওরা যে অত্যাচার-নির্যাতন চালাচ্ছে তার প্রতিশোধ নিবো এবং সে সকল বন্দী ভাই-বোনদের মুক্ত করব।'

'তোমরা এখন ঘরে ফিরে যাও, সময়মতো তোমাদের আমি ডেকে নিবো–বলল ঈগল–আপাদত তোমাদের আমি সঙ্গে নিতে পারছিনা।' বন্দীরা ঈগলের কথা মাথা পেতে মেনে নিলো।

ঈগল তাদেরকে সাদা একটি মাইক্রোতে উঠিয়ে যার যার বাড়িতে পৌঁছে দেয়ার জন্য রওয়ানা দিল। তাদের বিদায় জানানোর জন্য আবু বকর সাহেব অনেক দূর গাড়ির পাশে হাটলেন। তাঁর সাথে রাহাতও এলো ঈগল ও বন্দীদের বিদায় জানাতে। কিন্তু আসলো না সুমাইয়া। ঈগল বুঝলো মেয়েটি তার সাথে রাগ করেছে। নতুবা সেই ফজরের ওয়াক্তের পর এখন বেলা নয়টা বাজে, অথচ এর মধ্যে একবারও সে আসলো না। ঈগলের কাছে সে যা জানতে চেয়েছে, ঈগল তাকে তা জানাতে পারেনি সময় স্বল্পতার কারণে। তাই নামায পড়ে ঈগল একটি চিঠি লিখল সুমাইয়ার উদ্দেশ্যে। চিঠি দেয়ার মত সুযোগ হয়নি। সুমাইয়াও আসেনি। তাই ঈগল গাড়িটা থামিয়ে রাহাতকে কাছে ডেকে তার পকেটে চিঠি দিযে বলল, এটা তোমার আপুকে দিবে। এরপর গাড়ি ছুটালো জোরে। যতক্ষণ নজরে আসে ততক্ষণ আবু বকর সাহেব তাকিয়ে রইলেন ঈগলের গাড়ির দিকে। অবশেষে গাড়ি চলে গেল চোখের আড়ালে। তিনি রাহাতকে নিয়ে ঘরে চলে এলেন।

* * *

ঈগল যখন আজও সুমাইয়ার প্রস্তাবে স্পষ্টভাবে কোন জবাব না দিয়ে পাশ কাটিয়ে গেল, সুমাইয়া তখন মনে খুব কষ্ট পেল। সে জন্যই ঈগলকে বলেছিল, 'আমার জীবনের অতি যত্নে লালিত আশাকে তুমি পদদলিত না করে দু'হাত দিয়ে গলা টিপে আমাকে শেষ করে দিয়ে যাও।' মেয়েটি আজ এতটাই ইমোশন্যাল হয়ে পড়েছে যে, আত্মহত্যা করা জায়েজ থাকলে সে তাই করত। কিন্তু তার জানা আছে, আত্মহত্যা করা মহাপাপ। আত্মহত্যাকারীর জন্য জাহান্নাম অবধারিত। তাইসে এ থেকে বিরত থাকল। নিজের রুমের ভিতর ধেকে দরজা বন্ধ করে কেঁদে কেঁদে বালিশ ভিজাতে লাগল।

আসলে প্রেম-ভালবাসা এমন এক জিনিস যা মানুষকে সর্বদা এক ঘোরের মধ্যে রাখে। এ সময় মানুষ সঠিকভাবে চিন্তা-ভাবনার শক্তিও হারিয়ে ফেলে। প্রিয়জনের দেখা, তার মুখের একটু কথা শোনার জন্য সে সর্বদা উৎকণ্ঠিত থাকে। যদি প্রিয়জনের পক্ষ থেকে সামান্য বিমাতা সুলভ আচরণ হয়, তখন পৃথিবীটাকে জাহান্নাম বলে মনে হয়। এ মুহূর্তে সুন্দরী কন্যা সুমাইয়ার অবস্থাও হয়েছে তাই। প্রিয়তমের মুখের সামান্য একটু কথায় যেন তার সারা জনমের স্বপ্ন- সাধ নিমিষেই মরু সাইমুমের প্রবল ঝাপটায় ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছে। তিলে তিলে গড়ে তোলা স্বপ্ন প্রাসাদ উড়িয়ে নিয়ে গেছে কোন দূর

অজানায়। এখন সে একা, শুধুই একা। সঙ্গী-সাথীহীন এক উদ্ভ্রান্ত ক্লান্ত পথিক। গন্তব্যের কোন ঠিকানাই আপাদত যার জানা নেই।

হঠাৎ সুমাইয়ার দরজায় নক পড়ল। সে কান্না থাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, কে ওখানে?'

'আপু আমি রাহাত। দরজা খোল!' এই ছেলেটিকে সুমাইয়া অত্যন্ত স্নেহ করে। মা-বাপ, ভাই-বোনের অভাব তাকে বুঝতে দেয়না কভু। আপন ভাইয়ের মত নাওয়া-খাওয়া সব নিজের হাতেই করায়। তাই রাহাত যখন দরজা খুলতে বলল, শত বেদনার মাঝেও দরজা না খুলে পারল না সুমাইয়া। সে দরজা খুলে দিল। রাহাত সুমাইয়ার অবস্থা দেখে কেঁপে উঠল।

'এতো তার সুমাইয়া আপু নয়! রীতিমত একজন সৈনিক, তাও আবার যেনতেন সৈন্য নয়, মার্কিন সৈন্য। মার্কিন সৈন্যদের দেখলে এমনিতেই তার মনে ঘৃণা ও ক্ষোভ ঝড়ে পড়ে। প্রতিশোধ স্পৃহায় ঝলসে উঠে তার কচি-শিশু মন। কিন্তু তার আপন বোন সমতুল্য শ্রদ্ধেয় সুমাইয়া আপু কিনা নিজেই একজন মার্কিন সৈন্য হিসেবে তার সম্মুখে উপস্থিত! যা তার বিশ্বাস করতেই কষ্ট হচ্ছে। সে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইল তার প্রতি।

'কি হয়েছে রাহাত, আমাকে ডাকছো কেন ভাইয়া?'

'তা বলছি! কিন্তু আপু আপনি এই পোষাকে কেন বলুন তো? আপনিও কি শত্রু বাহিনীতে নাম লিখিয়েছেন?'

সুমাইয়ার এতক্ষণ স্মরণই ছিল না যে, তার গায়ে মার্কিন কমান্ডারের পোষাক। রাহাতের কথায় সে বলল, 'না ভাইয়া! তোমার আপু কেন শত্রু বাহিনীতে যোগ দিতে যাবে? সে তো শত্রুদের পোষাক পরে শত্রুদের ধোকা দিয়ে, তাদের হত্যা করে এসেছে।'

সুমাইয়া মার্কিন সৈন্যদের হত্যা করেছে শুনে রাহাত খুশী হয়ে তার হাত ধরে চুমো খেল। সুমাইয়া তার মাথায় স্নেহের হাত বুলিয়ে আদর করে বলল, 'আমাকে ডাকলে কেন ভাই?'

রাহাত কিছু না বলে পকেটে হাত ঢুকিয়ে চিঠিটা বের করে সুমাইয়ার হাতে দিল। সুমাইয়া চিঠি খুলে প্রেরকের নাম দেখে চমকে উঠল। তার মন মুকুরে খুশীর রেখা ফুটে উঠল। কুলহীন সাগরে দিক হারানো নাবিক কোন শুভ প্রভাতে যখন দিগন্তরেখায় দেখতে পায় কোন বন্দরের সবুজ নিশান, তখন তার হৃদয় যেমন খুশীর আবেগে নেচে উঠে, সুমাইয়ার মনেও এ মুহূর্তে আনন্দের ফাল্গুধারা প্রবাহিত হচ্ছে সেভাবেই। রাহাতকে বলল, 'ভাইয়া! তুমি তোমার চাচীমার কাছে যাও। আমি একটু পরে এসেই তোমাকে নাস্তা খাওয়াবো।'

রাহাত চলে গেলে সুমাইয়ার দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বিছানায় গিয়ে বসল। একটি বালিশ টেনে পায়ের উপর রেখে তাতে ভর দিয়ে চিঠিটা পড়তে শুরু করল। ঈগল লিখেছে–

সুমাইয়া!

সালাম নিও। আশা করি সারারাত জাগনা থেকেও ভাল আছো তুমি। আমিও তোমার দোয়ার বরকতে সর্বোপরি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের মেহেরবাণীতে ভাল আছি।

পর সমাচার– ফুল বাগানে সূর্য উঠার আগে তুমি আমার কাছে যা জানতে চেয়েছো, তার উত্তর পরিপূর্ণভাবে দিতে পারিনি সময় কম ছিল বলে। আর তাতে হাসি মনে অনেক কষ্টই পেয়েছো। সে জন্য আমি দুঃখিত।

আমি বুঝি তোমার আবেগ অনুভূতির কথা। জানি, তুমি আমাকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালবাসো। পেতে চাও আপন করে; যদিও রাখতে চাওনা ভালবাসার তারে বন্দী করে। আমিও তোমাকে ভালবাসি সুমাইয়া! আপন করে পেতে চাই কাছে। ইচ্ছে হয় সর্বদা বসে থাকি তোমার পাশে। দু'জন মিলে গড়ে তুলি মধুময় স্বপ্নীল সোনালী সংসার। কিন্তু আমি অপরাগ! কর্তব্যের খাতিরে, জাতি-ধর্মের স্বার্থে তোমার ভালবাসাকে আমি প্রাধান্য দিতে পারি না। এটা আমার অন্যায় কিনা সে বিচারের ভার তোমার ওপর।

আমার জন্ম এমন এক দেশে, যেখানে মানুষের ভবিষ্যতের সুন্দর-সাজানো স্বপ্ন দেখার অধিকার ডাকাতের মত ছিনতাই করে নিয়েছে তথাকথিত নতুন বিশ্বব্যবস্থার (New World order) প্রবক্তা, স্বঘোষিত মোড়লেরা। আমার কাঁধে এখন এক মহান দায়িত্ব অর্পিত। তাহলো দেশকে শত্রু মুক্ত করা এবং আমাদের সত্য-সঠিক, নির্ভেজাল ধর্ম, পবিত্র ইসলামকে খৃষ্টবাদী ক্রুসেডারদের নাপাক হাত থেকে মুক্ত করা। কারণ ইতিমধ্যে উগ্র দানব, জঙ্গী বুশের ২৫ হাজার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত খ্রীস্টধর্ম প্রচারক ইরাক এসে পৌঁছেছে। জাতি-ধর্মের এই নাজুক মুহূর্তে আমার বিবেক প্রেম-ভালবাসার চিন্তা করার ফুসরত দেয়না আমাকে।

সুমাইয়া! আমি জানি, তুমি আমার প্রতি রাগ করেছ। কিন্তু কি করবো লক্ষী-সোনা বলো! তুমিও একজন ইরাকী কন্যা। তাই তুমি যদি হৃদয় দিয়ে বর্তমান পরিস্থিতির ভয়াবহতা অনুধাবন করার চেষ্টা করো, তবে নিজের মনকে শান্তনা দিতে পারবে অতি অনায়াসেই। তুমি হৃদয় খুলে, দু'হাত তুলে প্রভুর কাছে ফরিয়াদ জ্ঞাপন কর। তিনি যেন অচিরেই আমাদেরকে এই দুঃসহ পরিস্থিতি থেকে মুক্তি দান করেন। তোমার বুকের লালিত আশাকে যেন তিনি পূরণ করেন।

তোমার আম্মিজানের প্রতি সর্বদা খেয়াল রাখবে। রাহাতের যত্ন নিতে ভুল করবে না মোটেই; কারণ এতিমের প্রতি যত্ন নিলে আল্লাহ খুশী হন। আমি সময় সুযোগ পেলে তোমার সাথে দেখা করতে আসবো। আজ এখানেই শেষ করলাম।

ইতি

তোমার প্রিয় ঈগল

পত্রখানা পড়ে সুমাইয়া কিছুটা শান্তনা পেলো। ভাবলো, যাক এতদিনে তাহলে ঈগলও...আর ভাবতে পারে না সে। লজ্জা এসে জড়িয়ে ধরে তাকে। বিরহ-মিলনের এক অন্যরকম শিরহণ জাগে তার মনে। ঈগল তাকে ভালবাসে এটাই এ মুহূর্তে তার সবচেয়ে বড় পাওয়া। মুক্ত বিহঙ্গের মত আকাশের নীলিমায় ঈগলের সাথে উড়তে থাকে সে কল্পনার পাখায় ভর করে। কিন্তু যখনই স্মরণ হয় মার্কিনীরা তাদের মুক্ত মনে উড়ার অধিকার কেঁড়ে নিয়েছে, তখনই বুকের তলটা ব্যাধায় মোচড় দিয়ে উঠে। হঠাৎই যেন সে ডানা কাটা বিহঙ্গের মত মহাশূন্য থেকে ভূ-তলে ছিটকে পড়ে ধড়াস করে। মুহূর্তেই তার সব ভাল লাগা, শিহরণ জাগা-হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। সে হতাশ মনে বিছানা ছেড়ে রুম থেকে বেড়িয়ে যায়।

সাত

'মেয়েটা গেল কোথায়? সারা ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজলাম, ব্যাংকারেও দেখছি না, ব্যাপার কি সালমান?' মেজর আসাদুল্লাহ সাহেব সালমানকে লক্ষ্য করে বললেন–'মুয়াজ তো একা ব্যাংকারের খাটে ঘুমাচ্ছে।'

'হয়তোবা জরুরী কোন কাজে বাহিরে গিয়ে থাকবে'–বলল সালমান– 'রুকাইয়া তো অবুঝ মেয়ে নয়।'

'তুমি যাই বল সালমান! আমার মনে কেমন যেন সন্দেহ লাগছে'–বললেন মেজর সাহেব– 'সে একা একা যুদ্ধ করতেই গেলো কিনা কে জানে!' এই বলে তিনি সেখানে চলে গেলেন যে স্থানে রাখা ছিল ৪টি একে-৪৭ অ্যাসল্ট রাইফেল এবং অন্যান্য বেশ কিছু যুদ্ধ উপকরণ; যা মার্কিন সৈন্যদের মেরে গণিমত হিসেবে আনা হয়েছিল। সালমানও এল তার সাথে।

এস্থানে এসেই মেজর সাহেবের সন্দেহ অনেকটা বাস্তবে পরিণত হল। তিনি দেখলেন ৩টি রাইফেল, ৩ জোড়া বুট, ৩টি হেলমটে, ৩টি গ্যাস মাস্ক, তিনটি ঘড়ি, একটি হাতে বহনযোগ্য রকেট লাঞ্চার এবং বেশ সংখ্যাক গোলাবারুদ নেই রক্ষিত অস্ত্র থেকে। ঘর থেকে বেড়িয়ে গেলেন তিনি গাড়ির রুমে। গাড়িও নেই একটি। তার আর বুঝতে বাকী রইলো না যে, তাঁর বীর বাহাদুরিনী দখলদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেই গেছে। কিন্তু সে একা গেলে তো এতগুলো অস্ত্র-শস্ত্র নেয়ার কথা নয়। যেহেতু সবকিছু তিনটি করে নিয়েছে সেহেতু তার সাথে আরও দু'জন কেউ গেছে। কিন্তু তারা কারা, মেজর সাহেব সে চিন্তাই করছেন এ মুহূর্তে। হঠাৎ বাড়ির গেট পেড়িয়ে ভিতরে ঢুকলেন একজন হিজাবধারী মহিলা। ভদ্র মহিলা সরাসরি এসে মেজর সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওরা এসেছে কি ভাইজান?'

মহিলার প্রশ্ন শুনে মেজর সাহেব আশ্চার্য হলেন। তিনি বললেন, 'আপনি কাদের কথা জিজ্ঞেস করছেন? আপনিইবা কে? আপনাকে তো চিনলাম না!

'আমি জিজ্ঞেস করছি রুকাইয়া, সালমা ও মাহমুদার কথা বললেন ভদ্রমহিলা–'আমি মাহমুদার আম্মা।'

মাহমুদার আম্মা শরীফা বেগমকে ভাল করেই চিনতেন মেজর সাহেব। তাঁদের পাশের বাড়িই মাহমুদাদের। মাহমুদার পিতা জয়নুল আবেদীন সাহেব ছিলেন বাগদাদ সিটির পুলিশ সুপার। তার সাথে মেজর আসাদুল্লাহ সাহেবের বেশ ঘনিষ্ট সম্পর্ক; সেই সূত্রে রুকাইয়াও মাহমুদার মধ্যেও গড়ে ওঠে বান্ধবীর সম্পর্ক। অবশ্য মাহমুদা, সালমা ও রুকাইয়া-এরা একই বিদ্যালয়ের একই শ্রেণীর ছাত্রী এবং পাশাপাশি বাড়ি হওয়ায় তাদের বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত মজবুত। কোথাও বেড়াতে গেলে, কিছু কেনা-কাটা করতে গেলে কিংবা মেয়েদের জন্য নির্ধারিত কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে, সব সময়ে এরা তিন বান্ধবী একত্রে যাবেই। তাছাড়া তিনজনই সেরা নজরকারা সুন্দরী। রূপের চমকে কারও চেয়ে কেউ পিছিয়ে নেই। এমন তিনটি অপরূপা সুন্দরী তরুণীর একত্রে চলাফেরায় পরিচিত মহলে তারা 'ত্রিরত্নের সমাহার' হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিল। কেউ কেউ আবার তাদের দেখে হিংসায় জলে মরতো।

মেজর সাহেব মাহমুদার আম্মাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওরা তিনজন কোথায় গেলো বাবী সাহেবা?'

'দখলদার সৈন্যদের সাথে যুদ্ধ করতে গেছে ওরা–বললেন শরীফা বেগম–প্রথমে এমন দুঃসাহস করতে ওদেরকে আমি নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু ওদের চেতনা এবং দৃঢ়তার কাছে আমি হেরে যাই। পরে স্বেচ্ছায় অনুমতি দিয়েছি আমি। কিন্তু এতক্ষণে তো ফিরে আসার কথা ওদের!'

'আসেল কাজটি বেশী ভালো হয়নি' –বললেন মেজার সাহেব– 'এভাবে তিন তিনটি মেয়ে যুদ্ধ করতে যাওয়া মানে অযথাই নিজেদের বিপদে ফেলা। এরা একটু অপেক্ষা করলে দু'চারজন মুজাহিদকে সাথে দিতে পারতাম। তাছাড়া মেয়েদের ফিল্ডের যুদ্ধে না গিয়ে ঘরে বসেও যুদ্ধে শরীক হওয়ার অবকাশ রয়েছে।'

'তারা জানে যে আপনি এলে ওদের যুদ্ধে যেতে দিবেন না। তাই আপনি আসার আগেই ওরা চলে গেছে। ওরা তিন বান্ধবী শপথ করেছিল দু'চারটি মার্কিন হানাদার সৈন্য হত্যা না করে দানাপানি গ্রহণ করবে না। মূলতঃ ওদের এই অভিযান, ওদের শপথ পূরণের অভিযান। আর সে জন্যই আমি অনুমতি দিতে বাধ্য হয়েছি।' বললেন শরীফা বেগম।

'তবে তো বলার কিছু নেই'–বললেন মেজর সাহেব– 'অবশ্য ভয় এবং আশংকার ব্যাপারে হচ্ছে, মার্কিন সৈন্যদের মারতে গিয়ে আল্লাহ না করুন তারা যদি নিজেরাই ওদের হাতে ধরা পড়ে, তবে জীবন সম্ভ্রমই দু'ই খুয়াতে হবে। যেটা পিতা হিসেবে আমি ভাবতেও পারিনা।'

'আপনি সে চিন্তা করবেন না। আল্লাহ ওদের হেফাযত করবেন। তাছাড়া দুর্ভাগ্যক্রমে যদি ধরা পড়েও যায়, তবে তারা জীবন শেষ হয়ে গেলেও ইজ্জত বিলীন হতে দিবে না কোনক্রমে।' বললেন মাহমুদার আম্মা।

'আমাকে এখন দু'টো বিষয় পেরেশানিতে ফেলল' –উদাস মনে বললেন মেজর সাহেব– 'একটা হলো ঈগলের প্রত্যাবর্তন না করা, অপরটি হলো মেয়েদের একাকী অভিযানে যাওয়া।' তিনি কথা বলে ঘরের দিকে যেই না হাটা দিলেন, অমনি উত্তর দিক থেকে ধেয়ে আসলো তিনটি গাড়ি। একটি প্রাইভেট পিকআপ, অপর দু'টি সেনাবাহিনীর স্পেশাল জীপ। যাতে বহন করা হয় অস্ত্র-যুদ্ধ সামগ্রী।

মেজর আসাদুল্লাহ সাহেবের বাড়ির গেট খোলাই ছিল। গাড়ি তিনটি হুরমুড় করে ভিতরে ঢুকে গেল। মেজর সাহেব, সালমান এবং শরীফা বেগম প্রথমে ঘাবরে গেলেন। তারা অপ্রকৃতস্থ হয়ে সে স্থান ত্যাগে উদ্যত হলেন। কিন্তু পরক্ষণেই গাড়ীর ড্রাইভারদের ডাকে তাদের আর সরতে হলো না।

গাড়ি থামিয়ে ড্রাইভিং সিট থেকে নেমে এলো ড্রাইভারেরা। তাদের মুখে বিজয়ের হাসি। মাথা উঁচু করে বীরদর্পে হেটে এলো মেজর আসাদুল্লাহর সম্মুখে। একজন হাটু গেড়ে বসে গেল। মুখোশ খুলল সে এইমাত্র। হাত জোর করে ক্ষমা ভিক্ষা চাচ্ছে তাঁর কাছে। মেজর সাহেব কন্যার মাথায় হাত বুলিয়ে স্নেহমাখা কণ্ঠে বললেন, 'আম্মিজান! কোন সমস্যা হয়নি তো?' কন্যাকে কাছে পেয়ে তিনি ভুলে গেছেন সব রাগ গোস্বা।'

'আল্লাহর রহমতে কোন সমস্যা হয়নি আব্বা হুজুর'–বলল রুকাইয়া– 'আমরা সম্পূর্ণ নিরাপদে শত্রুদের ঘায়েল করে অস্ত্র বোঝাই গাড়ি দু'টি নিয়ে এসেছি।' বিজয়ের গৌরবে তার চেহারায় আনন্দের দ্যুতি ঝক্‌মক্ করছে।

'কিভাবে তোমরা নিরাপদে শত্রুদের ঘায়েল করলে আম্মিজান?' জিজ্ঞেস করলেন মেজর সাহেব।

আমরা আগে গাড়ি দু'টি এবং অস্ত্রগুলো নিরাপদ স্থানে রেখে নেই তারপর ঘরে গিয়ে সব খুলে বলব।' বলল রুকাইয়া।

মেজর সাহেব, সালমান, শরীফা বেগম, রুকাইয়া, সালমা ও মাহমুদা সকলে হাতে হাতে ধরে অস্ত্রগুলো নিরাপদ স্থানে সরাতে লাগল। অস্ত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অত্যাধুনিক ক্লাসিনকভ ২,০০০। বুলেট প্রায় ৫০,০০০। রকেট লাঞ্চার ৪০-টি। সিক্সটি সেভেন মি মি কামান ও তার গোলা। বিভিন্ন ধরণের গোলাবারুদ অসংখ্য। অস্ত্র-গোলাবারুদের নীচে উভয় গাড়িতেই পাওয়া গেল বড় আকারের বেশ ক'টি কাগজের বাক্স।

বাক্সগুলো দেখে সকলে কৌতুহলী হয়ে উঠল। কিন্তু এ স্থানে বসে কেউই কৌতুহল নিবারণের চেষ্টায় মনোনিবেশ করল না। এগুলোও ভূগর্ভস্থ ব্যাংকারে নিয়ে যাওয়া হল। গাড়ি দু'টি গ্যারেজের ভিতরে রাখা হল। অতঃপর সকলে এসে জড়ো হল

ব্যাংকারে। কৌতুহল নিবারণের উদ্দেশ্যে সালমান একটি বাক্স খুলল। বাক্সটির ভিতরের দৃশ্য দেখে সকলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। 'এ কোন আজগুবি কারবার? যুদ্ধের ফিল্ডে এগুলো দিয়ে কি করতো ওরা?' প্রশ্নসূচক ভঙ্গিতে বললেন শরীফা বেগম।

মেজর আসাদুল্লাহ সাহেবের সেন্টিমেন্টাল গরম হয়ে গিয়েছিল ওগুলো দেখেই। এবার মাহমুদার আম্মার প্রশ্ন শুনে ক্ষিপ্তকণ্ঠে বললেন, 'জারজ সন্তানের বাচ্চা জারজেরা, এগুলো এনেছে ইরাকী মুসলমানদের নৈতিক চরিত্রকে ধ্বংস করতে। ভাবী সাহেবা! আপনি বলছেন যুদ্ধের ময়দানে এগুলো দিয়ে ওরা কি করতো, তাহলে শুনে রাখুন, এই অশ্লীল ফিল্ম আর নোংরা, পুতিগন্ধময় সাহিত্য- ম্যাগাজিনগুলো ওদের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার আপনি এতক্ষণ যে সকল অস্ত্র এনে এখানে জমা করেছেন তার চেয়ে শত কুটি গুণ বেশি ধ্বংসাত্মক মারণাস্ত্র হলো এগুলো। এ সকল অস্ত্র যদি ওরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে আর তাতে যদি মুসলমান নিহত হয় তবে তারা হবে শহীদ। অমর জীবন লাভ করবে তারা। কিন্তু যে অস্ত্র ওরা এই কার্টনগুলোতে ভরে এনেছে, এগুলো যদি মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে, তবে যে মুসলমান ঘায়েল হবে এর দ্বারা সে জাহান্নামের পথে এগিয়ে যাবে ওদের পথ ধরে। সে হবে দেশের শত্রু, ধর্মের শত্রু। দখলদারদের দালাল হবে সে। বন্ধু হবে ইহুদী-খৃষ্টান ধর্মের। অস্ত্র ধরবে সে স্বজাতির বিরুদ্ধে, ধর্মের বিরুদ্ধে। দয়ামায়া, শালীনতা, ভদ্রতা, জাতীয় চেতনা, আত্মমর্যাদাবোধ সব নিঃশেষ করে দিবে এই ফিল্ম আর সাহিত্য অস্ত্র। সে হয়ে যাবে মানুষরূপী হায়েনা। নিজের লালসা চরিতার্থ করার জন্য আপন মা-বোন-কন্যাকেও রেহাই দিবে না। যেমনটি রেহাই পায়না ঐ জারজ সন্তানদের স্বর্গরাজ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রমনীরা। এই অস্ত্রের মাধ্যমে ওরা আমাদের যুবকদেরকে ওদের মত পশু বানানোর জন্যই এগুলো এনেছে। সালমান! এগুলো শীঘ্র বাহিরে নিয়ে যাও। আমি এক্ষুণি আগুন দিয়ে এগুলো পুড়ে ফেলব।'

সালমান কার্টন উঠাতে উদ্যত হলে বাঁধা দিল রুকাইয়া। সে বলল, 'আব্বু খৃষ্টানদের এই অস্ত্র যদি এতই ধ্বংসাত্মক হয়ে থাকে, তবে এগুলো এত সহজভাবে নষ্ট করা ঠিক হবেনা?'

রুকাইয়ার কথা শুনে সবাই বিস্মিত হল। বলে কি রুকাইয়া! ওর মাথা ঠিক আছে তো? এই খারাপ জিনিসগুলো পোড়াতে তার আপত্তি কেন? পোড়া না হলে এগুলো দিয়ে সে কি করবে?

'রুকাইয়া! এগুলো নষ্ট না করে এ দিয়ে তুমি কি করবে? প্রশ্ন করল সালমান।

রুকাইয়া গাম্ভীর্যের সাথে বলল, 'এগুলো প্রয়োগ করে আমাদের শত্রুরা যেমন আমাদের অসংখ্য লোককে বিপথগামী করত, আমি তেমনি এগুলো ওদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে, অসংখ্য না হলেও ওদের বেশ কিছু সৈন্যকে জাহান্নামের ঠিকানায় পৌছাব।'

'এটা কি করে সম্ভব রুকাইয়া' –জিজ্ঞেস করল সালমান– 'তুমি খুলে বলতো ব্যাপারটি।'

'ব্যাপার অত্যন্ত সহজ'–বলল রুকাইয়া–'এখানে আছে আটটি কার্টন। প্রত্যেক কার্টন থেকে কিছু কিছু বই-পত্রিকা-সিডি কমিয়ে ভিতরে একটি করে বোমা রাখা যায় মত জায়গা করতে হবে। বোমাগুলো হতে হবে রিমোট সিষ্টেম। উদ্ধৃতগুলো ভিন্ন কার্টনে ভরে তাতেও বোমা রাখতে হবে। এরপর আমাদের একজন যে কোন এক মার্কিন ক্যাম্পে গিয়ে তাদের দালাল হিসেবে পরিচয় দিয়ে বলবে, আমি এক মুজাহিদকে ধোকা দিয়ে আপনাদের বিপুল সংখ্যক পর্ণ সামগ্রী উদ্ধার করেছি।' পণ্যে সামগ্রীর কথা শুনলে সেগুলো পাওয়ার জন্য নিশ্চয় ওরা মরিয়া হয়ে উঠবে। তখন গাড়ি যোগে কার্টনগুলো সেখানে নিয়ে যাওয়া হবে। এরপর যখন ওরা গাড়ি থেকে মালগুলি নামাতে থাকবে ঠিক তখন আমাদের লোক দূরে সরে এসে রিমোট চাপ দিবে। ব্যাস্ কিল্লা ফতেহ।'

রুকাইয়ার পরিকল্পনার কথা শুনে সবাই তাকে ধন্যবাদ দিতে লাগল। কিন্তু এখন সমস্যা হল, দালাল সেজে কে যাবে মার্কিন ক্যাম্পে? এবারও রুকাইয়াই বলল, 'এ কাজের জন্য সর্বোত্তম ব্যক্তি হলো ঈগল ভাইয়া। প্রাথমিক কাজগুলো আমরা সেরে রাখবো, সে আসলেই তাকে পাঠাবো।'

মার্কিন সৈন্যদের পর্ণ অস্ত্র দ্বারা তাদেরকেই ধ্বংস করার কৌশল কন্যার মুখে শুনে মেজর সাহেব খুশী হলেন। তিনি বললেন, 'মা-মনি! ঈগল আসলে তোমার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে। এ মুহূর্তে আমাদেরকে তুমি তোমার অভিযানের বিবরণ শোনাও।' তার কথায় সায় দিলেন শরীফা বেগম বেগম এবং সালমানও।

'সে বর্ণনা আমার চেয়ে মাহমুদা–সালমা ভাল দিতে পারবে।' বলল রুকাইয়া। সালমা-মাহমুদা রুকাইয়াকে বলতে অনুরোধ করল। বাধ্য হয়ে রুকাইয়াই বলতে শুরু করল– 'প্রথমে আমরা তিনজন গাড়ি নিয়ে ঘুরতে থাকি শহরের বিভিন্ন স্থানে। খুঁজতে থাকি মার্কিন সৈন্যদের ওপর হামলা করার সুযোগ। হঠাৎ একস্থানে দেখলাম মার্কিন সৈন্যরা চেকপোস্ট বসিয়ে গাড়ি থামিয়ে গাড়িতে গাড়িতে তল্লাশি চালাচ্ছে। জনসাধারণকে নানাভাবে হয়রানি করছে। জনতারা কোন অস্ত্র কিংবা বিস্ফোরক বহন করছে কিনা সে জন্য প্রত্যেকের দেহ তল্লাশি করছে। এমনকি মহিলাদেরকেও তল্লাশি থেকে রেহাই দিচ্ছে না। তল্লাশির নামে তাদের স্পর্শ কাতর স্থানে হাত দিচ্ছে অসভ্য জানোয়ারগুলো। কোন যুবতী মেয়েকে তাদের পছন্দ হলে, তাকে সন্দেহভাজন আখ্যা দিয়ে এক পার্শ্বে নিয়ে বসিয়ে রাখছে। যাওয়ার সময় সম্ভবত এদেরকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে আনন্দ স্ফূর্তি করার জন্য।

সহসা এক ভদ্র মহিলা সৈন্যদেরকে তার ব্যাগে হাত দিতে বাধা দিল। কারণ দর্শাতে বললে, তিনি বললেন, তার ব্যাগে কোরআন শরীফ আছে। এ কথা শুনেই এক সৈনিক ঝটিকা টানে তার ব্যাগটি ছিনিয়ে নিয়ো। অতঃপর ব্যাগ থেকে কোরআন শরীফ খানা বের

করে রাস্তার পার্শ্বে ফেলে দিয়ো। সাথে সাথে মহিলা চিৎকার দিয়ে উঠেন, 'ওহে মুসলমানেরা! তোমরা কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মহান রাব্বুল আলামিনের পবিত্র কালামের অপমান বরদাস্ত করে যাবে?'

আমরা তখনও চেকআপকারী সৈন্যদের থেকে বেশ দূরে ছিলাম। গাড়িতে বসে চিন্তা করছিলাম চেকের হাত থেকে কিভাবে রক্ষা পাওয়া যায়। নানা চিন্তা তখন মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। এরই মধ্যে মহিলার কণ্ঠ ভেসে এলো কর্ণকুহরে। তাকিয়ে দেখি রাস্তার পাশে পরে আছে কোরআনখানা। মহিলা সেটাকে উদ্ধার করার জন্য যেতে চাচ্ছে, কিন্তু সৈন্যরা অস্ত্রের মুখে তাকে বাঁধা দিচ্ছে আর উল্লাসে-অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছে। মহিলা অসহায়ভাবে চিৎকার করে করে মুসলমানদেরকে বলছে পবিত্র কোরআনের ইজ্জত রক্ষা করতে। এ দৃশ্য দেখে আমি হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। ড্রাইভিং সিট থেকে মাহমুদাকে সরিয়ে দিয়ে নিজে বসলাম। অন্য গাড়ি ওভারটেক করে রং সাইড দিয়ে আমাদের গাড়ি টান দিলাম। ওদের দু'জনকে বললাম ক্লাসিনকভের ট্রিগারে হাত রেখে বসতে। অকুস্থলে পৌঁছার সাথে সাথে ফায়ার চালিয়ে দিতে।

দ্রুতগতিতে গাড়ি চালিয়ে চেকপোষ্ট বরাবর রাস্তায় থামালাম। রাস্তা থেকে চেকপোষ্ট আনুমানিক ৪০/৫০ হাত দূর হবে। ব্রেকে চাপ দিয়েই পরপর দু'তিনটি গ্রেনেড ছুড়ে মারলাম চেকপোষ্টের দিকে। গ্রেনেড বিস্ফোরিত হল প্রচন্ড শব্দে। চেকপোষ্ট গেল উড়ে। মারা পড়ল প্রায় সব ক'জন সৈন্য। সে সাথে শহীদ হলো বেশ ক'জন সাধারণ নাগরিক। শহীদ হলো কোরআন শরীফ বহনকারী সে মহিলাও। আমাদের কিছুই করার ছিল না। তাছাড়া যারা শহীদ হয়েছে তারা ছিল মার্কিন সৈন্যদের বন্দী। এদেরকে ওরা বেইজ্জতী করত, নির্যাতন করত। তারপর হয়তো মরুভূমিতে ফেলে রাখত। তার চেয়ে একবারে শহীদ হয়েছে তাও ভাল হয়েছে।

সালমা-মাহমুদা নির্দেশ মতই কাজ করেছে। সৈন্যদের যারা বিস্ফোরণের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিল তাদেরকে ঘায়েল করল ওদের রাইফেলের বুলেট। মার্কিন সৈন্যদের এই করুন পরিণতি দেখে সমস্ত গাড়ির যাত্রী-ড্রাইভাররা রাস্তায় নেমে আল্লাহু আকবার শ্লোগান দিতে লাগল। সকলে আমাদের কাছে ভিরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে লাগল। আমি শহীদদের লাশগুলো তাদেরকে নিয়ে যেতে বললাম। তারা লাশ নিয়ে চলে গেল। আমরা পবিত্র কোরআন খানা ঐ স্থান থেকে উদ্ধার করে সামনের দিকে চলতে শুরু করলাম।

শহরের বর্তমান অবস্থা দেখে আমার বিশ্বাস করতেই কষ্ট হচ্ছিল যে, এই সেই বাগদাদ নগরী যার সৌন্দর্য-সুষমার কথা ছড়িয়ে পড়েছিল বিশ্বময়। যেই নগরীর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে একদা ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর মত খোদাভীরু ফকীহ এবং বুযুর্গ ব্যক্তি স্বীয় শাগরেদ ইউনুস বিন আবদুল আলীকে বলেছিলেন, 'তুমি বাগদাদ নগরীকে না দেখলে পৃথিবীই দেখেনী।' হানাদাররা আজ বাগদাদ নগরীর সৌম্য-কান্তি অবয়বকে

ছিড়ে-খাবলে রক্তাক্ত করে ফেলেছে। বাগদাদ এখন কুৎসিত নোংরা ও অশান্তির শহরে পরিণত হয়েছে। শান্তির শ্বেত পাখিরা উড়ে গেছে কোন দূর অজানায়। রাস্তা-দেয়ালে লেগে আছে ছোপ ছোপ রক্তের দাগ। বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে বারুদ-বোমার উৎকট গন্ধ। এখানে-ওখানে মানুষের লাশ নিয়ে টানাটানি করছে কুকুর-শৃগালেরা।

বাগদাদের এই করুন পরিণতি দ্বিতীয়বার অবলোকন করে আমার বুক ভেঙ্গে কান্না এলো। মার্কিনীদের প্রতি ঘৃণা-ক্ষোভ আরও বেড়ে গেল। বিষণ্ন মনে গাড়ির ড্রাইভ করছিলাম। সহসা নজরে আসলো নতুন শিকার। এসময় আমাদের গাড়ী ওভারটেক করে চলে গেল তিনটি গাড়ী। এগুলো যে মার্কিনীদের গাড়ি তা নিশ্চিত হলাম। গাড়ীগুলো সামনে গিয়ে বামে মোর নিল। আমি সচল হয়ে উঠলাম। ফুলস্প্রীডে গাড়ি চালিয়ে বিকল্প পথে ওদের অগ্রসরমান পথে আগে চলে গেলাম। আমার গাড়ীটি একটি বাড়ির আড়ালে রেখে অস্ত্রসহ দ্রুত একটি বিল্ডিংয়ের ছাদে উঠে গেলাম। ২/৩ মিনিটের মধ্যেই শত্রুদের গাড়ি তিনটি বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে গেল। আর অমনি উপর থেকে প্রথম গাড়ির ওপর একযোগে তিনজনে তিন ধরনের হামলা করলাম। সালমা নিক্ষেপ করলো গ্রেনেড আমি ছুড়লাম রকেট আর মুহমুদা করল ব্রাশ ফায়ার। হামলা করেই আমরা একটা রুমের মধ্যে ঢুকে পড়ি। জানালার ফাক দিয়ে তাকিয়ে দেখি প্রথম গাড়িটিতে আগুন জলছে এবং দ্বিতীয় তৃতীয় গাড়ির ড্রাইভার বেড়িয়ে এলো রক্ষীর গাড়ি থেকে। রক্ষীরা গাড়ি থেকে বেড়িয়ে এসে চতুর্দিকে ফায়ার চালাতে লাগল। দুই গাড়ীতে ড্রাইভারসহ মোট ছয়জন মার্কিনী ছিল। হানাদার মার্কিনীরা ইরাককে নিজেদের দেশ ঠাওরাচ্ছিল। আর সে জন্য এতগুলো অস্ত্র-শস্ত্রের নিরাপত্তার জন্য সৈন্য দিয়েছিল মোট নয়জন। যার তিনজন প্রথম গাড়িতে আগুনের মধ্যে কাবাব হচ্ছিল এবং বাকী ছয়জন খালি মাঠে গুলি চালাচ্ছিল।

ওদের অবস্থা দেখে আমার হাসি পেল। ওরা বুঝতেই পারেনি কোনদিন থেকে হামলা হয়েছে। ওদের বুদ্ধিকে আল্লাহ তা'য়ালা বিলুপ্ত করে দিয়েছিলেন। ওরা উপরের দিকে তাকায়ও নি আর ফায়ারও করেনি। আমরা তখন রুম থেকে বেড়িয়ে তিনজনে একই সাথে ওদের দিকে ফায়ার করলাম। ওদের পিঠ ছিল আমাদের দিকে। তিনজন হুমরি খেয়ে পড়ল আমাদের বুলেট পিঠে ধারণ করে। বাকী তিনজন ঘুরে দাঁড়াল আমাদের দিকে বুক করে। এবারেও ওরা উপরে তাকাল না। আমরা আরেক দফা ফায়ার করলাম। সাথে সাথে এ তিনজনও বুকে বুলেট নিয়ে ওপুর হয়ে পড়ে গেল। পর দেশ দখলের স্বাধ চিরতরে মিটে গেল ওদের।

ওদের সব ক'জনকে খতম করে আমরা দ্রুত গতিতে বিল্ডিং থেকে নেমে এলাম। ওদের গাড়ি দু'টি তখনও স্টার্ড অবস্থায় ছিল। আমি আর মাহমুদা দু'টিতে চড়ে বসলাম। সালমা বসল আমাদেরটায়। এরপর ফুলস্প্রীডে গাড়ি চালিয়ে দিলাম আল্লাহর নাম নিয়ে। আর তাঁর খাছ মদদে সম্পূর্ণ অক্ষতভাবে নিরাপদে পৌঁছে গেলাম এখানে।'

রুকাইয়ার মুখে তাদের অভিযানের বিবরণ শুনে মেজর সাহেব আল্লাহ্ তা'য়ালার শুকরিয়া আদায় করলেন এবং বললেন, 'আমরা যদি সাহসিকতার সাথে আল্লাহর উপর ভরসা রেখে মার্কিনীদের এদেশ থেকে তারাবার শপথ গ্রহণ করি এবং এভাবে গেড়িলা লড়াই চালিয়ে যাই তবে আল্লাহর মদদও প্রতি মুহূর্তে আমাদের সঙ্গ দেবে। ফলশ্রুতিতে মার্কিনীরা ইরাক ছাড়তে বাধ্য হবেই হবে ইনশাআল্লাহ।'

'আর সে জন্য কঠিন থেকে কঠিনতর ত্যাগ কোরবানী দিতে আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ইরাকীরা সদা-সর্বদা প্রস্তুত।' বলল ঈগল।

হঠাৎ করে ঈগলের কণ্ঠস্বর শুনে সকলে চমকে উঠল। সকলের চেহারায় খুশীর আভা ফুটে উঠল। তাদেরকে সালাম দিয়ে কক্ষে প্রবেশ করল ঈগল। মেজর সাহেব বসা থেকে উঠে বুকে জড়িয়ে ধরলেন ঈগলকে। ঈগল তাঁর সাথে মোয়ানাকা করে সালমানের সাথেও মুছাফাহা, মুয়ানাকা করল। অতঃপর শরীফা বেগম, রুকাইয়া তাঁর বান্ধবীদের সাথেও কুশল বিনিময় করল।

'আপনারা তো খুব অসতর্ক মানুষ!' মেজর সাহেবকে লক্ষ্য করে বলল ঈগল।

'তা কেমন ঈগল?' জানতে চাইলেন মেজর সাহেব।

'এতগুলো মানুষ আপনারা এখানে বসে কথাবার্তা বলছেন, অথচ বাড়ির সদর দরজা থেকে এ পর্যন্ত সমস্ত দরজা, এমনকি এই বাংকারের গোপন দরজাগুলো পর্যন্ত সব খোলা।'

ঈগলের এ কথা শুনে সকলে জিহ্বায় কামড় দিল। অস্ত্রগুলো রেখেই তারা এখানে বসে পরেছিল। দরজার কথা কাররই স্মরণ ছিল না। সালমান বলল, 'আমরা সবে রুকাইয়াও তার এই বান্ধবীদের অভিযানের কাহিনী শুনায় ব্যস্ত থাকায় দরজার ব্যাপারে একেবারেই বেখবর হয়ে পড়ি।'

'এ ব্যাপারে আমাদের সকলকে সর্বদা হুশিয়ার থাকতে হবে'—বলল ঈগল—'আমাদের এতটুকু ভুলের কিংবা অসতর্কতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে পারে শত্রু। কেননা প্রত্যেক শত্রুই তার প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে সুযোগের সন্ধান করে ফিরে। এতটুকু ফাক ফোকর পেলেই সে আঘাত হানতে তৎপর হয়। এইক্ষণে এ বাড়ির অবস্থা দেখে আমি সন্দেহে পড়েছিলাম; বাড়িটি মার্কিনীরা দখল করে নিয়েছে কিনা এই ভেবে। অতঃপর আল্লাহর উপর ভরসা করে ভিতরে প্রবেশ করি। সতর্ক পা ফেলে অস্ত্র তাক করে সম্মুখে অগ্রসর হই; হয়তো শত্রু লুকিয়ে থাকতে পারে সে আশংকায়।

রুমের বাইরে এসে থমকে দাঁড়াই কথার শব্দ শুনে। পর্দার কারণে ভিতরের কাউকে দেখা যাচ্ছিল না। রুকাইয়ার কণ্ঠ শুনে বুঝতে পারি যে, সে এখানে আছে। অন্য আর কে কে আছে তা তখনও বুঝতে পারিনি, তাই দাঁড়িয়ে দাঁয়ে রুকাইয়ার অভিযানের কাহিনী শুনতে থাকি। ওর কথা শেষে যখন ফুফা জান কথা বলে উঠলেন, তখন বুঝলাম

অন্য কেহ নয়, বাড়ির মাকিলই এখানে আছেন, ভয়ের কোন কারণ নেই। তো, বোন রুকাইয়াতো রীতিমত একজন সিপাহসালার বনে গেছে। সেদিন তাকে যখন সামরিক পোষাক পরিহিতা অবস্থায় গাড়ি চালাতে দেখেছিলাম, তখনই আমি তাকে সিপাহসালার হিসেবে মন্তব্য করেছিলাম। আজ তার অভিযানের অপূর্ব কৌশল অবগত হয়ে বুঝা গেল, আমার বোন বাস্তবেই একজন সিপাহসালার হওয়ার যোগ্যতা রাখে। আর তার এই সৈনিকদ্বয় যোগ্য সেনাপতির যোগ্য সৈনিক বৈকি।' সালমা ও মাহমুদার দিকে ইঙ্গিত করে বলল।

ঈগলের এমন কথায় সকলেই হাসল। রুকাইয়া বলল, 'ভাইয়া! তুমি বড় বাড়িয়ে বললে কিন্তু! সিপাহসালার তো তুমি। আমরা সবাই তোমার অনুগত সৈনিক। আমরা টুকটাক কাজ করে তোমার শিকারের জন্য ক্ষেত্র তৈরী করি মাত্র। তোমার জন্য এক মজার শিকারের ব্যবস্থা করেছি এবারের অভিযান থেকে। ভবিষ্যতে আরও করব ইনশাআল্লাহ।'

ঈগল জানতে চাইল, 'কেমন শিকার?' রুকাইয়ার পরিবর্তে সালমান সব খুলে বলল, গাড়িতে পাওয়া মার্কিনীদের পর্ণো সাহিত্য-ম্যাগাজিন ও ব্লু ফিল্মের সিডি ক্যাসেটের কথা। তা দিয়ে মার্কিনীদের ঘায়েল করার রুকাইয়ার পরিকল্পনার কথাও বলা হলো তাকে। এ কাজটি যে রুকাইয়া তাঁর জন্যই নির্দিষ্ট করে রেখেছে, বলল তাও।

সব শুনে ঈগল বলল, 'একটা চমৎকার কৌশল বের করেছে তো আমার বোন! ইনশাআল্লাহ এর মাধ্যমে মার্কিনীদের বিরাট ক্ষতি করা সম্ভব হবে।'

'ঈগল ভাইয়া প্রথমে এসেই আমাদেরকে অসতর্কতার অভিযোগে অভিযুক্ত করলেন অথচ আপনি আসলেন ১০/১৫ মিনিট হলো, এখনো তো দরজা বন্ধের কোন বন্দোবস্ত করলেন না বরং আমাদের মত অসতর্ক হয়ে রীতিমত আলোচনায় মত্ত হয়ে গেলেন।' টিপ্পনী কেটে বলল মাহমুদা।

ঈগল মুচকি হেসে বলল, 'কেন হবোনা? ঐ যে কথায় বলে "সঙ্গ দোষে লোহাও ভাসে" অবস্থা তো তাই হয়েছে।'

'শেষমেষ অসতর্কতার অপবাদটা আমাদের মাথায়ই বর্তানো হলো তাহলে।' মৃদু হেসে বলল মাহমুদা। তার এমন কথায় ঈগলসহ সকলেই হেসে দিল। সালমা উঠে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে যেতে যেতে বলল, 'থাক! আর একে অপরকে অভিযুক্ত করার প্রয়োজন নেই, আমি সব দরজা বন্ধ করে আসি।' বলেই সে দরজা বন্ধ করতে চলে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে সমস্ত দরজা বন্ধ করে চলে এলো।

'তাহলে এই অভিযানে তুমি কখন যাচ্ছো ঈগল ভাইয়া? প্রশ্ন রুকাইয়ার।

' 'শুধু আজকে বাদে যে কোন সময়ই যাওয়া যায়'—বলল ঈগল—'আজকে আমার কিছু জরুরী কাজ আছে সেগুলো সারতে হবে। এ মুহূর্তে তোমাকে এবং তোমার

বান্ধবীদেরকে আমি একটা কাজের কর্মসূচী দিচ্ছি। আপাদত এ কাজটি তোমরা চালিয়ে যাও গুরুত্বের সাথে।'

'কি কাজ ভাইয়া? জলদি বলো! আমরা তোমার হুকুম পালনে সদা-সর্বদা প্রস্তুত হয়ে আছি।' বলল রুকাইয়া।

'হুকুম নয় পাগলী'–বলল ঈগল–'দেশ স্বাধীনের লড়াইয়ে কেউ কাউকে হুকুম দেয় না বরং প্রত্যেককে তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করে দেয়া হয়। তোমাদেরকেও আমি এই কাজের দায়িত্ব দিচ্ছি এখন। তোমরা ইরাকের মা-বোন-স্ত্রীদেরকে বুঝাও, তারা যেন স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য, আজাদী ও মুক্ত জীবনের স্বাদ ফিরে পাওয়ার জন্যে, আমাদের পবিত্র মহান দ্বীন ইসলামকে খৃষ্টবাদীদের কড়াল গ্রাস থেকে মুক্ত করতে স্বীয় সন্তান-ভাই ও স্বামীকে যুদ্ধের ময়দানে, জিহাদের রণাঙ্গনে পাঠাতে সৈথিল্য প্রদর্শন না করে।

'মা যেন তার ছেলেকে স্নেহের পরশে আটকে না রাখে। বোন যেন তার ভাইকে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ না করে। স্ত্রী যেন স্বামীকে ভালবাসার আঁচলে পেচিয়ে না রাখে। যদি তারা এমনটি করে, তবে তাদের শত্রুরা ছেলেকে মায়ের কোল থেকে, ভাইকে বোনের কাছ থেকে, স্বামীকে স্ত্রীর বুক থেকে ঠিকই ছিনিয়ে নিবে; তবে সে সাথে তাদের জীবন ইজ্জত ও লুণ্ঠন করতে ভুল করবে না ওই হায়েনার দলেরা।'

'সুতরাং তারা যাতে সন্তুষ্টচিত্তে আপন আপন পুত্র-ভাই-স্বামীকে স্বাধীনতার এই মহান লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করাতে উদ্বুদ্ধ করে এবং প্রয়োজনে নিজেরাও জীবন দিতে প্রস্তুত হয়ে যায়, সেই সবক তাদের ইয়াদ করাতে থাক। মনে রাখবে, তোমাদের এই কাজ সরাসরি ময়দানে যুদ্ধ করার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। তোমাদের কর্মতৎপরতার উপরই নির্ভর করবে আমাদের দীর্ঘ মেয়াদী গেড়িলা যুদ্ধের ভবিষ্যৎ, ইরাকের স্বাধীনতা ও মুক্তির ভবিষ্যৎ।'

'ঈগল ভাইয়া! তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। আমরা ইরাকের প্রতিটি নারীর কানে তোমার এ আওয়াজ পৌঁছে দিব ইনশাআল্লাহ!' বলল রুকাইয়া।'

ঈগল তাদেরকে আরও কিছু জরুরী দিক-নির্দেশনা দিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে এই দাওয়াতের কাজে বেড়িয়ে পড়তে বলল। রুকাইয়া মাহমুদা, সালমা ও মাহমুদার আম্মা শরীফা বেগম খানিকবাদেই বেড়িয়ে গেলেন বাংকার থেকে। তারা চলে গেলে ঈগল মেজর সাহেবের সাথে অন্য প্রসঙ্গে কথা শুরু করল। তাঁর কাছে সে জানতে চাইল, বিন লাদেনের প্রতিনিধি এসেছিলেন কিনা? এ পর্যন্ত কতজন স্বেচ্ছাসেবক মুজাহিদ এসেছে। তাদেরকে এখন কোথায় কিভাবে রাখা হয়েছে। কোন অভিযানে তাদের পাঠানো হয়েছে কিনা, ইত্যাদি।

মেজর সাহেব একে একে তার সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলেন। ঈগল তাঁর কাছে সকল বিষয়ের সাফল্যসূচক জবাব শুনে অত্যন্ত খুশী হল। প্রতি বিষয়েই আল্লাহর

সাহায্য তাদের পক্ষে থাকায় আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার মস্তক অবনত হয়ে আসে। দু'হাত উচিয়ে ধরে সে মহান রবের শুকরিয়া জ্ঞাপনার্থে বলল–হে পাক পরওয়ারদিগারে আলম! সকল প্রশংসা পাওয়ার উপযুক্ত একমাত্র তুমি। তুমিই সত্যিকারে ইনসাফ করণে ওয়ালা। তোমার ব্যবস্থাপনায় ভুল ধরতে পারে এমন সামর্থ–শক্তি নাই কোন মানুষের। আমাদের এতটুকু প্রচেষ্টায়ই তোমার মদদ হাজির। এই সামান্য রক্তের নজরানার বদৌলতেই পাঠিয়ে দিলে তোমার সাহায্য। তুমি কত দয়াবান বান্দার প্রতি! আর আমরা কত নির্বোধ বান্দা তোমার। এই প্রচেষ্টা যদি আগে করতাম। এই রক্ত যদি আগে দিতাম। তবে তোমার সাহায্যও আগে আসতো। তখন মার্কিন দস্যুরাও আর এই পবিত্র ভূমিতে পা ফেলাবার সাহস পেত না। এত লাঞ্ছিত-অপমানিত হতে হতোনা আমাদেরকে। সুতরাং তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করার কোন সুযোগ, কোন অধিকার আমাদের নেই। বরং তোমার কাছে এই ফরিয়াদ, 'আমাদের প্রতি তোমার সাহায্যের ধারাকে চালু রাখা। আমাদের দৃঢ়পদ থাকার তৌফিক দাও! আমাদের জরুরী হাজত তোমার গায়েবী খাজানা থেকে পূরণ করো। শত্রুর শক্তি তুমি নিস্তেজ করে দাও। তাদের ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তাদেরকেই ধ্বংস করে দাও। আমাদের ফরিয়াদ তুমি কবুল কর। আমাদের দরখাস্ত মঞ্জুর করে নাও হে রাব্বুল আলামীন! ইয়া রাব্বাশ শুহাদায়ে ওয়াল মুজাহিদীন!!'

বলতে বলতে ঈগলের গণ্ড বেয়ে অশ্রুধারা প্রবাহিত হয়ে দাড়ি সিক্ত হয়ে লাগল। তার সাথে মেজর-সালমানও হাত তুলল। তারা তার দু'য়া সমর্থন করে আমীন আমীন বলল। ঈগলের মনটা যে এখন কেমন প্রশান্তি অনুভূত হচ্ছে তা সে ভাষায় ব্যক্ত করতে পারছেনা। এ মুহূর্তে তার মনোবল এতটা চাঙ্গা হয়েছে যে, তার কাছে মনে হচ্ছে সে একাই মার্কিন বাহিনীকে নাস্তাবাদু করে ফেলার জন্য যথেষ্ট।

সহসা ঈগলের মোবাইল ফোনটি বেজে উঠল। সে ফোনটি কানের কাছে নিয়েই সালাম দিলো। সালামের উত্তরের পরিবর্তে ও প্রান্ত থেকে ভেসে এলো কার যেন কান্নার শব্দ। ঈগল বলল– হ্যালো! কে আপনি?

'আমি হাদীদের পিতা।' অস্পষ্ট ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বললেন আবু বকর সাহেব।

'আপনি কাঁদছেন কেন চাচা! কি হয়েছে খুলে বলুন।' জিজ্ঞাসা ঈগলের।

'আমার সব শেষ হয়ে গেছে বাবা ঈগল' –বললেন আবু বকর সাহেব – 'মার্কিন সৈন্যরা আমার বাড়িতে হানা দিয়ে সব কিছু লুট করেছে। আমার হাত-পা বেঁধে মারধর করে সুমাইয়া ও তার মাকে ধরে... ।'

এতটুকু শুনেই ঈগল সজ্ঞাহীনের মত দাঁড়ানো থেকে পরে যাবার উপক্রম হতেই সালমান তাকে ধরে ফেলল। বসিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে ঈগল ভাই? কে করেছে ফোন? নিশ্চয়ই কোন জটিল সংবাদ?' সালমানের প্রশ্নের জবাবে ঈগল ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। নিষ্প্রভের মত হয়ে গেলো সে। যেন বাকরুদ্ধ তার। কথা

বলতে চাচ্ছে সে, কিন্তু কে যেন গলাটা চেপে ধরেছে। এভাবে প্রায় ২/৩ মিনিট অতিবাহিত হল। সে ভাবতেই পারছে না, 'যে মেয়ে নিজের জীবন-ইজ্জত বাজি রেখে কাল বন্দীদের উদ্ধার করল তাদের ইজ্জত বাচিয়ে দিল, আজ সে নিজেই কিনা বন্দী। নিজের ইজ্জত আজ তার শত্রুর হাতে লুণ্ঠিত প্রায়!'

মেজর সাহেব ঈগলের বাহুতে হাত রেখে পিতৃসুলভ স্নেহের পরশ মাখিয়ে বললেন, 'কি হয়েছে ঈগল? খুলে বলো বেটা! আর কিছু না পারি আমরাও তোমার ব্যথায় সমব্যথী হতে তো পারবো অন্তত!'

'ব্যথায় ব্যথায় জর্জরিত আমার হৃদয়। নতুন কোন ব্যথা আর এখানে ঠাই পায়না–বলল ঈগল কিন্তু এক্ষণের সংবাদটি আমার সকল দুঃখ-যাতনা ছাপিয়ে পুরো হৃদয় অবয়বকে প্লাবিক করেছে। এমনটি ভাবতেও হৃদয়তন্ত্রী ছিড়ে যাচ্ছে। হৃদয় ভেঙ্গে-চুড়ে চুরমার হচ্ছে।'

'প্লিজ ঈগল! তুমি ব্যাপারটি খুলে বল আমাদের।' বলল সালমান।

'সংবাদটি হচ্ছে মার্কিনীদের নির্যাতন ও নিষ্পেষনের করুন শিকার এক পরিবারের অসহায় আর্তি' – বলল ঈগল– 'আমার ঘনিষ্ট বন্ধু হাদীদ কামালের কথা সেদিন আপনাদের বলেছিলাম। যে মার্কিনীদের বাগদাদ দখলের প্রাক্কালে শহীদ হয়েছিল। তাঁর এক সুন্দরী বোন ছিল। নাম সুমাইয়া আফরোজ। সে অত্যন্ত আত্মর্যাদাবোধ সম্পন্ন ইরাকী কন্যা। গতকালই সে আমার সাথে এক অভিযানে অংশ নিয়েছিল।'

অতঃপর সুমাইয়া কি কৌশল খাটিয়ে নিজের জীবন-ইজ্জত ঝুঁকির মধ্যে ফেলেও বন্দীদের উদ্ধারে সহায়তা করেছিল সংক্ষেপে তাও বলল ঈগল। 'এখন আপনারাই বলুন এই ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মেয়েটির বন্দী হওয়া আমাদের জন্য কত বড় দুঃসংবাদ? মাকিন সৈন্যরা সুমাইয়া ও তার আম্মুকে ধরে নিয়ে গেছে এবং তার পিতাকে হাত-পা বেঁধে মারধর করে ফেলে রেখে গেছে।' অত্যন্ত বেদনাহত কণ্ঠে বলল ঈগল।

'আসলেই ব্যাপারটা বড় স্পর্শকাতর' –বলল সালমান– 'মার্কিন বাহিনীর এই আচরণ অত্যন্ত ঘৃণার্হ ও দুঃখজনক। তারা এভাবে অযথা হয়রানি ধরপাকড় চালিয়ে, নির্যাতন-নিস্পেষণ আর লুটপট চালিয়ে ইরাকীদের বোঝাতে চাচ্ছে যে, 'তোমাদের স্বাধীনতা এখন আমাদের হাতে। সুতরাং কোনরূপ বিদ্রোহ-বিক্ষোভ কিংবা প্রতিরোধের চেষ্টা না করে মেনে নাও আমাদের অধীনতা। বেঁচে থাক আমাদের দাস হয়ে।' কিন্তু তারা জানেনা, জোর করে কোন মানুষকে অনুগত বানানো যায় না। কাউকে বশ করতে হলে ভালবাসার পালক বিছিয়ে দিতে হয়। সে যা হোক, ঈগল! তুমি সুমাইয়াদের মুক্তির ব্যাপারে কি চিন্তা করছো?'

'আমি কিছুই চিন্তা করতে পারছিনা! আমার চিন্তা করার শক্তিও যেন হারিয়ে ফেলেছি। তুমি একটি উপায় চিন্তা করো সালমান ভাই! মাথায় হাত ঠেকিয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে বলল ঈগল।

'উপায় একটি আছে, তবে তা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।' বলল সালমান।

'যত ঝুঁকিপূর্ণ হোক বলে ফেল তুমি'–ঈগল বলল–'যদি আমার জীবন বিলীন করতে হয় তবুও ওদের মুক্ত করা চাই। যার ভাই মৃত্যু মুখে দাঁড়িয়েও আমার জীবন নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিল, তার বোন যদি শত্রুর হাতে বন্দী থাকে...তবে শহীদ হাদীদের জান্নাতী আত্মা আমাকে অভিসম্পাদ করবে।'

'আগে আমাদের খোঁজ নিতে হবে কোন ক্যাম্পে তাদের রাখা হয়েছে। এরপর রাতের বেলা মুজাহিদরা চতুর্দিক দিয়ে ক্যাম্পটি ঘিরে ফেলবে। যাতে প্রয়োজনের সময় একযোগে হামলা চালাতে পারে। অতঃপর যে কোন একজন ক্যাম্পের ভিতরে প্রবেশ করবে। তবে তার আগে প্রহরী সৈনিকদের অত্যন্ত সুকৌশলে নিঃশব্দ অপহরণ করে তার থেকে ক্যাম্পের যাবতীয় তথ্য নিতে হবে।

ক্যাম্পের অস্ত্রাগারে আগুন লাগাতে হবে যে কোন মূল্যে। অস্ত্রাগারে আগুন লাগলেই সৈন্যরা ব্যস্ত হয়ে পড়বে আগুন নিভানোর কাজে। আর এই ফাকে বের করে আনা হবে সুমাইয়া ও তার আম্মাকে।' বলল সালমান।

'সঠিক চিন্তাই তুমি করেছো সালমান ভাই'–বলল ঈগল–'এছাড়া বিকল্প কোন পথ নেই। এভাবেই তাদের উদ্ধার করতে হবে।'

'তবে সমস্যা হলো, তাদেরকে কোন ক্যাম্পে রাখা হয়েছে তার অবস্থান না জানা গেলে কিছুই করতে পারবো না আমরা।' উদ্বেগ প্রকাশ করে বলল সালমান।

'সে চিন্তা করতে হবেনা–বলল ঈগল–তাবেদার পুলিশ বাহিনীর মধ্যে আমাদের পক্ষাবলম্বী একজন পুলিশ অফিসার আছেন। তার মাধ্যমেই জানা যাবে কোন ক্যাম্পে রাখা হয়েছে তাদের।'

'তবে ইনশাআল্লাহ্! আমরা তাদের মুক্ত করতে পারবো, তুমি চিন্তা করনা বেটা!' সব শুনে বললেন মেজর সাহেব।

'ঈগল! তুমি এক্ষুনি সংবাদ নাও যে, কোন ক্যাম্পে রাখা হয়েছে শহীদ হাদীদের মাও বোনকে'–বলল সালমান– 'আমরা অভিযানের জন্য মুজাহিদ এবং অস্ত্র-শস্ত্র প্রস্তুত করে রাখছি।'

এরই মধ্যে ঘুম থেকে জেগে উঠল মেজর পুত্র মুয়াজ। মেজর সাহেব, সালমান ও মুয়াজ চলে গেলেন দজলার তীরভিমুখে গাড়ি নিয়ে। আর ঈগল সাথে নিয়ে আসা গাড়ি নিয়ে চলে গেল পুলিশ অফিসার ইউসুফ সাহেবের গৃহাভিমুখে।

প্রায় ঘণ্টা তিনেক পর ফিরে এলো ঈগল দজলার তীরে বাগান বাড়িতে। মেজর আসাদুল্লাহ বসে ছিলেন ইরাকের একটি মানচিত্র মেলে। তার পার্শ্বে মোড়ালো আরো ৩টি মানচিত্র। একটি বিশ্ব মানচিত্র, অপর একটি খেলাফত যুগের জাজিরাতুল আরবের মানচিত্র এবং অপরটি আধুনিক বাগদাদের সিটি এলাকার মানচিত্র। ঈগল সালাম দিয়ে

তার পাশ ঘেষে বসল। তিনি মানচিত্রে দৃষ্টি রেখেই সালামের জবাব দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'ক্যাম্পের তথ্য পেয়েছো কি ঈগল?'

'জি পেয়েছি।' ঈগলের সংক্ষিপ্ত উত্তর।

ঈগলের উত্তরে মেজর সাহেব চমকে উঠলেন। মানচিত্র থেকে দৃষ্টি হটিয়ে তাকালেন তার দিকে। ঈগলের মুখে হতাশার ছাপ দেখতে পেলেন তিনি। জিজ্ঞেস করলেন, 'ক্যাম্পের তথ্য পেয়েছো তবু কেন তোমার মুখে হতাশার সুর?'

'তথ্য পেয়েছি ঠিকই, কিন্তু যে মার্কিন কমান্ডার বন্দী করেছে তাদেরকে, তার প্রকৃতিও জেনেছি। অত্যন্ত নীচু ও লম্পট চরিত্র সেই কমান্ডারের। আমার ভয়, আশংকা এবং পেরেশানীর কারণ হচ্ছে বন্দিনীদের ইজ্জত-আব্রুর হেফাযত নিয়ে।' বেদনাহত কণ্ঠে বলল ঈগল।

'বেটা ঈগল! তুমি নিজেকে সামলাও। বিপদে ভেঙ্গে পড়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। হতাশ হলে মনোবল ভেঙ্গে যায়। এতে শত্রু লাভবান হয় বেশী। তুমি যে বিষয়ে আংশকা প্রকাশ করছো, তার বাস্তবতা বুঝি আমিও। তবে এ বিষয়টি আপাদত আল্লাহর হাওয়ালা করে দাও। এ ছাড়াতো এ মুহূর্তে কিছুই করতে পারছিনা আমরা। রাত নামা পর্যন্ত তো অন্তত আমাদের অপেক্ষা করতেই হবে। এ অভিযানকে সফল করার জন্য অধুনালুপ্ত বাগদাদের স্পেশাল ফোর্সের ৬০ জন বাছা বাছা সৈনিককে নির্বাচন করেছি আমি। যাদের যোগ্যতা ও দক্ষতার উপর ফখর আছে আমার। অস্ত্র-শস্ত্র প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে গাড়ির ভিতর। তুমি যাও পাশের কামরায় অবস্থান করছে বীর সিপাহীরা; তাদের কিছু বলার থাকলে বল গিয়ে।' বললেন মেজর সাহেব।

ঈগল পাশের রুমে চলে এলো। এখানে মুজাহিদদের সাথে কথা বলছে সালমান। তার পাশে বসা ছোট্ট মুয়াজ। ঈগল সকলকে সালাম দিয়ে তাদের পাশে বসে পড়ল। তার পিছন পিছন মেজর সাহেবও এলেন। তিনি এসে সৈনিকদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'আমার প্রিয় মুজাহিদ ভাইয়েরা! আর কিছু সময় পরেই রাত নামবে। রাতের দ্বিতীয় প্রহরে হবে আমাদের অভিযান। এই অভিযানের গুরুত্ব এবং দায়িত্ব সম্বন্ধে তোমাদের অবহিত করবে আমাদের প্রাণপ্রিয় 'বাগদাদের ঈগল।'

এ কথা শুনে সকলে খুশী হলো। তারা আনন্দে তাকবীর ধ্বনি দিল। ঈগল দাঁড়িয়ে কোন ভূমিকা ছাড়াই বলতে শুরু করল–হে আমার মুসলমান ভাইয়েরা! আজ আমি তোমাদেরকে কোন নতুন ঘটনা শুনাবোনা। আমি তোমাদের বিবেকের কাঠগড়ায়–আত্মমর্যাদার বাটখাড়ায় একটি পুরানো ঘটনার সার-নির্যাস তুলে দিব। নিজেরা তোমরা পরিমাপ করে নিবে, আপনার মাঝে কতটুকু জ্যাত্যাভিমান অবশিষ্ট আছে।

আজ থেকে ১৩শ বছর আগের কথা। ভারত সাগরের তীরবর্তী ইয়াকুত নামে একটি দ্বীপ ছিল। সেই দ্বীপে তখন আরব মুসলমানরা যেতেন বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে। দ্বীপের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, রকমারী ফলফলাদি, শষ্যপণ্য তাদেরকে খুবই আকৃষ্ট করেছিল এবং

বহু আরব মরুবাসী সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে দিল। মুসলমান ব্যবসায়ীদের আদর্শিক জীবনযাপন, অমায়িক ব্যবহার, স্বচ্ছ লেনদেন ও সার্বিক পরিচ্ছন্নতার কারণে সেখানকার লোকদের কাছে তারা প্রিয় ও আস্থাভাজন ছিলেন। স্থানীয় লোকেরা তাদের খুব ইজ্জত-সম্মান করত এবং সার্বিক সহযোগিতাও করতো।

এসব প্রবাসী আরব মুসলমানদের কয়েকজন ঘটনাক্রমে এক নৌ দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করলে বিদেশ বিভূয়ে তাদের পরিবার-পরিজন অসহায় ও অভিভাবকহীন হয়ে পড়ে। ইয়াকুত দ্বীপের সর্দার ছিল এসব আরবদের প্রতি খুবই শ্রদ্ধাশীল। এ দ্বীপে আরবদের বসবাসকে দ্বীপবাসীর সর্দার তাদের জন্য সৌভাগ্যের প্রতীক মনে করতো। দুর্ঘটনা কবলিত নিহতদের পরিবার-পরিজনকে তাই দ্বীপের সরদার স্বদেশ ইরাকে পাঠিয়ে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ইরাকের শাসকের কৃপা দৃষ্টি লাভের প্রত্যাশায় একটি জাহাজ সংগ্রহ করল। সেই জাহাজে আপনজন ও অভিভাবক হারানো পরিবার-পরিজনদের তুলে প্রয়োজনীয় পাথেয় ও শাসকদের উদ্দেশ্যে মূল্যবান উপহার-উপঢৌকন দিয়ে ইরাকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করিয়ে দিল।

অভিভাবক হারা অসহায় মুসলিম আরবদের বহনকারী জাহাজের গন্তব্য ছিল ইরাকের সামুদ্রিক বন্দর বসরা। সেই জাহাজের পথ ছিল বর্তমান কলম্বো থেকে করাচি, সিন্ধু, বন্দর আব্বাস, হরমুজ প্রণালী হয়ে আরব সাগর হয়ে বর্তমান আরব আমিরাত, বাহরাইন, কাতার, কুয়েতের উপকূল হয়ে বসরা। সিন্ধু অঞ্চলের নৌপথ ছিল সেখানকার চরমপন্থী হিন্দু লুটেরাদের স্বর্গরাজ্য। পৌত্তলিক এই লুটেরা গোষ্ঠী সেখানকার ব্রাহ্মণরাজা দাহিরের পৃষ্ঠপোষকতা পেত। এরা মুসলিম অভিযাত্রীদের ধন-সম্পদ লুটে নিতো। ডাকতারা আরব মুসলমানদের অভিভাবকহারা অসহায় নারী-শিশুদের বহনকারী জাহাজটিকেও রেহাই দিল না। বসরাগামী এই জাহাজটিও তারা লুট করল। নারী-শিশুদের অত্যাচার ও লাঞ্ছিত করে আটক করল।

লুটেরারা যখন অসহায় মুসলিম নারী-শিশুদের বন্দী করলো তখন তাদের মধ্যকার এক মুসলিম বালিকা তৎকালীন মুসলিম শাসক হাজ্জাজ বিন ইউসুফকে উদ্দেশ্যে করে একটি চিঠি লিখেছিল। সেই বালিকা লিখেছিল–"দূতের মুখে মুসলমান শিশু ও নারীদের বিপদের কথা শুনে আমার দৃঢ় বিশ্বাস বসরার শাসনকর্তা স্বীয় সৈন্য বাহিনীর আত্মমর্যাদাসম্পন্ন সৈনিকদের অশ্ব প্রস্তুত করার আদেশ দিয়ে দিয়েছেন। সংবাদ বাহককে হয়ত আমার এ পত্র দেখাবার প্রয়োজন হবে না। কিন্তু হাজ্জাজ বিন ইউসুফের রক্ত যদি শীতল হয়ে জমে গিয়ে থাকে তবে হয়তো আমার এ পত্রও বিফল হবে। আমি আবু হাসানের কন্যা। আমিও আমার ভাই এখনো শত্রুর নাগালের বাইরে। কিন্তু আমাদের অন্য সমস্ত সঙ্গী এখন শত্রুর হাতে বন্দী-যার বিন্দুমাত্র দয়া নেই। বন্দীশালার সেই অন্ধকার কুঠরীর কথা কল্পনা করুন–যেখানে বন্দীরা মুসলিম মুজাহিদদের অশ্ব ক্ষুরের শব্দ শোনার জন্য উৎকর্ণ ও অস্থির হয়ে আছে। আমাদের জন্য অহরহ সন্ধান চলছে। সম্ভবতঃ

অচিরেই আমাদেরকেও কোন অন্ধকার কুঠরীতে বন্দী করা হবে। এও সম্ভব যে, তার পূর্বেই আবার যখন আমাকে মৃত্যুর দুয়ারে পৌঁছিয়ে দেবে এবং আমি সে দূরদৃষ্ট হতে বেঁচে যাব। কিন্তু মরবার সময় আমার দুঃখ থেকে যাবে যে, যেসব ঝাঞ্ঝা গতি অশ্ব তুর্কিস্থান ও আফ্রিকার দরজায় ঘা মারছে, স্বজাতির এতিম ও অসহায় শিশুদের সাহায্যের জন্য তারা পৌঁছতে পারল না। এও কি সম্ভব যে তলোয়ার রোম ও ইরানের গর্বিত নরপতিদের মস্তকে বজ্ররূপে আপতিত হয়েছিল, সিন্ধুর উদ্ধত রাজার সামনে তা ভোঁতা প্রমাণিত হবে। আমি মৃত্যুকে ভয় করি না। কিন্তু হাজ্জাজ! তুমি যদি বেঁচে থাক, তবে আত্মমর্যাদাশীল জাতির এতিম ও বিধবাদের সাহায্যে ছুটে এসো।

আত্মাভিমানী জাতির এক অসহায় কন্যা।

নাহীদ

রুমালের উপর রক্তে লিখিত চিঠিখানিক কয়েক ছত্র পড়েই হাজ্জাজ বিন ইউসুফ শিউরে উঠলেন। তার চোখের স্ফুলিঙ্গ অশ্রুতে পরিণত হতে লাগল। রাগে-ক্ষোভে বসা থেকে লাফিয়ে উঠলেন তিনি। পরিপার্শ্বিক অবস্থা ভুলে গিয়ে প্রায় অচেতন হয়ে মানচিত্র দেখতে লাগলেন। কটিবন্ধ থেকে খঞ্জর বের করে তার অগ্রভাগ সিন্ধুর মানচিত্রে বিদ্ধ করে বললেন–আমি সিন্ধুর বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করছি। লাব্বাইক ইয়া বিনতী-কন্যা...আমি আসছি, আমি আসছি তোমাদের নিরাপত্তার জন্য আমি আসছি... ।'

এ সময় হাজ্জাজ বিন ইউসুফ নিজ জাতির অসহায় নারী-শিশুদের উপর কৃত অত্যাচার নির্যাতনের প্রতিশোধ নিতে নিজের সকল আরাম আয়োজন হারাম করলেন। জানা যায় সেই দিনগুলোতে হাজ্জাজের মাথায় রাজা দাহির ও পৌত্তলিক ডাকাতদের প্রতিশোধ চিন্তা ছাড়া আর কোন কিছুর খেয়াল ছিল না। শেষ পর্যন্ত অসহায় মুসলিম নারী-শিশুদের অত্যাচারকারী লুটেরা হিন্দুদের আরব কন্যাদের উপরকৃত জুলুম-অত্যাচারের কঠিন প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছিল। আর অহংকারী হিন্দু রাজা দাহিরকেও পরিশোধ করতে হয়েছিল দাম্ভিকতার চড়া মূল্য। বিলিয়ে দিতে হয়েছিল নিজের প্রিয় জীবনটা।

'হাজ্জাজ বিন ইউসুফ, যার লৌহ-কঠোর হস্ত থেকে শত্রু মিত্র সকলেই মুক্তি প্রার্থনা করত। যার তলোয়ার আরব অনারব সকল দেশে বজ্রের মত পতিত হত। এবং অনেক সময় সীমা অতিক্রম করে মুসলিম জাহানের এমন সব উজ্জ্বল নক্ষত্রকে রক্ত-ধূলিতে লুটিয়ে দিয়েছে যাঁদের বক্ষ ঈমানের জ্যোতিতে ছিল প্রদীপ্ত। ইতিহাসের এমন ঘৃণিত ও স্বজাতি অত্যাচারী শাসক হাজ্জাজ বিন ইউসুফও বেঈমান বিজাতীয় লুটেরা কর্তৃক স্বজাতির কন্যার নির্যাতনের প্রতিশোধে সকল আরাম-আয়েশ হারাম করেছিলেন। স্বজাতির একটি অসহায় কন্যার আর্তনাদে তৎকালের যুবকেরা প্রতিশোধের নেশায় সেনাবাহিনীতে স্বেচ্ছায় ভর্তি হওয়ার জন্য উদগ্রীব ছিল। অথচ আরব ও ইরাকের মুসলমান হাজ্জাজের প্রতি ছিল অপ্রসন্ন, তাকে সুনজরে দেখত না; ঘৃণা করতো। তা সত্ত্বেও হাজ্জাজের প্রতি বিদ্বেষ

তাদের জাতীয় কর্তব্যবোধকে দমাতে পারেনি। কেঁদে উঠেছিল সারা মুসলিম জগত। মুসলিম বিত্তবানরা সেনাবাহিনীর খরচ নির্বাহের জন্য তাদের সঞ্চিত সম্পদ উজাড় করে দিয়েছিলেন। আর তৎকালীন শাসক নিন্দিত হলেও তার মধ্যে এতটুকু জ্যাত্যাভিমান ও আত্মমর্যাদাবোধ ছিল যে, স্বজাতির কন্যার উপর জুলুম করার প্রতিশোধ গ্রহণের আগে পর্যন্ত জাগতিক আরাম-বিশ্রাম সম্পূর্ণ বর্জন করেছিলেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ।

হে আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন যুবক ভাইয়েরা! শুধু একজন তরুণীর ডাক, একজন নারীর আহ্বান, শুধু একটি কন্যার আর্তি...। আর আজ সেই হাজ্জাজ বিন ইউসুফের দেশের কন্যা, জায়া, জননীদেরকে হিংস্র হায়েনার মত ক্ষতিবিক্ষত করছে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী, তাদের বুকের উড়না ছিনিয়ে নিচ্ছে, হেজাব কেড়ে নিচ্ছে, অপমান-লাঞ্ছিত ও অপদস্ত করছে, সম্ভ্রম লুটে পাশবিক অত্যাচার চালিয়ে পথেঘাটে, বাড়িঘরে উন্মুক্ত মাঠে ফেলে রাখছে মুসলিম মায়েদের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ। ইরাকী তরুণীদের আর্তচিৎকার ভাসছে ইথারে ইথারে, সারা দুনিয়ার মানুষই বুঝতে পারছে জঘন্য অত্যাচার চলছে ইরাকী নারীদের উপর। একদল মুসলমান নামের ইরাকী গাদ্দাররাই ইরাকী তরুণীদের তুলে দিচ্ছে বিদেশী হায়েনাদের হাতে হায়! ইতিহাসের কি নির্মম প্রতিশোধ! বহু খুনাখুনি ও রক্তের বিনিময়ে মিল্লাতের প্রাণকেন্দ্র ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের লীলাভূমি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিল যে ইরাক, যাদের রক্তের বিনিময়ে ইসলাম পেয়েছিল বিরাট শক্তি, যার সহযোগিতায় মুসলমানরা লাখ লাখ লাঞ্ছিত নারীকে জুলুমের নাগপাশ ছিন্ন করে দিয়েছিলেন মুক্তির স্বাদ, দিয়েছিলেন মাতৃত্বের মর্যাদা ও বোনের সোহাগ, নারীর ইজ্জত রক্ষায় যারা ছিলেন জীবনপণ সংগ্রামী জীবনের চেয়েও যাদের কাছে দামী ছিল নারীর ইজ্জত–সম্ভ্রম; আজ তাদেরই বোন-কন্যা-জননীরা লাঞ্ছিত ও ধর্ষিত হয়ে ধুকে ধুকে মরছে!'

হে ইরাকী নওযোজান ভাইয়েরা! হে হাজ্জাজ বিন ইউসুফ, মুহাম্মদ বিন কাসিম, সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর উত্তরসুরীরা!! হে নারীর ইজ্জতের মোহাফেজকারী বীর সেনানীদের বংশধরেরা!!! তোমরা কি ইরাকী নারীদের এই দুর্দশা নীরবে সহ্য করবে?

ঈগলের এ প্রশ্নের উত্তরে উপস্থিত মুজাহিদরা এমন গগণবিদারী শব্দ করে 'না' বলল যে, সমস্ত ভূর্গস্থ কক্ষটি থর থর করে কেঁপে উঠল। তারা বলল, আমরা সবাই জীবন বিলিয়ে দিব, তবু আর একজন ইরাকী কন্যার অপমান সহ্য করা হবে না।'

'আমি জানতাম তোমরা এই উত্তরই দিবে–বলল ঈগল–সুমাইয়া তোমাদের সেই ইরাকী বোন যে, নিজের জীবন ইজ্জতকে ধ্বংসের মুখোমুখি করে একদল নিরপরাধ অসহায় ইরাকী নারী-পুরুষকে দুশমনের হিংস্র থাবা থেকে মুক্ত করে এনেছিল সুমাইয়া তোমাদের সেই ইরাকী বোন যে, এক মুহূর্তের জন্যও ইরাকের পবিত্র ভূমিতে অবৈধ দখলদার ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীকে দেখতে নারাজ; যে ইরাককে দখলদার মুক্ত করতে মুজাহিদদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করতে সবচেয়ে বেশী স্বাচ্ছন্দবোধ করে।

তোমাদের এই আত্মর্যাদাবোধ সম্পন্ন ইরাকী বোনটিকে এবং এমন একজন গর্বিতা কন্যাকে পেটে ধারণকারী তার সম্মানিতা মাতাকে আটক করে নিয়ে গেছে ওই নরপশু মার্কিন সৈনিকরা। তাদের উদ্ধার...

ঈগলকে তার কথা শেষ করতে না দিয়ে মুজাহিদরা বলে উঠল, 'আর বলতে হবে না ঈগল! আমাদের জ্যাত্যাভিমান একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। এখনও তা যথেষ্ট পরিমাণ অবশিষ্ট রয়ে গেছে। আমরা এক্ষুণি গিয়ে বোন সুমাইয়া ও তাঁর মাকে উদ্ধার করে আনবো। আমাদের আর তর সইছে না।'

'হ্যাঁ, আমরা এক্ষুণি যাবো' – বলল ঈগল– 'তবে এখন যাবো সুমাইয়ার বাড়িতে। সেখানে শয়তানেরা তাঁর বাবাকে আহত করে বেঁধে রেখেছে।'

* * *

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে ৬১ জন সশস্ত্র নওয়োয়ান প্রবেশ করলো আবু বকর সাহেবের বাড়ির আঙ্গিনায়। এদের ৬১তম টগবগে নওয়োয়ানটি হলো বাগদাদের ঈগল। বাড়ির পরিবেশ দেখে ঈগলের মনটা কেমন ধক করে উঠল। অনেক নারী-পুরুষের আনাগোনা দেখা যাচ্ছে বাড়ির মধ্যে। ব্যাপার কি? ঈগলের বুঝে আসছেনা। সঙ্গীদের বাহিরে রেখে সে ঘরে প্রবেশ করলো।

ঘরে প্রবেশ করেই ঈগলের চৈতন্য হারাবার উপক্রম হলো। বুকটা কেঁপে উঠল প্রচন্ডভাবে। ঘরের মেঝেতে বসে আছেন আবু বকর সাহেব। তাঁর সম্মুখে সাদা কাপড় দিয়ে কি যেন ঢাকা। তিনি কাঁদছেন অঝোর ধারায়। তাঁর পাশে বসে হেচকি মেরে কাঁদছে এতিম ছেলে ছোট্ট রাহাত। ঈগলকে দেখে তাদের কান্নার বেগ আরও বেড়ে গেল। ঈগলেরও দু'চোখ ছাপিয়ে কান্না আসলো তাদের অস্থা দেখে।

আবু বকর সাহেব এক দিক দিয়ে কাপড়টা একটু সড়ালেন। সুমাইয়ার লাশ দেখে ঈগলের মাথাটা ঝিম ধরে গেল। শরীরের ধমনীতে রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেল। শ্বাস প্রশ্বাস ঘন হয়ে এলো। পুরো দুনিয়াটা তার কাছে এক মস্তবড় প্রবঞ্চনা মনে হতে লাগলো। তার বিশ্বাসই হচ্ছে না যে, সুমাইয়া লাশ হয়ে শুয়ে আছে তার সামনে। যেই মেয়ে হাজারও দুঃখ-বেদনা আর হতাশা-নিরাশার মাঝে তাকে দেখিয়েছিল ভালবাসার সুখের বাসর সাজাবার স্বপ্ন, সেই কিনা আজ তাকে ছেড়ে একাই জান্নাতের মাঝে চিরস্থায়ী বাসর রচনা করতে চলে গেল। এ কথা ভাবতেও ঈগলের দিলরাজ্য ভেঙ্গে-চুরে খান খান হয়ে যাচ্ছে। শোকে-দুঃখে সে পাথরের মত নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলো। আবু বকর সাহেব সুমাইয়ার লাশ ঢেকে দিলেন। তার পাশেই তার মায়ের লাশও একই কাপড়ে ঢাকা।

এবার ঈগলের প্রতিশোধ স্পৃহা বেড়ে গেল শতগুণ। বাইরে বের হলো সে। সাথীদের উদ্দেশ্য করে বলল, 'ভাইয়েরা আমার! সুমাইয়া ও তার মাকে আর মুক্ত করানো লাগবেনা। তারা মুক্ত হয়ে এসেছেন। তবে জীবিত নয়, লাশ হয়ে!' এতটুকু বলেই ঈগল

খামোশ হয়ে গেল। উপস্থিত মুজাহিদরাও একেবারে থ খেয়ে গেল ঈগলের কথা শুনে। সকলেই শোকাবিভূত হয়ে পড়ল। সকলের চোখ বেয়ে পড়তে লাগল তপ্ত অশ্রু। কারো মুখেই কোনো কথা সরছে না। সকলেই যেন তাদের আপন বোন আর মাকে হারিয়েছে।

এভাবে কেটে গেল বেশ কিছু সময়। মুজাহিদ ছফিউল্লাহ ঈগলকে বলল, 'ঈগল ভাই! আপনি সুমাইয়া আপা এবং তার আম্মার দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করুন। আমরা এক্ষুণি এই হত্যার প্রতিশোধ নিতে চলে যাচ্ছি।' বলেই সে মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে ছুটলো মার্কিন সৈন্যদের ক্যাম্প অভিমুখে। বুকে তাদের প্রতিশোধের আগুন জ্বলছে দাউ দাউ করে। পরলে এখন মার্কিন সৈন্যদের চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে তারা।

শোক সাগরে ভেসেও ঈগলকে নিজ হাতে খনন করতে হলো সুমাইয়া ও তার মায়ের কবর। একই সাথে দু' শহীদের জানাযা পড়ে কবরস্থ করা হল তাদের। সুমাইয়াকে কবরে রাখার সময় ঢুকরে কেঁদে উঠল ঈগল। কিছুতেই যেন নিজেকে শান্তনা দিতে পারছেনা সে। আজ তার মা-বাবা-ভাই-বোনের স্মৃতিগুলোও হৃদয়পটে ভেসে উঠছে। মার্কিনীদের প্রতি তার মনে ঘৃণা-ক্ষোভ শত শত গুণ বৃদ্ধি পেল।

দাফন পর্ব সেরে সকলেই চলে যেতে লাগল। আবু বকর সাহেব রাহাতকে নিয়ে এগিয়ে এলেন ঈগলের নিকট। তিনি কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললেন, 'বাবা! চলো ঘরে ফিরে যাই।' ঈগল তাদের সাথে ঘরে এলো। বাড়িতে আসার কিছুক্ষণ পরেই কাউকে কিছু না বলে, সে গোপনে আবার চলে এলো গোরস্থানে।

সুমাইয়ার কবরের পাশেই একটি জায়তুন গাছ। ঈগল গাছটির গোড়ায় বসে পড়ল। তার চোখ বেয়ে অঝোর ধারায় গড়িয়ে পড়ছে বেদনার লোনা পানি। স্মৃতির পাতারা উল্টে উল্টে পিছনের ঘটনাবলী সম্মুখে তুলে ধরছে নতুন করে। আজকের রাতটি যেন ঈগলের কাছে কেমন অন্যরকম লাগছে। তার মনে পড়ছে যে, সে পিতা-মাতাহারা ইয়াতীম অসহায় একটি মানুষ। এ পৃথিবীতে তাকে একান্ত ভালবাসার, হৃদয় মেলে কাছে ডাকার কেউ যে নেই তার! এমনই হাহাকার করা তার হৃদয় মরুর উষ্ণ-চৌচির বেলাভূমিতে, চির আকাংখিত শীতল বারিবর্ষণ করতে শুরু করেছিল সুমাইয়া। কিন্তু সুমাইয়ার মৃত্যুতে তার অবস্থা ঠিক তেমন হয়েছে, যেমন চৈত্রের প্রখর সূর্যতাপে শুষ্ক ভূমি সামান্য বৃষ্টির ছোয়ায় আরও হাহাকার করে উঠে।

ঈগল যয়তুন গাছটির সাথে পিঠ ঠেকিয়ে পা দু'টি সামনে ছড়িয়ে দিয়ে দুঃখ ভারাক্রান্ত কণ্ঠে সামান্য সুর করে শোকগাথা আবৃতি করতে লাগল–

বোন আমার, প্রিয়া আমার
গেলে আমায় ছেড়ে
তোমার শোকে হৃদয় আমার
যাচ্ছে ভেঙ্গে-চুরে।

এই দুনিয়ায় নেইগো আমার
আপন বলতে কেউ
শেওলার মতো জীবন আমার
ভাসে দুঃখের ঢেউ।
বেসেছিলাম তোমায় ভাল
নতুন আশা নিয়ে
নিভে গেলো আশার আলো
হলোনা আর বিয়ে।
চলে গেলে একা তুমি
না বলিয়া চুপি চুপি
তুমি ছাড়া এখন একা আমি
সময় কাটাই, বুকে দুঃখ চাপি।
তোমার আমার আশা যারা
করলো পুরে ছাই
ওদের কেটে করবো সারা
রক্ষা ওদের নাই।
তোমার পুত-পবিত্র গায়ে
দিল যারা হাত
যুদ্ধ করে ওদের আমি
উপড়ে ফেলবো দাঁত
প্রতিশোধ নিবোই আমি
ওই জালিম সেনানীর
এক এক করে শয়তানগুলোর
উড়িয়ে দিবো শির।
যেথায় পাবো যখন পাবো
হানবো আঘাত ঘাড়ে
জ্বেলেছে যারা অশান্তির আগুন
তোমার আমার ঘরে।

এভাবে বহু সময় গোরস্থানে কাটল ঈগল। গভীর রাতে চলে এলো সেখান থেকে। গোরস্থান থেকে বেড়িয়ে সোজা চলে গেলো নিজের আস্তানায়। এরপর থেকে একের পর এক অবিরাম গতিতে চলতে লাগল ঈগলের এ্যাকশন। প্রতিদিন দু'চারটি মার্কিন অথবা জোটের অন্য সৈন্য নিহত হতে লাগল ঈগলের হাতে। অভিনব পন্থায় আঘাত হানছে সে দখলদারদের উপর। তার এ্যাকশনের একটা উল্লেখযোগ্য এবং মজার দিক হলো চিরকুট। যখন যেখানে মার্কিন সৈন্যদের আঘাত হানে, সেখানে একটি চিরকুট রেখে যায়। তাতে সে লিখে দেয় "বাগদাদের ঈগল আজ এ স্থান অতিক্রম করেছে।"

ঈগলের এ্যাকশনে মার্কিন বাহিনী দিশেহারা হয়ে পড়ল। এ ক'দিনেই নাভিশ্বাস উঠেছে তাদের। ঈগলকে গ্রেফতার করার জন্য তারা উঠে পরে লাগল। কিন্তু তারা তাঁর কৌশলের সাথে কুলিয়ে উঠতে পারছে না। তারা হয়তো তথ্য পেয়েছে ঈগল ওমুক স্থানে আছে। গেলো গ্রেফতার করতে, গিয়ে দেখলো সেখানে ঈগল নেই বরং যেখান থেকে গ্রেফতারকারীরা গেছে সে ক্যাম্পে লংকাকান্ড ঘটিয়ে সে উধাও হয়ে গেছে অন্য কোথাও।

ঈগলের ভয়ে মার্কিনীরা এতটা তটস্থ যে, রাতের বেলা প্রহরারত সৈনিকরা গাছের একটি পাতা পড়লে কিংবা কোন নিশাচর পাখী বা প্রাণী ডানা ঝাপটালে- দৌড়াদৌড়ি করলে এমন আতংকগ্রস্থ হয়ে পরে যে, কম্পনের প্রবলতায় হাতের অস্ত্র নীচে পরে যায়।

একদিকে আত্মত্যাগী মুজাহিদদের আত্মঘাতি বোমা হামলা, অপরদিকে বাগদাদের ঈগলের দুর্ধর্ষ থাবায় মার্কিন বাহিনীর লবেজান দশা। বাধ্য হয়ে তারা যে কোন মূল্যে ঈগলকে ধরার প্রত্যয় ব্যক্ত করল। ঈগলের মাথার বিনিময়ে ঘোষণা করলো মোটা অংকের পুরস্কার। প্রচার করে দিল সংবাদ মাধ্যমে পুরস্কারের কথা। কিন্তু তারা জানেনা যে, ইরাকবাসী কস্মিন কালেও তাদের গৌরব, তাদের বন্ধু ঈগলকে তাদের হাতে তুলে দিবে না কখনই। মার্কিনরা ভেবেছিল অর্থের টোপ ফেললে হয়তো ঈগলকে ধরা একেবারে সহজ হবে। তারা ইরাকীদের লোভী ভেবেছে। আর তা ভাবাটাই স্বাভাবিক, কারণ যারা যেরকম তারা অন্যদেরও তাই ভাবে। চোর সর্বদা অন্য মানুষকে চোর ভাবতে থাকে।

অবশ্য প্রত্যেক দেশেই ভালো-মন্দ উভয় চরিত্রের লোক থাকে। যেখানে ভালো মানুষের বাস, সেখানে বদ চরিত্রের দু'চারজন থাকাটা বিচিত্র নয়; বরং এটাই বাস্তবতা। শাহীন রেজা বাগদাদের মন্দ চরিত্রের বাসিন্দাদের একজন। প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের আমলে কয়েকবার জেল খেটেছিল। লোকটা অসম্ভব লোভী এবং ধুরন্ধর। বাগদাদের উপকণ্ঠে তার বাড়ি। শারজা তার একমাত্র কন্যা। অত্যন্ত সুন্দরী দেখতে খুব ভালো মেয়ে। জন্মদাতা বলে পিতাকে কিছু বলতেও পারেনা। বললেও শোনেনা তার পিতা। দেশের প্রতি টইটুম্বর ভালবাসা তার হৃদয়ে। ধর্মের প্রতিও তার হৃদয়ে ভালবাসার কমতি

নেই। কলেজে বসে পরিচয় তার রুকাইয়ার সাথে। তার সংস্পর্শে সেও একনিষ্ঠ ধার্মিকা হিসেবে গড়ে উঠেছে।

শাহীন রেজার নিকট সংবাদ পৌঁছেছে, 'যে ঈগলকে জীবিত কিংবা মৃত ধরিয়ে দিতে পারবে তাকে ইরাকের অস্থায়ী সরকারের পক্ষ থেকে মোটা অংকের পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হবে।' এ সংবাদ শুনে তো সে মহা খুশী। যেভাবেই হোক ঈগলকে সে ধরিয়ে দিবেই এমন খেয়াল চাপলো তার মাথায়। সর্বদা সে ঈগলের খোঁজে ব্যস্ত। কিন্তু ঈগলকে খুঁজে পাওয়া কি এত সোজা! তবুও চেষ্টায় ত্রুটি করলো না সে।

আরবীতে একটি প্রবাদ আছে, "যে খুঁজে সে পায়।" শাহীন রেজাও খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে গেলো একদিন ঈগলের ঠিকানা। তবে তা খুব সহজে নয়; প্রতারণা ও ধোকার আশ্রয় নিয়ে পেতে হয়েছে এই খোঁজ। তার খুশী আজ দেখে কে! শাহীন রেজা ঈগলের খোজ পেলো, না জানি আসমানের চাঁদ হাতে পেলো। যেন কোন হারানো মানিকের সন্ধান পেয়েছে সে।

* * *

বাগদাদের পশ্চিম উপকণ্ঠে জরাজীর্ণ একটি বাড়ি। বহুদিন ধরে পরিত্যক্ত পরে আছে বাড়িটি। বাড়িটির মালিকের সন্ধান সঠিকভাবে কেউ বলতে পারে না। পুরানো বাড়ি হিসেবে পরিচিত এ বাড়িটিরও কোন এক সময় নতুনত্ব ছিল। ছিল ভরা যৌবনকাল। তখন এর রূপ-সৌন্দর্য কত মনোমুগ্ধকর ছিল তা এখনকার ধ্বংসাবশেষ দেখেই অনুমান করা যায়। দ্বিতল ভবনের ভিতর অংশে অনেকগুলো কক্ষ। জানা যায় ভিতরে নাকি একাধিক পাতাল কক্ষও আছে। যা শত্রুর হাত থেকে বাড়ির অধিবাসীদের হেফাযত করার নিমিত্তে তৈরী করা হয়েছে। তবে এ পাতাল কক্ষ বর্তমানকার তৈরী প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম, মেজর আসাদুল্লাহ ও অন্যান্য সরকারী বেসরকারী লোকদের বাংকারের মত এতটা সুপ্রসস্ত নয়। মোটামুটিভাবে শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচা যায় মতো বানানো হয়েছে এগুলো। তবে এ জন্যও এর নির্মাতাদের ধন্যবাদ দেয়া দরকার।

এই বাড়ি যখন নির্মাণ করা হয়েছিল তখন এর আশেপাশে অন্যকোন ঘড়-বাড়ি ছিলনা। বর্তমানে এ এলাকায় অনকে বাড়ি-ঘর নির্মিত হয়েছে। অবশ্য এখনো তা 'পুড়ানো বাড়ি' থেকে বেশ দূরে। নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে একেবারে মন্দ নয় বাড়িটি। তাই বাগদাদের ঈগল এই বাড়িটি তার দ্বিতীয় আস্তানা হিসেবে ব্যবহার করছে ইদানিং। দারুন এক নিরাপদ আশ্রয়ই বটে!

মে মাসের শেষের দিকের কোন একদিন শেষ বিকেলে 'পুড়ানো বাড়ি'র প্রতিবেশীরা দেখল দখলদার বাহিনীর বিশাল এক কনভয় এগিয়ে যাচ্ছে উক্ত বাড়ির দিকে। মার্কিন সেনাবাহিনীর কনভয়টি পুড়ানো বাড়ির সম্মুখে গিয়েই থামল। সামরিক যানগুলো থেকে সৈন্যরা নেমে পড়ল। তারা পরিত্যক্ত অবহেলিত এই বাড়িটি চতুর্দিক থেকে ঘেরাও

করলো। এমন নিচ্ছিদ্র বেষ্টনী তৈরী করলো তারা, যা দেখে প্রতিবেশীদের মনে হল, যেন তারা কোন শক্তিশালী অপাজেয় শত্রুদুর্গ ঘেরাও করেছে। ভিতর থেকে কাউকে বের হতে দিবেনা।

ঘেরাও সম্পন্ন করে সৈন্যরা সতর্কতার সাথে বাড়ির দিকে অস্ত্র তাক করে দাঁড়িয়ে কিসের যেন অপেক্ষা করতে লাগলো। দেখা গেল কয়েক মিনিটের ব্যবধানে উড়ে এলো দু'টি জঙ্গীবিমান। বিমান দু'টো পুড়ানো বাড়ির উপর চক্কর দিতে লাগলো। মার্কিন সৈন্যরা তাদের ঘেরাও আরও প্রশস্ত করলো। এবার বিমান থেকে পুড়ানো বাড়ির জীর্ণশীর্ণ অবয়বে নির্দয়ভাবে বোম্বিং করতে লাগলো। এ বাড়িটি ধ্বংস করতে জঙ্গী বিমানের দু'একটি বোমাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু বোমা নিক্ষেপ করা হলো অজস্র ধারায়, অসংখ্য-অগণিত।

মাটির সাথে মিশে গেলো পুড়ানো বাড়ির অস্থিও। চলে গেলো জঙ্গী বিমান। এবার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে তল্লাশি শুরু করলো সৈন্যরা। তাদের ধারণা পুড়ানো বাড়ির সাথে ঈগরও শেষ হয়ে গেছে। তাই ঈগলের লাশ খুঁজছে তারা। এরই মধ্যে আকাশে দেখা দিল আরেকটি জঙ্গী বিমান। বিমানের পতাকা দেখেই সৈন্যরা বুঝলো, তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা পরখ করার জন্যই এ বিমানের আগমন।

কিন্তু সহসাই বিমান থেকে শুরু হলো বোমা বর্ষণ। মার্কিন বিমান থেকে মার্কিন সৈন্যদের উপর বোম্বিং! কিছুই বুঝে আসছে না তাদের। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে বোঝার চেষ্টা করা মানে স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা। যে যেদিক পারলো দিক বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পালাতে লাগলো। কেউ ট্যাঙ্কের আড়ালে কেউবা গাড়ির মধ্যে। আবার কেউ কেউ ছুটলো লোকালয়ের দিকে। কেউ আবার বুদ্ধি করে শুয়ে গেলো মাটিতে।

এত দৌড়া-দৌড়ির পরেও বেশ সংখ্যক সৈন্য মারা পড়লো বিমানের গোলার আঘাতে। আহতও হলো অনেক। বিমান চলে গেলে সৈন্যরা একত্রিত হলো। নিজেদের বিমান থেকে বোমা নিক্ষিপ্ত হওয়ায় সাধারণ সৈন্যরা ক্ষোভে ফেটে পড়লো। কমান্ডার তাদের অনেক কষ্টে শান্ত করলো। অবশেষে ঈগলকে ধরতে আসা কনভয়টি নিজেদের সৈন্যদের লাশ ও আহত সৈন্যদের গাড়িতে তুলে দ্রুত এলাকা ত্যাগ করলো।

যে সময় মার্কিন বাহিনী ঈগলকে গ্রেফতার করতে এসে নিজেরাই আহত-নিহত হচ্ছিল, এর ঠিক পাঁচ ঘন্টা পূর্বে পুড়ানো বাড়ি থেকে মাইল দু'এক দূরের একটি বাড়িতে কথোপকথন হচ্ছিল দু'জন লোকের মধ্যে। লোক দু'জন হলো শাহীন রেজা ও তার কন্যা শারজা। শারজা তার পিতাকে খুব করে বকা দিচ্ছিল তার মন্দ কার্যাবলীর জন্য। মেয়ের কথায় কখনো ক্ষ্যাপেনা শাহীন। ক্ষ্যাপলো না আজও বরং অপরাধীর মত মাথা নীচু করে বসে রইলো। যতই খারাপ হোক কিন্তু মেয়েকে সব সময় পীর মানে বেচারা শাহীন।

শারজা প্রথমে পিতাকে তার মন্দকাজের জন্য ভর্ৎসনা করল, পরক্ষণেই অপরাধীদের ইহকালীন এবং পরকালীন অকল্যাণ ও শাস্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে অন্যায় পথ থেকে

ফিরে আসার আহ্বান জানাল। সেই সাথে দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে মুক্তি সংগ্রামের গুরুত্ব এবং প্রত্যেক ইরাকী নাগরিকের উপর সে সংগ্রাম চালিয়ে নেয়ার দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করে সে তার পিতাকে।

শাহীন জানে যে তার মেয়ে ইরাককে মুক্ত করার জন্য মুজাহিদ বাহিনীর সাথে কাজ করে। আজ যখন তার মেয়ে তাকে মুক্তি সংগ্রামের গুরুত্ব বুঝাচ্ছিল, তখন তার মাথায় একটি দুষ্ট বুদ্ধি খেলে গেল। সে ভাবলো শারজা যেহেতু মুজাহিদ গ্রুপের লোক, সেহেতু ঈগলের তথ্য তার জানা থেকে থাকবে হয়তো। তাই সে ভালো মানুষীর ভান করে শারজার কথায় সায় দিয়ে বলল, 'মা-মনি! আমি তো অপরাধ জগতের মানুষ। মুজাহিদরা আমাকে তাদের সাথে যুদ্ধ করতে নিবে কি?'

'কেন নিবেনা? দেশ মুক্তির সংগ্রামে, ধর্ম রক্ষার জিহাদে, স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের লড়াইয়ে সবাই অংশগ্রহণ করতে পারে।' বলল শারজা। সে মনে মনে খুশী হলো পিতার কিছুটা সুমতিসুলভ প্রশ্ন শুনে। কিন্তু 'কয়লা ধুইলে যে ময়লা যায় না' এ কথাটি সম্ভবত ভুলে গেছে মেয়েটি।

'তদুপরি আমার মন বলছে, তাঁরা আমাকে বিশ্বাস করতে পারবে না–বলল শাহীন–কারণ জীবনটা আমার কেটেছে অপরার্ধ আর অপরাধীদের মধ্যে এ কথা বাগদাদের কে না জানে! আমি যদি তওবাও করি তবু মুজাহিদরা আমাকে বিশ্বস্ত হিসেবে মেনে নেবে কিনা, সেটাই ভাবনার বিষয়। আর কোনমতে যদি ঈগলের হাতে পরে যাই তবে তো আর রক্ষা নেই। প্রথম সাক্ষাতেই যে, সে আমাকে ব্রাশ ফায়ার করে উড়িয়ে দেবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

পিতার এ কথা শুনে শারজা কিছুটা ঝাঁজের সাথে বলল–আব্বু! তুমি এখনও বোকার স্বর্গে বাস করছো। মুজাহিদদের সম্বন্ধে তোমার ধারণা মোটেও পরিচ্ছন্ন নয়। তুমি যদি মুজাহিদদের কাছে যাও, তবে তাদেরকে তুমি দেখতে পাবে মরুভূমির কষ্ট সহিষ্ণু উটের মতো অসম্ভব ধৈর্য্যশীল, বিস্তৃত আকাশের মতো উদার তাদের হৃদয়, বিশাল পর্বতের মতো অটল-অবিচল তাদের অবস্থান, সর্বংসহা মাটির মতো সহনশীল তাদের দিল-মন। তাদের বন্ধুত্ব এবং শত্রুতা শুধু মাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এবং এ লক্ষেই তাদের জীবন দেয়া-নেয়ার খেলা চলে থাকে। বিনা কারণে গাছের একটি পাতাও ছিড়েনা তাঁরা। তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন বলেন–তারা তাওবাকারী, এবাদতকারী, শোকরগোযার, (দুনিয়ার সাথে) সম্পর্কচ্ছেদকারী, রুকু ও সিজদা আদায়কারী, সৎকাজের আদেশ দানকারী ও মন্দ কাজ থেকে নিবৃতকারী এবং আল্লাহর দেয়া সীমাসমূহের হেফাযতকারী। বস্তুতঃ সুসংবাদ দাও ঈমানদারদেরকে।' (আল-কুরআন) সুতরাং এমন লোকদের সম্বন্ধে তোমার উক্ত ধারণা মোটেও শোভনীয় নয়।

যদি কেউ মুনাফিকী করার পর ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে নেয়, তবে আল্লাহ যেমন তাকে ক্ষমা করে দেন তেমনি মুজাহিদরাও আল্লাহর উপর ভরসা করে সে ব্যক্তিকে ভাই হিসেবে বরণ করে নেয়। অবশ্য পুনরায় বিশ্বাস ঘাতকতা করলে তার আর রক্ষা নাই। আর তুমি যে ঈগল ভাইয়ের কথা বলেছো, তিনি তোমাকে দেখলেই ব্রাশফায়ার করবেন। তোমার এ ধারণাও সম্পূর্ণ ভুল এবং ঈগল ভাইকে অযথা দোষারোপ করার শামিল। এটা ঠিক যে, ঈগল অত্যন্ত কঠিন দিলের মানুষ; তবে তা শুধু কাফেরদের বেলায়। নতুবা নিজেদের মধ্যে তাঁর মতো দয়ালু এবং বন্ধু বৎসল মানুষ খুব কমই দেখেছি। তুমি যদি চাও তবে তোমাকে আমি তাঁর ঠিকানা বলে দিতে পারি। তিনি আমাদের এলাকাই বর্তমানে অবস্থান করছেন।

তুমি গিয়ে তার কাছে যদি বলো, ঈগল! আমি জীবনে বহু অপরাধ করেছি। এখন তার প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য আল্লাহর পথে জিহাদ করে জীবন উৎসর্গ করতে চাই।' আমার দৃঢ় বিশ্বাস তিনি তোমাকে হত্যা কিংবা ঘৃণা না করে আপন পিতার মতো শ্রদ্ধা করবেন এবং মুজাহিদদের সাথে কাজ করার সুযোগ করে দিবেন।'

কন্যার কাছে ঈগলের ঠিকানা পাবে শুনে খুশীতে শাহীন রেজার মন নেচে উঠলো। কল্পনায় সে লক্ষ লক্ষ ডলার গুণতে লাগলো। শারজাকে সে বলল, 'মা-মনি! আসলেই আমি মুজাহিদদের ও আমাদের গৌরব বাগদাদের ঈগলের সম্বন্ধে ভুল ধারণা পোষণ করেছিলাম। তুমি জলদি আমাকে ঈগলের ঠিকানা দাও, আমি এক্ষুণি গিয়ে তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে তার অনুগামী হয়ে দখলদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করবো। প্রয়োজনে শহীদ হবো, তবু মার্কিনীদের এদেশ ছাড়া করবো।'

শারজা পিতাকে বিশ্বাস করে সরল মনে ঈগলের ঠিকানা দিয়ে দিল। শাহীন রেজা ঈগলের ঠিকানা পেয়ে যেন সাগর তলের মুক্তার খনির সন্ধান পেলো। চটজলদি ভালো জামা-কাপড় পড়ে ঘর থেকে বের হয়ে পড়ল; সে তা হাসিলের লক্ষ্যে।

শারজার আজ খুব আনন্দ লাগছে, এতদিনে পিতাকে সে সৎপথে আনতে পেড়েছে, তা ভেবে। সে জানালা খুলে পিতার গমন পথের দিকে তাকিয়ে রইলো। হঠাৎ তার মনে কেমন যেন সন্দেহ দোলা দিল; তার পিতা 'পুড়ানো বাড়ি'র পথে না গিয়ে শহরের পথ ধরেছে দেখে। সে ভাবলো, 'আব্বু কি পথের কথা ভুলে গেলেন?' আবার নিজে নিজেই বলল, 'না, এতটুকু সময়ের মধ্যে পথ ভুলার কথা নয়! তার মনে হতে লাগলো, পিতা তাকে ধোকা দিয়ে ঈগলের ঠিকানা নিলো কিনা। সে নিজে নিজেকে শাসাতে লাগলো, কেন সে এত তাড়াতাড়ি পিতাকে বিশ্বাস করলো আর কেনইবা এমন একজন মানুষকে ঈগলের তথ্য দিতে গেল। নিজের প্রতি নিজেরই রাগ হচ্ছে এখন তার। কিন্তু তীর যে ধনুক থেকে বেড়িয়ে গেছে এখন কি করা?

একবার ভাবলো দৌড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করবে, আব্বু তুমি কোথায় যাচ্ছো? এরই মধ্যে দেখলো একটি সামরিকযান থামিয়ে তার পিতা তাতে চরে বসলো। গাড়িটি যে

মার্কিন সৈন্যদের তা দেখেই বোঝা গেল। শারজার আর বুঝতে বাকি রইলো না, তার পিতা কেন তারাহুরা করে বের হয়েছে। এমতাবস্থায় সে কি করবে ভেবে পাচ্ছে না মেয়েটি। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো পিতার গমন পথের দিকে। এখন কি হবে...

সহসা তার মাথায় চিন্তা আসলো, আব্বু মার্কিনীদের সংবাদ দিলেই তো ওরা ঈগলকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাবে। আর তার গ্রেফতারের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী হবো আমি। না তা হতে পারেনা! ঈগল ভাইয়ের এমন ক্ষতি কিছুতেই হতে দেয়া যায় না।' নিজে নিজেই এই স্বগোতুক্তি করে ঈগলকে বাঁচানোর জন্য তৎপর হয়ে উঠলো সে। অতি দ্রুতগতিতে ঘরে রাখা প্যান্ট, শার্ট পড়ে, মাথায় হেলমেট দিয়ে পুরুষ সাজলো শারজা। তাকে এখন কেউ দেখলে ভাবলে, এ যে এক বলিষ্ঠ আরবী নওযোয়ান। পিতার জাপানী হোন্ডাটি বের করে তাতে চেপে বসলো সে। ঘণ্টায় ১৬০ মাইল বেগে হোন্ডা চালালো পুড়ানো বাড়ির দিকে। হোন্ডা তো নয় যেন উড়োজাহাজ চলছে পিচঢালা রাস্তার ওপর।

অল্প সময়ের মধ্যে শারজা পৌঁছে গেল পুড়ানো বাড়িতে। হোন্ডা থামিয়ে ষ্টান্ড করে দ্রুতপায়ে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করলো। অতঃপর নির্দিষ্ট কোড সংকেত দিলে ঈগল বেড়িয়ে বাইরে এলো। পুরুষবেশী শারজাকে দেখে মুচকি হেসে বলল, কি ভাই? কোন জটিল সমস্যা নয়তো?

'সমস্যা অত্যন্ত জটিল। ঈগল ভাইয়া! তোমার আর এক মুহূর্ত সময় এখানে অবস্থান করা চলবে না'—পেরেশান অবস্থায় বলল শারজা— 'মার্কিনীদের ক্যাম্পে তোমার এই আস্তানার তথ্য-ঠিকানা পৌঁছে গেছে। এতক্ষণে হয়তো সৈন্যরা রওয়ানাও হয়েছে তোমাকে গ্রেফতারের উদ্দেশ্যে। জলদি তুমি এ স্থান ত্যাগ করো ভাইয়া!'

'এতদিন আমি ওদের খুঁজে খুঁজে মার দিয়েছি, আজ যখন ওরা স্বেচ্ছায় আসছে আসতে দাও; আজকে ঘটা করে একটা মার দিব ওদের।' বলল ঈগল।

'ঈগল ভাইয়া! তুমি অবস্থার ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে চেষ্টা করো, প্লিজ' —হাত জোর করে বলল শারজা— 'তোমাকে ধরার জন্য ওরা ব্যাপক আয়োজন করে আসবে। তাদের সাথে থাকবে অত্যাধুনিক সামগ্রিক বহর-ট্যাঙ্ক, কামান, মর্টার এবং সে সাথে বিমান বাহিনী তো আছেই। সুতরাং একা তুমি তাদের তেমন কিছুই করতে পারবে না।'

'তুমি এত অস্থির হয়ো না শারজা' —বলল ঈগল— 'ওরা যত যাই নিয়ে আসুক ইনশআল্লাহ আমি তার মোকাবেলা করে যাবো।'

'আমি তোমার সাহস এবং হিম্মতের প্রশংসা করি ভাইয়া! কিন্তু শত্রুদের এতসব অস্ত্র-আযোজনের মোকাবেলায় তুমি একা, বলতে গেলে খালি হাতে লড়বে, এটা নিছক আত্মপ্রবঞ্চনা বৈ কিছুই নয়। বুদ্ধিমান মুজাহিদরা এভাবে নিজেকে আত্মপ্রবঞ্চনার মধ্যে ফেলে না। বরং তারা কৌশলের আশ্রয় নেয়। তুমিও পারলে কৌশলের আশ্রয় নাও।

এভাবে একা একা লড়াই করার চিন্তা করলে হয়তো তোমার শহীদ হওয়ার তামান্না পূরণ হবে, কিন্তু তুমি যে আমাদের প্রেরণা ভাইয়া! তোমার থেকে আমরা সাহসিকতার শিক্ষা পাই। তাই তুমি আমার কথাটা রাখো! জলদি তুমি এ স্থান ত্যাগ করো।' অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বলল শারজা।

এরই মধ্যে ঈগলের মোবাইল ফোনটা বেজে উঠলো। ফোন ধরতেই অপর প্রান্ত থেকে ভেসে এলো একটি ব্যস্ত এবং আতংকিত কণ্ঠস্বর—'ঈগল! মার্কিন সৈন্যরা তোমাকে গ্রেফতার করার জন্য ক্যাম্প থেকে বের হয়েছে! তুমি দ্রুত তোমার অবস্থান পরিবর্তন করো!'

ঈগল জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কে? মার্কিন বাহিনী আমার অবস্থানের সংবাদ পেল কিভাবে?'

'তুমি আমাকে চিনতে পারছো না ঈগল? আমি তোমার সুহৃদ ক্যাপ্টেন পার্ল উইলসন। আর তোমার অবস্থানের সংবাদ একটু পূর্বে শাহীন রেজা নামক একজন ইরাকী গাদ্দার মার্কিনীদের দিয়ে গেল। তোমাকে গ্রেফতার করার জন্য যে বাহিনী যাচ্ছে সে বাহিনীকে বিমান সহায়তা দানের জন্য আমিও আসছি। আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, প্রথমেই বিমান থেকে বোমা মেরে তোমার অবস্থান স্থল মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে। তাই তুমি যদি এখন পুড়ানো বাড়িতে থাকো তবে অনুগ্রহপূর্বক এক্ষুণি অন্যত্র চলে যাও।' একথা বলেই লাইন কেটে দিলেন ক্যাপ্টেন পার্ল উইলসন।

ক্যাপ্টেন পার্ল উইলসন একজন উদারপন্থী খৃষ্টান। চাকুরী করেন মার্কিন বিমান বাহিনীতে। এক অনাকাংখিত পরিস্থিতিতে ঈগলের সাথে পরিচয় তার। সেবার মার্কিন ক্যাম্পে হামলা করতে গিয়ে ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছিল ঈগল, তা ক্যাপ্টেন পার্ল উইলসনের কারণেই রক্ষা পেয়েছিল সে। ক্যাপ্টেন তখন তাকে এও বলেছিলেন, কোনরূপ সহযোগিতার প্রয়োজন দেখা দিলে আমাকে কল করবে, সাধ্যমত সহযোগিতা করার চেষ্টা করবো।' সেই ক্যাপ্টেন পার্ল সাহেব তাকে সতর্ক করলেন তখন ঈগল তার কথা না শুনে পারলো না।

মোবাইল পকেটে রাখতে রাখতে ঈগল শারজাকে লক্ষ্য করে বললো, 'শারজা! এইমাত্র আমি জানতে পারলাম তোমার পিতাই নাকি আমার ঠিকানা মার্কিনীদের কাছে পৌঁছিয়েছে।'

'তা আমি জানি ঈগল ভাইয়া! তুমি আগে বাঁচো, তারপর আমার পিতার বিরুদ্ধে এ্যাকশন আমিই নেবো। এতবড় বিশ্বাস ঘাতকতার শাস্তি তাকে পেতেই হবে।'

ঈগল ঝটপট তার গাড়ি বের করে কেটে পড়লো এ বাড়ি থেকে। শারজা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে চলে এলো আপন আলয়ে। অপেক্ষায় রইলো পিতাকে শাস্তি দিবার জন্য।

পুড়ানো বাড়ি থেকে বেড়িয়ে ঈগল গাড়ি নিয়ে চলে এলো শহরের দিকে। মার্কিনীদের সেই সামরিক বহরটি যা ঈগলকে গ্রেফতার করার জন্য যাচ্ছে, সেটি

এইমাত্রই গেলো ঈগলের পাশ দিয়ে। তার ইচ্ছা করছে এখনই ওদেরকে তাকে গ্রেফতারের স্বাদ মিটিয়ে দিতে। কিন্তু কি ভেবে যেনো তাদেরকে অতিক্রম করে সামনে অগ্রসর হতে লাগলো সে।

যে ক্যাম্প থেকে ঈগলকে গ্রেফতার করতে সৈন্যরা বের হয়েছে সেটা বিমান বন্দরের নিকটেই অবস্থিত। ঈগল বিমান বন্দরের কাছাকাছি গিয়ে গাড়ি থামালো। সে দেখল দু'টি জঙ্গী বিমান আকাশে উড্ডয়ন করেছে। বিমান দু'টি শহরের উপকণ্ঠের দিকেই যাচ্ছে। তাঁর আর বুঝতে বাকি রইলো না কোথায় এবং কেন যাচ্ছে এ দু'টো বিমান। এ মুহূর্তে প্রচন্ড হাসি পেলো ঈগলের। তার মনে পড়লো পাকিস্তানের বিখ্যাত মুজাহিদ নেতা মাওলানা মাসউদ আযহার সাহেবের মুখ নিঃসৃত একটি অমূল্য বাণী "রব বাঁচাতে চাচ্ছেন আর ভূতের পূজারীরা মারতে চাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত রবের ইচ্ছাই বাস্তবায়িত হয়।"

মাওলানা সাহেবের কথাটা ধ্রুব সত্য। নতুবা বর্তমান বিশ্বের সর্ববৃহৎ শক্তির দাবীদার, তথাকথিত বিশ্বমোড়ল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই নব্বইয়ের দশক থেকে খ্যাতিমান আরব মুজাহিদ, সারা দুনিয়ার মুজাহিদদের নয়ন মনি, শায়খ ওসামান বিন লাদেনকে ধরার জন্য মারার জন্য কম চেষ্টা করেনি, কম হামলা চালায়নি। কিন্তু অদ্যবধি তারা ওসামার শরীরে এতটুকু আছড়ও দিতে পারেনি। তিনি এখনও বহাল তবিয়তেই আছেন এবং সেই আফগানেই আছেন যেই আফগান এখন আমেরিকার দখলে। আজও মার্কিন সৈন্যরা আমাকে ধরার জন্য অন্য কথায় মারার জন্য অভিযান চালাতে গেল অথচ আল্লাহ্ তা'য়ালা তাদের পৌঁছার পূর্বেই আমাকে নিরাপদে বাঁচিয়ে আনলেন।' গাড়িতে বসেই এসকল কথা চিন্তা করছিল ঈগল। তার মন পাখিটা এ মুহূর্তে পুড়ানো বাড়ি এলাকায় ঘুরা-ফিরা করছে।

এভাবে গাড়িতেই আরো কিছু সময় কাটালো ঈগল। সে এমন স্থানে গাড়িটি রেখেছে যাতে ক্যাম্পের সৈন্যদের এবং বিমান বন্দরের কর্মকর্তাদের নজরে না পড়ে। এদিকে দিন মনিটা গোধূলীর আকাশে রক্তিমাভা ছড়িয়ে দিয়েছিল। আর একটু পরেই চতুর্দিকে অন্ধকারের চাদর বিছিয়ে দিয়ে রাতের আঁচলে সে মুখ ঢেকে নিবে। এমনই মুহূর্তে ঈগল দেখল অভিযান শেষ করে ফিরে এসেছে বিমান দু'টো। বিমান দু'টো যখন আকাশে চক্কর দিয়ে অবতনের প্রস্তুতি নিল, ঠিক সে মুহূর্তে ঈগল তার গাড়ি চালু করল। এদিকে সূর্য ডুবে আবছা অন্ধকার ছড়িয়ে গেছে সর্বত্র। বিমান দু'টো অবতরণ করে রানওয়ে যেই না স্থির হলো আমনি ঈগলের গাড়ি ছুটে এসে একটি বিমানের দরজা ঘেষে দাঁড়িয়ে গেল। বিমানের কাছে গাড়ি ছুটে যেতে দেখে বিমান বন্দরের গার্ড ও কর্মকর্তারা হতভম্ব হয়ে গেল। তারা কোন পদক্ষেপ নেয়ার পূর্বেই পরিস্থিতি তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল।

যখন ঈগলের গাড়ি বিমানের পাশে গিয়ে থামলো, ঠিক তখন পাইলট দরজা খুলে বের হতে যাচ্ছিল। সাথে সাথে ঈগল তার মাথায় অস্ত্র তাক করে ভিতরে যেতে বললো। বিমানের পাইলট ছিলেন পার্ল উইলসন। তিনি উচ্চবাচ্য না করে ঈগলের কথামত ইঞ্জিন ষ্টার্ড দিয়ে বিমান পুনরায় আকাশে উড্ডয়ন করলেন। বিমান উড্ডয়ন করার পর ঈগল ক্যাপ্টেন সাহেবকে বিমানের নিয়ন্ত্রণ তার হাতে দিতে বললো। তিনি নিয়ন্ত্রণ ঈগলের হাতে দিয়ে পাশের সিটে বসলেন। ঈগল বিমান চালাতে লাগল।

অনেকদিন পর ঈগল আজ বিমান চালানোর সুযোগ পেল। আগফানিস্তান থাকাকালীন সময়ে এই যান্ত্রিক ফড়িং নিয়ন্ত্রণের কৌশল শিখেছিল সে। ক্যাপ্টেনের নিকট থেকে নিজ হাতে নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে এ জন্য, যাতে মার্কিন কর্তৃপক্ষ তাকে বিমান ছিনতাইয়ের সহযোগী হিসেবে অভিযুক্ত করতে না পারে। নিয়ন্ত্রণ নিজ হাতে নিয়ে সরাসরি চলে এলো সে পুড়ানো বাড়ির আকাশে। এসেই বোম্বিং করতে লাগল তার লাশ সন্ধানকারী মার্কিন সৈন্যদের ওপর। সৈন্যরা যখন ইতস্ততঃ ছুটোছুটি করছিল তখন ঈগলের খুব আনন্দ লাগছিল। কারণ, এরাই তো সেই মার্কিন সৈনিক যারা তার প্রিয়তমাকে তার কাছ থেকে চিরতরে কেড়ে নিয়েছে। এরাইতো সেই মার্কিন বাহিনীর সৈনিক যারা তাকে মায়ের স্নেহ, পিতার আদর, ভাই-বোনের ভালবাসা থেকে জনমের তরে বঞ্চিত করেছে।

বিমানটিতে বোমা ছিল কম। যেহেতু একবার এর বোমা ব্যবহার করা হয়েছিল। বিমানে পর্যাপ্ত পরিমাণ বোমা থাকলে একটা সৈনিকও জীবিত ফিরতে পারত কিনা সন্দেহ। তার খুব আফসোস হতে লাগলো সবগুলোকে মারতে না পারায়। অগত্য এ স্থান ত্যাগ করে চলে গেলো বিমান নিয়ে অন্যত্র।

এখন সমস্যা দেখা দিল বিমান থেকে ঈগলের নামা নিয়ে। বাগদাদ বিমান বন্দরে অবতরণ করলে নিশ্চিত গ্রেফতার হতে হবে মার্কিন সেনাদের হাতে। অন্যত্র কোন বিমান বন্দরেও নামা নিরাপদ মনে হলো না ঈগলের। ক্যাপ্টেন উইলসন পরামর্শ দিলেন বিমানটিকে বসরার বিমান বন্দরে অবতরণ করাতে। কিন্তু বসরা যেতে যে পরিমাণ অকটেন প্রয়োজন তা বিমানে মজুদ নেই। যা আছে তাতে আর বড় জোর ১৫ মিনিট চলতে পারবে বিমান। শেষতক ঈগল নিজেই উপায় একটি বের করল। ক্যাপ্টেন সাহেবকেই পুনরায় পাইলটের আসনে বসিয়ে দিল। অতঃপর নিজে একটি প্যারাস্যুট নিয়ে নিলো। তাঁকে বললো বিমান দজলার দিকে নিয়ে যেতে। তিনি তাই করলেন। বিমান যখন দজলার তীরে খেজুর বাগান বরাবর এলো ঠিক তখন ঈগল বিমান থেকে লাফিয়ে পড়লো। আর ক্যাপ্টেন পার্ল উইলসন বিমান নিয়ে চলে গেলেন।

বিমান থেকে প্যারাস্যুট নিয়ে লাফ দিয়ে আস্তে আস্তে নীচে নামতে লাগলো ঈগল। 'বাগদাদের ঈগল' আজ সত্যিকারে আকাশে উড়ছে। ঈগল নামের প্রকৃত সার্থকতা ফুটে উঠল যেন এ মুহূর্তে। শূন্যে ভেসে নামতে ভালই লাগলো ঈলগের। তখন সন্ধ্যা পেড়িয়ে রাত নেমেছে প্রকৃতিতে। দাদশীর চাঁদটা আকাশে দেদীপ্যমান হয়ে জ্যোসনালোক ছড়িয়ে

দিয়েছে সে সময়েই। সালমান মাগরিবের নামায পড়ে কেবল অবসর হলো। হাতে একটি তছবী নিয়ে খেজুর বাগানে বিচরণ করছে আর মহান শক্তিধর প্রভুর পবিত্র নামের জাপনা করছে মনে মনে। সহসা তার দৃষ্টি আকাশের দিকে নিবদ্ধ হলো।

সালমান দেখলো আকাশ থেকে কি যেন নীচের দিকে নেমে আসছে! হঠাৎ দেখে তার মনে হলো, চাঁদের থেকেই যেন ছুটে আসছে ওটি। 'কি হতে পারে' ভাবতে লাগলো সে। কোন শব্দ নেই, আলো নেই। গভীরভাবে বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করতে লাগল সালমান।

দেখতে দেখতে সালমানের সম্মুখে অবতরণ করলো আশ্চার্য বস্তুটি। সালমান একেবারে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। ঈগল তাকে সালাম দিলে দু'জনে আলিঙ্গনাবদ্ধ হলো। সালমান বলে উঠলো, 'বাগদাদের ঈগল আজকাল সত্যি সত্যি আকাশে উড়তে শুরু করেছে! এতদিন বুঝলাম বাগদাদের জনগণ সঠিক জিনিসের সঠিক নাম দিয়েছে।'

'এ এক ব্যতীক্রমী ঈগল সালমান ভাই' –মৃদু হেসে বলল ঈগল– 'প্রত্যেক ঈগল শুধু আকাশেই উড়ে। আর বাগদাদের ঈগল আকাশে উড়ে, মাটিতে ঘোরে এবং পানিতেও সাতরায়।' এবার দু'জন একত্রেই হেসে উঠলো। তাদের হাসির মাঝে পাশে এসে দাঁড়ালো রুকাইয়া। ঈগলকে দেখে সে উচ্ছসিত হয়ে বলল, 'ভাইয়া! তুমি এলে কখন? এতদিন কোথায় ছিলে তুমি? তোমার খোজে সুমাইয়ার পিতা কতবার যে এসেছিলেন তার কোন ইয়ত্তা নেই!'

'আরে তোমার ঈগল ভাইয়া তো এইমাত্র আকাশ থেকে উড়ে নামলো!' বলল সালমান।

'আকাশ থেকে উড়ে নেমেছে! এটা আবার কেমন কথা–আশ্চার্যান্বিত হয়ে বলল রুকাইয়া–সালমান সাহেব কি বলছেন ঈগল ভাইয়া? সত্যি কি তুমি আকাশে উড়ো?'

'তোমরা যখন ঈগল নাম দিয়েছো আমায়, তো মাঝে মধ্যে না উড়লে কি ঈগল নামের সার্থকতা থাকে!' উত্তর দিল ঈগল।

'তা অবশ্যি সত্য। কিন্তু কিভাবে উড়লে আকাশে, তা বলবে কি ভাইয়া?' বলে রুকাইয়া তা শোনার আবদার ছুড়ে দিল।

ঈগল সবকিছু খুলে বলতে লাগলো সালমান ও রুকাইয়ার কাছে। কিভাবে মার্কিনীরা তাকে গ্রেফতারের অন্য কথায় হত্যা করার টার্গেট করেছিল। কার সহায়তায় পুড়ানো বাড়ি থেকে বের হয়েছিল। কিভাবে বিমান বন্দরে ঢুকে পড়েছিল। কিভাবে বিমান ছিনতাই করে ওদের বিমান থেকে ওদের সৈন্যদের উপর বোম্বিং করেছিল এবং কিভাবে প্যারাস্যুট নিয়ে বিমান থেকে নেমে আসল। সব শুনে রুকাইয়া উৎফুল্লভাবে বলে উঠলো, এই না হলে কি আর ঈগল হওয়া যায়। আজ বাগদাদকে দখলদার মুক্ত করতে এমনতার দূরন্ত সাহসী ঈগলেরই প্রয়োজন।

'হ্যাঁ এখন ইরাকের ঘরে ঘরে আমার মতো ঈগল তৈরী হয়েছে এবং হচ্ছে। ইনআশাল্লাহ্ অচিরেই ঈগলদের ঠোকড়ে দিশেহারা হয়ে পালাতে বাধ্য হবে মার্কিনী শকুনীরা।' বলল ঈগল-

'আচ্ছা, এবার সবাই ভিতরে চলো' -বলল রুকাইয়া- 'বাকী কথাবার্তা ওখানে গিয়ে বলা যাবে।'

ভিতরে যেতে যেতে ঈগল রুকাইয়াকে জিজ্ঞেস করলো, 'সুমাইয়ার আব্বা কেন এসেছিল?'

'তিনি এসেছিলেন তোমার খোঁজে' -বলল রুকাইয়া- 'আর রাহাত নামের এতিম ছেলেটিকে আমাদের কাছে রাখবেন বলে। সুমাইয়া ও তার আম্মু মারা যাওয়ার পর একা ঘরে সে শুধু বসে বসে কাঁদতো। তাই ওকে নিয়ে এসেছিলেন তিনি। রেখে গেলেন আমাদের কাছে।'

'রাহাত এখন কোথায়?' জিজ্ঞেস করল ঈগল।

'সে মুয়াজের সাথে পড়ছে।' বলল রুকাইয়া।

'যাক ভালো হলো। ছেলেটির জন্য আমারও বেশ চিন্তা ছিল। ওর অবস্থা ঠিক আমার মতো। মা-বাবা, ভাই-বোন সবাইকে হারিয়েছে ও। অতঃপর আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিল সুমাইয়ার স্নেহসিক্ত কোমল পরশে। সুমাইয়া ওকে আপন ভাইয়ের মত আদর-সোহাগ করত। খাইয়ে-পড়িয়ে দিত। কিন্তু ব্যাচারার সে অবলম্বনটিও কেড়ে নিল অসভ্য শ্ব্যাপদেরা, মার্কিন জানোয়ার গোষ্ঠীরা।' বলল ঈগল।

বাংকারের ভিতরে প্রবেশ করে ঈগল দেখলো তার ফুফা মেজর আসাদুল্লাহ সাহেব রাহাদ ও মুয়াজের পাশের খাটে আধশোয়া অবস্থায় ওদের দু'জনের পড়ার তদারকি করছেন। রুকাইয়া পিতাকে লক্ষ্য করে বলল, 'আব্বী! দেখেন তো কে এসেছে!'

তিনি ওদের দিক থেকে দৃষ্টি হটিয়ে পিছনে তাকালেন। ঈগলকে দেখে সোজা হয়ে বসলেন। ঈগল তাকে সালাম দিল। তিনি সালামের উত্তর দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'বেটা! তুমি নিরাপদ আছো তো? মার্কিনীদের ঘোষণার পর তোমার ব্যাপারে আমি দারুন উদ্বিগ্ন হয়ে পরেছিলাম।'

'আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ তা'য়ালা আমাকে নিরাপদেই রেখেছেন'-বলল ঈগল- 'মার্কিনীরা আমার কিছুই করতে পারেনি, ভবিষ্যতেও পারবে না ইনশাআল্লাহ্। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আল্লাহ যতদিন আমার দ্বারা তাঁর দ্বীনের খেদমত করানোর ইচ্ছা করেন ততদিন দাজ্জালের সৈনিকেরা আমার কোনই ক্ষতিই করতে পারবে না। আর যখন আমার দ্বারা দ্বীনের খেদমত নেয়া তিনি পছন্দ করবেন না তখন তিনিই আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে নিবেন।'

'তাতো অবশ্যই'–বললেন মেজর সাহেব– 'এমন বিশ্বাস থাকতে হবে প্রতিটি মু'মিনের মুসলমানের। প্রতিটি মুজাহিদের পাথেয়ই এই বিশ্বাস।

এভাবে বিভিন্ন বিষয় আলাপ-আলোচনা হলো তাদের মধ্যে। ঈগল তার কর্ম কান্ড সবিস্তারে আলোচনা করলো। মেজর সাহেব বর্ণনা করলেন তাদের কর্মকুশলতার কথা। এতে রাত নয়টা বেজে গেল। ঈগল বললো, আমার আজকে একটু তাড়াতাড়ি বিশ্রাম নিতে হবে। তাই ইশার নামাযটা সকলে একত্রে জামায়াতের সাথে আদায় করে নিলেই ভালো হয়।'

কিছুক্ষণের মধ্যে ব্যাংকারে অবস্থানরত সকল মুজাহিদ ইশার নামাযের তৈরী নিয়ে কাতার সোজা করে দাঁড়ালো। মেজর সাহেবের ইমামতিতে সকলে নামায পড়লো। নামাজান্তে প্রাত্যাহিক রুটিন অনুযায়ী ২০ মিনিট হাদীসের দরস আরম্ভ হলো। দরস প্রদান করলো বিদেশী সাংবাদিক হাফেজ সালমান কোরেশী–

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলে দিন, যা জিহাদের সমান। তিনি (সাঃ) বললেন, জিহাদের সমমর্যাদার কোন আমল আমিখুজে পাচ্ছি না। তারপর তিনি বললেন, তুমি কি এ কাজ করতে সক্ষম যে, মুজাহিদ জিহাদে রওয়ানা হওয়ার সময় মসজিদে প্রবেশ করে অবিরাম নামায পড়তে থাকবে এবং এতে কোনরূপ দূর্বলতা ও অলসতা তোমাকে স্পর্শ করবে না। আর রোজা রাখবে, (মুজাহিদ জিহাদ থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত) একদিনও রোজা কাজা করতে পারবে না। (দিনের পর দিন মাসের পর মাস দিন-রাত সমানে নামাযে নিমগ্ন থাকতে পারবে? পারবে কি লাগাতার রোজা পালন করতে?) লোকটি বলল, কার সাধ্য এমন কঠিন আমল সম্পাদন করো?

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এ প্রসঙ্গে বলেন, ঘোড়া ঘাস খাওয়ার সময় যদি রশিটা একটু দীর্ঘ করে দেয়া হয়, (বেশী জায়গা ঘুরে ঘাস খাওয়ার জন্য) এতেও মুজাহিদদের জন্য (ছোট করে বাঁধার চেয়ে বেশী) সওয়াব লেখা হয়।–সহীহ বুখারী, পৃষ্ঠা ঃ ৩৯১, খন্ড ঃ ১, অধ্যায় ঃ ফযলুল জিহাদি ওয়াস্‌সিয়ার ব্যাখ্যা ঃ সকল আমালের মর্যাদা নির্ভর করে তার লক্ষ্যে উঁচুতা ও গুরুত্বের উপর। তাই যেহেতু জিহাদের উদ্দেশ্য হল, আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং এই মহান উদ্দেশ্য যেহেতু জিহাদ ব্যতীত সফল হবেনা, সেহেতু বলা হয়েছে, সকল আমলের চেয়ে জিহাদের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশী।

আমরা যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে কোন আমলকে উত্তম বা অধম আখ্যায়িত করার এখতিয়ার রাখিনা। আল্লাহ আমাদেরকে এই অধিকার দেননি। আল্লাহ স্বয়ং নির্ধারণ করে দিয়েছেন কোন কোন আমল উত্তম ও সর্বোত্তম এবং কোনটির গুরুত্ব কোনটির চেয়ে বেশী। এই এখতিয়ার ও অধিকার একমাত্র আল্লাহ'র। তাঁর এই একক কর্তৃত্বে দ্বিতীয় কারো দখলদারিত্ব নেই। আর আল্লাহ্'র পক্ষ থেকে তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিহাদকে সবচেয়ে মর্যাদাবান ও উত্তম আমল হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন।

উপরন্তু আমরা যদি হাদীস ও ফেকাহ'র মূলনীতির আলোকে পর্যালোচনা করি, তখনও অন্যান্য আমলের চেয়ে জিহাদ উত্তম ও মর্যাদাসম্পন্ন হওয়ার পক্ষে একটি বিশেষ কারণ পরিলক্ষিত হয় যে, জিহাদ ইসলামের যাবতীয় আমল ও বিষয়-আশয়ের একমাত্র সংরক্ষক।

জিহাদ-জয়ের মাধ্যমেই মুসলমান স্বাধীনভাবে ইসলামের সকল আমল যথার্থভাবে আদায় করার সুযোগ পেয়ে থাকে। কোন ভূখন্ডে তখনই ইসলামী বিধানমতে বিচার, অর্থ, শিক্ষা ও সমাজ ব্যবস্থা পরিচালনা করা সম্ভব, যখন সে ভূখন্ডে বা জনপদে মুসলিম শক্তি জিহাদের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে পরাজিত করে বিজয় লাভ করবে। জিহাদের মাধ্যমে বিজয় লাভ করা ছাড়া পূর্ণাঙ্গরূপে ইসলামের উপর আমল করা সম্ভব নয়। উপরন্তু জিহাদ ত্যাগ করার ফলে কাফির বিজয়ী হলে তখন সে দেশের ইসলামী বিধান-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ লন্ডভন্ড হয়ে যায়। ইসলামের সকল আমলের মূল সংরক্ষক জিহাদ। তাই জিহাদ সকল আমলের চেয়ে উত্তম।

এছাড়া দ্বিতীয় কারণ হল, জিহাদে মানুষ তাঁর জীবনের দু'টি শ্রেষ্ঠ বিষয় কোরবান করে দেয়। এক জীবন, দুই সম্পদ। আর জিহাদ ছাড়া এই দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কুরবানী একত্রে অন্যকোন আমলে পাওয়া যায় না। এদিক বিবেচনায়ও জিহাদ সর্বোত্তম আমলের পর্যায়ে এসে দাঁড়ায়।

যদিও কোন কোন হাদীসে কোন আমলকে জিহাদের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে বটে, তবে তা সামগ্রিক বিচারে নয় এবং তা আপন অবস্থানে ব্যক্তি বিশেষের অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রযোজ্য-সকলের জন্য নয়। তা না হলে মুহাদ্দিসগণ এ হাদীসের দলীলে সর্বসম্মতিক্রমে কেন বলবেন, জিহাদ সকল আমলের চেয়ে উত্তম আমল?

কাজী ইয়াজ (রহঃ) বলেন, এ হাদীস দ্বারা জিহাদের সুমহান মর্যাদার কথা এবং অন্য কোন আমল যে জিহাদের সমান নয়, সে কথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।–ফতহুল বারী, পৃষ্ঠা ঃ ৫, খন্ড ঃ ৬

তাইতো রাসূল (সাঃ) অন্যত্র ইশরাদ করেন, 'আল্লাহ'র পথের এক সকাল কিংবা এক সন্ধ্যা দুনিয়ার সবকিছু অপেক্ষা উত্তম। –সহীহ বুখারী, পৃষ্ঠা ঃ ৩৯২, খন্ড ঃ ১

দরস শেষে কিতাব বন্ধ করে সালমান দু'আর জন্য হাত তুলল–হে আল্লাহ্! আপনি আমাদেরকে জিহাদের পরিপূর্ণ সওয়াব হাসিলের তওফীক দান করুন। পরিপূর্ণ মুজাহিদ হিসেবে কবুল করুন। শত্রুর মোকাবেলায় আমাদের দৃঢ়পদ রাখুন, শক্তি সাহস বৃদ্ধি করে দিন। শত্রুর ষড়যন্ত্রকে ধুলিষাৎ করে দিন। আমাদের সকলের জান-মাল আপনার রাস্তায় কবুল করুন। আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে আকায়ে মদীনা, মুহাম্মাদ আরাবী (সাঃ)-এর মত শহীদী তামান্না দান করুন। ইয়া আল্লাহ্! আপনি আপনার হাবিবের উছিলায় আমাদের ফরিয়াদ মঞ্জুর করুন।'

সালমানের সাথে সমস্ত মুজাহিদবৃন্দও আমীন! আমীন! বলতে থাকলো। দু'আ শেষে প্রত্যেকে নিজ নিজ কাজে আত্মনিয়োগ করলো। কেউ অস্ত্র রেডি করছে অপারেশনের জন্য। কেউ হামলার পরিকল্পনা তৈরী করছে। কেউ কোরআন তিলাওয়াত করছে। যারা শেষ রাতে কিংবা মধ্যরাতে অপারেশনে যাবে তারা খানা খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ছে। কেউ কেউ আবার মার্কিন বিরোধী কবিতা আবৃত্তি করছে। মার্কিন বিরোধী কবিতা রচনায় সিপাহী মাসউদ অগ্রগণ্য। সে নিত্য-নতুন কবিতা রচনা করে মুজাহিদদের জোশ-হিম্মত বাড়িয়ে তুলছে ঈগল যখন রেষ্টে যাওয়ার পূর্বে মুজাহিদদের বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিদর্শন করছিল, তখন ব্যাংকারের পূর্ব কর্ণারে বসেছিল সিপাহী কবি মাসউদের কবিতার আসর। এখানটায় এসে ঈগলও সালমানকে নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল তরুণ মুজাহিদ কবির কবিতা শ্রবণ করার জন্য। মাসউদ আবৃত্তি করে চলছে–

সত্যের জয় সেতো হবে নিশ্চয়/আলোকিত হবে তখন সারা বিশ্বময়
হতাশা-নিরাশা কেটে যাবে সব/সত্যের সেনাদল হবে-হবেই কামিয়াব
ঐ শুনো বিজয়ের পদধ্বনি ভেসে আয়/মার্কিন বাহিনীর হতেই হবে পরাজয়
ময়দানে দেখ আজ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে/ভেদাভেদ ভুলে সবে গিয়েছে দাঁড়িয়ে
আরবী-আজমী হয়ে আজ একাকার/বিজয়ের যাত্রা করেছে দুর্বার
বিশ্ব বেঈমান ইহুদী আর খৃষ্টান/জেগেছে মুসলিম হয়ে যা সাবধান
মেরেছো এতকাল করেছো ধ্বংস/মুসলিম দেশে দেশে হয়েছিল নিঃস্ব
বদলা নিবো আজ প্রতি ফোটা রক্তের/গুড়িয়ে দিয়ে তোর জালিমী তক্তের
আণবিক শক্তি নিয়ে যত কর গর্ব/মুজাহিদদের এ্যাকশনে হবে সবি খর্ব
যদিও খালি হাতে আছি মোরা দাঁড়িয়ে/ঈমানের পাল তুলে যাবো সাগর পেড়িয়ে
হাতে নিয়ে শান্তির সোনালী পয়গাম/দিকে দিকে উড়াবো ইসলামী পরচাম
কেন্দ্রীয় খেলাফত ছিল যেই বাগদাদ/রক্তাক্ত করলোতাহা হায়েনার বিষ দাঁত
হানাদার বাহিনীর সৃষ্টি করা দুর্যোগ/ইরাকী জনতার পদে পদে দুর্ভোগ
ছোট-কচি শিশুরা সইতে না পারছে/খাদ্য-পানীয়ের তৃষ্ণায় মরছে
কারবালার সেই ডাক ফের ওই আসছে/হাহাকার চিৎকার ইথারে ভাসছে
পারস্যর মোহনায় রণতরী ভাসছে/দাজ্জালের সেনারা বিমানে উড়ছে
তাইতো সত্যের সেনানীরা জাগছে/মার খেয়ে শয়তানের শিষ্যরা ভাগছে।

কবিতা শুনে ঈগল মাউদকে লক্ষ্য করে বলল, 'চমৎকার আবৃত্তি হে মুজাহিদ কবি! আরো আবৃত্তি করো।' ঈগলের আগ্রহে দেখে মাউদ আবারো আবৃত্তি করতে লাগলো–

আর খাবো না মার
যাবো ঘরের বা'র

মার্কিনীদের ঘার এবার
করবো যে চুরমার।
ও শয়তানের দল
তোদের কত বল
করবো সব বিফল
তুই হবি অচল।
পেন্টাগন যারে উড়ে
বলবি হায়! হলো কিরে
হোয়াইট হাউস যাবে গুড়ে
কেঁদে বলবি মারলো কেরে?
আফগানেতে মরবি
ইরাকেতে পুড়বি
কত আর তুই লড়বি
শেষে পাগল হয়ে ঘুরবি।
চোর-ডাকু আর লুটেরা
বিশ্ব কবলি ঝাজরা
কাঁদছে শত মায়েরা
তাই এবার মরবি তোরা।
আমার বোনের ইজ্জত
কেঁড়ে নিলি বজ্জাত
কেটে নিবো তোর হাত
ওহে! জালিম কুজাত।
বেড়ে গেছো অতি বেশী
এখন তোর হবে ফাঁসি
বিশ্ববাসী হবে খুশী
দেখে তোর গলায় রশি
বুশের বাচ্চা বুশ
নেই কোন তোর হুশ

আফগানেতে মরছে সেনা
ইরাকের তাও হচ্ছে ঠুশ।

কবিতার আসর শেষ করে ঈগল চললো বিশ্রামের উদ্দেশ্যে। তার সাথে সালমান, রুকাইয়া, মুয়াজ এবং রাহাদ। তারা যাচ্ছে মেজর সাহেবের বাড়িতে। গাড়িতে নয় পায়ে হেটে যাচ্ছে তারা পাতাল সড়ক দিয়ে। এক কিলোমিটারের দীর্ঘ এই সুরঙ্গ পথে চলছে তারা টর্স লাইটের আলোর সহায়তায়। মুয়াজকে সালমান এবং রাহাদকে ঈগল পিঠে তুলে নিয়ে হাটছে।

কিছুক্ষণের মধ্যে তারা পৌছে গেল বাড়িতে। রুকাইয়া সকলকে রাতের খাবার খেতে দিল। খানা খেয়েই ঈগল ঘুমিয়ে পড়লো। ঘুমের মধ্যে ঈগল স্বপ্নে দেখতে লাগলো–সুন্দর মনোমুগ্ধকর সবুজ-শ্যামল এক উদ্যান। তারই পাশ দিয়ে বয়ে গেছে স্বচ্ছ সুন্দর একটি নির্ঝরনী বহুদূর পর্যন্ত। নির্ঝরনীটির পানি স্বচ্ছ ডালিমের মতো। উদ্যানের কোল ঘেষে চতুস্পার্শ্বে সারি সারি খেজুর, আপেল, কমলা, আনার ও আংগুর গাছ। প্রত্যেকটি গাছের মধ্যে ঠাশা ঠাশা ফল। কাদি কাদি খেজুর, থোকায় থোকায় আংগুর, বোটে বোটে আপেল-কমলা।

নির্ঝরনীর তীরে অসংখ্য নাম জানা-অজানা ফুলগাছ; যার সুগন্ধ-সৌরভে মাতিয়ে রেখেছে পুরো এলাকাটিকে। ঈগল একা একা হাটছে অভূতপূর্ব সৌন্দর্য-সুষমায় পরিপূর্ণ ও উদ্যানে এত সৌন্দর্য-সুরভীত উদ্যানে পরিভ্রমণ করা সত্ত্বেও তার অন্তর খুশীতে আপ্লুত হচ্ছেনা। সঙ্গী হারা পথিকের মতো উদাস তার মন। এই বিশাল উদ্যানের মাঝে নিজেকে নিতান্ত একাকী-নিঃসঙ্গ মনে হলো তার। নির্ঝরনীর তীরে পা ছড়িয়ে বসে পড়লো সে। মন তার উথাল-পাথাল করছে। হঠাৎ একটা হাল্কা শীতল বাতাস বয়ে এলো। ঈগলের মন প্রশান্তিতে ভরে গেল। হৃদয় প্রফুল্ল হয়ে উঠলো। আনন্দ চিত্তে সে অনেকগুলো ফুল ছিড়ে তা নির্ঝরনীর পানিতে একে একে ছুড়ে মারতে লাগলো।

সহসা অনেকগুলো নারী কণ্ঠের সমন্বিত হাস্য-রোল ভেসে এলো ঈগলের কর্ণকুহরে। সে উৎকণ্ঠিত হয়ে তৎক্ষণাৎ হাস্য-রোলের উৎসস্থল দেখার জন্য ইতিউতি তাকাতে লাগলো। প্রথমে কিছুই নজরে আসলো না। অল্প সময়ের ব্যবধানে সে যা দেখল তাতে তার দৃষ্টি বিভ্রম হবার মত অবস্থা। এক ধেয়ানে সে তাকিয়ে রইলো এই নব আবিষ্কৃত বিষয়ের প্রতি। সে দেখল, ছয়-সাত জন অনিদ্য সুন্দরী, কান্তিময়ী রূপসী তরুণী উদ্যানে প্রবেশ করে ভ্রমন করছে এবং হাস্য-রোলে মাতামাতি করছে। সে কি রূপের বাহার! যেন এক একটা হীরার টুকরো, পূর্ণিমার চাঁদ। তাদের রূপের ছটা ও বেশ বিন্যাসের ঘটা দেখে ঈগল বিমোহিত হয়ে নীরব নিস্তব্ধভাবে বসে রইলো। তাদের পোষাক এমনই স্বচ্ছ ও মসৃণ যে তা ভেদ করে শরীরের অস্থিমজ্জা পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাদের রূপেও এমন আকর্ষণীয় শক্তি নিহিত যে, দৃষ্টি ফিরানোর উপায় রইলো না তার। সে দেখছে তো দেখছেই।

হঠাৎ ঈগল লক্ষ করল, এদের মধ্যে সপ্তম তরুণী-যার রূপ-সৌন্দর্য সকলের চেয়ে বেশী। মাথায় অতি মূল্যবান মুকুট শোভিত। সে আর কেউ নয়, তারই প্রেম প্রিয়াসী সুমাইয়া! তাকে দেখে সে আর স্থির থাকতে পারলো না। সে নিজের ভিতর চঞ্চলতা অনুভব করলো। দাঁড়িয়ে উচ্চ কণ্ঠে ডাকলো, 'সুমাইয়া!'

সুমাইয়া বান্ধবীদের সাথে গল্প-গুজবে মেতে ছিল, এখানে যে অন্য কেউ আছে তা সে এতক্ষণ খেয়ালই করেনি। ঈগলের ডাক শুনে সে সচকিত হলো। পিছনে ফিরেই দেখতে পেলো ঈগলকে। তাকে দেখেই ব্যাকুল হয়ে ছুটে এলো তার কাছে। এবার দু'জন দু'জনের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। সুমাইয়া জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি কখন এলে ঈগল? আমি তোমার খোজেই এখানে এসেছি।'

'অল্প আগেই আমি এখানে এসেছি'—বলল ঈগল— 'কিন্তু তুমি আমাকে একা ফেলে চলে এলে কেন? তোমার বিরহে আমি পাগল পারা হয়ে গেছি। আর এখন বা এলে কোথা থেকে এবং তোমার সাথে ওই মেয়েগুলোইবা কারা?'

'আমি তোমাকে ছেড়ে আসতে চাইনি'—বলল সুমাইয়া—'কিন্তু মার্কিন সৈন্যরা আমার উপর অনেক অত্যাচার-নির্যাতন করে আমাকে তোমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। আমি এখন জান্নাত থেকে এসেছি আর ঐ মেয়েগুলি আমার পরিচারিকা। তোমার সাথে আমি এজন্য দেখা করতে এসেছি যে, আমার আব্বু আজ ক'দিন যাবৎ তোমাকে খুঁজছেন, কিন্তু তোমার দেখা পাচ্ছেন না। তুমি শীঘ্র তার সাথে দেখা করো। তিনি তোমাকে যা করতে বলেন তা ঠিক সেভাবে করো। অপবিত্র মার্কিন সেনাদের হাত থেকে যত শীঘ্র সম্ভব ইরাককে মুক্ত করো।'

'সুমাইয়া! তুমি যা বলেছো সবই আমি করবো' —বলল ঈগল— 'কিন্তু আমার একটা কথার উত্তর দাও যে, তুমি আমার প্রতি রাগ করে আছো কি না?'

'কেন আমি তোমার প্রতি রাগ করবো?' জিজ্ঞাসা করলো সুমাইয়ার।

'সেদিন তোমার প্রশ্নের উত্তর দেইনি বলে' —বলল ঈগল— 'তোমার সেই প্রশ্নের উত্তর এখন দিচ্ছি—আমি তোমাকে ভালবাসি সুমাইয়া! তুমিই আমার স্বপ্ন, তুমিই আমার আশা।'

'আমি তোমার প্রতি পূর্বেও রাগান্বিত ছিলাম না আর এখনও না' —বলল সুমাইয়া— 'তুমি দুনিয়ার ঝামেলা চুকিয়ে শহীদ হয়ে চলে এসো আমি জান্নাতে তোমার অপেক্ষা করছি।'

'আমাকে তুমি এখনই সাথে নিয়ে যাও'—বলল ঈগল— 'তোমাকে ছাড়া একা থাকতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে প্রিয়ে।'

'তা হয়না প্রিয়'—বলল সুমাইয়া— 'আল্লাহর জমিনকে এখনও অশান্তি- বিশৃঙ্খলায় ভরে রেখেছে মানুষ নামের হায়েনারা। তুমি যতক্ষণ ওখানে আছো ততক্ষণ আল্লাহর

শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে থাকো। ওদের মেরে-কেটে জমিনকে পবিত্র করতে চেষ্টা করো। সময় হলেই আল্লাহ তায়ালা তোমাকে আমাদের সকাশে নিয়ে আসবেন। আমি এখন চলি! বিদায় ঈগল! বিদায় প্রিয়তম!'

ঈগল দেখলো সুমাইয়া একটা সবুজ কাপড়ের উপর দাঁড়ানো আর কাপড়টি তাকে সহ উপরের দিকে উড়ে যেতে লাগলো। সুমাইয়া তার উপর দিব্যি দাঁড়ায়েই তাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাচ্ছে, কিন্তু সে দুলছেও না পড়ছেও না। অবশেষে ঈগল পায়চারি করতে করতে উদ্যান থেকে বেড়িয়ে এলো আর তখনই তার ঘুম টুটে গেল। প্রিয়ার দর্শন থেকে সে বাস্তব জগতে ফিরে এলো।

ঘুম ভাংগার পর বেশ কিছুক্ষণ বিছানায় শুয়ে শুয়েই ঈগল সুমাইয়ার কথা চিন্তা করতে লাগলো। আর ঘুম এলো না চোখে। ঘড়িতে তাকিয়ে দেখলো রাত তিনটা বাজে। তাই নিঃশব্দে বিছানা ছেড়ে উঠে তাহাজ্জুদের প্রস্তুতি নিল। তাজ্জুদ নামাজ সে বাদ দেয়না কখনও। আর কেনইবা দিবে তা বাদ, তাহাজ্জুদইতো মু'মিনের শক্তি অর্জনের মাধ্যমে। মহাপরাক্রমশীল বিশ্ব নিয়ন্তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সান্নিধ্যে পৌঁছে শক্তি-সাহস, বিজয়ের মন্ত্রণা চেয়ে নেয়ার এটাই তো প্রধান মাধ্যম, এটাই তো উপযুক্ত সোপান।

এই যে মুজাহিদরা স্বল্প সংখ্যক হয়েও অগণিত-অসংখ্য কাফের-মোশরেক বেদ্বীনদের পরাজিত করে দেয়, নাস্তানাবুদ করে দেয় তা কিসের বলে; কোন শক্তির বলে এক একজন মুজাহিদ হাজার কাফেরের মোকাবেলায় যুদ্ধ করে? নিশ্চয়ই তা আল্লাহর সাহায্য-মদদের ফলেই করে থাকে। আর সে শক্তি সঞ্চয় করার প্রধান অবলম্বন হচ্ছে সালাতুত তাহাজ্জুদ। কুরআন মজীদে এ সালাত সম্পর্কে বিশেষভাবে তাগিদ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা নবী করীম (সা)-কে সম্বোধন করে বলেন–"রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করুন। এ সালাত আপনার জন্য অতিরিক্ত।" (বনি ইসরাইল ১৭ ঃ ৭৯)

নবী কারীম (সাঃ) এ সালাত সম্বন্ধে বলেন, "ফরয সালাতের পর সব চাইতে উৎকৃষ্ট হল তাহাজ্জুদের সালাত।" (মুসলিম)

গভীর রাতে আরামের ঘুম হারাম করে বান্দা যখন আল্লাহর নৈকট্য ও রহমত পাবার আশায় তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করে তখন আল্লাহ খুবই খুশি হন। বান্দার প্রার্থনা মঞ্জুর করেন, চাহিদা পূরণ করেন। এ সকল কারণে ইসলামে এর গুরুত্ব অপরিসীম। নবী কারীম (সাঃ) প্রতিনিয়ত এ সালাত আদায় করতেন এবং সাহাবীগণকেও আদায়ের জন্য উৎসাহিত করতেন। তাইতো প্রত্যেক মুজাহিদ তাহাজ্জুদের সালাত আদায়ে অত্যন্ত যত্নবান এবং স্ব স্ব কমান্ডারগণ অধীনস্ত মুজাহিদদের শত ব্যস্ততার মধ্যেও এ সালাত আদায়ে তাগিদ করে থাকেন। কেউ কেউ তাহাজ্জুদের সালাতকে মুজাহিদদের বৈশিষ্ঠাবলীর মধ্যে অন্যতম বৈশিষ্ট্য হিসেবেও উল্লেখ করে থাকেন।

বস্তুতপক্ষে মুজাহিদদের তাহাজ্জুদ আদায় এবং সাধারণ মানুষের তাহাজ্জুদ আদায় রাত-দিন ব্যবধান। কেননা পাহাড়ে গিড়ি কন্দরে, শত্রু পরিবেষ্টিত এলাকায় রাতের আধারে মুজাহিদ যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন তার দীলরাজ্যে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই ভাবনা স্থান পায় না। মৃত্যু তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে নামায পড়ছে।

একমাত্র এই নামাযেই ইবাদতের প্রকৃত স্বাদ রয়েছে। তার দৃঢ় বিশ্বাস, জীবন-মৃত্যুর মালিক একমাত্র আল্লাহ। কেননা পতঙ্গের মতো উড়ে আসা যে কোন একটি বুলেট এখনই, এই মুহূর্তে তার জীবনাবাসন ঘটাতে পারে। হয়তো এই নামাযরত অবস্থায়ই সে মিলিত হবে পরম করুণাময় আল্লাহর দরবারে। শত্রুবাহিনী উপর থেকে বোমা নিক্ষেপ করছে, সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই। সে নির্ভীক, তার মুখে উচ্চারিত হচ্ছে–আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন অর্থাৎ সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি সমগ্র সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা।'

এ সময় আল্লাহর প্রশংসা করতে কত যে মজা ও স্বাদ অনুভূত হয়, তা জিহাদের ময়দানে নামাযরত মুজাহিদ ছাড়া কারও পক্ষে অনুমান করা সম্ভব নয়।

অতঃপর সে বলছে, ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম অর্থাৎ হে আল্লাহ আমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করুন, যে পথে পরিচালিত হয়েছেন নবী, সিদ্দীক ও শহীদগণ।'

এটাই সত্যিকারের একাগ্রতার নামায। যদি কেউ মুজাহিদদের নামায পড়া দেখত, মুজাহিদরা কত নিবিষ্ট মনে নামায আদায় করে, তবে সে নিশ্চয়ই অভিভূত হয়ে বলত, মানুষ কিভাবে নামাযে এত আত্মমগ্ন হতে পারে।

তাই কবি যথার্থ বলেছেন ঃ

'আত্মগগ্ন ও একাগ্রতার নামায আদায় হয় তরবারীর ছায়াতলে।'

মুজাহিদদের শুধু নামাযই নয় বরং তাদের সামগ্রিক ইবাদত অন্য সাধারণ মুসলমানদের ইবাদতের তুলনায় ভিন্ন এবং শ্রেষ্ঠতর। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস এবং বীর মুজাহিদ আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ) ১৭০ হিজরীতে তারসূসের ময়দান থেকে মক্কা-মদীনাসহ সমগ্র পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বুযুর্গ ফোযাইল ইবনে ইয়াযকে নিম্নোক্ত পংক্তি কয়টি লিখে পাঠিয়েছিলেন। ফোযাইল ইবনে ইয়ায প্রতি রাতে অন্তত সত্তুরবার পবিত্র কাবা তাওয়াফ করতেন। তিনি অনন্য বুযুর্গ ও আল্লাহতায়ালা লোক ছিলেন। বাদশাহ হারুনুর রশীদ তাঁর সাক্ষাতে এলেও তিনি তার ঘরের দরজা খুলতেন না এ কারণে যে, ইবাদতে তার একনিষ্ঠতা নষ্ট হয়ে যাবে।

পংক্তিগুলো এই–

হারামাইনের ধ্যান-মগ্ন হে সাধক! যদি তুমি এসে আমাদের ইবাদত দেখতে

ইবাদতের নামে তুমি করছো শুধুই তামাশা, নিশ্চয় তখন পারতে বুঝতে।

তুমি সিক্ত কর কপোল চোখের (সাদা) অশ্রু দ্বারা

আমাদের বক্ষ রাঙ্গা হয় গ্রীবার তাজা লাল রক্ত দ্বারা।
তোমার ঘোড়া দিনমান অনর্থক কাজে হয় ক্লান্ত
আমাদের ঘোড়া ভয়াবহ যুদ্ধে লড়ে তবে হয় শ্রান্ত।
সকালে বের হও ঘর থেকে তুমি, আবার ফিরার তামান্না নিয়ে
প্রতি মুহূর্তে ভাবি আমরা, কখন পরতৃপ্ত হবো শাহাদাত-পিয়ালা পিয়ে।
মেশক-এর সুমিষ্ট-সুঘ্রাণ তোমার কাছে খুব প্রিয়
কোড়ার শপাশপ আর ধুলোবালি আমাদের কাছে (তার চেয়েও) প্রিয়।
আমি প্রিয় নবী (সাঃ)-এর একটি বাণী তোমাকে দিতে চাই স্মরণ করে
সাধ্য নেই কারুর যে, তাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে পারে। তাহল
"আল্লাহর পথের ধুলোবালি থাকবে নাকে যার
জাহান্নামের ধুয়ো একত্রিত হতে পারে না তার।"
আল্লাহর এই কিতাবই দিবে আমাদের মাঝে ফয়ছালা
শহীদের তো মৃত্যু নেই (নেই কোন কষ্ট জ্বালা)

যখন এই পংক্তিগুলো ফোযাইল ইবনে ইয়ায এর নিকট পৌছে তখন তিনি ইহা পাঠ করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দু'চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে শুরু করে। অবশেষে তিনি বলেন, আব্দুর রহমানের পিতা (আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক) ঠিকই বলেছেন।'

তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করে ঈগল মহান প্রভুর দরবারে বিনীত প্রার্থনা জানালো। প্রায় আধা ঘণ্টার প্রার্থনায় মূল প্রতিপাদ্যই ব্যক্ত করল সে শহীদী মৃত্যুর তামান্না। বার বার তার মুখে উচ্চারিত হতে লাগল– হে আল্লাহ! আমাকে আপনার রাস্তায় পরিপূর্ণ শাহাদাত নসীব করুন।' এই দোয়া করতে করতে তার চোখ দিয়ে অশ্রুর প্লাবন বয়ে যেতে লাগলো।

ঈগলের মুনাজাত শেষ হতে হতে ফজরের আযান পড়ে গেল। আযানের ধ্বনি কর্নগোচর হতেই সে মুনাজাত সমাপ্ত করে দিল। অতঃপর ফজরের নামায পড়েই চলে গেল সুমাইয়ার আব্বার সাথে দেখা করতে।

অল্প সময়ের ব্যবধানে ঈগলের গাড়ি এসে থামল সুমাইয়াদের দরজায়। গাড়ি থেকে নামতেই একটা অব্যক্ত বেদনা মোচড় দিয়ে উঠল ঈগলের বুকের মধ্যে। তা এজন্য যে, সে এ বাড়িতে আসলে আজ যে মানুষটি সবচেয়ে বেশী খুশী হতো, সে আজ নেই এ বাড়িতে, নেই এ মহল্লায় নেই বাগদাদে, নেই ইরাকে, নেই পৃথিবীর কোথাও। সে চলে গেছে পরপারে। চলে গেলে চিরস্থায়ী আবাসে। শান্তির নীড় জান্নাতে।

ঘরের দরজায় নক করল ঈগল। দরজা খুলে দিলেন আবু বকর সাহেব। ভিতরে নিয়ে বসালেন ঈগলকে। ব্যাচারা আবু বকর স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সকলকে হারিয়ে শোকে-দুঃখে

পাথর হয়ে গেছেন। এখন আর কাঁদেন না তিনি, কিন্তু তার দুঃখ ভারাক্রান্ত মলিন মুখে তাকালে স্বজন হারানোর অসহায় আকুতি স্পষ্ট প্রতিভাত হয়। অনেক সময় বসল ঈগল, তিনি কিছুই বলছেন না তাকে। অবশেষে বিনয়ের সাথে সে বলল, 'চাচাজান! আমাকে খোঁজ করেছিলেন কেন তা জানতে পারি কি?'

'একটা জরুরী সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করার জন্য তোমাকে প্রয়োজন ছিল আমার–মলিন মুখেই বললেন আবু বকর সাহেব–তাহল, এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে বেঁচে তাকার তিল পরিমাণ ইচ্ছা আমার নেই। যদি আত্মহত্যা জায়েজ থাকতো তবে আমি সে পথেই অগ্রসর হয়ে সকল দুঃখ-যাতনার অবসান ঘটাতাম। কিন্তু তা যেহেতু বৈধ নয় তাই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আত্মঘাতি হামলায় অংশ গ্রহণ করে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে জীবন বিলীন করে দিব। তাই তোমার সহায়তা প্রয়োজন আমার। আর আমার যেহেতু অন্যকোন ছেলে সন্তান নেই, সেহেতু আমার সমস্ত স্থাবর, অস্থাবর সম্পত্তি আমি তোমার নামে লিখে দিচ্ছি। তুমি জিহাদের কাজে, মার্কিনীদের ইরাক থেকে বিতাড়ন করার লড়াইয়ে প্রয়োজনমত খরচ করবে।'

'আপনি শান্ত হোন চাচা! আপনার আত্মঘাতি হামলায় অংশ নেয়ার প্রয়োজন নেই' –বলল ঈগল– 'আপনার দুঃখ লাঘবের জন্য, আপনার মনের ক্ষোভ দূর করার জন্য আমি এক ডজন মার্কিন সৈন্য ধরে এনে আপনার পদতলে নিক্ষেপ করবো। তাদের হত্যা করে, রক্ত প্রবাহিত করে আপনি মনের জ্বালা, ক্ষোভ, দুঃখ-যন্ত্রণা দূর করবেন।'

'ঈগল! এইতো তুমি সুমাইয়ার কথার অন্যথা করছো' –বললেন আবু বকর সাহেব– 'গতরাত্রে স্বপ্নে সুমাইয়া কি তোমাকে বলেনি যে, আমি যা বলব সে অনুযায়ী তুমি কাজ করবে?'

'জি বলেছে, কিন্তু আপনি তা জানলেন কি করে–আশ্চার্য হয়ে বলল ঈগল–আমি তো সে স্বপ্নের কথা এখন পর্যন্ত কারও কাছে প্রকাশ করিনি!'

'তোমার বলার প্রয়োজন নেই' –বললেন আবু বকর সাহেব– 'আমার সাথেও গতরাতে মা-মনি সুমাইয়ার স্বপ্নে কথা হয়েছে। তার কাছে আমি আমার দুঃখ-জ্বালার কথা ব্যক্ত করলে, সেই তখন আমাকে এই পরামর্শ দিয়েছে এবং তোমাকে যে জানাবে তাও বলেছে। সুতরাং তুমি অন্য কোন কথা না বলে আমি যা বলেছি এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছি তা অতিসত্বর বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করো।'

'ঠিক আছে আপনি তবে আত্মঘাতি হামলার জন্য মানসিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে থাকুন'–বলল ঈগল– 'বেশী বেশী তিলাওয়াত করুন, ইস্তেগফার করুন এবং সফলতার জন্য আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করে কান্না-কাটি করুন। আর সর্বাবস্থায় নিম্নোক্ত দু'য়া পড়তে থাকুন– হে আল্লাহ! আমাকে আপনার রাস্তায় পরিপূর্ণ শাহদাত নসীব করুন। বাকী আয়োজন আমি সম্পন্ন করছি।' এই বলে ঈগল সেখান থেকে বের হয়ে গেল।

আট

প্রেম-ভালবাসা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। কেউ মুক্ত নয় এর থেকে। মন প্রাণ দিয়ে যাকে ভালবাসে মানুষ তাকে হৃদয় উজার করে সোহাগ করতে স্বাদ জাগে। একটু সময় প্রিয়জন চোখের আড়াল হলে বিরহে ছটফট করে দুলে উঠে চিত্ত। কেবলই তার সাক্ষাতের জন্য আকুপাকু করে নয়ন মণি। তাইতো প্রেম মানেনা কোন বাধা-বিগ্ন। ধার ধারেনা কোন রাজা-বাদশার চোখ রাঙ্গানি। যুদ্ধ-বিগ্রহ থোরাই কেয়ার করে সে। তবে প্রেম করতে জানতে হবে। কিভাবে প্রেম করতে হয় তা শিখতে হবে। ভালবাসার গন্ডি অতিক্রম করা যাবে না কোনক্রমেই।

সালমান পরিপূর্ণ সুস্থতা অর্জন করেছে। পুনরায় হোটেলে ফিরে যেতে চায় সে কিন্তু এখানকার সকলে বাধ সাধে তাতে। সবচেয়ে বেশী আপত্তি তোলে রুকাইয়া। সে এ কথাটা সালমানের মুখে শুনতেই চায়না। তাকে এখানেই অবস্থান করার জন্য চাপ সৃষ্টি করায় পিতার মাধ্যমে। ক্ষেপিয়ে তোলে মুয়াজকে। সাহায্য নেয় স্বয়ং ঈগলের। তার যুক্তি হচ্ছে–বাগদাদ যখন ইরাকী বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে ছিল তখনই মার্কিনীরা সালমানকে হত্যার জন্য হামলা করলো। আর এখনতো পুরো ইরাক ওদের দখলে। এমতাবস্থায় তার হোটেলে থাকা মোটেও নিরাপদ নয়। কেননা ইতিমধ্যেই দখলদার-হানাদার বাহিনী হাতে ১৯জন সাংবাদিক নিহত হয়েছে।

সালমানকে আটকানোর ফন্দি আঁটে রুকাইয়া। কিছুতেই সে মনের মানুষকে চোখের আড়াল হতে দিতে চায়না। পিতার মাধ্যমে তার ওপর দায়িত্ব অর্পন করায় মুজাহিদদের তালিম-তরবিয়াত প্রদানের। এদিকে মুয়াজ তার চলে যাবার কথা শুনে একদম বেঁকে বসলো; রীতিমত অনশন শুরু করে দিল। সারাদিনে খেলো না কিছুই।

রুকাইয়ার আপত্তি, ঈগলের অনুরোধ, মুয়াজের অনশন, সর্বোপরি মেজর সাহেব কর্তৃক মুযাহিদদের তালিম-তরবিয়াতের দায়িত্ব প্রদানকে সামনে রেখে হোটেলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত ত্যাগ করে সালমান। হাফ ছেড়ে বাঁচে রুকাইয়া। খুশী হয় ক্ষুদে হাফেজ মুয়াজ বিন আসাদুল্লাহ। তুলে নেয় তার অনশন। খেতে শুরু করে সালমানের কোলে বসে।

সালমান এখন নিয়মিত সংবাদ সংগ্রহ করতে শুরু করেছে। মাঝে মাঝে সে মুজাহিদদের সাথে বিভিন্ন অভিযানের কৌশলী হিসেবে কাজ করছে। স্বশরীরেও অংশ নিচ্ছে কোন কোন অভিযানে। জিহাদ করতে যে কি স্বাদ তা অনুভব করতে পারছে সে এ সকল অপারেশনে। ইতিপূর্বে জিহাদ না করতে পারায় তার মনে যে অপূর্ণতা ছিল, যে শূন্যতা অনুভব করতো সে কুরআন তিলাওয়াতের সময়, আল্লাহর দরবারে অপরাধী সাব্যস্ত হওয়ার যে আশংকা তাকে আতঙ্কিত করে রাখতো, আজিকার দিনগুলোতে স্বশরীরে জিহাদে অংশ গ্রহণ করতে পেরে সকল অপূর্ণতা, শূন্যতা, আশংকাবোধ তিরোহিত হয়ে গেছে তার। আজ যদি কেউ জিহাদের উপকারীতার বিপরীতে হাজারও যুক্তি পেশ করে, তবে তা বিশ্বাস করা সালমানের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়। কারণ সে সরাসরি জিহাদ করে

যে তৃপ্তি, যে মজা অনুভব করেছে, তা তার কাছে যুক্তিবাদীদের হাজারো দলীলকে অকেজো করে দেয়। এই মিষ্টতা তার শাহাদাদের তামান্নাকে শত শত গুণ বৃদ্ধি করে দিয়েছে। সে এখন আর দেশে ফিরতেও তেমন বেশী একটা আগ্রহী নয়।

প্রতিদিন ফজর নামাজান্তে পবিত্র কুরআনের দরস এবং এশা রনামাজান্তে পবিত্র হাদীসের দরস প্রদান করে সালমান মুজাহিদদের উদ্দেশ্য। পাকিস্তানের গ্রান্ড মুফতী আল্লামা শফী (রহঃ)-এর বিখ্যাত তাফসীর 'তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন' এবং পাকিস্তানেরই অপর মুফতী, বীর মুজাহিদ, আল্লামা মাসউদ আযহার (দাঃ বাঃ)-এর 'ফাজায়েলে জিহাদ' নামক তাফ্সীর এবং হাদীসগ্রন্থ থেকে দরস প্রদান করে সে। অধিকাংশ সময় ফজরের পর দরস সমাপ্ত করেই বেড়িয়ে পড়ে সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্য। সারাদিন বিভিন্ন স্পটে, এক শহর থেকে অন্য শহরে ভ্রমণ করতে থাকে।

এদিকে যখন সালমান বাহিরে যায় সংবাদ সংগ্রহ করতে, তখন ফিরে না আসা পর্যন্ত উৎকণ্ঠিত থাকে রুকাইয়া। একতো প্রেমের টান, দ্বিতীয়ত যুদ্ধ ক্ষেত্রের ঝুকিপূর্ণ সাংবাদিকতা বেশী পেরেশানীতে ভোগায় রুকাইয়াকে। আর ফিরতে কখনও দেরী হলে তো কথাই নেই, সালমানের অকল্যাণ চিন্তায় একেবারে বেচাইন হয়ে পড়ে মেয়েটি। এমনিতেই একজন আরবী তার মেহমানের নিরাপত্তা দেয়া এবং যথাযথ সম্মান-খাতির করা নিজের পবিত্র দায়িত্ব বলে জ্ঞান করে, একজন আরব দুহিতা হিসেবে সে গুণ পুরো মাত্রায়ই বিদ্যমান আছে রুকাইয়ার ভিতর। তার উপর সালমানের প্রেম যোগ হয়ে বিষয়টি এমন রূপ লাভ করেছে যে, মেয়েটি সালমান ছাড়া বুঝে না কিছু। সালমান বিহীন মুহূর্তগুলো, সূর্যবিহীন অন্ধকার পৃথিবী সমতুল্য তার কাছে।

সালমানের প্রেম সাগরে হাবুডুবু খাওয়া সত্ত্বেও রুকাইয়া ভুলেনি তার জাতীয় কর্তব্য। বরং সালমানের অনুপ্রেরণায় দখলদার বিরোধী আন্দোলন–লড়াইয়ে নব উদ্দমে কাজ করে চলছে সে। বাগদাদের ঘরে ঘরে, প্রতিটি নারীর কানে কানে আযাদীর পয়গাম পৌঁছানোর দায়িত্ব আঞ্জাম দিচ্ছে সেও তার সঙ্গীনীরা। কখনো কখনো বিভিন্ন এলাকার মহিলাদের একত্রিত করে আন্ডারগ্রাউন্ড সমাবেশ করছে। সাহসী তরুণীদের অস্ত্র চালনার ট্রেনিং দিচ্ছে। এতে ব্যাপক সাড়া পড়েছে বাগদাদের নারী সমাজে। অস্ত্র হাতে এখন শত্রু বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে শুরু করেছে তারা। শাহাদাত পিয়াসী কোন কোন তরুণী আত্মঘাতি হামলাও পরিচালনা করছে। কখনও আবার সে নিজেও অস্ত্র হাতে রুদ্র-রোশে আঘাত হানছে হানাদার সৈন্যদের উপর। মনের ঝাল মিটিয়ে হত্যা করছে তার দেশ দখলকারীদের। তার এ সকল কর্ম তৎপরতায় বাগদাদের ঈগল বেশ সন্তোষ প্রকাশ করল। খুশী হল তার প্রিয়তম সালমানও।

ইরাকী প্রতিরোধ যোদ্ধাদের চতুর্মুখী আক্রমণে সাম্প্রতিক দিনগুলোতে দখলদার ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী ও তাদের দোসররা ভিয়েতনাম যুদ্ধের চেয়েও কঠিন গ্যারাকলে আটকা পড়েছে। পরিস্থিতি দিনকে দিন নাজুক থেকে নাজুকতর হচ্ছে। আর এটা হওয়ারই কথা।

কারণ, ভিয়েতনামের জনযুদ্ধে ভিয়েতকংরা সাহায্য পেত পরাশক্তি রাশিয়া ও চীনের পক্ষ থেকে। কিন্তু ইরাকী গেড়িলা মুজাহিদরা সাহায্য পাচ্ছে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলা'মীনের পক্ষ থেকে, যিনি সকল শক্তির আধার, সৃষ্টি জগতের সর্বময় ক্ষমতার যিনি একচ্ছত্র নিরংকুশ অধিপতি। তিনি মুজাহিদদের সাহায্য করতে ওয়াদাবদ্ধ। নিজ জবানীতে তিনি তার এ ওয়াদার ঘোষণা দিয়েছেন পাক কালামে এভাবে–যুদ্ধ কর ওদের সাথে আল্লাহ তোমাদের হাতে ওদের (ইসলাম বিরোধীদের) শাস্তি দিবেন। তাদের (কাফেরদের) লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন; মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন এবং তাদের মনের ক্ষোভ দূর করবেন। আর আল্লাহ তোমাদের (মুসলমানদের) সকলকে ক্ষমা করে দেবেন।' (সূরা ঃ তওবা ঃ আয়াত ঃ ১৪)

তাই মুসলমানদের বিজয় অর্জনে আল্লাহর নির্দেশে সাহায্য করবে বাতাস, পশুপাখী ও ফেরেশতাসহ পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু।

ভিয়েতনাম বাসীদের মার খেয়ে ১৯৭৩ সালের ২৭ জানুয়ারী আমেরিকা ভিয়েতনাম ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। 'সেখান থেকে মার্কিন সৈন্য প্রত্যাহারের বিষয়টি ছিল খুবই শিক্ষণীয়। প্রাণ নিয়ে তখন মার্কিন সেনারা যে যেভাবে পারছে ভিয়েতনামের বাইরে যাওয়ার চেষ্টায় মরিয়া হয়ে ওঠে। হেলিকপ্টারে ঝুলে, গাঁধায় চড়ে, ঠেলাগাড়িতে, এবং সাইকেলে চড়েও মার্কিন সেনারা ভিয়েতনামের সীমানা পেরুতে চেষ্টা করে। 'ছাইরা দে মা কাইন্দা বাঁচি' অবস্থা তখন তাদের। এক লাখের চেয়েও বেশী সেনা ভিয়েতনাম থেকে ফেরার হয়ে যায়। তাদের পরিধেয় উর্দি ছিল ছেঁড়া-ফাটা এবং সাথের পানির বোতলগুলো পর্যন্ত ছিল শূন্য। পথে জীবন ধারন করতে তাদেরকে নিজেদের বন্দুক, কার্তুজ ও ব্যাচ পর্যন্ত বিক্রি করতে হয়েছে।

ভিয়েতনাম যুদ্ধে তাদের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৬২ হাজার মার্কিন সেনা নিহত হয় আর আহতের সংখ্যা ৩ লাখ এবং নিখোঁজ এক লাখ তো গেছেই। যুদ্ধের পর ৫ লাখ ৩ হাজার ৯২৫ জন সেনা চাকরি থেকে ইস্তফা দেয়। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭১ সালে জুনিয়র সেনা অফিসাররা ক্ষিপ্ত হয়ে সিনিয়র সেনা অফিসারদের উপর ৭৩০টি হামলা করে, যার ৮৩টিই ছিল অব্যর্থ। এই যুদ্ধের শেষে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন বলেছিলেন, "যে কোন যুদ্ধে একটি সেনাবাহিনী অন্য একটি সেনাবাহিনীকে পরাজিত করতে পারে। কিন্তু সাধারণ জনতাকে নিয়মিত সেনাবাহিনী কখনো পরাজিত করতে পারে না।'

প্রেসিডেন্ট নিক্সনের মন্তব্য ছিল যথার্থ। বর্তমান ইরাক যুদ্ধে মার্কিন সেনাবাহিনীর নিয়মিত সৈনিকরা লড়াই করছে সাধারণ ইরাকী জনতার সাথে। এবারের যুদ্ধে মার্কিন সৈন্যরা ভিয়েতনামের চেয়েও মারাত্মক বিপর্যয়ের মখোমুখি হতে যাচ্ছে। ইরাকের ধুলোবালিও তাদের সাথে যুদ্ধ করতে শুরু করেছে। যার প্রমাণ মিলে মরুভূমিতে ধুলি

ঝড়ে-সাইমুমের তোড়ে দখলদার বাহিনীর লবেজান দশা থেকে। ইরাকের শিয়ারাও দখলদার বিরোধী মনোভাব পোষণ করতে শুরু করেছে।

মোট কথা বর্তমান ইরাকের সামগ্রিক পরিস্থিতি থেকে এ সত্যই স্পষ্ট হয়ে উঠছে, ইরাকে মার্কিন বাহিনীর জন্য ভয়ংকর দিন আসতেছে। সেইদিন খুব বেশী দূরে নয়, যেইদিন ইরাকের প্রতিটি মানুষ (শিয়া-সুন্নী নির্বিশেষে), প্রতিটি গাছপালা, প্রতিটি বাড়িঘর, প্রতিটি পাহাড়-পর্বত, প্রতিটি গুহা-ব্যাংকার, প্রতিটি ধুলো-বালি, অনু-পরমাণু দখলদারদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করবে। চলবে সর্বশেষ দখলদার সৈন্যটির ইরাক ত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত অব্যাহতভাবে।

* * *

বাগদাদ ইরাকের রাজধানী হওয়ায় এখানকার ঘটনাবলীর প্রভাব পরে পুরো দেশে। ইদানিং মুজাহিদরা বাগদাদ কেন্দ্রিক হামলা জোরদার করেছে। সে কারণে সালমানকেও খুব ব্যস্ত সময় কাটাতে হচ্ছে বাহিরে। কখনও কখনও তার বাসায় ফিরতে বেশ দেরী হয়ে যায় আর এতে শংকিত হয়ে পরে রুকাইয়া। একদিন পুরো রাতে বাসায় ফিরতে পারেনি সালমান। সে রাতে একটুও ঘুমাতে পারেনি রুকাইয়া। জেগে থেকেছে সমস্ত রাত; এই বুঝি বা এলো সালমান, এই বুঝি তার গাড়ি এসে গেটের কাছে থেমেছে, এই বুঝি দরজা নক করেছে সে, এমনসব ভাবনায় সারারাত ছটফট করেছে মেয়েটি। প্রেমানুভূতি তাকে জাগিয়ে রেখেছে সমস্ত রজনী।

পরের দিন সকালে যখন সালমান বাসায় ফিরলো তখন যেন ধারে প্রাণ ফিরে পেলো মেয়েটি। আবেগের অতিশয্যে কেঁদে ফেলল সে। সালমান বলল, 'রুকাইয়া! তোমাকে আরো ধৈর্য্যের প্রমাণ দিতে হবে। দেশে যুদ্ধ চলছে এর ভিতর যে জীবন নিয়ে প্রতিদিন ফিরে আসি এটাই তো অনেক কিছু।

'আপনি দু'য়া করুন আমি যেন আরো ধৈর্য্যশীল হতে পারি।' বলল রুকাইয়া! প্রকৃতপক্ষে রুকাইয়া ধৈর্য্যশীল মেয়েই ছিল। কিন্তু সালমানের প্রেম তাকে মাঝে মধ্যে কিছুটা অধৈর্য্যহীন করে তোলে। আর এটা অতি স্বাভাবিক ব্যাপার। কেননা সে এখন পূর্ণ যৌবনা একজন সুন্দরী যুবতী। তার মতো বয়েসের মেয়েরা এ সময় যৌবনের ডামাডোলে দিক-বিদিক ছুটোছুটি করে বেড়ায়। যুবকদেরকে নাচায় চোখের ইশারায়। প্রেমের সরোবরে হাবুডুবু খাওয়ায় শত চেনা-অচেনা নাগরকে। সে তুলনায় রুকাইয়াকে সাধুবাদ দিতে হয় এজন্য যে, হৃদয় গহীনে ঠাঁই দেয়া প্রেমিক সালমানের সাথে একই বাড়িতে অবস্থান করা সত্ত্বেও তার সামনে সে চেহারার নেকাব পর্যন্ত উন্মুক্ত করে না; মাতামাতি তো পরের কথা।

অবশ্য রুকাইয়ারও মাঝে মাঝে ইচ্ছে জাগে, মনের মানুষটিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে আদর-সোহাগ করতে; ভালবাসতে। তবে সেজন্য যে প্রয়োজন শরীয়ত অনুমুদিত পন্থা অর্থাৎ পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়া। কিন্তু এ মুহূর্তে বিবাহের কথা চিন্তা করাও সে

পাপ মনে করে। দেশকে শত্রুমুক্ত না করে কিভাবে বিবাহের কথা চিন্তা করবে সে। তাদের যে স্বাভাবিক জীবন-যাপনের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে মানবতার শত্রুরা।

আমেরিকা ইরাকীদের স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় যত বিগ্ন সৃষ্টি করছে, ইরাকী জনতাও তত বেশী ফুলে-ফেপে উঠছে। তাদের ক্ষোভ ও ঘৃণা উথলে তা অস্বাভাবিক রূপ পরিগ্রহ করছে। দখলদারদের প্রতি সাধারণ জনতার আক্রমণ এতবেশী জোরদার হচ্ছে যে, সপ্তাহে গড়ে অন্তত ২৩৫ বার হামলা করছে হানাদার সৈন্যদের উপর। দৈনিক গড়ে নিহত হচ্ছে অন্তত ১২ জন জোট সৈন্য।

যেদিন সালমান ভোরবেলা বাসায় ফিরেছে এবং রুকাইয়া তার সাক্ষাতে আবেগাপ্লুত হয়ে কেঁদে ফেলেছিল, আর সালমান তাকে ধৈর্য্য ধারণের উপদেশ দিচ্ছিল ঠিক সে সময় সেখানে আগমন ঘটে ঈগলের। সে জিজ্ঞেস করলো, 'রুকাইয়া! কোন সমস্যা হয়েছে নাকি আপু?'

'জি-না ঈগল ভাইয়া'– মুখে হাসি টেনে বলল রুকাইয়া– 'কোন সমস্যা নয়!'

'কিছুতো একটা অবশ্যই ঘটেছে–ইৎস হেসে, কিন্তু অত্যন্ত গাম্ভীর্যের সাথে বলল ঈগল–নতুবা কাঁদছো কেন? তোমার নয়নাশ্রুই বলে দিচ্ছে সমস্যা কিছু একটা নিশ্চয়ই হয়েছে।'

এবার রুকাইয়া চুপ হয়ে গেলো। কোন কথা বলছে না আর সে। তাই ঈগল সালমানকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'কি হয়েছে সালমান ভাই! রুকাইয়া কাঁদছে কেন?'

'গতরাতে আমি বাসায় ফিরতে পারিনি বলে কাঁদছে।' কিছুটা লজ্জিত ভঙ্গিতে মাথা নিচু করে বলল সালমান।

সালমানের উত্তর শুনে ব্যাপার বুঝে ফেলল ঈগল। এতদিন যেটা ছিল তার সন্দেহ, আজ রুকাইয়ার কান্না দেখে এবং সালমানের উত্তর শুনে বাস্তবতায় ধরা পড়লো তা। প্রথম যেদিন সালমানকে দেখে ঈগল বলেছিল, মশকারী নয় সত্যি করে বলতো বোন! লোকটি আসলে কে? আমাদের দুলাভাই নাতো!' তখন রুকাইয়ার লজ্জা মিশ্রিত অবয়ব এবং কথা থেকেই ঈগলের কিছুটা সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিল। এখন সে পুরোপুরি নিশ্চিত যে, রুকাইয়া সালমাকে ভালবাসে আর সে জন্যই তাঁর মাধ্যমে বলিয়ে সালমানের হোটেলে যাওয়া বন্ধ করেছে।

তাই কোনো রাকঢাক না করে ঈগল রুকাইয়াকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'ও তাহলে আমাদের না জানিয়ে চুপে চুপে এত দূর! মনের মানুষ একটু চোখের আড়াল হল আর বিরহ যাতনায় আখি ছাপিয়ে মুক্তার দানা ঝড়াচ্ছো? দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজাটা।' বলেই ঈগল চলে গেল সেখান থেকে।

ঈগলের প্রথম কথা শুনে রুকাইয়া-সালমান সসঙ্কচে যথাস্থানের মাটির মধ্যে দেবে যাওয়ার মতো অবস্থা। তার উপর যখন সে বলল, "দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজাটা" তখন ভয়ে

কেঁপে উঠলো দু'জনেই। সংকিত নয়নে উভয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। কথা সরছেনা কারো মুখে। কে যেন তাদের বাকশক্তি ছিনিয়ে নিয়েছে।

অবশেষে মুখ খুলল রুকাইয়া, 'এখন কি হবে আমাদের? ঈগল ভাইয়া তো নিশ্চয়ই আব্বুকে বলে দিবে, তাঁর কথা থেকে অন্তত তাই বুঝা যাচ্ছে। তখন সম্মানের হানি ঘটবে আমার চেয়ে আপনার বেশী। আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন! আমি আর কখনো আবেগাতারিত হবোনা; কাঁদবো না এক সপ্তাহ বাড়িতে না আসলেও।'

রুকাইয়ার কথা শুনে এই আকস্মিক বিপদেও হাসি পেলো সালমানের তাও সে হাসিকে নিয়ন্ত্রণ করে তাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'শুন রুকাইয়া! ভালবাসা যেরকম মানুষের জীবনে অনাকাংখিতভাবে আসে, তেমনি সাথে করে সে নিয়ে আসে অনাকাংখিত বিপদও। তাই প্রকৃত প্রেমিকরা সে বিপদে ভয় পায় না, ঘাবরে যায় না। কারণ ফুলকে পেতে হলে কাটার আঘাত সহ্য করে নিতে হয়। সে জন্য এখন থেকে সামনে যা ঘটবে, তা আমাদের মেনে নিতেই হবে। তাছাড়া আমার বিশ্বাস ঈগল কোন জটিল সমস্যা সৃষ্টি করবে না। তারপর করেও যদি, তাতে আমরা অতটা অসম্মানিত হবো না। কেননা আমরা একে অপরকে ভালবেসেছি ঠিক কিন্তু সীমা অতিক্রম করিনি। তুমি যাও নিশ্চিন্তে তোমার কাজ করো গিয়ে। আমি আমার কাজে ব্যস্ত হচ্ছি।'

* * *

'ঈগল তুমি যেটা ধারণা করেছো ব্যাপার তা নয়। আমার মেয়ে এমনিতেই একটু নরম দীলের। সেজন্য মেহমান রাতে না ফিরায় সে তার অমঙ্গল চিন্তায় ঘাবরে গিয়েছিল হয়তো, আর সে ফিরে আসায় খুশীর আবেগে কেঁদে ফেলেছিল। ব্যাপারটা এরকম কি হতে পারে না?' ঈগলের কাছে সালমান রুকাইয়ার ভালবাসার কথা শুনে মন্তব্য করলেন মেজর আসাদুল্লাহ সাহেব।

ঈগল তার মতামতের প্রবল বিরোধিতা করে বলল, 'ফুফা! আপনি বিষয়টি বুঝতে চেষ্টা করুন। আমি নিশ্চিত এবং সঠিক ঘটনা এটাই তারা একে অপরকে পছন্দ করে। সুতরাং আপনি এ ব্যাপারে একটু চিন্তা-ভাবনা করুন। তাছাড়া আপনার কন্যা এখন বড় হয়েছে। তাকে পাত্রস্ত করা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু যুদ্ধের ডামাডোলে পাত্র খোজার সুযোগ কই? এ যুদ্ধ শীঘ্রই বন্ধ হওয়ার কিংবা থেমে যাওয়ার আশংকা আপাদত একেবারেই ক্ষীণ। কেননা যতদিন ইঙ্গ-মার্কিন অথবা যে কোন একজন বিদেশী সৈন্যও ইরাকে থাকবে ততদিন আমাদের প্রতিরোধ যুদ্ধ অব্যাহতভাবে চলতে থাকবে। আর মার্কিনীরা যে খুব শীঘ্রই চলে যাবে না তা তাদের ভাব-ভঙ্গিমায়ই বুঝা যাচ্ছে; নতুবা তারা চৌদ্দটি ঘাটি ইরাকের মাটিতে কেন করবে? এর দ্বারা বুঝা যায়, ইরাক ছাড়তে তারা রাজি নয়।

অতএব যুদ্ধ শেষ হবে, আমরা ওদের সকল ঘাটি গুড়িয়ে দিব, ইরাকে পুনরায় স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরে আসবে, তারপর মেয়ে বিয়ে দিবেন, এমন ভাবনার কোনো

সুযোগ নেই। আপনি রাজী হয়ে যান, আমি আজই ওদের বিয়ের আয়োজন সম্পন্ন করে ফেলি।'

ঈগলের যুক্তির সামনে মেজর সাহেব হার মানলেন। তবুও বিভিন্ন কারণে তিনি হ্যাঁ না কিছুই বলতে পারছেন না। তার দোটানা ভাব দেখে ঈগল বলল, 'এখনও আপনি কি ভাবছেন ফুফা?'

'ভাবছি আমাদের এখানে তো দেশ-বিদেশী অনেক মুজাহিদগণ আছেন। যারা মার্কিনীদের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন ইসলামের পক্ষে-ইরাকের পক্ষে। যুদ্ধকালীন সময়ে তারা নানারকম সমস্যার সম্মুখীন। বেশ কিছু সংখ্যক মুজাহিদ আহত হয়ে চিকিৎসারত, এমতাবস্থায় আমি কি করে কন্যার বিয়ের আয়োজনের অনুমতি দিতে পারি? এ সকল মুজাহিদরা আমাকে কি ভাববে, তুমিই বলো?'

'আপনি সেই চিন্তা করছেন?' বলল ঈগল– 'তবে এই দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। তাদেরকে আমি বুঝাবো। আমার বিশ্বাস, মুজাহিদরা এই বিয়ের সংবাদে অসন্তুষ্ট না হয়ে বরং তারা অত্যন্ত খুশী হবে। কেননা তারা এখানে এসে শুধু মারা আর মরার খেলা নিয়েই সময় অতিবাহিত করছে। দুনিয়াবী কোন আনন্দ-বিনোদনের সাথে তারা বহুদিন ধরে অপরিচিত। এ বিয়ের উপলক্ষে তারা কিঞ্চিৎ হলেও আনন্দ-উল্লাসের সুযোগ পাবে। এতে তাদের মন উৎফুল্ল হলে দেহের শক্তিতেও প্রবৃত্তি আসবে।'

'তাহলে তুমি বিয়ের আয়োজন করতে পারো'–বললেন মেজর সাহেব–'এ ব্যাপারে ওদের সাথেও আগে ভাগে আলাপ করে নাও; এ মুহূর্তে তারা বিয়ে করতে রাজী আছে কিনা।'

মেজর সাহেবের সাথে কথা পাকাপাকি করে ঈগল প্রথমেই গেল রুকাইয়ার নিকট। গিয়েই বলল, 'এবার প্রেম করার শাস্তি ভোগ করার জন্য তৈরী হয়ে যাও! তোমাদের এমন শাস্তি দিব আমি, যাতে জীবনে আর প্রেম করার কথা কল্পনাও করতে না পারো।'

ঈগলের এরকম অস্বাভাবিক কথায় রুকাইয়া খুব বেশী ঘাবরে গেল। হাত পা কাঁপতে শুরু করল তার। কণ্ঠতালু শুকিয়ে গেল। কাঁপা কাঁপা স্বরে বলল, 'ভাইয়া! শাস্তি দিতে হলে আমাকেই দিবে। তাঁর কোন দোষ নেই।'

'শাস্তি আমি দু'জনকেই দিবো, যেহেতু প্রেম দু'জনেই করেছো বলল ঈগল–'কতদিন যাবৎ চলছে তোমাদের এই মন দেয়া-নেয়া?'

'সালমান সাহেব এই বাড়িতে আসার পর পরই আমি তার প্রেমে পড়েছি। ভাইয়া! তোমার কাছে আমার অনুরোধ, আমাকে তুমি মারো-কাটো যা খুশী তাই করো, কিন্তু তিনি আমাদের মেহমান, তাঁকে কিছু বলো না তুমি।' হাত জোর করে ঈগলকে বলল রুকাইয়া!

'তাকে কিছু না বলে যদি এখান থেকে তাড়িয়ে দেই তাতে রাজি আছো

তুমি'—কিছুটা নরম হওয়ার ভান করে বলল ঈগল।

এবার রুকাইয়া একদম খামোশ হয়ে গেল। হা অথবা না কিছুই বলছে না। রাগে-ক্ষোভে, লজ্জায় মুক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। ঈগল তার প্রেমের গভীরতা আরো কিছুটা যাচাইয়ের জন্য বলল, 'তবে তোমার শাস্তি হলো দু'একদিনের মধ্যে তোমাকে অন্যত্র বিয়ে দিয়ে দিবো।'

একথা শুনে রুকাইয়া ফ্যাল ফ্যাল করে ঈগলের দিকে তাকিয়ে রইলো। তার গন্ড বেয়ে টপ্ টপ্ করে অশ্রু ঝড়ে বক্ষ সিক্ত হতে লাগলো। কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলল, 'ভাইয়া! তোমরা এত নিষ্ঠুর? প্রেম-বালবাসার কি কোনই মূল্য নেই তোমাদের কাছে? তোমরাও কি মার্কিন সৈন্যদের মত অমানুষ হয়ে গেলে? ভাইয়া! তুমি কি সুমাইয়াকে ভালবাসনি? তার বিরহে কি তোমার হৃদয়-মন ভেঙ্গে খান্ খান্ হচ্ছে না? আমার এ বং সালমানের বিচ্ছেদ ঘটিয়ে আমাদেরকেও কি তুমি আজীবন মনভাঙ্গা রাখতে চাও? এতেই কি তুমি সুখ পাবে? এতে যদি তোমরা সুখ পাও তবে ভেঙ্গে দাও আমাদের মন। কিন্তু আমি স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছি জীবনে যদি বিয়ে করতেই হয় তবে সালমানকেই করবো; অন্য কাউকে নয়।'

রুকাইয়ার কথা শুনে ঈগল মনের মধ্যে একটা ধাক্কা খেল। সুমাইয়ার প্রসঙ্গ ওঠায় তার হৃদয়ে একটা বিরহের বেদনা হাহাকার করে উঠল। সে বুঝতে পারলো নিছক মজাক করার জন্য সে কথাগুলো বললেও রুকাইয়া তা বুঝতে না পারায় তার হৃদয়েই আঘাত হেনেছে কথাগুলো। মুহূর্তে ঈগল নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'থাক্ থাক্ আর কাঁদতে হবে না বোন! তোমার সালমানকে কেউ তোমার থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবেনা। আমি শুধু একটু পরীক্ষা করে দেখছিলাম তোমাদের ভালবাসা কতটা খাঁটি। আমার কথায় যদি মনে কষ্ট পেয়ে থাকিস, তবে আমাকে ক্ষমা করে দিস আপু! আর আনন্দও খুশীর খবর হলো, আগামীকাল তোমাদের ভালবাসার বিজয় দিবস উয্যাপিত হতে যাচ্ছে।'

'তা কেমন ভাইয়া?' প্রশ্ন রুকাইয়ার।

'হায়রে বোকা মেয়ে! প্রেম করে অথচ প্রেমের বিজয় দিবস চেনেনা—বলল ঈগল—প্রেমের বিজয় মানে ইয়ে, মানে আগামীকাল তোমার আর সালমানের বিয়ে! বুঝেছো এখন?'

ঈগলের নিকট ভালবাসার বিজয় দিবসের ব্যাখ্যা শুনে রুকাইয়া একেবারে হাতে স্বর্গ পেল যেন। এ যেন মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি। আষাঢ়ের দিনে ঘন মেঘের চাঁদর ভেদ করে হঠাৎ যেমন নীল আকাশে সূর্যটা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, ঈগলের ব্যাখ্যা শুনে রুকাইয়ার চেহারাও খুশীতে তেমনি জ্বল জ্বল করছে। কিন্তু খুশী হলেও পিতার মতো সেও ইরাকের বর্তমান পরিস্থিতিতে বিবাহ করতে অস্বীকার করে বসলো। অবশেষে ঈগলের যুক্তিতে রাজী হলো।

সালমানের সাথেও অনেক তর্ক-বিতর্কের পর ঈগল তাকেও রাজী করাতে সক্ষম হলো। সবশেষে আলোচনা হলো মুজাহিদদের সাথে। তারা এই বিয়ের কথা শুনে অত্যন্ত খুশী হলো। এ উপলক্ষে তারা অনুষ্ঠান আয়োজনের দাবিও জানালো ঈগলের নিকট।

দিন গড়িয়ে রাত নামলো প্রকৃতি জুরে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অসংখ্য-অগণিত নিয়ামতের মধ্যে মানুষের জন্য বিশেষ একটি নিয়ামত হচ্ছে 'রাত'। সারাদিনের শ্রান্ত-ক্লান্ত মানুষ অবসান্ন দেহটিকে রাতের কোলে ঠেলে দেয় একটু শান্তির পরশ পেতে অনাবিল সুখ নিদ্রায় হারিয়ে যেতে। শুধু মানুষই নয় পশু-পাখি, গাছ-পালা, কীট-পতঙ্গ সবাই সুখ খোঁজে, শান্তির পরশ খোঁজে রাতের আঁচলের নীচে। আর রাতও স্নেহময়ী মায়ের মতো নিজের কোলে টেনে সুখ নিদ্রার পরশ বিলিয়ে দেয় সকলের প্রতি অকৃপণভাবে।

তবে অতি আনন্দ কিংবা অতি দুঃখে মানুষ বঞ্চিত হয়, রাতের এই অনাবিল সুখ থেকে। তেমনি রুকাইয়াও অদ্য রাতের কোমল ছোয়া থেকে বঞ্চিত। অবশ্য আজিকার বঞ্চনা দুঃখের নয়; সুখের জন্য। আগামী দিনের শুভ প্রভাতে হবে তাদের ভালবাসার জয়। সালমানকে পাবে সে একান্ত আাপন করে। দু'জন মিলে সাজাবে মধুর বাসর। শুরু হবে তার জীবনের নতুন অধ্যায়। সুখ-স্বপ্নে ভরিয়ে তুলবে ভবিষ্যৎ জিন্দেগী। সে জন্য প্রয়োজন হবে মার্কিনীদের এদেশ থেকে তাড়ানো। তাই তারা দু'জন একত্রিত হয়ে যুদ্ধ করবে, বিদেশী হানাদারদের বিতারণ করবে; মুক্ত করবে স্বদেশকে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য গড়ে তুলবে মুক্ত-স্বাধীন এক সুসজ্জিত ইরাক। যেখানে থাকবে না কোন অত্যাচারী-জালিম শাসকের উৎপাত; থাকবে না বিদেশী হানাদারদের আধিপত্য বিস্তারের কোন সুযোগ। থাকবে শুধু ন্যায়-ইনসাফের আদালত; দেশ চলবে খোলাফায়ে রাশেদার নমুনায়।

আরও ভাবে রুকাইয়া, আগামীকালের মধুর বাসরে প্রথমে সাক্ষাতে কি বলে সে সালমানকে সম্বোধন করবে। কি বলে কথা শুরু করবে তার সাথে। এতদিন তো সালমান সাহেব...। আর ভাবতে পারে না রুকাইয়া। একরাশ লজ্জা এসে জড়িয়ে ধরে তাকে। লজ্জায় সে মুখ লুকায় বালিশের মধ্যে। সারা রাতে ঘুম আসলে ানা একটুও। কেবলই প্রিয়তমের মায়াবী মুখখানি ভেসে উঠছে চোখের সামনে। তার মধুর ছোয়া পেতে মন শুধু আকুপাকু করছে। আর মোটে তর সইছে না মনে।

বিবাহের পূর্ব রাতে এমন অবস্থা হয় প্রায় সকল মানুষের। ভালো লাগা আর ভালোবাসার এক অন্যরকম শিহরণ ছড়িয়ে পরে হৃদয়ের পরতে পরতে। দুনিয়ার সকল সুখ যেন এসে ভর করে বিবাহ আকাংখিত পাত্র-পাত্রীর দিলরাজ্যে। ভুলে যায় তারা সকল দুঃখ-বেদনার কথা। এ এমন এক সুখানুভূতি যা ব্যক্ত করা সাধ্যাতীত; সংশ্লিষ্ঠ পাত্র-পাত্রীই কেবল অনুভব করতে পারে এ সুখ। এমন সুখ মুহূর্ত জীবনে দ্বিতীয়বার আসেনা।

ব্যাচারা সালমানেরও একই অবস্থা। তবে তার অনুভূতি একটু ভিন্নতর। স্বদেশ থেকে বহুদূরে, বিদেশে-বিভূইয়ে সে শুরু করতে যাচ্ছে জীবনের এক নব অধ্যায়। জীবনের এই চির আকাংখিত খুশীর মুহূর্তে তার পাশে নেই মা-বাবা, ভাই-বোন এবং আত্মীয়-স্বজন। তার সবচেয়ে বেশী মনে পড়ছে মমতাময়ী আম্মাজানের কথা। যেই মা কোলে-কাঁখে করে মানুষ করেছেন, তিনি আজ তার থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে। এ কথা ভাবতেই কেমন খারাপ লাগে সালমানের। পরক্ষণেই হৃদয়ের পর্দায় ভেসে ওঠে প্রিয়তমা রুকাইয়ার পুত-পবিত্র মুখচ্ছবি। সে ভাবে, এমন বেহেশতের হুর সদৃশ বধু পেলে আম্মিজান অত্যন্ত খুশী হবেন। এমনতর ভাবনা-চিন্তার মধ্যে দিয়ে কেটে গেল রাত। ঘুমুতে পারলো না সে এতটুকু।

রাত শেষ। প্রকৃতিকে জাগিয়ে দিতে পূর্ব গগণে সুবহি সাদিকের সরব উপস্থিতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। আল্লাহর মু'মিন বান্দারা তাঁর সকাশে দিনের প্রথম হাজিরা দিতে প্রস্তুতি নিচ্ছে। বান্দা তার মালিকের দরবারে ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদন করতে অগ্রসর হচ্ছে। সালমানও বের হলো রুম থেকে। সম্মুখেই দেখা ঈগলের সাথে। সে জিজ্ঞেস করলো কোথায় যাচ্ছো ঈগল ভাই?'

'কোথায় আর যাবো'–বলল ঈগল– 'তোমার খোঁজেই এলাম। ভাবলাম ঘুম থেকে উঠলে কিনা।'

'রাতে ঘুমই হয়নি'–বলল সালমান-'বিভিন্ন চিন্তা-ভানায় কখন যে রাত শেষ হলো টেরই পেলাম না।'

'হ্যাঁ তাতো ঠিকই, বিবাহের চিন্তা মাথায় থাকলে ঘুম আসবে কেমনে?' টিপ্পনী কেটে বলল ঈগল।

ঈগলের কথায় সালমান শুধু মুচকি হাসলো, বললো না কিছুই। দু'জনেই চলে এলো ব্যাংকারের বৃহৎ কক্ষে। ইতিমধ্যে জামাতের সময় হয়ে গেলো। ঈগলের ইমামতির নামায পড়লো সকল মুজাহিদবৃন্দ, সালমান, মেজর সাহেব ও মুয়াজ-রাহাদ।

নামায শেষে যথারীতি সালমান পবিত্র কুরআনুল কারীমের দরস প্রদানের নিমিত্তে দাঁড়ালো। সমস্ত মুজাহিদগণ একত্রিত হয়ে বসে গেলেন দরস শ্রবণ করতে। আজকের দরসের নির্বাচিত সূরা হচ্ছে সূরাতুন নিসা। এই সূরার ১০ম রুকু থেকে প্রথমে তিলাওয়া করল সে। (৭১) হে ঈমানদারগণ! নিজেদের অস্ত্র তুলে নাও এবং পৃথক পৃথক সৈন্যদলে কিংবা সমবেতভাবে বেরিয়ে পড়। (৭২) আর তোমাদের মধ্যে এমনও কেউ কেউ রয়েছে, যারা অবশ্য বিলম্ব করবে এবং তোমাদের উপর কোন বিপদ উপস্থিত হলে বলবে, আল্লাহ আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, আমি তাদের সাথে যাইনি। (৭৩) পক্ষান্তরে তোমাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন অনুগ্রহ আসলে তারা এমনভাবে বলতে শুরু করবে যেন তোমাদের মধ্যে এবং তাদের মধ্যে কোন মিত্রতাই ছিলনা। (বলবে) হায়! আমি যদি তাদের সাথে থাকতাম, তাহলে আমিও যে সফলতা লাভ করতাম। (৭৪)

কাজেই আল্লাহর কাছে যারা পার্থিব জীবনকে আখেরাতের পরিবর্তে বিক্রি করে দেয় তাদের যুদ্ধ (জিহাদ) করাই কর্তব্য। বস্তুতঃ যারা আল্লাহর রাহে লড়াই করে অতঃপর মৃত্যুবরণ করে কিংবা বিজয় অর্জন করে, আমি তাদেরকে মহাপুণবান করব। (৭৫) আর তোমাদের কি হলো যে, তোমরা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে, যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান করো; এখানকার অধিবাসীরা যে অত্যাচারী! আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষাবলম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও। (৭৬) যারা ঈমানদার তারা যে যুদ্ধ করে আল্লাহই রাহেই। পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা লড়াই করে শয়তানের পক্ষে। সুতরাং তোমরা যুদ্ধ করতে থাক শয়তানের পক্ষালম্বনকারীদের বিরুদ্ধে (দেখবে) শয়তানের চক্রান্ত নিতান্তই দুর্বল।

তিলাওয়াত শেষ করে সালমান তেলাওয়াতকৃত আয়াতের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা পেশ করতে লাগলো–সম্মানিত মুজাহিদ ভাইয়েরা! উল্লেখিত আয়াতে কারীমা সমূহে পবিত্র জিহাদের বিধানাবলী বর্ণিত হয়েছে। 'ইয়া আইয়্যু হাল্লাযিনা আমানু খুজুও হিজরাকুম' আয়াতের প্রথমাংশে জিহাদের জন্য অস্ত্র সংগ্রহের এবং অতঃপর আয়াতের দ্বিতীয় অংশে জিহাদে অংশগ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এতে একটি বিষয় বুঝা যাচ্ছে এই যে, কোন ব্যাপারে বাহ্যিক উপকরণ অবলম্বন করা তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতার পরিপন্থী নয়। এ বিষয়টি আরো কয়েক জায়গায় সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে। যেমন সূরা আনফালের ৬০ নং আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন, "আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে (কাফেরদের ইসলাম বিরোধীদের সাথে) যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্য থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পরে আল্লাহর শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের উপরও যাদেরকে তোমরা জাননা; আল্লাহ তাদেরকে চেনেন... ।"

এ আয়াতে ইসলামের শত্রুকে প্রতিরোধ ও কাফেরদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুতির বিধান বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে, 'কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধোপকরণ তৈরী করে নাও যতটা তোমাদের পক্ষে সম্ভব। এক্ষেত্রে যুদ্ধোপকরণ তৈরী করার সাথে 'মাসতাত'তুম'-এর শর্ত আরোপ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তোমাদের সফলতা লাভের জন্য এটা অপরিহার্য নয় যে, তোমাদের প্রতিপক্ষের নিকট যে ধরনের এবং যে পরিমাণ উপকরণ রয়েছে, তোমাদেরকেও ততটাই অর্জন করতে হবে বরং সামর্থ অনুযায়ী যা কিছু উপকরণ জোগার করতে পারো তাই সংগ্রহ করে নাও, তবে সেটুকুই যথেষ্ট আল্লাহর সাহায্য ও সহায়তা তোমাদের সঙ্গে থাকবে।

অতঃপর সে উপকরণের কিছুটা বিশ্লেষণ এভাবে করা হয়েছে, 'মিন কুওওতিন' অর্থাৎ, মোকাবেলা করার শক্তি সঞ্চয় কর। এতে সমস্ত যুদ্ধোপকরণ, অস্ত্রশস্ত্র, যানবাহন

প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত এবং শরীর চর্চা ও সমর বিদ্যা শিক্ষা করাও অন্তর্ভুক্ত। কোরআন কারীম এখানে তৎকালে প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্রের কোন উল্লেখ করেনি, বরং ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ 'শক্তি' ব্যবহার করে ইঙ্গিত দিয়েছে, 'শক্তি' প্রত্যেক যুগ, দেশ ও স্থান অনুযায়ী বিভিন্ন রকম হতে পারে। তৎকালীন সময়ের সমর অস্ত্র ছিল, তীর-তলোয়ার বর্শা, খঞ্জর প্রভৃতি। তারপরে বন্দুক-তোপের যুগ এসেছে। তারপর এখন চলছে গ্রেনেড, বোমা, রকেট, টাঙ্ক, বিমান ও কামান প্রভৃতির যুগ। 'শক্তি' শব্দটি এ সবকিছুতেই ব্যাপক। সুতরাং যেকোন বিদ্যা ও কৌশল শিক্ষা করার প্রয়োজন হবে সেসবই যদি এই নিয়তে হয় যে, তার মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানদের শক্রকে প্রতিহত করা এবং কাফেরদের মোকাবেলা করা হবে, তাহলে তাও জিহাদেরই শামিল।

উল্লেখিত আয়াতে যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত করার নির্দেশ দানের পর সেসব সাজ সরঞ্জাম সংগ্রহ করার ফায়দা এবং আসল উদ্দেশ্যও এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে–'তুরহিবুনা বিহী আদুও ওল্লাহে ওয়া আদুও ওকুম' অর্থাৎ যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করার প্রকৃত উদ্দেশ্য যুদ্ধ-বিগ্রহ করা নয়, বরং কুফর ও শিরককে পরাভূত ও প্রভাবিত করে দেয়া...।

অতঃপর বলা হয়েছে, যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষা প্রস্তুতিতে যাদেরকে প্রভাবিত করা উদ্দেশ্য তাদের অনেককে মুসলমানরা জানে বা চিনে। আর তারা হল সেসব লোক যাদের সাথে মুসলমানদের মোকাবেলা চলছে। এ ছাড়াও কিছু লোক রয়েছে যাদেরকে এখনও মুসলমানরা জানেনা। এর মর্ম হল সারা দুনিয়ার কাফেরও মুশরিক, যারা এখনও মুসলমানদের মোকাবেলায় আসেনি কিন্তু ভবিষ্যতে তাদের সাথেও সংঘর্ষ বাধতে পারে। কোরআন কারীমের এ আয়াতটিতে বলে দেয়া হয়েছে যে, মুসলমানগণ যদি নিজেদের উপস্থিত শক্রর মোকাবেলার প্রস্তুতি নেয়, তবে এর প্রভাব শুধু সে শক্রর উপরই পড়বে না, বরং দূর দূরান্তের কাফের শক্তির উপরও পড়বে।

দ্বিতীয়তঃ বোঝা যাচ্ছে, এখানে অস্ত্র সংগ্রহের নির্দেশ দেয়া হলেও এমন প্রতিশ্রুতি কিন্তু দেয়া হয়নি যে, এ অস্ত্রের কারণে তোমরা নিশ্চিতভাবেই নিরাপদ হতে পারবে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বাহ্যিক উপকরণ অবলম্বন করাটা মূলতঃ মানসিক স্বস্তিলাভের জন্যই হয়ে থাকে। বাস্তবে এগুলো লাভ-ক্ষতির ব্যাপারে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। সেজন্য অস্ত্র-সামগ্রীর স্বল্পতার অজুহাত তুলে জিহাদে বের হবার ব্যাপারে গড়িমসি করার কোন সুযোগ নেই। যেমন সূরা তাওবায়ে ইরশাদ হয়েছে– তোমরা বের হয়ে পড় স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে, এটি তোমাদের জন্য অতি উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার। (আয়াত ঃ ৪১)

এর পরের দু'আয়াতে মুনাফিকদের যুদ্ধকালীন চরিত্র বর্ণনা করা হয়েছে এমনিতেই মুনাফিকরা ঈমানদারদের ধোকা দিয়ে বেরায়। আর যুদ্ধ জিহাদ যেহেতু এক প্রকার ঈমানদার-মুনাফিক যাচাইয়ের প্রক্রিয়া, তাই অন্যান্য সময়ের তুলনায় এ সময় তাদের

মুখোশ উলঙ্গভাবে প্রকাশ পায়। এজন্য আল্লাহ তা'আলা মুমিনদের জিহাদে বের হবার নির্দেশ দিয়ে পাশাপাশি মুনাফিকদের অবস্থাও বলে দিয়েছেন। মু'মিনরা আল্লাহ তা'আলার প্রতি এজন্যও কৃতজ্ঞ যে, তিনি তাঁর পাক কালামের মধ্যে যেখানেই জিহাদের আলোচনা করেছেন, সেখানেই মুনাফিক-বর্ণচোরাদের সম্বন্ধে দু'চার কথা অবশ্যই উল্লেখ করেছেন যে, তারা জিহাদ থেকে পিছনে থাকতে পারার ফলে আনন্দিত হত এবং যখন মুসলমানদের বিজয় দেখত, তখন তাদের সাথী হওয়ার জন্য তৎপর হয়ে উঠত।

সে অবস্থায়ই ব্যক্ত হয়েছে আয়াত দু'খানিতে। বলা হয়েছে–তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এরূপও আছে যে শৈথিল্য করে, অর্থাৎ জিহাদ অভিযানে বিরত পরাঙ্মুখ থাকে, পার্থিব স্বার্থই তাদের লক্ষ্য। অতঃপর যদি তোমাদের উপর অর্থাৎ মুসলমানদের উপর কোন বিপদ আসে তখন বলে, আল্লাহ্ আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, আমি তাদের সাথে ছিলাম না।

আর যদি আল্লাহর নিকট হতে মুসলমানদের প্রতি কোন অনুগ্রহ পৌঁছে অর্থাৎ বিজয় অর্জিত হয়, তখন এমনভাবে বলতে শুরু করে যে, তোমাদের ও তাদের মধ্যে কোন সম্পর্কই ছিলনা অর্থাৎ তারা যে ইতিপূর্বে গড়িমসি করেছে জিহাদে যেতে, এমন কোন ঘটনাই যেন ঘটেনি। এবং মুমিনদের দলভুক্ত হওয়ার জন্য বলে, হায়! আমিও যদি তাদের সঙ্গী হতাম, তবে আমারও মহান উদ্দেশ্য সফল হত।

উপরোক্ত প্রথম আয়াতে মুনাফিকদেরকে 'তোমাদের মধ্যে' অর্থাৎ মুসলমানদের মধ্যে কেউ কেউ বলা হয়েছে এ জন্য যে, এরা বাহ্যিকভাবে ইসলামের খোলস গায়ে জড়িয়ে রাখে এবং মুখে মুখে মুসলমান হওয়ার লম্বা-চওরা দাবীও করে। লোক দেখানো নামায পড়ে থাকে। আসলে এরা মুসলমানদের অস্তিনের সাপ। সর্বদা দংশন করার সুযোগ খুঁজতে থাকে।

এরপরের আয়াতে আল্লাহ্ তা'য়ালা মুজাহিদদের পরামর্শ দিয়েছেন এবং সফলতা লাভের নিশ্চয়তা দিয়েছেন এভাবে–কাজেই আল্লাহর রাহে যারা পার্থিব জীবনকে আখিরাতের পরিবর্তে বিক্রি করে দেয় তাদের যুদ্ধ করাই কর্তব্য। অর্থাৎ যুদ্ধ করলেই তাদের আখেরাতের পথের কন্টক দূরীভূত হবে। তাই তাদের জিহাদ করার পরামর্শ দিচ্ছেন আল্লাহ। বস্তুতঃ যারা আল্লাহর পথে লড়াই করে এবং অতঃপর মৃত্যুবরণ করে কিংবা বিজয় অর্জন করে, আমি তাদেরকে মহাপূণ্য দান করব। অর্থাৎ আল্লাহর রাহে জীবন বিক্রি করে দিয়ে নিশ্চিন্তে লড়াই করতে থাকো; জয়-পরাজয়ের পরোয়া করো না। কেননা তুমি নিহত হলে হবে শহীদ। আর শহীদের বিনিময় বিনা হিসেবে সাথে সাথে জান্নাত প্রাপ্তি। বিজয় লাভ করলেও অফুরন্ত সওয়াব দান করবো আমি আল্লাহ।

এই বিনিময় দানের ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা নিশ্চয়তা দিয়ে অন্যত্র বলেন–আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে, অতঃপর মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল

ও কুরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহ্র চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেনদেনের উপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে। আর এ হল মহান সাফল্য। (তাওবা ঃ ১১১)

সূরা নিসার ৭৫ নং আয়াতে উৎপীড়িতের সাহায্য করার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। মক্কা নগরীতে এমন কিছু দুর্বল মুসলমান রয়ে গিয়েছিল, যারা দৈহিক দুর্বলতা এবং আর্থিক দৈন্যের কারণে হিজরত করতে পারছিলেন না। পরে কাফেররাও তাদেরকে হিজরত করতে বাধাদান করছিল এবং বিভিন্নভাবে নির্যাতন করতে আরম্ভ করেছিল, যাতে তারা ইসলাম ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। এদের কারো কারো নামও তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, হযরত ইবনে আব্বাস ও তাঁর মাতা, সালমা ইবনে হেশাম, ওলীদ ইবনে ওলীদ, আবু জানদাল ইবনে সাহল প্রমুখ। (কুরতুবী) এসব সাহাবী নিজেদের ঈমানী বলিষ্ঠতার দরুন কাফেরদের অসহনীয়-উৎপীড়ন সহ্য করেও ঈমানের উপর স্থির থাকেন। অবশ্য তাঁরা এসব অত্যাচার নির্যাতন থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য বারবারই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দরবারে মোনাজাত করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'য়ালা তাদের সে প্রার্থনা মঞ্জুর করে নেন এবং মুসলমানদিগকে নির্দেশ দেন, যাতে তারা জেহাদের মাধ্যমে সেই নিপীড়িতদেরকে কাফেরদের অত্যাচার থেকে মুক্ত করেন।

এ আয়াতে বোঝা যায়, মুমিনরা আল্লাহ তা'য়ালার দরবারে দু'টি বিষয়ের দোয়া করেছিলেন। একটি হলো এই যে, আমাদিগকে এই (মক্কা) নগরী থেকে স্থানান্তরের ব্যবস্থা কর এবং দ্বিতীয়টি হলো যে, আমাদের জন্য কোন সাহায্য বা সাহায্যকারী পাঠাও। আল্লাহ তাদের এ দু'টি প্রার্থনাই কবুল করে নিয়েছিলেন।

এ আয়াতে পরিস্কার ভাষায় জেহাদ করার নির্দেশ দানের পরিবর্তে 'অমালাকুম লা-তুক্বতিলুনা' বাক্য ব্যবহার করার মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এমন পরিস্থিতিতে জিহাদ করাটাই স্বাভাবিক দায়িত্ব, যা না করা কোন ভালো মানুষের পক্ষে একান্তই অসম্ভব।

এ আয়াতের আলোকে আমাদের চিন্তা করা উচিত, মুসলিম বিশ্বের দেশে দেশে এবং অমুসলিম দেশে বসবাসকারী নির্যাতিত মুসলমানদের করুন আর্তচিৎকার-ফরিয়াদ আকাশ-বাতাস ভারী করে যখন আল্লাহর আরশও প্রকম্পিত করে তোলে তখনও আমরা যারা যুদ্ধ-জিহাদ করিনা, তাদের সাহায্যার্থে ছুটে যাইনা, তারা কোন শ্রেণীর ভালো মানুষ?

সুরাতুন নিসা-এর ১০তম রুকুর সর্বশেষ আয়াত অর্থাৎ ৭৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা মুমিন তারা জিহাদ করে আল্লাহর পথে। আর যারা কাফের তারা যুদ্ধ করে শয়তানের পক্ষে। এতে পরিস্কারভাবেই প্রতীয়মান হচ্ছে যে, পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করাই মুখ্যতঃ মুমনিদের যাবতীয় চেষ্টা-চরিত্রের লক্ষ্য। কারণ, আল্লাহই সমগ্র সৃষ্টির মালিক এবং তাঁর যাবতীয় বিধি-বিধান নির্ভেজাল ও ন্যায়ভিত্তিক। তাছাড়া ন্যায় ও কল্যাণভিত্তিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হলেই যথার্থ শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। বিশ্বশান্তির জন্যও

সমগ্র বিশ্বে এমন সংবিধানের প্রচলন অপরিহার্য, যাকে আল্লাহর কানুন বা সংবিধান বলা হয়। সুতরাং পরিপূর্ণ কোন মুমিন ব্যক্তি যখন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তখন তার সামনে এ উদ্দেশ্যেই বিদ্যমান থাকে।

কিন্তু এর বিপরীতে যারা কাফের তাদের বাসনা থাকে কুফরের প্রচলন, কুফরের বিজয় এবং পৈচাশিক শক্তির শাসন প্রতিষ্ঠা করা, যাতে করে বিশ্বময় কুফরী ও শেরেকী বিস্তার লাভ করতে পারে। আর কুফরী ও শেরেকী যেহেতু শয়তানের পথ, সুতরাং কাফেররা শয়তানের কাজেই সাহায্য করে থাকে।

এরপরে আয়াতে বলা হয়েছে–'ইন্না কাইদাশ শাইতনা কা-না দ'ঈফা' অর্থাৎ শয়তানের চক্রান্ত ও কলাকৌশল হয় দুর্বল। ফলে তা মুমিনদের সামান্যতমও ক্ষতি করতে পারেনা। অতএব, মুসলমানগণকে শয়তানের বন্ধুবর্গ অর্থাৎ কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে কোন রকম দ্বিধা করা উচিত নয়। তার কারণ, তাদের সাহায্যকারী হলেন আল্লাহ তা'য়ালা স্বয়ং। পক্ষান্তরে শয়তানের কলাকৌশল কাফেরদের কিছুই মঙ্গল সাধন করবে না।

এ আয়াতে শয়তানের কলাকৌশলকে যে দুর্বল বলে অভিহিত করা হয়েছে, সেজন্য আয়াতের মাধ্যমেই দু'টি শর্তের বিষয়ও প্রতীয়মান হয়। (এক) যে লোকের বিরুদ্ধে শয়তান কলাকৌশল অবলম্বন করবে, তাকে মুসলমান হতে হবে এবং (দুই) সে যে কাজে নিয়োজিত থাকবে, তা একান্তভাবেই আল্লাহর জন্য হতে হবে; কোন পার্থিব বস্তুর আকাংখা কিংবা আত্মস্বার্থ প্রণোদিত হবে না। প্রথম শর্ত 'আল্লাযিনা আ-মানু' বাক্যের দ্বারা এবং দ্বিতীয় শর্ত 'ইও কৃতিলুনা ফি সাবিলিল্লাহ' বাক্যের দ্বারা বোঝা যায়, এ দু'টি শর্তের যে কোন একটির আবর্তমানে শয়তানের কলাকৌশল দুর্বল হয়ে পড়া অবশ্যম্ভাবী নয়।

সুতরাং হে মুজাহিদ ভাইয়েরা! আমাদের যুদ্ধ, আমাদের জিহাদ শুধুমাত্র আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে হতে হবে। অন্য কোন উদ্দেশ্য, অন্য কোন স্বার্থ কখনো মনে স্থান দেয়া যাবেনা। এই দেশ, এই ইরাক এক সময় ইসলামী খেলাফতের রাজধানী ছিল, এই ভূ-খন্ডে আল্লাহর আইন চালু ছিল। অতএব আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে ইরাকের সেই হারানো দৌলতকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করা। এই পথ ও পাথেয় নিয়েই আমারে সম্মুখপানে অগ্রসর হতে হবে। আল্লাহ্ তা'য়ালা আমাদেরকে পবিত্র কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী জিহাদ করে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ অর্জনের তাওফিক দান করুন। আমীন! ইয়া রাব্বুল আলামীন!'

পবিত্র কুরআনুল কারীমের দরস শেষ হলে সালমান তার রুমের দিকে হাটা দিল। ঈগলও গেল তার সাথে। রুমে গিয়ে ঈগল সালমানকে বলল, 'সালমান ভাই! আমার আদরের বোনটি আজ তোমায় সোপর্দ করে দিব। তোমার সে দুলহীনের জন্য কিছু কেনা-কাটা করা দরকার না?

'তাতো অবশ্যই' –বলল সালমান– 'আমিও তাই ভাবছি, নাস্তা সেরে তোমাকে নিয়েই মার্কেটে যাবো। যা যা প্রয়োজন তার একটি তালিকা তৈরী করে নাও তুমি, ওখানে গিয়ে আবার ঝামেলায় পড়তে না হয়।'

* * *

সকাল নয়টা। বিবাহের বাজার করতে বের হল বাগদাদের ঈগলও পাকিস্তানি সাংবাদিক সালমান কোরেশী। গাড়ির ড্রাইভিংয়ে ঈগল। পাশের সীটে সালমান। নিরাপত্তার জন্য তিনজন তাগরা নওযোয়ান পিছনের সীটে স্বয়ংক্রিয় রাইফেল কাঁধে নিয়ে ট্রিগারে হাত দিয়ে চুপচাপ চসে আছে। অল্প সময়ের মধ্যে তারা বাজারে চলে এলো।

বাজার তো নয় যেন হানাদারদের ধ্বংসযজ্ঞের এক প্রামাণ্য চিত্র। বাগদাদের যে মার্কেটের রূপ-সৌন্দর্য, উন্নত অবকাঠামো আর চোখ ঝলসানো অপূর্ব জৌলুস দর্শকদের বিমোহিত করতো, তা এখন হারিয়ে গেছে–বিলীন হয়ে গেছে কালের গর্ভে। মার্কেটগুলোতে ক্রেতার উপস্থিতিও অপ্রতুল। ব্যবসায়ীরা দোকান খুলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন ক্রেতার জন্য। তার চেয়েও বেশী আংতকে ভোগেন তারা মার্কিন বাহিনীর অযাচিত মাতুব্বরী। সৈন্যরা প্রায়ই এসে দোকানীদের হয়রানি করে, অযথা ধমকায় নিজেদের বাহাদুরী ফলাবার লক্ষ্যে। কখনো আবার সন্দেহভাজন আখ্যা দিয়ে দোকানীদের গ্রেফতার করেও নিয়ে যায়। এজন্য ব্যবসায়ীগণ সর্বদা উদ্বিগ্ন ও পেরেশানিতে ভোগেন, কখন কি হয়ে যায়, কখন বিপদ এসে উপস্থিত হয় আর সর্বস্ব লুটে নিয়ে যায় এই আতংকে।

যাহোক, ঈগলেরা প্রথমে একটি তৈরী পোষাকের দোকানে ঢুকলো। দোকানী তালহা মাহমুদ অত্যন্ত মিশুক মানুষ। বয়স পঞ্চাশের কোঠায়। মুখ ভর্তি সাদা-কালো ঘন দাড়ি। ঈগলের পূর্ব পরিচিত। তিনি ঈগলকে দেখেই হাসি মুখে সালাম দিয়ে খোশ আমদেদ জানালেন। ঈগল সালমানকে নিয়ে পোষাক পছন্দ করতে লাগলো। মাহমুদ সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, 'ঈগল! আমাদের ভবিষ্যৎ কি হবে? আমরা কি মার্কিনীদের গোলামীর জিঞ্জির ছিন্ন করতে পারবো, নাকি চিরদিনের জন্য আটকা পরে থাকবো এ শিকলে?

মাহমুদ সাহেবের প্রশ্ন শুনে ঈগল কতক্ষণ তাকিয়ে রইলো তাঁর দিকে। সে ভাবছে, হায়রে আগ্রাসন! আমেরিকা আগ্রাসন চালিয়ে ইরাকের প্রতিটি মানুষের সুখ, আনন্দ, মুখের মধুর হাসি সব কেঁড়ে নিল। যেই মাহমুদ সাহেবের মিষ্টি মধুর কথা শুনে মনে প্রফুল্লতা আসতো। কথা বলার সময় সর্বদা যার অধরে ফুটে উঠতো এক চিলতে মুচকি হাসি, কিন্তু আজ কোথায় তার সেই হাস্য-রসিকতা? সব মিলিয়ে গেছে আগ্রাসীদের ট্যাঙ্কের চাকায় আর বিমানের মুহুর্মুহ আওয়াজের ভিতর।' তিনি প্রথমে তাদের দেখে যে হেসেছিলেন, সে হাসির ভিতর আনন্দের দ্যুতি ছিলনা, ছিল দুঃখের অভিব্যক্তি, বেদনার চাপা কান্না।

এভাবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বলল ঈগল, 'মাহমুদ চাচা! আমাদের তথা ইরাকীদের ভবিষ্যৎ তাই হবে যা মহান রাব্বুল আলামীন আমাদের ভাগ্যে লিখে রেখেছেন। কিন্তু আমি হলফ করে বলতে পারি, মার্কিনীরা আমাদেরকে গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ করে রাখতে পারবে না ইনশাআল্লাহ!

'সাবাশ ঈগল! তোমরা তরুণ, তোমরাই জাতির প্রাণ'–বললেন তালহা মাহমুদ সাহেব– 'তোমরা যদি জাতিকে গোলামীর শিকলে আবদ্ধ না করার শপথ গ্রহণ কর এবং জিহাদের ময়দান তোমাদের দীপ্ত পদচারণায় মুখরিত রাখ তবে আমিও আশাবাদী যে, ওরা আমাদের গোলাম বানাতে পারবেনা।'

আরও অনেক কথাবার্তা হল তাদের মধ্যে ইরাকের ভবিষ্যত নিয়ে। অতঃপর রুকাইয়ার জন্য, সালমানের জন্য, মেজর সাহেবের জন্য, ছোট রাহাদ-মুয়াজের জন্য এবং সালমানের পীড়াপিড়ীতে ঈগল নিজের জন্যও পোষাক বাছাই করল। মূল্য পরিশোধ করার সময় দেখা দিল বিপত্তি, ঈগল চাচ্ছে সে মূল্য পরিশোধ করবে কিন্তু সালমান কিছুতেই তাকে মূল্য পরিশোধ করতে দিবে না। অবশেষে ঈগল হার মানলো সালমানের কাছে। সালমানই মূল্য পরিশোধ করলো।

তারা কাপড়ের দোকান থেকে বেড়িয়ে অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিও দ্রুত ক্রয় করে বাড়ি ফিরতে শুরু করলো। ভালোয় ভালোয় তারা বাড়িতে পৌঁছে গেল।

আজ মেজর আসাদুল্লাহ সাহেবের বাড়ি ও বাংকারের প্রতিটি মানুষ খুশী। সন্ধার পরে বসবে বিয়ের আসর। সে আসরে যোগ দিতে পাড়াপড়শিরাও এসেছে। সবচেয়ে বেশী আনন্দিত মুয়াজ ও রাহাদ। তাদের হই হুল্লর পুরো বাড়িটিকে মাতিয়ে রেখেছে। কন্যাকে বিয়ের সাজে সাজাচ্ছে তার ঘনিষ্ঠ দু'বান্ধবী মাহমুদা ও সালমা। তারা তাকে সাজাচ্ছে আর টিপ্পনী কাটছে। বিভিন্ন রকম হাস্য-কৌতুক করছে। রুকাইযা সলাজ বসে বসে বান্ধবীদের সব রস-ব্যঙ্গ সহ্য করছে নীরবে। শুধু তাকে বলব কেন, এদিনে, এ সময় সব মেয়েদেরই লজ্জাকর এমনতর রঙ্গ-ব্যঙ্গাত্মক অত্যাচার সহ্য করতে হয় নীরবে।

নির্ধারিত সময়ে বসেছে বিয়ের আসর। সম্পন্ন হয়ে গেলো আকদ। বিলানো হলো শুকনো খেজুর। আসরের সকলে আনন্দচিত্তে লুফে নিল তা। হৃদয় উজার করে দোয়া করলো বর-কনেকে। হঠাৎ মজলিসের পূর্ব কর্ণারে হট্টগোল দেখা দিল। তৎক্ষণাৎ ঈগল ছুটে গেল সেখানে। গিয়ে দেখলো মধ্যে বয়সী এক লোককে মুজাহিদরা উত্তম মাধ্যম দিচ্ছে। ঈগল তাদের নিরস্ত্র করে ঘটনা জানতে চাইলো। উত্তরে কয়েকজন একত্রে বলতে লাগলো। স্পষ্টভাবে কারো কথাই বুঝা গেল না।

হট্টগোলের মধ্যে থেকে ঈগল যা বুঝলো তাহল এই, এ লোক মার্কিনীদের দালাল। বিবাহের মজলিসে সে প্রতিবেশীদের সাথে ঢুকেছে। এইমাত্র সে মজলিসের মধ্যে বোমা বিস্ফোরণ ঘটানোর প্রচেষ্টা কালে মুজাহিদদের হাতে ধরা পড়ে। ঈগল লোকটাকে

মুজাহিদদের হাত থেকে উদ্ধার করে ব্যাংকারের মধ্যে নিয়ে বন্ধী করে রাখলো। এ ঘটনায় আসরের বহিরাগত মেহমানরা অত্যন্ত দুঃখ প্রকাশ করলো। অতঃপর তারা বিদায় নিয়ে চলে গেল। মুজাহিদরাও যার যার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। এ অনাকাংখিত বোমা হামলার প্রস্তুতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করে তাদের সারাদিনের হাসি-আনন্দ ম্লান হয়ে গেল। 'যদি বোমাটি বিস্ফারিত হতো তাহলে কত হৃদয়বিদারক অবস্থার সৃষ্টি হতো' চিন্তা করে সবার গা কাঁটা দিয়ে উঠলো। উফ! মার্কিনরিা কত নিষ্ঠুর-অমানুষ, কত অসভ্য যালিম, কত পৈচাশিক ওদের ধ্বংসাত্মক চিন্তাধারা। কত নীচু ওদের মন-মানসিকতা যে, মানুষের মৌলিক অধিকারের উপরও অবৈধ হস্তক্ষেপ করতে এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করে না। হায়রে মানবতার দাবীদার! হায়রে সভ্যতার মুখোশধারী!

* * *

জনাব আবু বকর সাহেব। শহীদ হাদীদ কামাল ও সুমাইয়ার পিতা। তিনি আজ বেশ ক'দিন ধরে ঈগলের কথামতো মানসিকভাবে নিজেকে আত্মঘাতি হামলার জন্য প্রস্তুত করে চলেছেন। রাত্র-দিনে নিরবে-নিভৃতে মহান প্রভু আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীতে লিপ্ত থাকছেন বেশীরভাগ সময়। ফরজ নামাযের পাশাপাশি নফল নামায, নফল রোজা, তিলাওয়াত, তাছবী-তাহলীল এবং রীতিমতো তাহাজ্জুদ আদায়, নফল নামাযে শাহাদাত লাভের অকৃত্রিম বাসনা জানিয়ে আল্লাহর দরবারে হামলার সাফল্যের জন্য এমন হৃদয় উজাড় করে দু'আ-মুনাজাত করছেন, যার বর্ণনা দেওয়া সাধ্যাতীত ব্যাপার। মৃত্যুর মাধ্যমে স্বদেশকে স্বাধীন করা এবং পরম প্রিয় প্রভূর সাথে মিলনের উদগ্রীব-আকাংখা নিয়ে এত একনিষ্ঠতার সাথে আকুতি-মিনতি প্রকাশ করা আত্মঘাতি হামলার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে পরিস্কার করে দেয়। আর এটা অতি অস্বাভাবিকও কিছু নয়। কেননা নবী করীম (সাঃ) আল্লাহর দরবারে এই দোয়া করেছেন–আয় আল্লাহ্! যে ব্যক্তি আমি নবী হওয়া সম্পর্সে দৃঢ় বিশ্বাসী, মৃত্যুকে তার নিকট মাহবুব (প্রিয়) বানিয়ে দাও।' অন্যত্র আছে, তিনি (সাঃ) ফরমান, 'যদি তোমরা আমার উপদেশকে স্মরণ রাখ, তবে তোমাদের কাছে মৃত্যু থেকে অন্য কোন জিনিস প্রিয়তম হওয়া উচিত নয়।'

এজন্য বিদগ্ধ একজন মুজাহিদ নেতা বলেন, "মৃত্যু অতি দ্রুত তোমাদেরকে মিলিত করবে তোমাদের প্রেমাষ্পদ আল্লাহর সাথে। প্রত্যেক প্রেমিক প্রেমাষ্পদের মিলন কামনা করে। তোমাদের প্রেমাষ্পদ আল্লাহর সাথে তোমাদের মিলনে একমাত্র বাধ্য মৃত্যু।" যাহোক, জনাব আবু বকর সাহেব প্রথমে আত্মঘাতি হামলার পথ বেছে নিয়েছিলেন এজন্য যে, স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা সকলকে হারিয়ে শোকে-দুঃখে প্রায় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন তাই। কিন্তু এ ক'দিনের সাধনা-রিয়াজত ও মুজাহাদার ফলে এখন তাঁর মনে একমাত্র আল্লাহর জন্য জীবন বিসর্জন দেয়া ছাড়া অন্য কোন খেয়াল নেই। আর আত্মঘাতি হামলার জন্য আত্মার এমন পরিশুদ্ধিই কাম্য।

এদিকে ঈগল তাঁর জন্য হামলার আনুষাঙ্গিক আয়োজন সম্পন্ন করে ফেলেছে। বিস্ফোরণের স্থান চিহ্নিত করে তাঁর সকাশে এইমাত্র এসে উপস্থিত হলো সে। তাকে দেখে আবু বকর সাহেব খুশীতে আত্মহারা হয়ে উঠলেন। বললেন, 'বেটা ঈগর! হামলার আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে কি?'

'জি চাচা! সব আয়োজন আল্লাহর ইচ্ছায় সম্পন্ন করেছি–বলল ঈগল–এখন হামলার জন্য পরীক্ষামূলকভাবে আপনার দক্ষতা যাচাইয়ের পরে আজই আপনাকে চূড়ান্ত আঘাত হানতে পাঠানো হবে।'

'আলহামদুলিল্লাহ–বললেন আবু বকর সাহেব– এই কথাটি তোমার মুখ থেকে শোনার জন্য আমি এতদিন ব্যাকুল ছিলাম। তোমার মুখে ফুল-চন্দন পড়ুক! আল্লাহ তোমার কল্যাণ করুন। তোমাকেও তিনি শাহাদাতের মৃত্যুর সৌভাগ্য নসীব করুন। শীঘ্র তুমি আমার দক্ষতা যাচাই করো।'

একশ্বাসে এতগুলো কথা বলে ফেললেন তিনি। শাহাদাত লাভের জন্য তিনি এতই পাগল পা্যা হয়ে উঠেছেন যে, ঈগলের হ্যাঁ সূচক জওয়াব শুনে আর মোটে তর সইছে না তাঁর। পারলে এখনই তিনি হামলা করতে ছুটবেন এমনই তার ভাব। ঈগল তাঁর দক্ষতা নিরীক্ষা করলো। অতঃপর তাকে সাথে নিয়ে হামলার স্থান পরিদর্শন করিয়ে আনলো। এসব বাহ্যিক ট্রেনিং এবং প্রস্তুতির পর চূড়ান্ত সফলতার জন্য সর্বশেষ পড়া হলো দু'রাকাআত সালাতুল হাজত। করা হল মুনাজাত।

রাত এগারোটা। বাগদাদের ফেরদৌস স্কোয়ার অতিক্রম করে যাচ্ছে একটি প্রাইভেটকার। হাল্কা নীল রংয়ের গাড়িটি। গতি খুব দ্রুত। তবে লক্ষ তার নির্ধারিত বিস্ফোরক বোঝাই গাড়িটি চালাচ্ছেন আবু বকর সাহেব। বুকে তার শাহাদাতের নিঃসীম কামনা। মৃত্যুকে জয় করার অসাধ্য সাধনা। চির জীবিতের সনদ পাওয়ার উদ্বেল আশা। অসীম সাহসী এবং বীরত্বে গাড়ির ড্রাইভ করছেন শাহাদাত পিয়াসী এই সাধারণ ইরাকী অধিবাসী। আজ তিনি প্রতিশোধ নিতে ব্যাকুল অস্থির। তাঁর দেশ দখলকারী, পরিবার-পরিজন হত্যাকারী, হাজার হাজার সাধারণ ইরাকী জনগণ–তাঁরই স্বজাতি ভাই-বোন হত্যাকারী, অসংখ্য মসজিদ মাদ্রাসা ধ্বংসকারী ইঙ্গ-মার্কিন হানাদার গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তাঁর এই এ্যাকশন অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি সম্পন্ন করতে চাচ্ছেন। তিনি নিজেকে মানব বোমায় পরিণত করে প্রচন্ড বিস্ফোরণে ফেটে পড়তে যাচ্ছেন। এ মুহূর্তে তিনি নিজেকে অনেক বড় শক্তিশালী মানুষ হিসেবে ভাবছেন; এমন শক্তিশালী যে, মার্কিনীদের সমুদয় সামরিক আয়োজন ভেঙ্গে চূড়ে তছনছ করে দিবে, ইরাক থেকে ওদের নাম চিহ্ন মুছে ফেলবে।

এগারোটা ১০ মিনিটে আবু বকর সাহেবের গাড়ি টার্গেটে আঘাত হানে। টার্গেট ছিল একটি মার্কিন সেনা ছাউনি। ছাউনিতে আঘাত হানার সাথে সাথে প্রচন্ড শব্দ বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণে ছাউনির ছাদ ও এক পাশের দেয়াল উড়ে যায়। ছাউনির বাইরে

কমপক্ষে ৫টি গাড়ি ভস্মিভূত হয়। শত শত মিটার দূরের ভবনগুলো কেঁপে উঠে এবং জানালার কাঁচ ভেঙ্গে যায়। একটি বিধ্বস্ত গাড়ির টুকরো ছিটকে ছাউনির পরবর্তী ভবনের ছাদে গিয়ে পড়ে।

বিস্ফোরণের পর পর মার্কিন সৈন্যরা ৪টি ট্যাঙ্ক, ১০টি হামভি সামরিকযান ও একটি অত্যাধুনিক সামরিক হেলিকপ্টার নিয়ে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছে। ছাউনির ওপর চক্কর দেয়া অবস্থায়ই হেলিকপ্টারের পাইলট সার্চলাইট জ্বেলে দিয়েছে। সে আলোয় সৈন্যরা ধ্বংসস্তূপের মধ্যে অনুসন্ধান চালাতে থাকে। কম করে হলেও ১৫টি লাশ উদ্ধার করে তারা। আহত অবস্থায় উদ্ধার করে ৬০ থেকে ৭০ জনকে।

স্বপ্নপূরণ হলো আবু বকর সাহেবের। শাহাদাতের মধুর সুধা পানে তৃপ্ত হলো তাঁর হৃদয়। পেয়ে গেলেন বিনা হিসেবে জান্নাতে যাওয়ার সার্টিফিকেট। নাম লিখিয়ে নিলেন দেশ প্রেমিক বীর শহীদানের গৌরবময় আসনে। সফল হলো তাঁর মুজাহাদা-মুশাহাদা।

মার্কিন সৈন্যরা তাদের আহত-নিহত সাথীদেরসহ অক্ষত সৈন্যদেরকেও বিধ্বস্ত ছাউনি থেকে সরিয়ে নিয়ে যায় দুর্ঘটনার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। এদিকে বাগদাদের ঈগল আবু বকর সাহেবকে বিদায় জানিয়েই কেবল বসে থাকেনি। বরং দূর থেকে ছায়ার মতো তার হামলার সফলতার প্রতি সূতীক্ষ্ম লক্ষ্য রেখে গাড়িতে চড়ে টহল দিচ্ছিল। হামলার পর এমন একস্থানে সে অবস্থান নিলো, যেখান থেকে অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় অবস্থার মোকাবেলা করা যায়। যখন মার্কিনীরা তাদের সকল সৈন্যকে নিয়ে এলাকা ত্যাগ করল, তখন সে কয়েকজন ইরাকীর সহায়তায় শহীদ আবু বকর সাহেবের ছিন্ন ভিন্ন দেহ টোকিয়ে এক স্থানে জমা করতে লাগলো। অবশ্য সকল অঙ্গ পাওয়া গেল না কুড়িয়ে যা পাওয়া গেল তা নিয়েই রাতারাতি দাফন কাজ সমাধা করে সে চলে গেল নিজের আস্তানায়।

পরেরদিন সন্ধ্যায় শহীদ আবু বকর সাহেবের বাড়িতে এক স্মরণ সভায় আয়োজন করল ঈগল। দাওয়াত করলো আবু বকর সাহেবের আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব, ব্যবসায়ী পার্টনার ও সুহৃদদেরকে। আরও দাওয়াত করল ইরাকে ওসামা বিন লাদেনের প্রতিনিধি জনাব মুসার আল-জারকাবিকে।

যথাসময়ে দাওয়াতী মেহমানগণ এসে উপস্থিত হলেন। ঈগল হাজিরিনে মজলিসের মধ্যে দাঁড়িয়ে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তৃতা শুরু করল, 'সম্মানিত অতিথিবৃন্দ! আপনারা দাওয়াতে সাড়া দিয়ে কষ্ট স্বীকার করে এ মজলিসে উপস্থিত হওয়ায় আপনাদের সকলকে অসংখ্য মোবারকবাদ জানাচ্ছি। আজকের এই মজলিসটি একটি ব্যতিক্রমী মজলিস। কারণ যিনি আপনাদের দাওয়াত করতে বলেছেন আর আপনারা যার দাওয়াতে সাড়া দিয়ে, যার বাড়িতে এসেছেন তিনি আপনাদের মাঝে উপস্থিত নেই; নেই তিনি বাগদাদে এমনকি নেই ইরাকেও।

ঈগলের কথা শুনে মেহমানরা আশ্চার্য হলো। তারা জিজ্ঞেস করল, 'আবু বকর সাহেব তবে কোথায় গেছেন আমাদের দাওয়াত দিয়ে?'

'আমি এজন্যই বলেছি এটি একটি ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান–বলল ঈগল– আপনাদের দাওয়াতদাতা এবং এ বাড়ির মালিক জনাব আবু বকর সাহেব ইরাকে তো নেই, এমনকি তিনি নেই ইরাকের বাহিরে কোথাও অর্থাৎ তিনি দুনিয়ায়ই নেই। তিনি গতরাতে শহীদ হয়ে জান্নাতের সুউচ্চ আলয়ে পৌঁছে গেছেন। আজকের অনুষ্ঠান তাঁর শহীদ হওয়ার পূর্বক্ষণের সর্বশেষ ইচ্ছা বিধায় আপনাদের ডেকে আমি কষ্ট দিচ্ছি এই অসময়ে।'

ঈগলের এ কথা শুনে পুরো মজলিসের সকল অতিথি একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে গেল। শোকের নিদারুণ কালো ছায়া ঘিরে ফেলল সকলের অন্তর অবয়ব। অনেকের চোখেই দেখা দিল বেদনার অশ্রুজল। কেউ কেউ উচ্চস্বরেই কেঁদে ফেলল। কিছু সময় কেটে গেল এভাবেই। ঈগল পুনরায় আবার বলল, 'হে সম্মানিত অতিথিবৃন্দ! আপনারা জনাব আবু বকর সাহেবের শাহাদাতের সংবাদ শুনে খুবই মর্মাহত এবং তাঁর শাহাদাত স্মরণে এমন জাক-জমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের বিষয়টিও আপনাদের কাছে অভিনব মনে হচ্ছে, তাইনা! অথচ একটু তাকিয়ে দেখুন আমাদের প্রতিবেশী ফিলিস্তিনের দিকে। 'ফিলিস্তিনীদের মাঝে এ জাতীয় অনুষ্ঠান-সভা-সম্মেলন আজ প্রায় প্রতিদিনই সংঘটিত হচ্ছে। তাদের কোন সৌভাগ্যবান সন্তান ইয়াহুদী হত্যায় আত্মঘাতি বোমা বিস্ফোরণে যখনই সফলকাম হয়, তখনই পিতামাতা তার শাহাদাত বরণের আনন্দে এবং জান্নাতী হুরদের সাথে স্বীয় সন্তানের মিলনের খুশীতে আনন্দিত হয়ে অলিমার ন্যায় আনন্দ ঘন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সাধারণত তারা এভাবে নিমন্ত্রণ পত্র ছাপিয়ে থাকে–"জাওয়াদ ইব্রাহীম সা'আদাতের পরিবার স্বীয় সন্তান হাফিয সা'দাতের শাহাদাতবরণ স্মরণ সভার আনন্দঘন মুহূর্তে আপনার উপস্থিতিকে নিজেদের জন্য আনন্দ ও গর্বের বিষয় মনে করবে।"

তারা বাড়িতে সামিয়ানা খাটায়, বাড়িটি আলোকমালায় সাজায়। আমন্ত্রিতদের ধন্যবাদ জ্ঞাপনে গোটা পরিবেশ মুখরিত হয়ে ওঠে। উন্নতমানের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়। বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগণ সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। শহীদের বিদায় বেলার পয়গাম হাজিরিনে মজলিসের সামনে তুলে ধরাহয়। মজলিসে শাহাদাত পিয়াসীর অভিযানের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো আলোচিত হয়। শাহাদাতের ফজীলত উপলক্ষ্যে ঈমানদীপ্ত বক্তৃতা পেশ করা হয়। হঠাৎ দেখলে কারো মনে হবে, যেন এ কোন বিবাহ অনুষ্ঠান। শহীদের মাতা-পিতা সেকি আনন্দ ভরে স্বজনদের সঙ্গে মিলিত হন। আর দীপ্ত চেহারায় হাসিমাখা মুখে বরণ করে নেন তাদের দেয়া মারহাবা ও মোবারকবাদ। যেন আজ তাদের ঘরে এক নব বর-বধুর মিলন উৎসব। আত্মঘাতি বোমা বিস্ফোরণের সাফল্যে হিরোর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছে তাদের ছেলে আজ। তার পরিবারের শির সবার চেয়ে উঁচু আজ। শহীদ পরিবারটি যেন এলাকার সকলের মাথার তাজ।'

হে ইরাকী ভাইয়েরা! আমাদের গর্ব শহীদ আবু বকর সাহেব এমন একজন সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি, যার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা সকলে শাহাদাতের অমীয় সূধা পানে ধন্য। তাই আমার মনে বার বার এই চিন্তা জাগ্রত হতে লাগলো, এমন একটি পরিবারের শহীদদের

স্মরণে জাক-জমকপূর্ণ একটি স্মরণ সভা হওয়া দরকার। যাতে করে শহীদদের পয়গাম সকলের নিকট পৌঁছানো যায়। সে জন্য আমি ফিলিস্তিনী ভাইদের অনুকরণে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করলাম।

এরপর ঈগল শহীদ হাদীদ কামালের শেষ পয়গাম। শহীদ সুমাইয়া আফরোজের স্বপ্নের মাধ্যমে দেয়া পয়গাম এবং শহীদ আবু বকর সাহেবের শহীদি মৃত্যুর জন্য সাধনা-মুজাহাদা ও তাঁর শেষ পয়গাম সবিস্তারে বর্ণনা করল। অতঃপর বলল, 'এমন একটা অনুষ্ঠান করতে আবু বকর সাহেবের থেকেও অনুমতি নিয়ে রেখেছি আমি। এ অনুষ্ঠানে আমি আপনাদেরকে আর একটি সুসংবাদ দিতে চাচ্ছি, তাহল, আজকে আপনাদের শাহাদাতের ফজিলত সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনাবেন এমন একজন ব্যক্তিত্ব, ইরাকে যার অস্থির মার্কিন হানাদারদের জন্য এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। যাকে গ্রেফতার করতে দখলদাররা মরিয়া হয়ে উঠেছে। তিনি হলেন মুসলিম জাতির জাতীয় বীর শায়খ ওসামান বিন লাদেনের বিশেষ প্রতিনিধি জনাব মুসাব আল-জারকাবি।'

বিশিষ্ট মুজাহিদ নেতা মুসাব আল-জারকাবি শাহাদাতের ফাজায়েল সম্পর্কে আলোচনা শুরু করলেন। তিনি বলে চললেন, 'শাহাদাত এমন এক মর্যাদা সম্পন্ন নিয়ামত যা লাভ করা মহা সৌভাগ্যের বিষয়। কেননা আল্লাহ তা'আলার নিকট শহীদদের গুরুত্ব ও মর্যাদা সীমাহীন। তাদের মর্যাদার সাথে অন্য কারো তুলনা হয়না। যেমন–হযরত সামুরা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমি আজ রাতে স্বপ্নে দেখলাম, দু'জন লোক আমার নিকট এল এবং আমাকে নিয়ে একটি গাছে উঠালো। তারপর আমাকে এমন এক সুন্দর উৎকৃষ্ট একটি ঘরে প্রবেশ করিয়ে দিল যে, এর আগে আমি কখনো এর চাইতে সুন্দর ঘর দেখিনি। সে দু'ব্যক্তি আমাকে বলল, এ ঘরটি হচ্ছে শহীদদের ভবন।–সহীহ বুখারী, পৃষ্ঠা ঃ ১৮৫ খন্ড ঃ ১ এবং পৃষ্ঠা ঃ ৩৯১ খন্ডঃ ১

প্রিয়নবী (সাঃ) মেরাজেও দেখেছিলেন জান্নাতে শহীদদের জন্য নির্মিত কারুকার্যখচিত চোখ-জুড়ানো ভবনসমূহ। প্রিয়নবী (সাঃ) অবিভূত হয়েছিলেন সেইসব আলীশান ভবন দেখে। শহীদদের জন্য এইরূপ অভাবিত পূর্ব ও কল্পনাতীত সুন্দর প্রতিদানে পুরস্কৃত করার কারণ হল, শহীদরা শত্রুর মোকাবেলায় যুদ্ধ লড়ে অকুণ্ঠচিত্তে। নিজের জীবন আল্লাহ'র নিকট তুলে দেয়। সে তার জীবনের সবচেয়ে দামী জিনিসটি আল্লাহ'র জন্য বিলিয়ে দেয়। তাই আল্লাহ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে তাকে শ্রেষ্ঠ মর্যাদা ও উঁচু স্তরের পুরস্কারদানে সুখী করেন। সে সিক্ত হয় আল্লাহ'র ক্ষমা ও নিঃসীম করুণায়, যা পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হয়েছে এভাবে–যদি তোমরা আল্লাহ'র পথে নিহত হও বা মৃত্যুবরণ কর, তাহলে তারা যা জমা করে, আল্লাহ'র ক্ষমা ও দয়া অবশ্যই তা অপেক্ষা উত্তম। (আল-ইমরান ঃ ১৫৭)

তবে শহীদদের বিশেষ ফজিলত হল শাহাদাত লাভের পরও আল্লাহ্ তাদের আমলনামা বন্ধ করেন না। ফিরিশতারা কিয়ামত পর্যন্ত তাদের আমলনামায় জিহাদের ওসয়াব লিখতে থাকে।

সে কথাই পবিত্র কুরআনে এভাবে বলা হয়েছে–যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, আল্লাহ কখনই তাদের কর্ম বিনষ্ট করবেন না। –মুহাম্মদ ঃ ৪ আয়াত-১

উপরন্তু শহীদদের মর্যাদার প্রতি লক্ষ রেখে বলা হয়েছে–যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদেরকে মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বোঝনা।–বাকারা ঃ ১৫৪

শহীদদেরকে শুধু 'মৃত্যু' বলতেই বারণ করা হয়নি, মৃত ভাবতেও নিষেধ করা হয়েছে। শহীদ এক মহান উদ্দেশ্য–ইসলামের প্রতিষ্ঠাও বিজয়ের লক্ষ্যে জীবনবাজি রেখে যুদ্ধ করে। তাই তারা মৃত নয় অমর। কেননা তারা জীবন দিয়ে ইসলামকে জীবিত করে। ইসলাম যতদিন থাকবে, ততদিন তাদের মৃত বলা যাবেনা ভুলেও।

একথা পবিত্র কুরআনে অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে–আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়, তাদেরকে তুমি কখনো মৃত মনে কর না; বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত।–আলে ইমরান ঃ ১৬০

শহীদদের এই উঁচু মর্যাদা ও অধিক সম্মানে অভিসিক্ত করার কারণ হল, আল্লাহর জন্য তাদের নিঃস্বার্থ জীবনদান। উপরন্তু তারা পালন করেছে শ্রেষ্ঠ আমল-উত্তম জিহাদ।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে, উত্তম জিহাদ আবার কি? প্রিয়নবী (সাঃ)-এর হাদীসেই রয়েছে এর স্পষ্ট জবাব। যেমন–হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, এক ব্যক্তি প্রশ্ন করে, হে আল্লাহর রাসূল। সবচেয়ে উত্তম জিহাদ কোনটি? প্রিয়নবী (সাঃ) তাকে বললেন, উত্তম জিহাদ হল যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর আঘাতে তোমার ঘোড়ার পা কর্তিত হওয়া এবং তোমার শরীর থেকে রক্ত প্রবাহিত হওয়া। (অর্থাৎ সম্মুখ যুদ্ধে শাহাদাতবরণ)–ইবনে হাব্বান, ইবনে মাজাহ, (আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব পৃষ্ঠা ঃ ৪৩৮, খন্ড ঃ ২)

এর দ্বারা বুঝা যায়, আমলের মধ্যে উত্তম হল জিহাদ আর জিহাদের মধ্যে উত্তম ও শ্রেষ্ঠতম স্তর হল শাহাদাতবরণ। তাই শহীদদের ফজীলত সম্পর্কে হাদীসে ব্যাপক আলোচনা করা হয়েছে, তাদের মর্যাদা ও পুরস্কার প্রাপ্তিকে নিশ্চিত ও সন্দেহমুক্ত করা হয়েছে। এ সম্পর্কে আরো কয়েকখানা হাদীস আপনাদের সম্মুখে পেশ করা হচ্ছে–

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ বলেন, আব্দুল্লাহ বিন আমের বিন হারাম (রাযিঃ) অহুদের দিন শাহাদাতবরণ করলে প্রিয়নবী (সাঃ) বললেন, হে জাবের! আমি কি বলবনা, তোমার (শাহাদাতবরণকারী) পিতাকে আল্লাহ তায়ালা কি বলেছেন? আমি বললাম, অবশ্যই বলুন। অতঃপর প্রিয়নবী (সাঃ) তাকে বললেন, "আল্লাহ তায়ালা পর্দার আড়াল ব্যতীত কারো সাথে সরাসরি কথা বলেন না। কিন্তু তোমার পিতার সাথে তিনি সামনাসামনি কথা বলেছেন।"

–তিরমিযির বরাতে আত-তারগীব আয়াত-তারহীব, পৃষ্ঠা ঃ ৪৩৭, খন্ড ঃ ২

আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, শাহাদাতবরণকারীরা তিন প্রকার–

এক. সেই লোক, যে তার জীবন ও ধন-সম্পদসহ আল্লাহর পথে জিহাদে যোগদান করেছে। কিন্তু যুদ্ধ করাও শহীদ হওয়ার নিয়্যাত তার ছিল না। সে জিহাদে যোগদান করেছিল মুজাহিদ কাফেলার অবয়ব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে। অতঃপর এই লোক যদি ঐ সময় মৃত্যুবরণ করে বা শত্রুর আঘাতে নিহত হয়, তবে তার সকল পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে। কবর আযাব থেকেও সে মুক্তি পাবে। বিভিষীকাময় কেয়ামতের দিনেও সে বিন্দুমাত্র ভয় পাবেনা। ডাগরচোখা হুরদেরকে তার সাথে বিয়ে দেয়া হবে। ইজ্জতের পোষাক পড়িয়ে তাকে সম্মানিত করা হবে। জান্নাতেও তার মাথায় সর্বক্ষণ আভিজাত্যের বিশেষ মুকুট শোভা পাবে।

দুই. যে ব্যক্তি ধন-সম্পদ ও জীবন নিয়ে জিহাদে অবতীর্ণ হয়েছে–তার নিয়্যাত সওয়াবপ্রাপ্তির। তবে সে কাফের মারতে চেয়েছে, নিজে মরতে চায়নি। তারপর এই লোক যদি মৃত্যুবরণ করে বা শত্রুর আঘাতে নিহত হয় তবে তার অবস্থান হবে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সাথে। মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তা'য়ালা কেয়ামতের দিন হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর জন্য উত্তম ফয়সালা করবেন, তারও ফয়সালা হবে সেই ধরনের।

তিন. ওই ব্যক্তি, যে আপন ধন-সম্পদ ও জীবনসহ সওয়াবের নিয়্যাতে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তার নিয়ত হল শত্রুকে হত্যা করবে এবং নিজেও নিহত হবে। অতঃপর সে যদি মৃত্যুবরণ করে বা শত্রুর আঘাতে নিহত হয়, তবে সে কিয়ামতের দিন উন্মুক্ত তরবারী কাঁধে তুলে সামনে এগিয়ে আসবে। অথচ তখন অন্যসব মানুষ বিদিশা অবস্থায় পথে পথে পরে থাকবে, সে তখন হুংকার ছেড়ে তাদেরকে বলবে, তোমরা আমাকে সামনে থেকে পথ ছেড়ে দাও। আমি তো আমার পরম প্রিয় মাবুদের সন্তুষ্টির জন্য কুরবানী দিয়েছি জীবন ও ধন-সম্পদ।

প্রিয়নবী (সাঃ)-এ প্রসঙ্গে বলেন, যে মহান সত্তার অধিকারে আমার জীবন, তাঁর শপথ করে বলছি, ওই লোক যদি সেদিন একথা কোন নবীকে এমনকি হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কেও বলে, তবে তাঁরাও তাকে পথ করে দিবে। কেননা, তার এ দাবী সত্যও সঠিক। এরপর যেস আরশের নীচে নূরের তৈরী সিঁড়ির উপর গিয়ে বসবে। সেখানে বসে দেখবে, কিভাবে মানুষের বিচার হচ্ছে।

মৃত্যুকষ্ট, কবরের আযাব ও হাশরের বিভীষিকা তাকে বিচলিত করবে না বিন্দুমাত্র। তাকে হিসাব-নিকাশের মুখোমুখি হতে হবে না। মিজান ও পুলসিরাতের ঝামেলা তাকে পোহাতে হবে না। সে আরমের নীচে সুশীতল ছায়ায় বসে দেখবে কিভাবে লোকদের হিসাব নেয়া হবে, বিচার করা হবে। সে যা চাইবে, তৎক্ষণাৎ তা তাকে সরবরাহ করা

হবে। যার মুক্তির জন্য সুপারিশ করবে, তাকে তৎক্ষণাৎ মুক্তি দেয়া হবে। জান্নাতে যা সে চাইবে, তা-ই পাবে। যখন যে মহল ও ভবন কামনা করবে, তৎক্ষণাৎ সেটি বরাদ্দ দেয়া হবে।-(বাযযায, বায়হাকী)

নাঈম ইবনে হুমার (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূল (সাঃ) এর নিকট জানতে চায়, শহীদদের মধ্যে কার মর্যাদা বেশী? নবীজী (সাঃ) বললেন, সেই শহীদের মর্যাদা সবচেয়ে বেশী, যে সারিতে দাঁড়িয়ে লড়াই করে এবং ডানে-বায়ে মুখ ফিরে তাকায় না। এভাবে লড়াই করতে করতে শত্রুর হাতে নিহত হয়। এরাই তারা, যারা জান্নাতে সুউচ্চ কক্ষে ঘুরে বেড়াবে এবং তাদের রব তাদের দেখে হাসবেন। আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, পৃষ্ঠা ঃ ৪৪২, খন্ড ঃ ২

সম্মানিত উপস্থিতি বৃন্দ! শাহাদাতের এই নিঃসীম মর্যাদা ও সুউচ্চ সম্মানের কারণে স্বয়ং প্রিয় রাসূল (সাঃ) পর্যন্ত বার বার শহীদ হওয়ার তামান্না ব্যক্ত করতেন। সাহাবায়ে কেরাম শাহাদাতের মৃত্যুর জন্য উন্মুখ হয়ে জিহাদের ময়দানে ছুটে যেতেন। সে যুগের ছোট ছোট মাসুম বাচ্চারাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে যুদ্ধের ময়দানে ছুটে যেতো। তাদের পিতা-মাতারাও আপন সন্তানদেরকে যুদ্ধের সাজে সাজিয়ে দিতো আনন্দ চিত্তে।

'কিন্তু আজকের মুসলমানদের হল কি? এ যুগের পিতা-মাতারা তাদের সন্তানদেরকে এমনভাবে লালন-পালন করছে, মুরগী যেভাবে নিজের বাচ্চাদের লালন-পালন করে বড় বানায় আর ক'দিন পর মানুষ তাদের রান্না করে খেয়ে ফেলে। তেমনি আজ আমাদের মুসলমানরাও তাদের সন্তানদেরকে কাফির-মুশরিকদের মোকাবেলায় এমন নিরীহ এবং ভীতুরূপে গড়ে তোলে যে, নিজেদের ঈমান-ঐতিহ্য, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের উপর আঘাত আসলেও তারা শত্রুর মোকাবেলায় বেড়িয়ে আসতে সাহস পায় না। যার ফলে আজ কাফিররা মুসলমানদের রক্তে হোলি খেলছে, তামাশা করছে মুসলিম মা-বোনদের ইজ্জত আব্রুর সাথে। ধ্বংস করছে মুসলমানদের ঘর-বাড়ি, মসজিদ-মাদ্রাসা ও স্থাপনাসমূহ। বেশীদূরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, ইরাকের কথাই একটু চিন্তা করুন আপনারা, আজ ইঙ্গ-মার্কিন হানাদার বর্বর বাহিনী কেমন নিষ্ঠুর আচরণ করছে ইরাকীদের সাথে, আপনার আমার ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজদের সাথে?

আজ যাদের স্মরণে এই অনুষ্ঠান, তাদের কথা একটু চিন্তা করুন তো! শহীদ আবু বকর সাহেবের স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের নিয়ে কি একটা সাজানো-গোছানো সংসার ছিল না এই বাড়িতে? কিন্তু কেন আজ বিরান এই বাড়ি? কেন আজ এ বাড়ির প্রতিটি বস্তু স্বজন হারানোর ব্যথায় হাহাকার আর মাতম করছে?

'আমার মুসলিম ভাইয়েরা! দুঃখের বিষয় হল, নিজেরা পরিস্থিতির শিকার না হওয়া পর্যন্ত আমাদের হুঁশ হয়না। আমাদের জিহাদের ফযীলত ও বিধি-বিধানের কথাও তখন স্মরণ আসে, যখন কাফিররা আমাদের উপর আক্রমণ চালিয়ে পাশবিকতার চূড়ান্ত পর্যায় পৌঁছে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা নিজেরা আপদমুক্ত থাকি, যতক্ষণ পর্যন্ত নিজেদের

ঘরের আগুন না লাগে, ততক্ষণ একেবারে পার্শ্বের ঘরটির দাউ দাউ করে প্রজ্বলিত আগুনের লেলিহান শিখার তাপও গা স্পর্শ করে না। আজ যারা দখলদারদের প্রতিরোধ না করে ঘরে বসে আছেন, আল্লাহ্ না করুন, কাল যদি পরিস্থিতি পাল্টে যায় আর শহীদ আবু বকর সাহেবের পরিবারের মত তাদের উপর বিভীষিকা নেমে আসে, তখন কি তারা জিহাদ না করে প্রতিরোধ না করে বসে থাকতে পারবেন? এ কারণে ইরাকের প্রতিটি নাগরিকের উচিত, পরিস্থিতির শিকার হওয়ার আগেই সতর্ক ও প্রস্তুত হয়ে যাওয়া। আগুন নিজের ঘরে লাগার আগেই নিভিয়ে ফেলা। আর ইরাকের বাইরের মুসলমানদের উচিত, ইরাকের সমস্যাকে ইসলাম ও মুসলমানদের তথা নিজেদের সমস্যা মনে করে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ইঙ্গ-মার্কিন হানাদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ছুটে আসা। শহীদী মৃত্যু হাসিলের এই মওকা হাতছাড়া না করা। আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলকে দখলদারদের বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি-সাহস ও তৌফিক দান করুন এবং শাহাদাতের সৌভাগ্যের মৃত্যুবরণ করে বিনা হিসাব-নিকাশে চিরস্থায়ী জান্নাতের অধিকারী হওয়ার মহাসৌভাগ্য নসীব করুন। আমীন!"

বিশিষ্ট মুজাহিদ জনাব মুসাব আল-জারকাবি সাহেব তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন। উপস্থিত মেহমানবৃন্দের চোখে মুখে দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রচন্ড ঘৃণা ফুটে উঠল। অনেকেই শাহাদাতের মৃত্যুর জন্য আত্মঘাতি হামলায় অংশগ্রহণ করতে নাম লেখালো। ঈগল তাদের নাম তালিকাভুক্ত করে নিল। অতঃপর দাওয়াতী মহেমানরা পানাহার পর্ব সেরে একে একে বিদায় নিয়ে চলে গেলো। জনাব জারকারি সাহেবও ঈগলের সাথে জরুরী কথাবার্তা সেরে চলে গেলেন আপন গন্তব্যপানে।

* * *

তিকরিত। দজলা নদীর তীরে একটি ছোট শহর। আল-ওজা তিকরিতের একটি গ্রাম। হুসেন আল মজিদ এই গ্রামেরই এক বাসিন্দা পেশায় ভূমিহীন চাষী। সুবাহ তুলফাত আল মুসলাহ্ আল মজিদের স্ত্রী। মাটির কুড়ে ঘরে স্বামী-স্ত্রীর মোটামুটি সুখেই দিন গুজরান হচ্ছিল। হঠাৎ একদিন অসুস্থ হয়ে মারা যান আল-মজিদ। সুবাহ তুলফাত তখন চার মাসের গর্ভবর্তী। ১৯৩৭ সালের ২৮ এপ্রিল সুবাহ্ প্রসব করেন ফুটফুটে সুন্দর একটি ছেলে। ছেলেটির নাম রাখা হয় 'সাদ্দাম হোসেন।'

জন্মের ছয়মাস পূর্বে পিতা মারা যাওয়ায় শৈশবে সাদ্দাম ছিলেন পিতৃহীন, সহায়-সম্বলহীন এক অনাথ রাখাল বালক। কালক্রমে এই অনাথ বালকই ১৯৭৯ সালের ১৬ জুলাই ৪২ বছর বয়সে হয়ে গেলেন ইরাকের প্রেসিডেন্ট।

বহু ঘাত-প্রতিঘাতের সাথে মোকাবেলা করে সাদ্দাম হোসেন জীবন যুদ্ধে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর তিনি এক প্রকার বেপরোয়া হয়ে ওঠেন। সুন্নী মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও ইসলামিক জ্ঞান না থাকার কারণে একের পর এক ধর্মদ্রোহী কর্মকান্ড করতে থাকেন প্রকাশ্যভাবে; যা এ বইয়ে ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। আসলে

একটি তিক্ত সত্য হচ্ছে, ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দামের সাথে প্রাচীন মিশরের প্রেসিডেন্ট ফেরাউনের অনেকটা সাদৃশ্যতা খুঁজে পাওয়া যায়। সাদ্দামের মতো ফেরাউনও শৈশবে দরিদ্র কৃষক-পরিবারের সন্তান ছিল। রুটি-রুজির সন্ধানে গ্রামাঞ্চল থেকে শহরে এসে কুলি-মজুরের কাজ করত। কালক্রমে সেও সাদ্দামের মত একদিন গোটা মিশর সম্রাজ্যের অধিপতি-প্রেসিডেন্ট হয়ে যায়। কিন্তু সাধারণ কুলি থেকে মিশরের সম্রাট হয়েও তার বড় হওয়ার খায়েশ মিটল না। এক সময় সারা দেশময় ঘোষণা দিয়ে দিল "আনা রাব্বুকুমুল আ'লা" অর্থাৎ আমিই বড় খোদা। সকলকে আমার ইবাদত করতে হবে।' ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন যদিও প্রকাশ্য "আনা রাব্বুকুমুল আ'লা" বলে ঘোষনা দেননি, কিন্তু কাজে-কর্মে তার কিছু বাকীও রাখেননি তিনি।

বাগদাদের এই প্রতাপশালী প্রেসিডেন্ট ২০ মার্চের শুরু হওয়া যুদ্ধে হানাদার বাহিনীর অবিরাম গোলাবর্ষণের মুখে ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য হন। সভাসদ-পরিষদ, সৈন্য-সামন্ত, পাত্র-মিত্র, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, বাংলো-প্রাসাদ সব ছেড়ে রাতের অন্ধকারে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেন। শত্রুর হাতে গ্রেফতার এড়াতে একস্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়াতে থাকেন।

ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস! যেই ইরাকী প্রেসিডেন্টের ভয়ে সারা দেশের মানুষ থর থর করে কাপত। যার অঙ্গুলী হেলনে যে কেউ মুহূর্তের মধ্যে গ্রেফতার হয়ে যেতো; অপরাধী-নিরপরাধী নির্বিশেষে ফাসির কাষ্ঠে ঝুলে যেত। যার চোখে ইশারায় হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ ফৌজ উঠ-বস করত। যার হুকুম তামীল করার জন্য অসংখ্য গোলাম-বাদী সদা দন্ডায়মান থাকত। যে নিজেকে প্রকাশ করার জন্য, নিজের পরিচিতি, আমিত্ব-বড়ত্ব ফুটিয়ে তোলার জন্য শহরের মোড়ে-বিভিন্ন স্কোয়াড়ে নিজের প্রতিকৃতি-মূর্তি স্থাপন করিয়েছিলেন। তিনি আজ গ্রেফতার এড়ানোর জন্য মানুষের থেকে আড়ালে লুকাচ্ছেন, আত্মগোপন করছেন; কেউ যাতে তাকে না চিনতে পারে সে জন্য নিজের পোষাক-পরিচ্ছদসহ পরিচিতির সকল আলামত বদলে ফেলেছেন। কেউ আর এখন তার কথায় নাচে না, তার ভয়ে কাপে না।

হায়রে মানুষ! হায়রে আত্মভোলা ইনসান! কি লাভ তবে ক্ষমতার দাপটে অন্ধ হয়ে যাওয়ায়! প্রেসিডেন্ট সাদ্দামের কি লাভ হল ইসলামের সাথে বৈরীতা করে আর কুফরের সাথে বন্ধুত্ব করে? আসল সত্য তো এটাই, আমেরিকার যতদিন প্রয়োজন হয়েছিল ততদিন তাঁর সাথে বন্ধুত্বের ভান করে ইসলাম ও মুসলমানদের সর্বনাশ ঘটিয়েছে তার মাধ্যমে। আর যখন তাদের প্রয়োজন মিটে গেছে তখন ব্যবহৃত টিস্যুর মতই ছুড়ে ফেলে দিয়েছে; এমন কি এখন পৃথিবী নামক গৃহে সাদ্দামের অস্থিত্বই তাদের জন্য অস্বস্তিকর। সে জন্য আমেরিকার সৈন্যরা হন্যে হয়ে খুঁজছে তাকে।

* * *

ঈগল যেন উড়াল দিয়ে ঢুকলো বাড়িটির মধ্যে। মাত্র ১০-১৫ সেকেন্ডের ব্যবধানে মার্কিন সৈন্যদের হাতে ধরা পড়া থেকে বেঁচে গেলো সে। ঈগলকে ধাওয়া করতে আসা সৈন্যরা মোড় ঘুরে সোজা ডান দিকে চলে গেলো। তাদের ধারণামতে ঈগল এদিকেই পালিয়েছে। সে যে মোঁড়ের বাম পাশের বাড়িতে ঢুকে পড়েছে তা তাদের অজানা।

যে বাড়িতে ঢুকলো ঈগল, এ বাড়িটি মার্কিন সৈন্যদের ঘাটি থেকে প্রায় দু'কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। একতলা বিল্ডিংয়ের গেট করা বাড়ি। ঘরের সামনে সুন্দর একটি ফুল বাগান। বাগানে নানা জাতের বিভিন্ন রংয়ে ফুল ফুটে আছে। বাড়ির সাজ-গোজ, শান শওকত দেখে মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই বাড়িটি কোন অভিজাত ইরাকীর। এ বাড়ি পর্যন্ত এতখানি পথ ঈগলকে আসতে হয়েছে দৌড়িয়ে। সেতো দৌড় নয় যেন উড়ে আসা। এটাও ঈগলের একটা বিশেষত্ব যে, দৌড়ে তাঁকে হারায় এমন কেউ সম্ভবত বর্তমান বিশ্বে নেই; সে যদি বিশ্ব অলম্পিকে দৌড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করত, তবে নিঃসন্দেহে চ্যাম্পিয়ন হয়ে স্বর্ণ মেডেল লাভ করতে পারতো। মার্কিন সৈন্যরা প্রথমে গাড়ি নিয়েই ধাওয়া করছি করছিল তাঁকে। প্রায় অর্ধ কিলো দৌড়ালো সে দ্রুতগামী গাড়ির সম্মুখে। অতঃপর এমন একটা রাস্তা ধরল, যেটা ছিল আবাসিক এলাকার সরু রাস্তা। এই রাস্তায় বড় গাড়ি চলাচল ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। হোন্ডা, রিক্সা এবং প্রাইভেট স্কুটার ছাড়া অন্য গাড়ি যাতে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য রাস্তার ঠিক মাঝখানে চার ফুট লম্বা, এক ফুট চওড়া একটি পিলার গাড়া ছিল। এখানে এসে সৈন্যরা গাড়ি থামিয়ে ঈগলের পিছনে দৌঁড়াতে লাগল। ঈগলের সাথে দৌড়িয়ে কিছুতেই পারছিল না সৈন্যরা। দৌড়াতে দৌড়াতে ঈগল এল সাইজের বড় একটা মোড় ঘুরে বাম পাশের গেট করা বাড়ির গেট টপকিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল। সৈন্যরা তা না দেখে সামনের দিকে দৌড়াতে লাগলো। ঈগল বাড়ির ভিতর থেকে ওদের বুটের আওয়াজ শুনতে পেলো। বুঝলো যে ওরা সামনে যাচ্ছে। সে গেটের পাশেই বসে ঘন শ্বাস টেনে ক্লান্তি দূর করতে লাগলো।

সৈন্যরা আরো বেশ সামনে দৌড়িয়ে যখন দেখলো ঈগলের কোন চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না, তখন তারা দাঁড়িয়ে পরস্পর বলাবলি করতে লাগল, সন্ত্রাসীটার তো কোন চিহ্নই দেখছিনা, অযথা আর দৌড়িয়ে কি লাভ। তার চেয়ে বরং চলো ফিরে যাই।' একথা বলে ঈগলকে ধরতে আসা সৈনিকরা ব্যর্থ মনোরথে ফিরে গেলো।

ঈগল রুকাইয়ার অভিযানে সংগৃহীত অশ্লীল সাহিত্য-ম্যাগাজিন এবং পর্ণো সিডির চালানটি মার্কিনীদের হাতে পৌছানোর জন্য ছদ্মবেশ ধারণ করে বাগদাদের মার্কিনী সেনা দপ্তরে আসলো। সেনা ঘাটির প্রহরী সৈনিকদের একজন তাঁর পরিচয় জানতে চাইলো। ঈগল তার কাছে নিজেকে মার্কিনীদের সহযোগী-দালাল হিসেবে পরিচয় দিল। সৈনিকটি বলল, তুমি যে আমাদের লোক তার প্রমাণ কি? আমি কি করে বুঝব তুমি আমাকে ধোকা দিচ্ছো না?'

ঈগল বুঝলো যে, বেটা খুব সতর্ক চীজ। তবে এমন সতর্ক চীজদেরকে ধোকা দিয়ে বোকা বানানোর বন্দোবস্ত তার করা আছে। সে পকেট থেকে একটি গ্রীন কার্ড বের করে দেখালো; যে কার্ড একমাত্র বড় মাপের দালালদেরকেই প্রদান করা হয়। কার্ড দেখে প্রহরী সৈনিক অনেকটা নিশ্চিত হল, তবুও ভিতরে প্রবেশ করতে দিল না। জিজ্ঞেস করলো, 'ইরাকী অনুগত সৈন্যদের কেউ তোমাকে চিনে কি?'

ঈগল তিন-চারজন সৈন্যর নাম বলল, এরা তাঁকে চিনে প্রহরী সৈনিক তাঁকে দাঁড় করিয়ে রেখে তার বলা নামের সৈনিকদের ডেকে আনতে গেলো। অল্প সময়ের মধ্যেই তাবেদার ইরাকী ন্যাশনাল গার্ডের ২জন সৈনিককে ডেকে আনলো প্রহরী। সৈনিক আঃ মালেক ও কমান্ডার আহমদ ছাদেক এসে ঈগলকে দেখেই মুচকি হাস দিলেন। অতঃপর মুছাফেহার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলে ঈগল ও অনুরূপ মুচকি হাসি দিয়ে তাদের প্রতি হাত বাড়িয়ে মুছাফেহা করল। প্রহরী সৈনিক তাঁদের হাসির মর্ম বুঝতে সক্ষম হল না। সে জিজ্ঞেস করল কমান্ডার আহমদ ছাদেককে, আপনি একে চিনেন কি কমান্ডার সাহেব?

কমান্ডার সাদেক বললেন, 'চিনবো না মানে! এতো আমাদের অত্যন্ত ঘনিষ্ট সুহৃদ। বাগদাদে এর চেয়ে উপকারী বন্ধু আমাদের দ্বিতীয়টি নেই।'

কমান্ডারের উত্তর শুনে প্রহরী সৈনিক চমকে উঠল। সে ভাবলো এ লোক আমাদের এত বড় সুভাকাংখী, আর সে গ্রীন কার্ড দেখানোর পরেও তাঁকে আমি ভিতরে প্রবেশ করতে দেইনি। সে যদি ভিতরে গিয়ে মেজর সাহেবের কাছে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করে, তবে তো আমাকে শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে; তার চেয়ে এখনই এর থেকে ক্ষমা চেয়ে নেই। অতঃপর ঈগলকে লক্ষ্য করে বলল, জনাব! আপনাকে আমি চিনতে পারিনি বলে এখানে দাঁড় করিয়ে রেখে কষ্ট দিয়েছি। আপনি আমাকে ক্ষমা করুন! আমার বিরুদ্ধে মেজর সাহেবের নিকট অভিযোগ দায়ের করবেন না।'

'তুমি যা করেছো তা কর্তব্যের খাতিরে করেছো'–বলল ঈগল–এ জন্য আমি কারো নিকট অভিযোগ তুলতে যাবো না। তবে শুন হে প্রহরী! তোমরা আসলেই বোকা। এখনও তোমরা শত্রু-মিত্র চিহ্নিত করতে পার না।' এই বলে ঈগল কমান্ডার আহমদ ছাদেক ও সৈনিক আঃ মালেকের সাথে ভিতরে চলে গেলো। আর প্রহরী সৈনিক অপরাধীর মতো মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো।

ভিতরে প্রবেশ করে ন্যাশনাল গার্ডের দু'সদস্য ঈগলের থেকে পৃথক হয়ে গেলেন। এই দু'জনসহ আরো বেশ কিছু সংখ্যক সৈন্য ন্যাশনাল গার্ড বাহিনীর সদস্যরূপে এই সেনা সদর দপ্তরে আছেন, যারা বাহ্যিকভাবে মার্কিনীদের অনুগত্য মেনে নিলেও প্রকৃত পক্ষে তাঁরা দেশ মুক্তির জিহাদে তথ্য সংগ্রহ এবং গেড়িলাদের সাহায্য করার উদ্দেশে মার্কিন বাহিনীর সাথে কাজ করছেন। ঈগলের থেকে তারা পৃথক হয়েছেন এজন্য, যাতে ঈগলের অভিযানের পরে তাদেরকে কেউ সন্দেহ করতে না পারে। ঈগলের সাথে তাদের

সম্পর্কের কথা এখানে জানে শুধু প্রহরী সৈনিক; তবে তার মুখ বন্ধ করার ব্যবস্থা ঈগলই করে যাবে।

ঈগল সরাসরি গিয়ে সদর দপ্তরের কার্যালয়ে প্রবেশ করল। সেখানে তখন বাগদাদের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। তারা এমন গভীর আলোচনায় মত্ত ছিল যে, ঈগলের প্রবেশ কেউ লক্ষই করেনি। ঈগল ছিট খালি দেখে একস্থানে বসে পড়ল। আলোচনায় ঈগর প্রসঙ্গও উঠল। কর্ণেল বললেন, তোমরা কি কাজ করছো আমার বুঝে আসছেনা। এতদিনেও তোমরা ঈগলকে গ্রেফতার করতে পারলে না। সে একের পর এক আমাদের সৈন্যদেরকে হত্যা করছে, ক্যাম্প ধ্বংস করছে, কতগুলো গাড়ি শেষ হলো তার হাতে। এমনকি বিমান ছিনতাই পর্যন্ত করল সে। আর তোমরা তার কিছুই করতে পারলে না... ।' কর্ণেলকে তার কথা শেষ করতে দিল না ঈগল। পিছন থেকে বলে উঠল সে, 'আমি ঈগলকে ধরিয়ে দিব। তাঁর আস্তানা দেখে এসেছি আমি। আর আপনাদের জন্য...

ঈগল এতটুকু বলায় সকলের দৃষ্টি তাঁর দিকে নিবদ্ধ হলো। একযোগে কতগুলো প্রশ্ন নিক্ষিপ্ত হলো তার দিকে, "তুমি কে? ঈগলকে কখন দেখলে? তার আস্তানা কোথায়? এখন সে সেখানে আছে কিনা" ইত্যাদি।

'আমি আপনাদের সুহৃদ-সহযোগী–তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বলল ঈগল–কিছুক্ষণ পূর্বেই ঈগলকে তাঁর আস্তানায় দেখে এসেছি। সে আমাকে ভাবে তার আপনজন। কিন্তু আমি তাকে আপন ভাবি না। আমার আপন আপনারা, যারা সেই সুদূর আটলান্টিক মহা সাগর পাড়ি দিয়ে আমাদের মুক্তি দিতে এসেছেন। ঈগল আপনাদের একটা বহরে হামলা চালিয়ে বিপুল সংখ্যক অস্ত্র ও পর্ণ সামগ্রী ছিনতাই করে নিয়েছিল। আমাকে সে দায়িত্ব দিল পর্ণ সামগ্রীগুলো তার দ্বিতীয় আস্তানার আন্ডার গ্রাউন্ডে নিয়ে যাওয়ার জন্য, কিন্তু আমি সেগুলো সেখানে না নিয়ে, নিয়ে এসেছি আপনাদের এখানে।'

ঈগলের উত্তর শুনে সেনা কর্মকর্তারা তো খুশীতে বাগ্ বাগ্। এমন একটা সুসংবাদের জন্য দপ্তরের প্রধান কর্মকর্তা ঈগলকে নগদ পুরস্কার হিসেবে দিল ১০ হাজার ডলার। ঈগলকে ধরিয়ে দেয়ার পর ঘোষিত পুরস্কারের সমুদয় অর্থ তাকে প্রদান করা হবে বলে তিনি আবারও ওয়াদাবদ্ধ হলেন।

ঈগল সেখান থেকে বেড়িয়ে এলো। কর্মকর্তারাও তাঁর পিছন পিছন বেড়িয়ে এলো পণ্য সামগ্রী দেখার জন্য। ঈগল সেনা সদর দপ্তরের কিছু দূরে রাখা মাইক্রোবাসটি নিয়ে এলো দপ্তরের ভিতর। কর্ণেলের নিদেশে প্রহরী সৈনিকরা গাড়ি থেকে মালামালগুলো নামাতে শুরু করল। প্রথম কার্টন নামিয়েই চেক করা হল। তারা দেখল ঠিকই এগুলো পর্ণ সামগ্রী। এবার তারা নিশ্চিন্ত হল যে, লোকটি তাদের ধোকা দিচ্ছে না।

ঈগল প্রতিটি কার্টনের ভিতর একটি করে রিমোট সিস্টেম বোমা রেখে দিয়েছিল। ঘটনাক্রমে একটির ভিতর সাধারণ বোমা ছিল; যা তার নিজেরও জানা ছিলনা। গাড়ি থেমে

নামানোর সময় নাড়াচাড়ায় হঠাৎ বিকট শব্দে সে বোমাটি বিস্ফোরিত হল। যেই না বিস্ফোরণ ঘটলো সাথে সাথে ঈগল দিল দৌড়।

ঈগল দৌড় ঠিকই দিল তবে রিমোট চাপতে ভুল করল না। রিমোট চাপার সাথে সাথে সবগুলো বোমা একত্রে বিস্ফোরিত হল তাতে ঈগলের নিয়ে আসা মাইক্রোটিও উড়ে গেল। যে ক'জন সৈনিক কার্টনগুলো নামাতে ছিল মারা পড়ল সব ক'জন। আহত হল কর্মকর্তাদেরও অনেকে। সাথে সাথে কর্ণেল এক গাড়ি সৈন্য পাঠালো ঈগলকে ধরতে। কিন্তু সৈন্যরা গাড়ি নিয়ে ঈগলকে ধাওয়া করেও ধরতে সক্ষম হল না।

ঈগল গেট করা বাড়ির ভিতরে ঢুকে গেটের পার্শ্বে বসে ঘন শ্বাস টেনে যখন ক্লান্তি দূর করছিল তখন বাড়ির মালিক জাফর মুসা সাহেবের শোড়ষী কন্যা জান্নাতুন নাঈমা এলো ফুল বাগানে। নাঈমা ফুল গাছের পরিচর্যা করতে করতে হঠাৎ কেন যেন পিছনে তাকাল। পিছনে তাকিয়েই সে চমকে উঠল। 'গেটের ভিতরে পুরুষ আসলো কোত্থেকে।' সে নিঃশব্দে ঈগলের দিকে এগিয়ে এলো।

ঈগলের দৃষ্টি ছিল নীচের দিকে। সে টেরই পায়নি যে, কেউ এখানে এসেছে। নাঈমা জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি কে?'

প্রশ্ন শুনে সহসা ঈগল দৃষ্টি ঊর্ধ্বগতি করল। মেয়েটিকে দেখে সে অতিশয় বিস্মিত ও আশ্চার্য হয়ে গেলো। 'আরে এ যে হুবহু তাঁর প্রেমিকা সুমাইয়া আফরোজ।' সে অপলক নেত্রে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইলো।

ঈগলকে এভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে নাঈমা দারুন লজ্জা পেলো। সে পুনরায় জিজ্ঞেস করল, 'এভাবে তাকিয়ে আছেন কেন জনাব? যা জিজ্ঞেস করেছি উত্তর দিন, আপনি কে?'

'আমি কে তা পরে বলছি, আগে বলতো তুমি কে–পাল্টা প্রশ্ন ঈগলের তুমি সুমাইয়া আফরোজ নও তো?'

'আমি সুমাইয়া আফরোজ হতে যাবো কেন!' বলল নাঈমা– 'আমি এই বাড়ির মালিক জনাব জাফর মুসা সাহেবের কন্যা। আমার নাম জান্নাতুন নাঈমা। এবার বলুন আপনি কে?'

'আসলেই তো! তুমি সুমাইয়া আফরোজ হতে যাবে কেন? তবে তুমি অবিকল সুমাইয়া আফরোজের মতই–বলল ঈগল–সে যা হোক, তুমি জানতে চেয়েছো আমি কে? তবে শুন, আমার নাম শুনে আবার ভয় পেয়োনা যেন। আমার নাম ওমর শুজা। তবে এখন সকলে বাগদাদের ঈগল বলে ডাকে।'

'কি বললেন বাগদাদের ঈগল আপনি।' মেয়েটি যেন সত্যি সত্যিই ভয় পেলো। যেখানে দাঁড়ানো ছিল সেখান থেকে পিছিয়ে গেলো দুই পা পিছনে।

'তুমি ভয় পাচ্ছে কেন নাঈমা–বলল ঈগল–আমি তো ইরাকীদের কাউর ক্ষতি করি না; আমার এ্যাকশন এবং প্রতিশোধ গ্রহণ শুধুমাত্র হানাদার বাহিনীর উপর হয়ে থাকে।'

'এ ভয় নয় ঈগল ভাইয়া' –বলল নাঈমা– 'আমার অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল বাগদাদের ঈগলকে একনজর দেখার। প্রেসিডেন্ট সাহেবও কয়েকবার আপনার কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন। আর সেই আপনি নিজেই এসেছেন আমাদের বাড়িতে। তাই খুশীর আবেগে চমকে উঠেছি আমি। আর এক মুহূর্তও আপনি এখানে বসবেন না, শীঘ্র ঘরে চলুন। আপনার আগমনে আমাদের বাড়ী ধন্য হয়েছে হে বাগদাদের ঈগল!' বলেই মেয়েটি চঞ্চলা হরিণীর ন্যায় দৌড়ে ঘরে প্রবেশ করল।

ঈগল সেখান থেকে উঠে নাঈমাদের ঘরে গিয়ে বসল। কিছুক্ষণ পরই নাঈমা বড় একটা প্লেটে করে বিভিন্ন রকম ফল-মূল এনে হাজির করল। ঈগল বলল, 'বাড়িতে অন্য কেউ নেই? তোমার আব্বা, ভাই-বোন।

'আব্বা বাহিরে গেছেন' বলল নাঈমা– 'ভাই-বোন বলতে আমি একাই আম্মাজান ঘরে আছেন আর...।' এতটুকু বলে থেমে গেলো মেয়েটি। ঈগল জিজ্ঞেস করল, কি আর নাঈমা?'

'কিছু না ঈগল ভাইয়া! আপনি আহার গ্রহণ করুন। এবং আপনার অভিযানের দু'একটি কাহিনী শুনিয়ে কৃতার্থ করুন।'

'তুমি যে বিষয়টি আমার থেকে লুকাচ্ছো, তা না বললে আমি তোমার আহার্যও গ্রহণ করবো না আর আমার অভিযানের কাহিনীও শুনাবোনা। মুচকি হেসে বলল ঈগল।

'সেটা এখন আপনাকে বলব না। আপনি আহার করুন। তারপর আপনাকে আমি সরাসরি দর্শন করবো, যা এখন লুকালাম।'

'আচ্ছা! তাহলে তো তারাতারিই আহার পর্ব শেষ করতে হয়–বলল ঈগল–'নাও তুমিও শুরু করো।'

খাওয়ার ফাকে ঈগল নাঈমাকে শুধাতে লাগলো তাঁর এখনকার অভিযানের কাহিনী। নাঈমাতো এমন শ্বাসরুদ্ধকর কাহিনী শুনে হতবাক। সে বলল, ঈগল ভাইয়া! তুমি জীবনের এমন ঝুকি নিয়ে অভিযান চালাও! তোমার কি একটুও ভয় করে না?

'ভয়! সেতো আরো আমার থেকে পালাবার পথ খুঁজে–বলল ঈগল–আমরাতো যুদ্ধের ময়দানে সর্বদা মৃত্যুর সন্ধান করে ফিরি অথচ তাকে খুঁজে পাইনি এখনও।'

'আচ্ছা, ঈগল ভাইয়া! আপনি আমাকে দেখে যে বললেন, আমি সুমাইয়া কিনা। আবার বললেন, আমি ঠিক সুমাইয়ার মতো।' আসলে সুমাইয়া কে বলুন তো?' প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে জিজ্ঞেস করল জান্নাতুন নাঈমা।

'সে এক করুন উপাখ্যান বোন!' একটা তপ্ত দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল ঈগল। অতঃপর সুমাইয়া কে? তার সাথে সুমাইয়ার কি সম্পর্ক ছিল, বন্দীদের মুক্ত করানোর ব্যাপারে

সুমাইয়ার অসাধারণ অবদান ও কৃতিত্ব, সর্বশেষ তাঁর শহীদ হওয়ার কাহিনী বিস্তারিত বর্ণনা করল ঈগল। সব শুনে নাঈমা অত্যন্ত ব্যথিত হল। ঈগলের ব্যথা তার মর্মেও পশেছে যেন। সে অন্তর দিয়েই অনুভব করল যে, সুমাইয়ার বিরহ ঈগলকে কেমন পীড়া দিচ্ছে। কিছুক্ষণ উভয়েই নিষ্প্রভ থাকার পর নাঈমা বলল, 'ঈগল ভাইয়া! এভাবেই কি আমেরিকা আমাদেরকে তার 'মুক্তি' উপহার দিচ্ছে! এর মানে কি ইরাকের সমস্ত মানুষকে হত্যা করে 'মুক্ত ইরাক' গঠন করা?'

'আমেরিকানরা নিজেরাও মানুষ নয়, অন্যদেরকেও তারা মানুষ ভাবেনা'–বলল ঈগল –'কারণ, চেহারা আকৃতিতে মানুষ হলেও যদি তার মধ্যে মানুষের গুণাবলী না থাকে তাকে মানুষ বলা যায়না। ওরা মানুষ নামের পশু; শুধু পশুই নয় তার চেয়েও অধম বলে পবিত্র কুরআন ঘোষণা করেছে। সুতরাং হিংস্র জানোয়ারের ন্যায়ই এরা মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পরে, মানুষের ক্ষতি করে, মানুষকে হত্যা করে। সে যা হোক, এবার তুমি আমাকে সেই বিষয়টা দেখাও, যা তুমি এতক্ষণ বলনি।'

'আপনি আসুন আমার সাথে।' বলে নাঈমা ঘরের মধ্যে হাটা দিল। ঈগল তার অনুগমণ করলো। দু'টো রুম অতিক্রম করে নাঈমা তৃতীয় এক রুমে প্রবেশ করল। ঈগল দেখল, সাজানো-গোছানো অত্যন্ত চমৎকার রুমের অভ্যন্তর ভাগ। ফ্লোরে অতি মূল্যবান কার্পেট বিছানো।

রুমের মধ্যে একটি কাঠের ও দু'টি ষ্টিলের আলমারী। নাঈমা একটি ষ্টিলের আলমারী খুলল। অতঃপর তার ভিতরে অবস্থিত একটি সুইস টিপে দিল। সাথে সাথে আলমারীর নিচের ফ্লোরটুকু একদিকে সরে গেল। বের হল একটি লোহার সিঁড়ি। সেটি চলে গেছে সরাসরি ভূগর্ভ ব্যাংকারে। নাঈমা সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে বলল, আসুন ঈগল ভাইয়া! এই বাংকারেই আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন।'

ঈগল ব্যাংকারে প্রবেশ করে দেখল, একটি খাটের উপর মধ্য বয়সী একজন পুরুষ শায়িত। মাথায় উসকো-খুসকো চুল। মুখে ঘন লম্বা দাড়ি। দাড়ি অনেকটা পেকে গেছে। গায়ে হাফ হাতা গেঞ্জি। পরনে ঢিলা সাদা পাজামা। লোকটি দেখতে মনে হয় কোন ফকির-দরবেশ হবেন নিশ্চয়ই। তিনি এতক্ষণ শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিলেন। কারো আগমন টের পেয়ে উঠে বসলেন। নাঈমার সাথে অন্য একজন নওযোয়ানকে এখানে আসতে দেখে তিনি কিছুটা বিরক্তবোধ করলেন। এক ধেয়ানে ঈগলের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। অতঃপর নাঈমাকে জিজ্ঞেস করলেন এই যুবক কে মা-মনি?

'কেন যার কথা মাঝে মধ্যেই জিজ্ঞেস করেন আমার কাছে বলল নাঈমা–ইরাকী সেই বীর 'বাগদাদের ঈগল' এই যুবক।'

'কি বললে! কি বললে নাঈমা তুমি?–অতিশয় আবেগাতারিত হয়ে বলতেন বয়স্ক লোকটি– এই যুবকই বাগদাদের ঈগল? এসো ঈগল! এসো! আমার কাছে এসো!

তোমার মত ঈগলেরাই বাগদাদকে মুক্ত করতে পারবে। ঐ হানাদার গোষ্ঠীকে ইরাক ছাড়া করতে তোমার মতো নওয়োয়ানদের খুবই প্রয়োজন ইরাকবাসীর। আমার বদনসীব! আমার যৌবন হারিয়ে ফেলেছি।'

লোকটির কথাবার্তা শুনে চিন্তায় পরে গেল ঈগল। কে এই লোক? চেহারায় সাদা-সিধা দরবেশ মনে হলেও, কথাবার্তায় অন্তত তা মনে হয় না। কণ্ঠস্বরও যেন কেমন পরিচিত পরিচিত মনে হচ্ছে তাঁর। তবে কি এই লোকই প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন? গোফ-দাড়ির মধ্যে দিয়েও চেহারা তো অনেকটা সে রকমই দেখা যাচ্ছে! একটু আগে বাহিরে বসে সে যখন নাঈমার কাছে নিজের পরিচয় দিয়েছিল তখন তো নাঈমা বলেছিল, "প্রেসিডেন্ট সাহেবও অনেকবার আপনার কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন।" ঈগল এসব কথা ভাবছে আর লোকটিকে নিগুঢ়ভাবে দেখছে যে, আসলেই এই লোক প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম কিনা। হঠাৎ ঈগলের মনে পড়ল, সে শুনেছে সাদ্দামের ডান হাতে উল্কি করা আছে, তিনটি গাঢ় নীল ডট রয়েছে তার কব্জির কাছে। তার গোত্রের লোকের চিহ্ন এটি। ৫/৬ বছর বয়সের সময় এটি করেছিলেন তিনি।

ঈগল সাথে সাথে লোকটির ডান হাতের দিকে তাকালো। দেখল, সত্যি সত্যিই তার হাতে উল্কি আছে। তার আর বুঝতে বাকী রইল না যে, এই লোকই প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন। ঈগল সাদ্দাম হোসেনের কাছে এগিয়ে গেল। তিনি তাকে নিজের বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলেন। রাখলেন অনেকক্ষণ। মাথাটা ধরে চুমু খেলেন কপালে।

ঈগল জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন?'

'হ্যাঁ, আমি ইরাকের প্রোসিডেন্ট –বললেন সাদ্দাম হোসেন। তবে বুশ এখন ইরাকের প্রেসিডেন্ট হতে চাচ্ছে।'

'এটা সত্যি একটা বেদনাদায়ক কথা জনাব প্রেসিডেন্ট সাহেব বলল ঈগল–মহান আল্লাহ তা'য়ালা এ জন্যই বলেছেন, "আল্লাহ যাকে খুশী রাজত্ব দান করেন, যার থেকে খুশী রাজত্ব ছিনিয়ে নেন।"–আল কোরআন।

'মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অত্যন্ত সঠিক কথা বলেছেন ঈগল! –বললেন সাদ্দাম হোসেন–কেননা তিনি কারো থেকে জুলুম করে রাজত্ব ছিনিয়ে নেন না। তিনি অবশ্যই সুবিচারক। তাঁর বিচারে ভুল ধরার সাধ্য কারো নেই; অবকাশই নেই। তিনি মানুষকে ক্ষমতা-কর্তৃত্ব দিয়ে পরীক্ষা করেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তাঁর দেয়া ক্ষমতার অপব্যবহার করে ফেলে। ক্ষমতা পেয়ে তারা ধরাকে সরা জ্ঞান করতে শুরু করে। ভুলে যায় ক্ষমতা দাতাকে। ক্ষমতার দাপটে যেন জমিনে পা পড়তে চায়না। অধীনদেরকে গোলাপ ভাবতে শুরু করে তখন। আর নিজেকে ভাবে তাদের আরাধ্য পাওয়ার উপযুক্ত মালিক কিংবা প্রভু। রীতিমত স্রষ্টা বনে যায় ক্ষমতাবানরা। তাদের ইচ্ছেমত আইন তৈরী করে তা জনগণের ঘারে চাপিয়ে দেয় নিজের খেয়াল খুশীমত চালায় জাতিকে। রাষ্ট্রীয়

সম্পদকে ভাবতে শুরু করে নিজের সম্পদ। জনগণের কষ্টার্জিত–ঘাম ঝড়া পয়সা দিয়ে আমোদ-প্রমোদ আর বিলাসিতায় মেতে ওঠে উলঙ্গভাবে। অভাগা জনতার দুঃখ লাঘবের চিন্তা আদৌও তার মাথায় আসেনা। টুকটাক যা করে, তা শ্রেফ লৌকিকতা প্রদর্শন এবং ভোট পাওয়ার আশায়ই করে থাকে। ক্ষমতার ভীত পাকাপোক্ত করতে হীন এমন কোন কাজ নেই যা ক্ষমতাবানরা করেনা। এহেন পরিস্থিতিতে আল্লাহ তায়ালা যদি ক্ষমতাবানদের ক্ষমতা কেড়ে নেন, তবে সেটা কোন ভাবেই জুলুম নয় বরং এটাই ইনসাফের কথা-মানবতার দাবি।'

'মাননীয় প্রেসিডেন্ট সাহেব! বেয়াদবি ক্ষমা করবেন–বলল ঈগল–আপনার সাথে আমার আজই প্রথম সরাসরি দেখা। জানিনা আজকের পর আবার কখনও দেখা হবে কিনা! আজ যখন ঘটনাক্রমে দেখাই হলো, তখন কয়েকটি কথা বলি আপনাকে, আমার কথায় যদি কোন রূপ কষ্ট পান, সে জন্য অগ্রীম ক্ষমা চেয়ে নিলাম। কথা হলো, আপনি ক্ষমতাবানদের যে ক্রুটির কথা বললেন, আপনি নিজে কি এর আওতার বাইরে ছিলেন। দীর্ঘ প্রায় দুই যুগ ক্ষমতায় ছিলেন আপনি, এ সময়ের মধ্যে আপনার নিজের কার্যাবলী কি এর থেকে ভিন্ন? আপনি কি আমেরিকার ইঙ্গিতে ইরানে হামলা করেন নি? আপনি কি কুয়েত দখল নাটকের নায়ক সেজে পবিত্র হারামাঈন শরীফাইনের পবিত্র বুকে অপবিত্র ইহুদী-খৃষ্টান সৈন্যদের ঘাটি করার সুযোগ করে দেন নি? আপনি কি দেশের ধর্মীয় শিক্ষার ওপর অবৈধ হস্তক্ষেপ করেন নি? অস্বীকার করত পারবেন কি আপনি, একজন মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও সারাজীবন ইসলামের পরিবর্তে জাতীয়তাবাদ নামক নতুন ধর্মের প্রচার করেছেন? পবিত্র কুরআনের পরিবর্তে জাতীয়তাবাদের রচনা সামগ্রী, নবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর চেয়ে খৃষ্টান-কাফির মাইকেল আফলাক, ইসলামী কৃষ্টি-কালচারের বিপরীতে খৃষ্টীয় কালচার বেশী প্রাধান্য পায়নি কি আপনার কাছে?'

'বেটা ঈগল! তোমার আর বলতে হবেনা'– ঈগলকে বাঁধা দিয়ে বললেন সাদ্দাম হোসেন– 'আমার সম্বন্ধে তুমি যা বলবে, তার চেয়ে ঢের বেশী অবগত আছি আমি নিজে। একটু পূর্বে ক্ষমতার অপ ব্যবহার সম্বন্ধে আমি যে কথাগুলি বললাম, তা মূলত আমার নিজের কথাই বলেছি। ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে এ সকল কথা আমার মাথায় আসেনি। এখন আমার কাছে ক্ষমতার মাকাল ফলের বাস্তবতা উদ্ভাসিত হয়েছে। ক্ষমতার দাপটে আমার দ্বারা যে সব কাজ হয়েছে তারই প্রতিফল ভোগ করছি এখন বলতে গেলে এই বন্দী জীবনে। যেই আমি বাস করার জন্য সারা দেশে ৮টি জান্নাতসম প্রাসাদ বানিয়েছিলাম, যেখানে ছিল পৃথিবীর আরাম-আয়েশের সকল আয়োজন। কিন্তু আজ? আজ আমার থাকার জন্য, আমার বাস করার জন্য এতটুকু জায়গা আমার নিজ করায়ত্বাধীনে নেই। এখন যেখানে অবস্থান করছি আমি; এ জায়গাটি পর্যন্ত আমার মালিকানাধীন নয়– আমি এখানে আশ্রিত।'

একটু থেমে পুনরায় তিনি বলতে লাগলেন, 'আজ আমি বুঝতে পারছি মানুষ হয়ে মানুষের উপর অযাচিত মাতুব্বরী করা অন্যায়। মানুষ মানুষের প্রভু হতে পারেনা। সকল মানুষের প্রভু একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। যারা এটা বিশ্বাস করেনা, যারা তাঁর এই একক নিরঙ্কুস রুবুবিয়্যাতের ওপর ভাগ বসাতে চায় তার কাফের। তাদের মস্ত-কঠিন শাস্তি হওয়া দরকার; এটা তাদের প্রাপ্য। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা গাফুরুর রাহীম। আল্লাহ তায়ালা অসীম ধৈর্য্যশীল ও অত্যন্ত দয়ালু মেহেরবান বিধায় তিনি বান্দাকে সংশোধন হওয়ার সুযোগ দেন। হটকারীতা পরিহার করার জন্য অবকাশ দেন।

ঈগল! তুমি জানো, রাজনৈতিক জীবনে আমি কমিউনিস্ট ছিলাম। আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিলাম আমি; ভুলে গিয়েছিলাম যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তাঁকে। মিশরের পাপিষ্ট-অভিশপ্ত ফেরাউনের মতোই নিজে খোদা সাজতে বসেছিলাম আমি ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে। কিন্তু তদুপরিও অসীম দয়ালু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাকে পাকরাও করলেন না; বরং সংশোধন হওয়ার সুযোগ দিলেন। আমার এক সময়ের পরামর্শ দাতা, আমার ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের মাধ্যমেই আমাকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়ে তওবা করার সুযোগ এনে দিলেন। আমাকে হটকারিতা পরিহার করার ব্যবস্থা করে দিলেন। আমি এখন আমার সমস্ত ভুল-অন্যায়, সমস্ত মন্দ-বাড়াবাড়ি যা সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিল, বুঝতে পারছি। তাই এখন তওবা করেছি। আমি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেছি। ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে পুরোপুরি আশ্রয় নিয়েছি আমি। এখন আমি আল্লাহ ওয়ালাদের সাথে যোগাযোগ রাখতে চেষ্টা করছি।'

'আল্লাহ আপনাকে সুমতি দানে ধন্য করেছেন এ জন্য আমি অত্যন্ত আনন্দবোধ করছি'–বলল ঈগল– 'আপনার পরিবর্তিত সু-বেদোধায় দেখে স্মরণ হচ্ছে ষষ্ঠ শতাব্দীর পারস্য সম্রাট তথা ইরাকের সম্রাট, হাজার বছরের ঐতিহ্যবাহী সাসানী রাজ বংশের শেষ প্রতিভূ সম্রাট তৃতীয় ইয়াজদিগর্দ-এর কথা, যিনি তখনকার মুসলমানদের শান্তির পয়গাম উপেক্ষা করে তাঁদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিলেন। একে একে অনেকগুলো যুদ্ধ করলেন; সবশেয়ে ৬৪১ সালে নিহওয়ান্দের যুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়ে বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে পর্বতে ঘুরে বেড়াতেন। পরিশেষে তাঁরও সুমতি হয়েছিল। তিনি পূর্বের সমস্ত ভুল-ত্রুটি থেকে তওবা করেছিলেন। মসুলের এক মসজিদের ইমাম সাহেবের কাছে ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়েছিলেন।'

'তুমি ইতিহাসের বাস্তবতার কথা বলছ ঈগল!' বললেন সাদ্দাম হোসেন– 'ইতিহাস সর্বদা কালের সাক্ষী হয়ে নীরবে মানব জাতিকে অহঃরহ সবক দিয়ে যাচ্ছে, তার থেকে শিক্ষা নেয়ার জন্য। কিন্তু নির্বোধ মানুষ আমরা, ইতিহাসের সে ভাষা বুঝতে অক্ষম। ইতিহাস আমাদের সম্মুখে থাকা সত্ত্বেও আমরা এর থেকে শিক্ষা নিতে ব্যর্থ হই সর্বদা। চেয়ে দেখ তুমি ১২৫৮ সালের ইরাকের দিকে। যখন বর্বর তাতারী বাহিনী ইরাকে হামলা চালালো এবং বাগদাদে দখল দারিত্ব প্রতিষ্ঠিত করল। অতঃপর খলীফা মুসতাসিম

বিল্লাহকে হানাদার বাহিনী আটক করে দানা-পানি বন্ধ করে দিল। ক্ষুধার জালায় অস্থির হয়ে খলীফা তাদের কাছে খাবার চাইলেন। তখন তাতারী নেতা হালাকু খানের নির্দেশে একটি তশতরিতে কিছু স্বর্ণ মুদ্রা ও মুক্তা-মানিক্য রেখে তাকে খেতে দেয়া হলো। খলীফা তশতরির দিকে তাকিয়ে বললেন, "এগুলো তো খাওয়া যায় না।"

তার একথা শুনে হালাকু খান বলল, "যদি এগুলো খাওয়াই না যায় তাহলে এত কষ্ট-ক্লেশ করে সঞ্চয় করেছিলে কেন? অভিশাপ তোমার উপর-গোটা জাতির অভিশাপ। যে ধন-রত্ন তুমি সঞ্চয় করেছিলে, আজ তা তোমার ক্ষুধা নিবারণ করতে পারছে না। যদি তুমি এ সম্পদ প্রজাদের রক্ষার জন্য, খেলাফত রক্ষার জন্য ব্যয় করতে, তাহলে তোমার রাজত্ব শেষ হত না। এই স্বপ্নময় শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হত না। তুমিও আমার নিকট বন্দী হতে না। তুমি বেকুব, নির্বোধ। তুমি লোভাতুর নীচু। এ ধরনের মানুষ দুনিয়াতে জীবিত থাকার কোন অধিকার রাখে না।"

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, হালাকু খান খলীফা মুসতাসিম বিল্লাহকে উক্ত কথাগুলো এ জন্য বলেছিল, যেহেতু খলীফা দেশের সামরিক ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মজবুত না করে বরং তা একেবারে সংকুচিত করে ফেলেছিল আর অর্থ-সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছিল। দজলা নদীর তীর ঘেষে বড় বড় কূপ খনন করে স্বর্ণমুদ্রা, রৌপ্যমুদ্রা এবং মহামূল্যবান মনিমুক্তা-জওহারে পরিপূর্ণ করে উপর দিয়ে কূপের মুখ এমনভাবে বন্ধ করে দিয়েছিলেন যাতে বাহিরের কেউ বুঝতে না পারে এখানে কোন কূপ আছে আর তার মধ্যে লক্ষ্য-কুটি টাকার সম্পদ লুকায়িত আছে।

যাহোক, অতঃপর সাদ্দাম হোসেন আরো বললেন, 'ঈগল! এটা ছিল এই ইরাকেরই ইতিহাস। এই বাগদাদেই ঘটেছিল সেই ঘটনা; যা বইয়ের পাতায় স্পষ্টাক্ষরে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। খলীফা মুসতাসিম বিল্লাহ এই বাগদাদের শাসক ছিলেন, আর আমিও ছিলাম এখানের শাসক। অথচ আমি ইতিহাসের এই বাস্তব ট্রাজেডী থেকে শিক্ষা গ্রহণ করিনি। খলীফার মত আমিও ক্ষমতায় থাকাকালীন আত্মপ্রবঞ্চনায় পরেছিলাম। মদ-মাদকতা আর ভোগ-বিলাসিতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে পরেছিলাম। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা ন্া করে পরাশক্তির ইচ্ছা পূরণের পুতুল হয়ে ইরান-কুয়েতের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে ইরাকের অত্যাধুনিক সামরিক শক্তি এবং প্রযুক্তিকে নিঃশেষ করে দিয়েছিলাম, যার মাশুল দিতে হলো এবারের যুদ্ধে। আজ যদি ইরাকের সামরিক বাহিনী ১৯৮০ সালের মত ক্ষমতাসম্পন্ন থাকতো এবং ক্রমান্বয়ে নিশ্চয়ই এ শক্তি আধুনিক প্রযুক্তিমন্ডিত হয়ে মহা শক্তিতে পরিণত হত, তাহলে আমেরিকা কোনদিনও ইরাকে হামলা করার সাহস পেত না। আফসোস! সে এমন সময় হামলা চালালো যখন সামরিক শক্তি বলতে ইরাকের তেমন কিছুই অবশিষ্ট ছিল না।'

'জনাব প্রেসিডেন্ট সাহেব! এখন আর আফসোস করে কি হবে' –বলল ঈগল– 'ইরাকের যা ক্ষতি হবার তা হয়ে গেছে। তবে আপনার জন্য একটি সুসংবাদ হলো,

মুজাহিদরা আপনার ফেদাইন বাহিনীর সদস্যদের আমল-আকিদা দুরস্ত করে তাদেরকে 'সাদ্দামের জন্য নিবেদিত' সৈনিক থেকে 'আল্লাহর জন্য নিবেদিত' মুজাহিদে পরিণত করছেন।'

'তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ঈগল! তোমার এই সংবাদটি শুনে আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি' –বললেন সাদ্দাম হোসেন –'এ ব্যাপারে আমি দারুন পেরেশানিতে ভুগছিলাম। কারণ কোন মানুষের জন্য অন্য কোন মানুষের জীবন উৎসর্গিত হতে পারে না। সকল মানুষের জীবন উৎসর্গিত হবে একমাত্র মহান প্রভু আল্লাহরই উদ্দেশ্যে। যারা নিজের জন্য অন্য মানুষের জীবন উৎসর্গ করায় তারা আল্লাহর সাথে শিরিক করায়। আর আল্লাহ শিরিকের অপরাধ ক্ষমা করেন না। অথচ এই কাজটিই করেছিলাম আমি। তবে করেছি না বুঝে। এখন বুঝি। এজন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। যখন যেখানে যার সাথে দেখা হয়, তখনই তাকে বলি, আমার জন্য নয় তোমাদের জীবন আল্লাহর উদ্দেশ্যে কোরবান করো। মুজাহিদগণও আমাকে শিরকের গোনাহ থেকে পবিত্র করছে শুনে তাঁদের প্রতি আমি অতিশয় কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাদের বিজয় দান করুন।'

'প্রেসিডেন্ট সাহেব! আপনাকে অসংখ্য মোবারকবাদ' –বলল ঈগল– 'আল্লাহ আপনাকে পরিপূর্ণ ক্ষমা করুন, সুস্থ এবং নিরাপদ রাখুন এই কামনাই করি। এখন আমি এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি। আপনার কাছে শেষ বারের মত একটি কথা জানতে চাচ্ছি, আপনি কি সব সময় এখানেই অবস্থান করেন নাকি অন্য কোথাও যান?'

'ঈগল! আল্লাহ তায়ালাই প্রত্যেক মানুষের তথা প্রত্যেক সৃষ্টির হেফাযতকারী, তদুপরিও আমাদেরকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সতর্ক থাকা দরকার। আর সেই সতর্কতার খাতিরেই আমাকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় সরে যেতে হয়। বিভিন্ন স্থান পরিবর্তন করতে হয়। কিন্তু যতই আমাকে পালিয়ে বেড়াতে হোক না কেন, এই দেশ, এই মাটি এবং এদেশের মানুষকে বিপদের মুখে রেখে, যুদ্ধের কবলে ফেলে রেখে আমি অন্যত্র যাবোনা কিছুতেই। মরতে হলে এখানেই মরবো! শহীদ হয়ে মরবো।'

'আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ আপনাকে শহীদ হওয়ার তওফীক দিন'–বলল ঈগল–'এবার তাহলে আমি চলি। আমার জন্য দোয়া করবেন।' বলে ঈগল ব্যাংকার থেকে বের হতে লাগল। পিছনে থেকে ডেকে সাদ্দাম হোসেন বললেন, ঈগল! আমি যখন যেখানেই থাকি না কেন তা মা-মনি নাঈমার জানা থাকবে। তুমি ওর সাথে যোগাযোগ করে মাঝে মধ্যে আমার সাথে দেখা করবে।'

ঈগল, 'জি আচ্ছা' বলে ব্যাংকার থেকে বেড়িয়ে এলো। নাঈমাও এলো তার সাথে। নাঈমার থেকে বিদায় নিয়ে গিয়ে দেখা দিল এক নতুন বিপত্তি। সে বলল, ঈগল 'ভাইয়া! আমাকে যখন তোমার সুমাইয়ার মত মনে হয় তখন কি আমাকে সুমাইয়ার স্থানে অধিষ্ঠিত করা যায়না?'

নাঈমা কথা ক'টি বলল খুবই ক্ষীণ কণ্ঠে এবং নিচের দিকে চেয়ে। লজ্জায় একেবারে আড়ষ্ট হয়ে। তাও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হিসেবে এতটা সাহসিকতা দেখিয়েছে। নতুবা সাধারণতঃ আরবী কন্যাগণ এতটা বেপরোয়া নয় যে, যাকে পছন্দ হবে তাকেই বলবে, 'আনতা বী হুব্বাক' আমি তোমাকে ভালবাসি, যেমনটি বলে থাকে পশ্চিমা দেশের তরুণীরা। অবশ্য আধুনিক যুগে প্রগতি নামের দুর্গতির ছোয়া আরব-আজম সর্বত্রই লক্ষ করা যাচ্ছে; যার সিংহভাগ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যয়নরতরা আর বাকী কিছু সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের অসহায় শিকারী। যা কিছু খারাপ আর দুশ্চারিত্রিক কার্যাবলীর কথা আমরা আরব নারীদের সম্বন্ধে শুনি বা জানি তা এদের মাধ্যমেই সংঘটিত হয়ে থাকে। সামগ্রিক বিচারে আরব নারীগণ এখনও বিশ্বের অন্যান্য নারী সমাজের উপর শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার। কেননা যেই আরব নারীগণ জন্ম দিয়েছিলেন, মুহাম্মদে আরাবী (সাঃ), ছিদ্দিকে আকবর আবু বকর (রাঃ), ফারুকে আজম ওমর (রাঃ), গনিয়ে আরব ওসমান (রাঃ), শের-এ খোদা আলী (রাঃ), সাইফে আল্লাহ খালিদ (রাঃ), ফাতহে ক্রুসেড সালাহুদ্দীন আইয়ুবী, ফাতহে হিন্দ বিন কাসিম, ফাতহে স্পেন বিন যিয়াদদের মতো বিশ্ববরেণ্য সমর কুশলীদের। সেই আরব নারীদের ঐতহ্যময় ধারাকে অব্যাহত রেখে বর্তমানের আরব নারীগণ জন্ম দিচ্ছেন বিশ্ব বিখ্যাত মুফতী, কমান্ডার আব্দুল্লাহ আযযাম (রাঃ), সারা দুনিয়ায় আলোড়ন সৃষ্টিকারী মুজাহিদ ওসামা বিন লাদেন, ডঃ আইমান আল-জাওয়াহারী, মুসাব আল-জারকাবী, শেখ আহমদ ইয়াছিন, কমান্ডার ওমর খাত্তাব, খালেদ শেখ মুহাম্মদের মতো বিশ্ব নন্দিত বীরদের।

সে যা হোক, নাঈমার অস্ফুট কণ্ঠের বলা কথা ক'টি ঈগল কিছু বুঝল কিছু বুঝল না। তাই সে বলল, 'তার মানে তুমি সুমাইয়ার মত বীরঙ্গনা হতে চাও?'

'জি! সেই সাথে সুমাইয়ার মতো ঈগলের মনের মানুষ...।' এতটুকু বলেই থেমে গেলো নাঈমা। আরও কিছু বলতে চাইলেও লজ্জা ও জড়তায় তার কণ্ঠ আড়ষ্ট হয়ে এলো। আর বলতে পারল না। ঈগল এ কথা শুনে অনেকটা আশ্চার্যান্বিত হয়ে নাঈমার দিকে তাকালো। চেয়ে রইলো অনেকক্ষণ। নাঈমা তখনও নিচের দিকে তাকানো। এভাবে কেটে গেলো ২/১ মিনিট। কারো মুখ থেকেই কোন কথা বের হচ্ছে না।

অবশেষে নীরবতা ভাঙ্গল নাঈমাই। বলল, 'আমার কথায় কি আপনি রাগ করলেন? হয়তো এইভেবে রাগ করতে পারেন যে, কেমন বেওকুফ মেয়ে আমি, অল্প সময়ের সাক্ষাতেই আপনাকে ভালবাসার প্রস্তাব দিলাম। এরূপ ভাবটাই হয়তো আপনার জন্য যুক্তিযুক্ত। তবে সত্যি সত্যি আমি বেওকুফ মেয়েও নই, বেশরমাও নই। ইতিপূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক নামী-দামী ছাত্ররা আমাকে প্রস্তাব দিয়েছিল কিন্তু আমি তাদের আহ্বানে কখনই সাড়া দেইনি। অনেক বড় বড় ঘর থেকে আমার বিয়ের প্রস্তাবও এসেছিল, আমি বিয়েতে রাজী হইনি। কেন হইনি জানিনা। কিন্তু আজ যখন আপনাকে দেখলাম আর আপনি আমাকে দেখে ভাবলেন সুমাইয়া। শুনলাম সুমাইয়া ও আপনার

করুন কাহিনী, তখন আপনার প্রতি আমার কেমন যেন মায়া জন্মে গেল। আমার বিবেক আমাকে এজন্য দংশন করতে লাগলো, যে লোক নিজের জীবনকে বাজী রেখে দেশ-জাতি-ধর্মের জন্য প্রাণপণ যুদ্ধ করে যাচ্ছে, তাকে একটু ভালবাসার, একটু মধুর ছোয়া দেয়ার কেউ নেই! তাঁর দুঃখে সমবেদনা প্রকাশ করার জন্য হৃদয়ের একেবারে কাছের কেউ নেই! আমাকে যখন সে তাঁর হৃদয়ের কাছের হারিয়ে যাওয়া মানুষটির মতই মনে করেছিল প্রথম দর্শনে, তখন আমি কি পারিনা তার দুঃখের সাথী হতে? পারি না কি বিপদে-আপদে তার পাশে থেকে শান্তনা দিতে, সহযোগিতা করতে? বিবেকের এই জ্বলন থেকেই আপনাকে আমি ঐ কথা ক'টি বললাম।'

'নাঈমা! তোমার প্রতি আমি রাগও করিনি, তোমাকে বেওকুফ বেশরমাও ভাবিনি' –বলল ঈগল– 'আমি শুধু ভাবছিলাম যে, তোমার সাথে সুমাইয়ার কতটা সাদৃশ্য বিদ্যমান। চেহারা-সুরত, কথাবার্তা এবং চিন্তা-চেতনা সবই সুমাইয়ার মত; সর্বোপরি আমাকে ভালবাসার প্রস্তাব দেয়ার ব্যাপারটিও ঠিক তার মতো। যেন হুবহু মিল তোমাদের দু'জনের মধ্যে। যেন একে অপরের কার্বন ছবি। সেজন্যই চিন্তা তোমাকে কি উত্তর দিব। সুমাইয়াকে 'না' বললেও তাৎক্ষণিক কোন উত্তর না দেয়ায় সে আমার উপর রাগ করেছিল। এরপর জীবিতকালীন তার সাথে আর সাক্ষাত হয়নি। তাকে হারিয়ে ফেললাম...। আজ তোমাকেও বা কি উত্তর দিব আমি? আমার জীবনটা তো আল্লাহর জন্য এবং তাঁর দ্বীন ইসলামের জন্য উৎসর্গিত। তদুপরি তোমাকে আমি সরাসরি 'না' বলব না। তাহলে সুমাইয়ার মতো তুমিও আমার উপর রাগ করবে। আজ তবে আমি যাই। অন্য এক সময় জানাবো তোমাকে; আল্লাহ যদি জীবিত রাখেন।' এই বলে সে নাঈমার থেকে বিদায় নিয়ে গেট পেড়িয়ে রাস্তায় নেমে পড়ল। নাঈমা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো তার গমন পথের দিকে। যেন তার মন পাখিটাও উড়ে যাচ্ছে বাগদাদের ঈগলের সাথী হয়ে।

* * *

বাসর! যাকে বলে বিশেষ দিন। সাধারণত বিবাহের দিনকে বাসরদিন আর বিবাহের রাতকে বাসররাত বলা হয়। নর-নারী উভয়ের চিরকাংখিত একটি রাত-বাসররাত। যে রাতটির জন্য মানুষ যুগ যুগ ধরে অপেক্ষা করে। এই রাতের মত আনন্দঘন রাত জীবনে দ্বিতীয়টি আর আসেনা কভু। প্রিয় মনের মানুষকে একান্ত আপন করে পাওয়ার রাত এটি। হৃদয়ের সাথে হৃদয়ের সংযোগ স্থাপনের রাতই তো 'বাসর রাত'। পূত পবিত্র ইসলাম ধর্মের এটাও একটা পবিত্র দিক যে, এতে নর-নারীর বিবাহপূর্ব সহযাপন অত্যন্ত কঠোরভাবে নিষিদ্ধ; এমন কি শাস্তিযোগ্য-ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। ইসলাম বলে, বিবাহের মাধ্যমে হালাল করে পবিত্রভাবে সহযাপন কর। তাতে কোন দোষ নেই–গুনাহ নেই। বরঞ্চ সঠিক নিয়ম-পদ্ধতি অনুযায়ী সহযাপনে রয়েছে অফুরন্ত সওয়াব ও নেককার সন্তান লাভের নিশ্চয়তা।

বিবাহ সংঘটনের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানী সাংবাদিক সালমান ও ইরাকী কন্যা রুকাইয়ার স্বপ্ন পূরণ হল। বাড়ির দ্বিতীয় তলায় সাজানো হলো তাদের স্বপ্নের বাসর। চারিদিকে যুদ্ধের ডামাডোল হেতু সাজ-গোজ বেশী একটা জাঁকালোভাবে করা হয়নি ঠিক, তবু এই অনারম্বর বাসর রচিত হওয়াটাও তাদের অনেক বিরাট পাওয়া। এতেই তারা খুশী, এতেই আনন্দিত-আহ্লাদিত। আজ তাদের মন অনাবিল সুখের দোলায় পুলকিত।

বাসর ঘরে ঘোমটা দিয়ে বসে আছে কনে রুকাইয়া। হৃদয় কাননে তার হাজারো সুখের পায়রারা ডানা ঝাপটাচ্ছে। বাসন্তী কোকিলেরা কুহুকুহু ডেকে তাদের প্রেমের বিজয় গাঁথা গাইছে। ফুটন্ত গোলাপ-মালতীরা তাদের পবিত্র প্রেমের খুশবু ছড়াচ্ছে। কাননের সর্বত্র ঝংকিত হচ্ছে তাদের ভালবাসার বিজয়ী সানাইয়ের সুর। সেই সুরে মাতোয়ারা হয়ে ভ্রমরেরা সব ছুটে আসছে ফুলের মধু খেতে। এই অগণিত ভ্রমরকুলের ভীড় ঠেলে এখনই এসে পড়বে ভ্রমর-রাজ, তার হৃদয় রাজ্যের অধিস্বর প্রিয়তম সালমান। এই কাননের ফুলের মধুর সেই তো একমাত্র যোগ্য হকদার। সে আসবে আর তার কোমল ছোয়ায় ফুল হবে ধন্য; সুগন্ধ ছড়াবে আরও অধিক মাত্রায়।

এমনতর নানা চিন্তা করতে করতে রুকাইয়া অনেকটা হাফিয়ে উঠল– 'কিন্তু তিনি কোথায়? কেন আসছেন না এখনও? তিনি কি জানেন না অপেক্ষার মুহূর্তের যাতনা কতবেশী পীড়াদায়ক?' রুকাইয়ার মনে এমনসব ভাবোদয় হতেই এসে গেল তার ভ্রমররাজ-এসে গেল প্রিয়তম সালমান। এসে গেল হৃদয় রাজ্যের অধিস্বর। সালমান কক্ষে ঢুকে প্রথমেই রুমের দরজাটা ভেজিয়ে দিল। এরপর সুন্নত মোতাবেক মিষ্টিস্বরে সুন্দর করে সালাম দিয়ে প্রিয়তমার প্রতি হাত বাড়িয়ে দিল মোছাফেহার জন্য। রুকাইয়াও নিম্নস্বরে সালামের উত্তর দিয়ে হাত বাড়িয়ে মুছাফেহা করল মনের মানুষের সাথে। হাত ধরা অবস্থায়ই সালমান বসে পড়ল নববধুর পাশটিতে। অতঃপর হাত ছেড়ে দিয়ে আস্তে করে ঘোমটাটি সরালো!

রুকাইয়ার মুখমন্ডল থেকে ঘোমটা সরিয়ে চমকে উঠল সালমান। এত রূপ নয়! যেন ফুটন্ত লাল গোলাপ। যেন মধ্যে রাত্রিতে সূর্য উঠেছে সালমানের বাসর ঘরে। চাঁদের কিরন, জ্যোৎস্নার হাসি আর ফুন্টন্ত গোলাপের রক্তিম পাপড়ির সৌন্দর্যও ম্লান হয়ে যায় তার নববধুর রূপের চমকে। সে তার নববধুর রূপের ছটায় বিমোহিত হয়ে হা করে তাকিয়ে রইল। স্বামীকে নিজের দিকে নিস্পলকভাবে তাকিয়ে থাকতে দেখে রুকাইয়া সলজ্জভাবে বলল, 'এত করে কি দেখছেন!' সালমান কোন উত্তর না দিয়ে তার চিবুক ধরে উপরে তুলে প্রেম-ভালবাসার বিজয় দিবসে তার গলায় পড়িয়ে দিল একটি স্বর্ণের নেকলেস। অতঃপর বলল, 'দেখছি তোমার রূপ সুষমা। তুমিই যে রুকাইয়া তা বিশ্বাস করতেই কষ্ট হচ্ছে আমার! তোমাকে মানুষ বলেই মনে হয়না আমার।'

'তবে আমাকে কি বলে মনে হয় আপনার!' বিস্ময় প্রকাশ করে বলল রুকাইয়া।

'হতে পারো হুর-পরী!' মুচকি হেসে বলল সালমান– কেননা তোমাকে প্রথমে যা দেখেছিলাম তার সাথে এখন মিল নেই।'

'কোন দিক দিয়ে মিল নেই, সেই রুকাইয়ার সাথে এই রুকাইয়ার? রুকাইয়াও মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করল।

'মিল নেই রূপের চমকে বলল সালমান–প্রথম দেখা রুকাইয়াও অসম্ভব সুন্দরী ছিল আর এই রুকাইয়াও তুলনাহীন সুন্দরী। তবে তখন চোহরায় তোমার যতটা না চমক ছিল, এখন তার চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশী যৌলস, মুখমন্ডলে এমন প্রভাময় দিপ্তী ছড়াচ্ছে যে, দৃষ্টি হটানো দায়। বলবে কি তোমার রূপের চমকের রহস্য?'

'আমি তো কোন কারণ খুঁজে পাচ্ছি না তবে... ।'

'তবে কি রুকাইয়া?'

'আমার ধারণা আপনার কথাটা মেনে চলার কারণেই আমার চেহারার এই পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।'

'আমার কথা!'

'হ্যাঁ, আপনার কথা' –বলল রুকাইয়া– 'আপনি আমাকে বলেছিলেন মেয়েদের চেহারাও পর্দার অন্তর্ভুক্ত– নেকাব ছাড়া পরিপূর্ণ পর্দা হয় না। আর আমি আপনার সেই কথাটি মেনে নিয়ে সেদিন থেকেই নেকাব ব্যবহার শুরু করি। আমার যা ধারণা, আপনি যে বলছেন আমার চেহারার রওনক আগের তুলনায় অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, তা এই নেকাব তথা পরিপূর্ণ পর্দা পালন করার জন্যই হয়েছে।'

'গুড আইডিয়া রুকাইয়া' –বলল সালমান– 'পরিপূর্ণ পর্দা পালন করার কারণেই তোমার রূপ এমন যৌলস– অপরূপা হয়েছে। এটা একটা বাস্তব সত্য যে, যে সকল মেয়েরা পরিপূর্ণ পর্দা রক্ষা করে চলে তাদের চেহারা যদি কালোও হয়, তবু তাদের মুখমন্ডলে পবিত্র এক আভা ফুটে উঠে– যা দারুন এক আকর্ষণ সৃষ্টি করে। পক্ষান্তরে, যে সকল মেয়েরা পর্দা করেনা– পর্দার ধার ধরে না কিংবা পর্দা করলেও পরিপূর্ণভাবে করেনা; পর পুরুষ থেকে চেহারাকে ঢেকে রাখে না, তাদের চেহারা যত ফর্সা হোক– সুন্দর হোক তাতে কোন জৌলস থাকেনা, কোন আকর্ষণ থাকে না। অসংখ্য অগণিত পর পুরুষের কুদৃষ্টির কারণে চেহারার লাবণ্যতা নষ্ট হয়ে যায়। উপরন্তু এই বদনজরীর কারণে তাদের চেহারায় রুক্ষভাব ফুটে উঠে। আর তখন সে মেয়েরা রূপ চর্চায় মেতে ওঠে। নানা রকম প্রসাধনী স্নো, পাউডার, মেকআপ আরো কত কি ব্যবহার করে। এর ফল কি হয় জানো? এর ফলে তাদের ত্বক রুগ্ন হয়ে পরে। ত্বকে দেখা দেয় নানারকম রোগ, যেমন– ব্রন, ত্বক ক্যান্সার, এলার্জি। গবেষণায় দেখা গেছে রূপ চর্চার জন্য বাজারজাতকৃত অধিকাংশ প্রসাধনীতে এমন সব রাসায়নিক পদার্থও ব্যবহৃত হয় যার ক্রিয়ায় ত্বকে ক্যান্সার পর্যন্ত হয়ে যায়।

সে যা হোক, আজ আমার মন অত্যন্ত আনন্দিত এজন্য যে, মহান রাব্বুল আলামীন আমাদের দু'আ কবুল করেছেন।'

'কোন দোয়া কবুল করেছেন আল্লাহ?' জিজ্ঞেস করল রুকাইয়া।

'কেন, ঐ যে সেদিনকার দোয়া, যেদিন ব্যাংকারে বসে আমি দু'আ করেছিলাম আর তুমি হঠাৎ এসে সে দু'আ সমর্থন করে 'আমিন' বলেছিলে।'

'ও আচ্ছা! সেই দু'আ।' বলল রুকাইয়া।

'হ্যাঁ সেই দু'আ'–বলল সালমান– 'তাই এসো আমাদের মনোবাসনা পূরণ করায় আমরা মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ দু'রাকাআত শুকরানা নামায আদায় করি এবং কতিপয় নেক দু'আ করে আবারও ফরিয়াদ করি। কেননা আল্লাহ ফরিয়াদ কারীদের ভালবাসেন।'

কথামত স্বামী-স্ত্রী দু'জন খাট থেকে নেমে কক্ষের মেঝেতে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত ভক্তি ও বিনয়ের সহিত দু'দু' রাকাআত শুকরানা নামায আদায় করল। নামায আদায় শেষে সালমান বলল, 'রুকাইয়া! সেদিন আমি দু'আ করেছিলাম আর তুমি আমিন বলেছিলে। আজ তুমি দু'আ করবে আমি আমিন বলব।'

'না, তা হয় না'–বলল রুকাইয়া– 'আপনি আমার স্বামী এবং আমার চেয়ে অনেক বেশী জ্ঞানী সুতরাং আপনিই দু'আ করুন আমি আমিন আমিন বলব।'

'রুকাইয়া! আমেরিকা তোমাদের উপর জুলুম করতেছে এবং তোমরা হচ্ছ মজলুম'–বলল সালমান– 'হাদীস শরীফে এসেছে, তিন ব্যক্তির দু'আ ব্যর্থ হয় না তার মধ্যে একজন হচ্ছে মজলুম। মজলুমের দোয়া আল্লাহ পাক মেঘের উপর উঠিয়ে নেন। আসমানের সকল দরজা তার জন্য খুলে যায় এবং বলা হয় আমি নিশ্চয় তোমার সাহায্য করব। তবে প্রয়োজনে তা বিলম্বও হতে পারে। অতএব তুমি দোয়া কর এবং আমি আমিন বলি।'

'সেই দিক বিবেচনা করলে আপনার দোয়াও অবশ্য কবুল যোগ্য'–বলল রুকাইয়া– 'কেননা আপনি মুসাফির। নিজ দেশ, আত্মীয়-স্বজন সব ছেড়ে একমাত্র ইসলামের স্বার্থে এই সুদূর ইরাক এসেছেন। আর ইরাকে যে এখন পরিপূর্ণ জিহাদের ময়দান তা বলার অপেক্ষা রাখেনা এবং ইরাকের প্রতিটি ঘর জিহাদের ময়দানের এক একটা দুর্গসম। সে হিসেবে আপনি যুদ্ধের ফিল্ডে অবস্থানরত একজন যুদ্ধবাজ মুজাহিদ। আর মুজাহিদদের এ সময়ের দু'আ ব্যর্থ যায় না বলে হাদীস শরীফে ঘোষণা দেয়া আছে। শুধু তাই নয় উপরন্তু তাদের দোয়া নবীদের দোয়ার মত কবুল হয় বলেও উল্লেখিত হয়েছে। সুতরাং দু'আ আপনিই করুন আমি আপনার সাথে আমিন আমিন বলতে থাকি।'

এভাবে দু'আ করার জন্য একে অপরকে বলতে লাগল। অবশেষে সালমান বলল, 'আচ্ছা! এ ব্যাপারটি এভাবে সমাধান হোক– আমি দোয়া করি তুমি আমীন বল এবং তুমি দোয়া কর আমি আমিন বলি।'

'হ্যাঁ, এটা একটা চমৎকার ফয়সালা'–বলল রুকাইয়া– 'তবে আপনিই আগে দোয়া করুন আমি আমিন বলি।'

রুকাইয়ার কথা মত দু'আর জন্য হাত তুলল সালমান– ইয়া আল্লাহ! আমরা তোমার গুনাহ্গার বান্দা। অগনিত গুনাহ্ করে তোমার সকাশে ক্ষমা ভিক্ষতে হাত উত্তোলন করেছি, তুমি মেহেরবানী করে আমাদের অপরাধ মার্জনা কর! সারা বিশ্বের মুসলমানদের তুমি ক্ষমা কর। আমাদের সকলের উপর তোমার অফুরন্ত রহমত বর্ষণ কর। কাফেরদের মোকাবেলায় আমাদেরকে বিজয়ী কর। মুসলমানদের হেদায়েত দান কর। তাদের সঠিক বুঝ দান কর। ইসলামের জন্য নিবেদিত প্রাণ মুজাহিদদেরকে তোমার গায়েবী মদদ দ্বারা নুসরত কর। ইরাক, আফগান, ফিলিস্তিনসহ সমস্ত বিক্ষুব্ধ মুসলিম জনপদকে আজাদ করে দাও। আমেরিকা, বৃটেন, ইসরাঈল, ভারতসহ সমস্ত মুসলিম বিদ্বেষী শক্তিকে তোমার গজব দ্বারা বিলুপ্ত করে দাও।

ইয়া রাব্বুল আলামীন! ইয়া আরহামার রাহিমীন! আমাদের এই নব জীবনের প্রারম্ভে তোমার কাছে ফরিয়াদ জ্ঞাপন করছি, তুমি আমাদের জীবনকে তোমার এবং তোমার রাসূলের সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করার তওফীক দান করো। সুখ, শান্তি এবং নিরাপত্তার সঙ্গে জীবন যাপন করার ব্যবস্থা করে দাও। জীবন চলার পথে কখনও যেন তোমার আদেশকে পদদলিত না করি এবং তোমার হুকুম মোতাবেক যেন সকল কর্ম সম্পাদন করতে পারি সেই শক্তি আমাদেরকে দান কর।'

এভাবে অনেকক্ষণ দু'আ করল সালমান। আর তার পাশে বসে রুকাইয়া আমিন! আমিন! বলল। সালমানের দু'আ শেষ হলে রুকাইয়া হাত তুলল– ইয়া আল্লাহ! ইয়া রাহমানুর রাহীম! আজকের এই শুভক্ষণে, মনে অনেক আশা নিয়ে তোমার মহিমান্বিত দরবারে আমাদের অপবিত্র চারখানা হাত তুলে ধরেছি। তুমি আমাদের হাতকে পবিত্র কর। আমাদের অপরাধ মার্জন কর। আমাদের মনের আশাগুলিকে পূরণ কর। আমাদেরকে বরকতময় হায়াত দান কর। আমাদের জীবনকে তোমার সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত কর। আমাদের মনের সমস্ত কুমন্ত্রনা বিদুরিত করে দাও।

হে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ! হে অনন্ত-অসীম ক্ষমতা ওয়ালা! হে অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তির আধার! আজ পৃথিবীর যাবতীয় কুফরী শক্তি ধরার বুক থেকে তোমার অনুগত বান্দাদের-মুসলমানদের নাম নিশানা মিটিয়ে দিবার কোশেষ করে যাচ্ছে। ইরাকের উপর তাদের দানবীয় থাবা বসিয়ে দিয়েছে। তুমি তোমার কুদরতী নজর দিয়ে ইরাকের দিকে তাকাও! দেখ, জালিমরা কত নির্মম নৃশংস নির্যাতন চালাচ্ছে আমাদের উপর। হে খোদা! তুমি ওই পাষন্ড-শয়তানদের উপযুক্ত শাস্তি দাও। ওদের শক্তি চূর্ণ কর। ওদের মোকাবেলায় আমাদের বিজয়ী কর। আমাদের শক্তি-সাহস-বুদ্ধি বৃদ্ধি করে দাও। আমাদের জান-মাল তোমার হাওয়ালা করলাম, তুমি হেফাযত কর।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের দাম্পত্য জীবনকে কল্যাণময় কর। শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে রক্ষা কর। আল্লাহ! তোমার কাছে শেষ আরজু, আমার দেশকে তুমি মুক্ত স্বাধীন করে দাও এবং আমাকে ও আমার স্বামীকে জীবনে-মরণে একই সাথে রেখ। তুমি আমার ফরিয়াদ কবুল কর হে ফরিয়াদ কবুলকারী!' সালমান বলল– 'আমিন।'

সালমান রুকাইয়ার মধুর বাসরে নামায ও দু'আ পর্ব শেষ হল। এবার তারা খাটে গেল। বসল একে অপরের কাছাকাছি-ঘনিষ্ট হয়ে। সালমান তার প্রিয়তমা স্ত্রীর হাত ধরে আরো নিকটে আনল। মাথায় হাত রেখে ললাট দেশে যেইনা চুম্বন করতে মুখাগ্রসর করল ঠিক সেই মুহূর্তে বিল্ডিংয়ের ছাদে এমন বিকট শব্দ হল যে, মনে হল আকাশ ভেঙ্গে পড়েছে বিল্ডিংয়ের উপর। থর থর করে কেঁপে উঠল বিল্ডিং। আতঙ্কিত হয়ে রুকাইয়া জড়িয়ে ধরল সালমানকে। সালমান হাত ধরা অবস্থায়ই রুকাইয়াকে নিয়ে খাট থেকে নেমে এলো। রুমের দরজা খুলে বাইরে বেরুলো। রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে ঘটনা আঁচ করার চেষ্টা করল। অন্ধকারে কিছু বুঝে উঠতে না উঠতেই আরো কয়েক দফা ভয়ংকর শব্দ হল। সেই সাথে সাথে বিল্ডিং ভেঙ্গে পড়তে লাগল। (সালমান বুঝল এটা মার্কিনীদের কারবার তারা ক্ষেপণাস্ত্রের মাধ্যমে আঘাত হেনে বিল্ডিংটিকে ধ্বংস করছে) তাই শশব্যস্ত হয়ে বলল, 'রুকাইয়া! বাঁচতে হলে এখান থেকে লাফ দেয়া ছাড়া উপায় নেই।' বলেই দু'জনে হাত ধরাধরি করে লাফ দিতে তৈরী হল। লাফ দিতে গিয়ে সালমান রেলিংয়ে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে ভিতরের দিক পড়ল আর রুকাইয়া পড়ল নিচের দিকে।

* * *

মানব জীবনের চিরকাংখিত মধুময় স্বপ্নীল রাত বাসর রাত। এই রাতটি কারও জীবনে আসে চির শান্তির অনাবিল ছোয়া নিয়ে, আর কারও জীবনে আসে অশান্তির দাবানল প্রজ্জ্বলিত করে। কারও জন্য মধুময়, কারও জন্য বিষাদময়। কারও সীমাহীন আনন্দের কারও সীমাহীন দুঃখ-বেদনার। কারও সুখময় দাম্পত্য জীবনের সূচনা, কারও সুখঝড়া অনন্ত দুঃখের ঠিকানা। সালমান ও রুকাইয়ার মধুময় বাসরটিও সুখময় আনন্দে ভরে ওঠার পরিবর্তে দুঃখের নীল বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। ঘোর অমানিশা গ্রাস করে নিল তাদের ভালবাসার স্বপ্নালোক। তারা পারলো না চির কাংখিত সুখাধারের অনাবিল সুখ মন-প্রাণ ভরে উপভোগ করতে। পারল না বহুদিনের তৃষ্ণার্ত হৃদয় দু'টিকে ভালবাসার পুষ্পরসে পরিতৃপ্ত করে নিতে। পারল না হাতে হাত রেখে একে অপরকে আদরে-সোহাগে ভরিয়ে দিতে। কেন পারল না? কে দিল তাদের বাধা? কোন অমানিষা আগমন করল তাদের বাসর ঘরে প্রেমের প্রজ্জ্বলিত দীপশিখাকে নিভিয়ে দিয়ে? এ কোন বিনাশী সর্বগ্রাসী-সর্বনাশী ঝড়; যে তাদের সুখের বাসরে তুষের আগুন জ্বালিয়ে মহাসর্বনাশা ঘটিয়ে দিয়ে গেল? হ্যাঁ এ সেই ঝড়, যে ঝড় আটলান্টিক মহাসাগরের বেলাভূমি থেকে উঠে এসে সমগ্র পৃথিবীময় ধ্বংশলীলা চালাচ্ছে। হাজারো প্রেমিক-প্রেমিকার ফুল শয্যাকে

লণ্ডভণ্ড করে দিচ্ছে। তাবৎ পৃথিবীময় তাণ্ডবলীলা চালিয়ে অশান্তির কালো ধোয়া উড়াচ্ছে। সে ঝড় মার্কিনী ঝড়। সে ঝড় ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়ে গেল একের থেকে অন্যকে।

বর্বর মার্কিন বাহিনীর নৃশংস ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় ধ্বংশ হয়ে গেল মেজর আসাদুল্লাহ সাহেবের চারতলা বিল্ডিংটি; যার দ্বিতীয় তলায় ছিল বর-কনের বাসর- ফুলশয্যা। তৃতীয় তলায় ঘুমন্ত ছিল পুত্র মুয়াজ, এতিম ছেলে রাহাদ ও আরো কতিপয় ছোট শিশু যারা বিবাহ অনুষ্ঠান উপলক্ষে আগমন করেছিল মেজর সাহেবের বাড়িতে। মার্কিনীদের এই পৈশাচিক হামলায় পুরো এলাকা জুড়ে নেমে এলো শোকের কালো ছায়া। মহল্লার মানুষজন এসে জড়ো হলো মেজরের সাহায্যার্থে। বিল্ডিংয়ের অবস্থানরতদের ভাগ্য সম্বন্ধে কেউই কিছু অবগত হতে পারছিল না। শুরু হল ধ্বংসস্তুপের মধ্যে অনুসন্ধান।

মেজর আবদুল্লাহ সাহেবের নেতৃত্বে পরিচালিত 'সালফিষ্ট ব্রিগেট অব সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর মুজাহিদ সৈনিকগণ এবং এলাকাবাসী যৌথভাবে অনুসন্ধান করতে শুরু করল। কিন্তু ধ্বংসস্তুপের মধ্যে থেকে উদ্ধার কাজ পরিচালনা করা অত সহজ নয়। এই ব্যাপারে পূর্ণ দক্ষতার পরিচয় দিলেন সাদ্দাম আমলের দমকল বাহিনীর চার সদস্য মুজাহিদ। তারা তাদের বিশেষ প্রশিক্ষণের প্রতিফলন ঘটিয়ে ধ্বংশস্তুপ থেকে উদ্ধার করল সালমান, মুয়াজ, রাহাদ ও অন্য শিশু পাঁচটিকে। কিন্তু পাওয়া গেল না রুকাইয়াকে। আঘাতের প্রচণ্ডতায় এবং অত্যধিক রক্তক্ষরণের ফলে উদ্ধারকৃত সব কজনের দেহ নিথর হয়ে গেছে। জীবিত কি মৃত বুঝা যাচ্ছে না। তাই জলদি তাদের গাড়িতে উঠিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল।

হাসপাতালে ডাক্তারগণ তাদেরকে জরুরী চিকিৎসা সেবাদানে দ্রুত সুস্থ করে তোলার প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন। ডাক্তারদের উন্নত চিকিৎসা আর অকৃত্রিম সেবা শুশ্রুষায় তিন ঘণ্টার মাথায় হুঁশ ফিরলো সালমানের। শিশুদের মধ্যে ফিরলো একজনের। সে হলো রাহাদ। বাকী শিশুদের মৃত বলে ঘোষণা দিলেন ডাক্তার। ছয় ছয়টা তরুতাজা ফুলের মত নিষ্পাপ শিশুর মৃত্যুতে তাদের মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজনরা পাগলের মত হয়ে গেলো। হাসপাতালের বারান্দায় কান্নার রোল পরে গেল। আত্মীয়-স্বজনের হাহাকার-আহাজারীতে আল্লাহর আরশও মনে হয় এ মুহূর্তে কেঁপে উঠছে। মেজর আসাদুল্লাহ শিশু পুত্রের লাশের দিকে তাকিয়ে শোকে দুঃখে পাথর হয়ে গেলেন। একদিকে পুত্র শোক অন্য দিকে কন্যা নিখোঁজ। তার উপর জামাতা সালমান মুমূর্ষ অবস্থায় হাসপাতালের বেডে কাতরাচ্ছে। খুব কঠিন সময় অতিবাহিত করছেন তিনি। তবুও ধৈর্য্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করে চলছেন এই বীর মুজাহিদ।

মেজর আসাদুল্লাহ সাহেবের বাড়ির এই দুর্ঘটনায় তার নেতৃত্বে পরিচালিত 'সালফিস্ট ব্রিগেট অব সালাহুদ্দীন আইয়ুবী'র মুজাহিদরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। তারা একের পর এক দখলদারদের উপর হামলা চালিয়ে এই অমানবিক হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নিতে লাগল।

মাত্র ২৪ ঘণ্টায় তারা ১৪ জন মার্কিন সৈন্যকে হত্যা করল। এ ছাড়া আহত করল অগণিত। ভূপাতিত করল দু'টি চিনুক হেলিকপ্টার, ধ্বংস করল ৪টি সাজোয়ান ও দু'টি হামভী সামরিক যান।

রুকাইয়ার বিয়ের বাসরে হামলা, নিখোঁজ রুকাইয়া, আহত তার স্বামী, তার আদরের ছোট ভাইসহ ছয়টি নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করায় রুকাইয়ার বান্ধবী সালমা, মাহমুদা এবং অন্যান্যরা দারুন ক্ষুব্ধ হল। প্রতিশোধ নিতে তারা অস্ত্র নিয়ে বেড়িয়ে পড়ল। একস্থানে বাগদাদের এই বাঘিনী কন্যাদের সাথে মার্কিন সৈন্যদের সাথে তুমুল লড়াই বেধে গেল। প্রথমদিকে তারা মার্কিনীদের অবিরাম ফায়ারের সামনে টিকতে না পেরে পিছু হটতে লাগল। পিছু হটলেও তারা ফায়ার বন্ধ করেনি মুহূর্তের জন্যও।

সঙ্গিনীদের পিছু হটতে দেখে মাহমুদা চিৎকার করে বলল, 'বোনেরা আমার! তোমরা পিছু হটছো কেন? তোমরা পিছু হটে কি আরব কন্যাদেরকে ভিরুতার অপবাদে কলংকিত করছ না? তোমরা কি কাপুরুষ মার্কিন সেনাদের কাছে এটাই প্রমাণ করবে যে, ইরাকী কন্যারা তাদের মোকাবিলা করতে অক্ষম? কান পেতে শোন, তোমাদের বান্ধবী রুকাইয়া তোমাদের পিছু হটা দেখে, তোমাদের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করছে। তোমরা সম্মুখে অগ্রসর হও। মার্কিন সেনাদের উপর বীরঙ্গনা খাওলা (রাঃ) মত হামলা চালাও। প্রয়োজনে জীবন বিলিয়ে দিয়ে শহীদ হয়ে যাও। নিজেদের জন্য চিরস্থায়ী জান্নাত পাওয়াকে নিশ্চিত করে নাও।'

মাহমুদার সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় ৮ সদস্যের মহিলা মুজাহিদ কাফেলায় বিদ্যুতের মত চেতনা ঝলক দিয়ে উঠল। তারা সাঁ সাঁ করে সম্মুখে অগ্রসর হতে লাগল এবং অবিরাম ফায়ার চালাতে থাকল। প্রচণ্ড গুলি বিনিময় হতে লাগল উভয় পক্ষে। হঠাৎ মার্কিনীদের পক্ষ থেকে গুলি চালানো বন্ধ হয়ে গেল। মাহমুদার সঙ্গীনীরা তখনও অবিরাম ফায়ার চালাতে থাকল। মার্কিন সেনারা দিশেহারা হয়ে গেল তাদের আক্রমণে। অবশেষে ট্যাঙ্কের সাহায্য নিয়ে এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়ে পালিয়ে গেল। অত্যন্ত লজ্জাজনকভাবে পরাজয় বরণ করল তারা এই ইরাকী বীরঙ্গনাদের হাতে। কেন তার ট্যাঙ্ক কামান থাকা সত্ত্বেও আটজন অবলা নারীর সামনে পরাজয় বরণ করল?

এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেছে উক্ত বাহিনীর কমান্ডারের মুখ থেকে। ফিলিস্তিন হোটেলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে উক্ত কমান্ডার সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, আমরা লড়াইয়ের স্থান এজন্য দ্রুত ত্যাগ করেছি যে, প্রথমে মেয়েরা পিছু হটতে থাকল এবং গুলি প্রায় বন্ধ হয়ে গেলো। কিন্তু পরক্ষণেই তারা ক্ষীপ্ত বাঘিনীর ন্যায় সম্মুখে এগিয়ে আসতে লাগল এবং তাদের সাহায্যকারী বিপুল সংখ্যক মুজাহিদও ঠিক সে সময় তাদের পিছন পিছন ধেয়ে আসছিল। আমরা তাদের প্রতি অবিরাম গোলা নিক্ষেপ করে অতঃপর বিমান সাহায্য চাওয়ার কথা ভাবছিলাম। হঠাৎ কি হল, রাইফেলের ট্রিগার চাপি কিন্তু গুলি বের হচ্ছে না সব সৈন্যদের রাইফেলের একই অবস্থা। গেলাম ট্যাঙ্কের গোলা

নিক্ষেপ করতে, কিন্তু সেখানেও একই বিপত্তি। গোলা ব্যারেলের মাথায় গিয়ে আটকে গেল। বিমান সাহায্য চাইতে মোবাইল করবো তা মোবাইলেও লাইন পেলাম না।

এ অবস্থা দেখে আমার মনে ভয় ঢুকে গেল। আমি ভাবলাম এটা নিশ্চয়ই কোন অলৌকিক শক্তির কাণ্ড যে, আমাদের সকল কলকব্জা অকেজো করে দিল। মুসমানরা যেই অদৃশ্য খোদার আরাধনা করে তিনিই মনে হয় মেয়েদের সাহায্য করার নিমিত্তে আমাদের সকল আয়োজন বিকল করে দিলেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে সাহায্যকারী বাহিনীও প্রেরণ করলেন। তাই যদি হয় তবে, সে সৈন্যরাও এসে মেয়েদের সাথে যোগ দিলে আমরা একজনও জীবন নিয়ে ফিরতে পারবো না। কখনও আমি চাইনা যে, আমি ইরাকীদের হাতে নিহত হই আর আমার লাশটিও ওশিংটন না নিয়ে সমুদ্রে ফেলে দেয়া হোক। এজ্যই আমি সৈন্যদের নিয়ে ওখান থেকে চলে এসেছি।'

সাংবাদিকদের অন্য এক প্রশ্নের জবাবে কমান্ডার বলেন, আপনারা বলেছেন তখন আমি নিজের ধর্মের কাছে– যিশুর কাছে কেন সাহায্য চাইলাম না! এর জবাবে আমি দুটি উত্তার দিব। প্রথমত, এই যুদ্ধকে আমি ধর্ম যুদ্ধ মনে করি না। কারণ যেই যুদ্ধের ভিত্তি মিথ্যার উপর রচিত, তা কখনও ধর্ম যুদ্ধ হতে পারে না। ঠাণ্ডা মাথায় নির্বিচারে মানুষ হত্যাকে ধর্ম যুদ্ধ বলা যায় না। প্রতারণা করে অন্যের দেশ দখল করা আবার কেমন ধর্ম যুদ্ধ? দ্বিতীয়ত, আমরা যুদ্ধে শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছি তাকি যিশু দেখেন নি? যিশু যদি খোদা হয়ে থাকেন তবে তো তার দেখার কথা। যেমন মুসলমানদের আল্লাহ্ তার কতিপয় দাসীকে শত্রু কবলিত দেখে সাথে সাথে নিজের পক্ষ থেকে সাহায্য পাঠিয়ে দিলেন। সুতরাং যেই ধর্মে মিথ্যাচার করে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের লক্ষ্যে ধর্ম যুদ্ধ ডাকা হয় এবং নির্বিচারে মানুষ খুন করা হয় সেই ধর্ম কোন সত্য ধর্ম কি না সে ব্যাপারেই আমি সন্দিহান। যিশুর সাহায্য আর কি চাবো! বলবেন, এটা মিথ্যার যুদ্ধ জেনেও কেন আমি এ যুদ্ধে এলাম? এর উত্তর হলো, আমি সৈনিক, আমার কর্তব্য হলো উপরস্তদের হুকুম তামিল করা। একজন অনুগত সৈনিকের মতো এতদিন তাই করছি। তবে ভবিষ্যতে অন্যায়ের প্রতি এভাবে অনুগত থাকতে পারবো কিনা তা নিশ্চিত করে বলতে পারছি না। আমার এখন মনে হচ্ছে খ্রীষ্ট ধর্ম মিথ্যা এবং ইসলামই একমাত্র সত্য ধর্ম।

* * *

ঈগল যেই না শুনল তার আদরের বোন রুকাইয়ার কোন খোজ নেই। মার্কিনীদের নির্দয় আঘাতে তার স্বপ্ন মধুর বাসর রক্ত স্নাত বাসরে পরিণত হয়েছে। তার আদরের দুলাভাই সালমান কোরেশী হাসপাতালে মৃত্যুশয্যায় শায়িত। তখন রাগে ক্ষোভে সে যেন ফেটে পড়ল। মনের জ্বালা নিবারণ করতে তাৎক্ষণিকভাবে হামলা চালালো বাগদাদে মার্কিনীদের সদর দপ্তর গ্রীন জোনের অভ্যন্তরে। মর্টারের হামলায় গ্রীন জোনের পুরো ভবন থর থর করে কেঁপে উঠল। জানালার কাঁচ ভেঙ্গে চুরে খান্ খান্ হয়ে গেল। পুরো বাগদাদ নগরীই যেন প্রকম্পিত হয়ে হয়ে উঠল মর্টার বিস্ফোরণের শব্দে।

সালমানের সাথে রুকাইয়ার আক্‌দ সম্পন্ন হওয়ার পরপরই ঈগল চলে গিয়েছিল জনাব আবু বকর সাহেবের ওখানে। সেখানে আবু বকর সাহেবের আত্মঘাতি হামলা পরিচালনা অতঃপর তার বাড়িতে শহীদদের স্মরণে শুকরিয়া অনুষ্ঠান করেই সে চলে গিয়েছিল নিজের আস্তানায়। তার এই আস্তানায় রক্ষিত পর্ণ সামগ্রী, যা রুকাইয়াদের অভিযানে সংগৃহীত হয়েছিল; তা নিয়ে মার্কিন সেনা সদর দপ্তরে লংকা কাণ্ড ঘটিয়ে পালাবার পথে সাক্ষাত হলো প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের সাথে। পরিচয়ের পর ভালবাসার সেতু বন্ধন রচিত হলো জান্নাতুন নাঈমার সাথে। এত ব্যস্ততার ভিতর দু'দিনে সে আর তার ফুফার বাড়ি সংবাদ নেয়ার সুযোগ পায়নি। আজ এসে দেখল তার বাড়ি ধ্বংসস্তূপে পরিণত আর শুনলো রুকাইয়া নিখোজ এবং সালমান আহত হাসপাতালে।

প্রতিশোধ হিসেবে প্রথম দফাতেই আঘাত হানলো গ্রীন জোনে। গ্রীন জোনে হামলা করে ফেরার পথে সংবাদ পেল, তার শুভাকাংখী স্বাধীনতাকামী মুজাহিদা শারজাকে তার বাড়ি থেকে দখলদাররা গ্রেফতার করে নিয়ে গেছে। তাকে রাখা হয়েছে আবু গারীব কারাগারে। এদিকে বিবাহের অনুষ্ঠানে বোমা ফাটানোর চেষ্টাকালে ধৃত যে দুষ্কৃতিকারীকে ঈগল বন্ধী করে রেখেছিল তার সম্বন্ধে মুজাহিদরা রিপোর্ট দিল যে, সে অসলংগ্ন আচরণ করছে এবং অস্বাভাবিক কথাবার্তা বলছে।

ঈগলের হাতে এখন কয়েকটি জরুরী কাজ, যার কোনটির গুরুত্ব কোনটির চেয়ে কম নয়। প্রথমত রুকাইয়াকে খুঁজে বের করা এবং মার্কিনীদের থেকে ব্যাপক প্রতিশোধ গ্রহণ করা। দ্বিতীয়ত বন্দী মুজাহিদ শারজাকে উদ্ধার করা। তৃতীয়ত বিবাহ অনুষ্ঠানে ধৃত গাদ্দারকে শাস্তি দেয়া। এ সকল কাজের মধ্যে ঈগল সর্ব প্রথম গাদ্দারের শাস্তি দেয়াকে অগ্রাধিকার দিল। প্রথমে বদমাশটাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য চোখ বেধে ব্যাংকারের এক গোপন কক্ষে নিয়ে গেল।

ব্যাংকারের গোপন কক্ষে আনার পর ঈগল তার নাম জিজ্ঞেস করল। জিজ্ঞেস করল বাড়ি-ঘরের পরিচয় এবং কেন সে বোমা হামলা করতে চেয়েছিল বিবাহ অনুষ্ঠানে; আরও জিজ্ঞেস করল কিভাবে সে বিবাহ অনুষ্ঠানের কথা জানল। কিন্তু কোন প্রশ্নেরই কোন উত্তর সে দিলো না। শুধু চাতক পাখির মত তাকিয়ে রইল ঈগলের প্রতি। যেন সে কোন কথাই বলতে পারে না-বোবা। অথচ গত দু'দিনবন্ধী থাকা অবস্থায় সে বিভিন্ন রকম কথাবার্তা বলেছে। মুজাহিদদেরকে নানা রকম হুমকি ধমকিও দিয়েছে রীতিমত। আর এখন বোবা সেজেছে। ঈগল বুঝল সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠবে না। তাউ দু'জন মুজাহিদকে বলল, একে ব্যাংকারের সিলিংয়ের সাথে ঝুলাও। কথামত মুজাহিদদ্বয় লোকটাকে ছাদের স্লিংয়ের সাথে ঝুলিয়ে দিল। ঈগল একটি লোহার ষ্টেভ দিয়ে বদমাশটার পাছার উপর কয়েক ঘা লাগাতেই মুখ খুলল সে। ঠিক ঠিক মত ঈগলের প্রশ্নের উত্তর দিতে শুরু করল।

নাম তার আব্বাস আলী। বাড়ী সদর সিটিতে। জাতিতে শিয়া। মার্কিনীদের পরামর্শেই সে বোমা হামলার পরিকল্পনা করেছিল। এ জন্য সে মোটা অংকের পুরস্কারও পেয়েছে। বিবাহ অনুষ্ঠানে ঢুকেছিল বাহিরের মেহমানদের সাথে। তবে অনুষ্ঠানের কথা তার পূর্বে জানা ছিল না। সে মুজাহিদদের মধ্যে নাশকতামূলক তৎপরতা পরিচালনার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছিল বিভিন্ন স্থানে। তার প্রাত্যহিক রুটিন অনুযায়ী সেদিনও এই বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছিল। এমনি সময় বাড়ির গেটে ভিড় দেখে ছোট একটি বাচ্চাকে জিজ্ঞেস করে জানল এই বাড়িতে বিবাহ। তাই সেও ভিড়ের মধ্যে ভিতরে প্রবেশ করল। ঈগলকে সে পূর্ব থেকেই চিনত। তাই অনুষ্ঠানে তাকে দেখে সে ধরে নিয়েছিল উপস্থিত অন্যান্যরা নিশ্চয় মুজাহিদ। সুতরাং এই সুযোগ সে হাতছাড়া করতে চাচ্ছিল না।

ঈগলের প্রশ্নের উত্তরে সে আরো জানালো, তার কল পেয়েই বিমান থেকে হামলা করা হয়েছিল, যাতে নিহত হয়েছে মুজাহিদসহ চার চারড়িাড়াট নাবালক শিশু। আহত হয়েছে সালমান, বিধ্বস্ত হয়েছে মেজর সাহেরেব বাড়িটি।

ঈগল জানতে চাইল, তুমি তো ছিলে বন্দী। কল করলে কিভাবে। এবার বদমাশ খামোশ হয়ে গেলো। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে ঈগলের মাথায় খুন চেপে গেল। আয়রণ স্টেভ দিয়ে এলোপাথারি পিটান শুরু করল। সহ্য করতে না পেরে আব্বাস আলী গলা ছেড়ে চিৎকার আরম্ভ করলো। কিন্তু এতে ঈগলের এ্যাকশান থামলো না মোটেই। অবশেষে আব্বাস বলল, 'ঈগল বলছি! বলছি! আর মেরো না।'

এ কথা শুনে ঈগল পিটানো বন্ধ করল। আব্বাস বলল, আমার প্যান্টের ডান পকেটে হাত দিলেই জানতে পারবে। তার কথামত ঈগল তার ডান পকেটে হাত ঢুকালো। সেখানে পেলো দু'ইঞ্চি দৈর্ঘ্য এবং দেড় ইঞ্চি প্রস্থ একটি অত্যাধুনিক সুপার একসেলেন্ট মোবাইল ফোন। যা শরীরের যে কোন জায়গায় লুকিয়ে রাখা যায়। এই উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন মোবাইল তাকে সরবরাহ করেছে মার্কিনীরা।

ঈগলের জিজ্ঞাসাবাদে সে আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিল। অবশেষে গাদ্দার আব্বাস আলীকে ঈগল নিজ হাতে ব্রাশ ফায়ার করে তার গাদ্দারীর উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করল। রাতে মুজাহিদদের হাতে তার লাশ সোপর্দ করে বুঝিয়ে দিল এটিকে কি করতে হবে। মুজাহিদ ঈগলের নির্দেশানুযায়ী আব্বাসের লাশটিকে শহরের কেন্দ্রস্থলে ফিলিস্তিন হোটেলের সামনে একটি বৈদ্যুতিক খামের সাথে ঝুলিয়ে দিল এবং লাশের গায়ে সাদা কাগজের একটি সাইন বোর্ড বেধে দিল। কাগজটিতে লেখা ছিল, "আমি নিজ জাতির সাথে গাদ্দারী করে মার্কিনীদের দালালী করায় দেশ প্রেমিক ইরাকীরা আমাকে এই শাস্তি দিয়েছে। যারা এখনও মার্কিনীদের দালালী করছ তারা আমার পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো।"

সকাল বেলা বিষয়টি বাদদাদের জনগণের দৃষ্টিগোচর হলে ফিলিস্তিন হোটেলের সামনে জনতার ভীড় জমে যায়। অতি উৎসাহী শিশু-কিশোররা খুশীতে শ্লোগান দিতে শুরু

করে– মার্কিনীদের দালালেরা– হুশিয়ার সাবধান! দুষ্ট বুশের সৈনিকেরা, এই মুহূর্তে ইরাক ছাড়! ঈরাক হলো মোদের দেশ, হানাদারদের করবো শেষ!

এমনতর নানা শ্লোগানে তারা এলাকটি মাতিয়ে তুলল। বিষয়টি কতিপয় মার্কিনী এজেন্টদের দৃষ্টিগোচর হল। গাদ্দার আব্বাস আলীর পরিণতি দেখে তাদেরও অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠল। সাথে সাথে তারা তাদের প্রভু মার্কিন বাহিনীকে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করল এবং লাশটি উদ্ধারের আহ্বান জানাল। কিছুক্ষণ পরেই এক প্লাটুন মার্কিন সৈন্য সেখানে এসে উপস্থিত হল। তাদের দেখে শিশু-কিশোররা আরো জোরে শ্লোগান তুলল– বিদেশী দখলদার, এই মুহূর্তে ইরাক ছাড়! বার বার তারা একই শ্লোগান দিতে লাগল। অবশেষে সৈন্যরা বিপদ সংকেত বাজিয়ে ভিড়ের মধ্যে গাড়ি ঢুকিয়ে দিল। জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে দু'দিকে সরে গেল। তখন সৈন্যরা লাশটি নামিয়ে নিয়ে চলে গেল।

ঘৃণিত গাদ্দার মুনাফিক আব্বাস আলীকে শাস্তি দেয়ার পর ঈগল মনোযোগ দিল মার্কিনীদের হাতে বন্দী মুজাহিদা শারজাকে উদ্ধার করার প্রতি। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি তাকে উদ্ধার করা দরকার। কিন্তু কিভাবে? কিভাবে ঈগল তাকে উদ্ধার করবে? এ নিয়ে সে পড়ল মহা ভাবনায়। অনেক চিন্তা ভাবনার পর একটা সমাধান আসল তার মাথায়। হ্যাঁ, এক্ষেত্রে মার্কিন বিমান বাহিনীর সদস্য ক্যাপ্টেন পার্ল ইউলসনের সহায়তা নেয়া যেতে পারে। তবে এ ব্যাপারে তার সাহায্য নেয়া একদিকে যেমন ঝুকিপূর্ণ অপরদিকে নিরাপদও বটে। এছাড়া কারাগারে প্রবেশ করার অন্য কোন পন্থা আপাদত ঈগলের মাথায় আসছিল না। তাই সে ক্যাপ্টেন ইউলসনকে ফোন করল। তাকে সব কিছু খুলে বলল।

ক্যাপ্টেন পার্ল সাহেব ঈগলের কাছে ক'দিন সময় চাইলেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি কারাগারের ভিতর-বাহিরের তথ্য সংগ্রহ করবেন বলে জানালেন।

শারজাকে মুক্ত করানোর ব্যাপারে উইলসনের উত্তর শুনে ঈগল অন্য দিকে মনোযোগ দিল। তার মনের মধ্যে প্রতিশোধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। মার্কিনী সেনাদের রক্ত ঝড়াতে পাড়লে এ আগুন কিছুটা প্রশমিত হয়। আবার অল্প সময় পরই তা লেলিহান অগ্নি শিখায় রূপান্তরিত হয়। মার্কিনী সৈন্যদের সর্বশেষ সেনাটিকে ইরাক ছাড়া করতে না পারলে তার এ আগুন পূর্ণরূপে নির্বাপিত হবে না। তাই সে এবার টার্গেট করল মার্কিনীদের সেবাদাস জাতিসংঘের বাগদাদ অফিসকে। কেননা জাতিসংঘের ছত্রছায়ায় দখলদাররা তাদের দখলদারিত্বকে বৈধতাদানের প্রয়াস পাচ্ছে। তাছাড়া ইরাকীদের শত্রু মার্কিনীদের চেয়ে এ সংস্থাটিও কম নয়। সে জন্য প্রতিটি ইরাকীর নিকট জাতিসংঘ মানেই ইরাকের দশ লক্ষ শিশুর হত্যাকারী। লক্ষ লক্ষ শিশুকে চিকিৎসা-ওষুধের অভাবে পঙ্গুকারী, ইরাকীদের দুঃখ কষ্টের অন্যতম হোতা। এ সকল কারণেই জাতিসংঘের অফিসটি চক্ষুশুলে পরিণত হয়েছে ঈগলের।

ঈগল যখন জাতিসংঘ অফিসে হামলার পরিকল্পনা করছিল ঠিক সেই মুহূর্তে মুজাহিদ আবু ছালিম একটি লোককে ধরে নিয়ে এলো তার কাছে। ঈগল জিজ্ঞেস করল, 'এ লোক কে আবু ছালিম?'

'এ লোক আপনার সাথে সাক্ষাত করতে উদগ্রীব'– বলল আবু ছালিম– 'প্রথমে গেটের সম্মুখে এসে ঘোরাঘোরি করছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি চাও এখানে? বলল, আমি বাগদাদের ঈগলের সাথে দেখা করতে চাই। অত্যন্ত জরুরী আলাপ আছে তার সাথে। তাই একে আপনার কাছে নিয়ে এলাম।'

'আপনি কে? কি জন্যে আমার সাথে দেখা করতে চান?' আগুন্তুককে উদ্দেশ্য করে প্রশ্ন করল ঈগল।

'আমার নাম শাহিন রেজা। বাড়ি 'পুরনো বাড়ি' এলাকায়'– বলল আগন্তুক– 'তোমাদের সহযোগী শারজা রেজার পিতা আমি।'

'আপনি না মার্কিনীদের দালাল? আমার সাথে আপনার কি জরুরী আলাপ'– বলল ঈগল– 'আপনি কি এই আলাপ করতে এসেছেন যে, আমি আপনার সাথে গিয়ে মার্কিনীদের হাতে ধরা দিব আর আপনি তাদের থেকে লক্ষ ডলার পুরস্কার আদায় করে জীবনের রঙ্গীন স্বপ্ন পূরণ করবেন?'

ঈগলের কথা শুনে শাহীন রেজার চোখ বেয়ে দরদর করে অশ্রু ঝড়তে লাগলো। তিনি কাঁদো কাঁদো স্বরেই বলতে লাগলেন, 'ঈগল! আমি গাদ্দার, মুনাফিক, বেঈমান। অপরাধ জগতের মানুষ আমি। অপরাধই ছিল আমার নেশা এবং পেশা। এ কথা বাগদাদের সবাই জানে। কিন্তু কেউ জানে না কেন আমি অপরাধি হলাম। কোন কারণে আমি অপরাধকে পেশা হিসেবে বেছে নিলাম। যাক, সে অজানা অতীতের প্রসঙ্গ এখানে টেনে লাভ নেই। তবে শুন ঈগল! আমি এখন আর অপরাধ জগতের মানুষ ...।'

তার কথা শেষ করতে না দিয়ে বলল ঈগল, 'আমি আপনার সেই অতীত কাহিনী শুনব। আপনি বলুন, কোন কারণে আপনি অপরাধি হলেন?

'তুমি ধৈর্য্য ধরে শুনলে আমি বলতে পারব।' বলেন শাহীন রেজা।

'আমি অবশ্যই ধৈর্য্য ধরতে পারবো' আপনি বলুন।

'আমি ছিলাম বাগদাদের এক সম্ভ্রান্ত ঘরের আদরের সন্তান।' বলতে শুরু করলেন শাহীন রেজা– 'মাতা পিতার তৃতীয় সন্তান ছিলাম আমি। পড়তাম বাগদাদের কেন্দ্রীয় সরকারী স্কুলে। ছাত্র হিসেবে খারাপ ছিলাম না। আমি ছিলাম ক্লাসের সেকেন্ড বয়। ফাস্ট স্টুডেন্ট ছিল রাবেয়া নাম্নী এক সুন্দরী বালিকা। ক্লাসের প্রথম দিকের ছাত্র-ছাত্রী হওয়ায় পড়াশুনা নিয়ে আমাদের মধ্যে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বি হত। কিন্তু রাবেয়ার স্থান কখনও আমি দখল করতে পারতাম না। এ জন্য ওর প্রতি আমার ছিল প্রচণ্ড রাগ। ওকে একদম চোখেই দেখতে পারতাম না আমি।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, আমি তাকে হিংসা করলেও সে সব সময় আমার সাথে হাসি মুখে কথা বলত এবং সুন্দর আচরণ করে আমার রাগ দূর করতে চেষ্টা করত। রাবেয়ার মার্জিত আচরণ এবং অমায়িক ব্যবহারে ধীরে ধীর তার প্রতি আমার হিংসার পরিবর্তে ভালবাসার মুকুল ফুটতে শুরু করল। এক সময় আমি হয়ে গেলাম তার জন্য পাগল-দিওয়ানা। তাকে ছাড়া যেন আর একটা মুহূর্তও কাটতে চায়না। আমার হৃদয়ের রানীর আসনে স্থায়ী আসন করে নিল সে। তাকে ছাড়া পৃথিবীর সকল কিছু তুচ্ছ মনে হত আমার।

আমাদের এই সম্পর্কের কথা এক সময় আমাদের অভিভাবকগণ জানতে পারলেন। তারা এ কথা শুনে ক্ষেপে আগুন। কারণ দু' ফ্যামিলির মধ্যে ছিল পুরানো শত্রুতা। তারা কিছুতেই আমাদের এ সম্পর্ক মেনে নিচ্ছিলেন না। এদিকে আমাদের স্কুল লাইফ শেষ হয়ে কলেজে পড়ার পালা। এবারও দু'জনে ভর্তি হলাম একই কলেজে। কলেজ জীবনের দু'বছরের মাথায় আমরা গোপনে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলাম। একদিন রাবেয়াকে নিয়ে উঠলাম বাড়িতে। জানতে পেরে আমার পিতা ঘর থেকে বের করে দিল আমাদেরকে। রাবেয়াকে নিয়ে চলে গেলাম পুরানো বাড়ি এলাকায়। সেখানে আমার এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়িতে উঠলাম। সেই বাড়িতে থাকতে চাকরি নিলাম এক তেল কোম্পানীতে। চাকরি নেবার পর ঘর ভাড়া করলাম। মাসিক পাঁচ হাজার দিনার বেতনে আমাদের দু'সদস্যের সংসার ভালভাবেই কাটতেছিল। অত্যন্ত সুখ আনন্দে ভরেছিল আমাদের জীবন। রাবেয়ার মত গুণবতী এবং হাসি-খুশি মিশুক স্ত্রী পেয়ে আমি হয়েছিলাম ধন্য। বছরের মাথায় আমার সুখের সংসারে আগমন করলো আরেক সুখ। জন্ম নিল ফুটফুটে একটি কন্যা সন্তান। নাম রাখলাম 'শারজা'।

এতটুকু বলে থেমে গেল শাহীন। ঈগল বলল, 'থামলেন কেন শারজার পিতা? আমি তো ধৈর্য্য সহকারেই আপনার কথাগুলো শুনতেছি।'

ঈগলের উৎসুক্য দেখে শাহীন রেজা পুনরায় বলতে শুরু করল– এরপর থেকেই আমার দুঃখের দিন শুরু হল। উপসাগরীয় যুদ্ধে আমেরিকান জোট বাহিনীর নির্দয় বোমার আঘাতে কেড়ে নিল আমার স্ত্রী রাবেয়ার জীবন। আমি হয়ে গেলাম একা নিঃসঙ্গ। অল্পের জন্য রক্ষা পেল শারজা। ওর বয়স তখন সবেমাত্র ৬ মাস। স্ত্রীর মৃত্যুতে আমি পাগলের মত হয়ে গেলাম। যার জন্য ঘর ছাড়লাম, মাতা-পিতা ছাড়লাম সেই আমাকে ছেড়ে গেল। চির জনমের মত চলে গেল। আমাকে দুঃখ সাগরে ভাসিয়ে চলে গেল।

বলতে বলতে বাষ্পচ্ছন্ন হয়ে গেল তার কণ্ঠ। খানিক থেমে পুনরায় বলতে শুরু করলেন তিনি– একদিকে স্ত্রী হারাবার বেদনা সেই সাথে ৬ মাসের শিশু কন্যার লালন-পালন এবং দেখা শুনা করতে গিয়ে রীতিমত চাকরিতে যোগদান করতে পারতাম না। অনিয়মিত অফিস করায় কর্তৃপক্ষ চটে যেতে লাগল। এরই মধ্যে মেয়ের অসুস্থতার দরুন ৫দিন অফিস কামাই দিয়ে ৬ষ্ঠ দিন অফিসে গেলে কোম্পানীর প্রধান নির্বাহী খুব

করে বকা দিল আমাকে। তার মন্দ শুনে রাগে-ক্ষোভে তৎক্ষণাৎ চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে বাড়িতে চলে গেলাম। বাড়িতে এসে অন্য কোন কাজ খোজার আর কোন চেষ্টা করলাম না। এদিকে দিন যতই যাচ্ছে ততই আমার দুঃখ-দুঃচিন্তা বৃদ্ধি পেতে লাগল। সংসারে অভাব অনটন দেখা দিল। এমন দুর্দিনেও কেউ শান্তনা দেয়ার মত ছিল না আমার পাশে। বাহিরে বের হলে মেয়েকে ঘরে একা রেখেই বের হতে হতো।

এমতাবস্থায় দুঃখ-দুর্দশা এবং স্ত্রীর স্মৃতি ভুলে থাকার জন্য আমি নেশা দ্রব্য সেবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ি। একদিন এক রেস্টুরেন্টে পরিচয় হল এক মাফিয়া গডফাদারের সাথে। সে আমাকে জিজ্ঞেস করল, নেশা করছ কেন? আমি বললাম, সব ভুলে যাওয়ার জন্য। সে জিজ্ঞেস করল, কি ভুলার জন্য? আমি বললাম, স্ত্রীর শোক, সংসারের অভাব। এ কথা শুনে সে আমার আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল। আমার সার্বিক অবস্থার খোঁজ নিল খুটিয়ে খুটিয়ে। অতঃপর পাঁচ হাজার দিনারের একটা বাণ্ডিল আমার হাতে ধরিয়ে দিল বলল, এ দিয়ে কন্যার জন্য দুধ কিনবে এবং অন্যান্য প্রয়োজন সেড়ে নিবে। একটি ঠিকানা দিয়ে বলল, যখন যা প্রয়োজন হয় আমার এই ঠিকানায় এলেই পেয়ে যাবে। তোমার নাবালক সন্তানের যাতে কোন কষ্ট না হয় সে জন্য আমি সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে যাবো; তোমার কোন চিন্তা করার প্রয়োজন নেই।

এভাবে আমার অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে সে এক প্রকার কিনে ফেলল আমাকে। আমিতো দিনার পেয়ে খুশীতে আটখান। সঙ্গে সঙ্গে দু'হাজার দিনারে কিনলাম শিশু খাদ্য। এক হাজার দিনারে করলাম আনুষাঙ্কিক বাজার এবং বাকি দু'হাজার দিনার দিয়ে কিনলাম শরাব।

এর চারদিন পর আমার শরাব শেষ হয়ে গেল। আমি শরাবের জন্য পাগল হয়ে উঠলাম। চলে গেলাম গডফাদারের দেয়া ঠিকানায়। সেটা তার আস্তানা ছিল। সেখানে যাওয়ার পর সে আমাকে নিয়ে গেল তার আন্ডার গ্রাউন্ড রুমে। সেতো রুম নয় যেন জান্নাতী আয়োজন। অত্যাধুনিক বিশাল সামগ্রীতে ঠাসা সে রুমের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে শরাব এবং নারী। বাগদাদের বড় বড় ব্যবসায়ী এবং অনেক সরকারী কর্মকর্তাদের আসা-যাওয়া ছিল সে আন্ডার গ্রাউন্ড আস্তানায়। আমাকে সেখানে নিয়েই সর্বপ্রথম এক বোতল শরাব দিল। এরপর দেয়া হলো আঙ্গুর, আপেল ইত্যাদি বিভিন্ন রকমের ফল। আমি শুধু শরাব পান করলাম, ফল-মূল কিছুই খেলাম না। নেশাগ্রস্থ অবস্থায় সে কিলার আমাকে বলল, তোমার তো বাড়িতে কাজ-কাম করার লোক নেই। কাজ কাম করার জন্য আমি একটি মেয়ে দিচ্ছি। এ তোমার বাচ্চাকেও দেখা-শুনা করবে এবং তোমার সেবা-যত্নও করবে। এই বলে সেখানে অবস্থানরত একটি সুন্দরী রূপসী মেয়েকে ডেকে আমার হাওয়ালা করে দিল এবং আমার হাতে গুজে দিল আরও তিন হাজার দিনার।

এ যেন মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি। এ রকম একটি সুন্দরী রূপসী মেয়ে এবং নগদ অর্থ পেয়ে আমি একেবারে তার ভক্ত অনুরক্ত হয়ে গেলাম। আমার কাছে মনে হল তার চেয়ে উদার, মহানুভব, পরহিতৈষী মানুষ বুঝি আল্লাহর সৃষ্টি জগতে দ্বিতীয় আর একটি নেই।

'এটাই অবশ্য ঠিক যে, মানুষ বিপদ এবং অভাব-অনটনের মুহূর্তে যার কাছ থেকে সাহায্য পায় তাকেই ভাবে সবচেয়ে দয়ালু-সবচেয়ে বড় হিতাকাঙ্খী'– বলল ঈগল আর সেজন্য আপনিও তখন সেই কিলারকে ভেবেছিলেন সবচেয়ে ভাল মানুষ, সবচেয়ে বড় উপকারী বন্ধু তাইতো? আচ্ছা এবার বলুন তারপর কি হল? বলল ঈগল।

'গডফাদারের দেয়া সেই মেয়েটি ছিল গণিকা– বলল শাহীন রেজা– 'শুধু এ মেয়েই নয়, তার আস্তানার প্রতিটি মেয়েই এক একটি পেশাদার গনিকা। এদের দ্বারাই সে তার সিংহভাগ কার্যসিদ্ধি করে থাকে। আমার সাথেও সেই মেয়েটাকে দেয়ার উদ্দেশ্য ছিল আমাকে পুরোপুরি কব্জায় নিয়ে আসা। আর তার পরিকল্পনা পুরোপুরি বাস্তবায়ও হয়েছিল। আমি দিনরাত শরাব আর সেই গনিকা মেয়েটিকে নিয়েই মেতে থাকতাম। আর সেই মেয়ে আমাকে সর্বক্ষণ কিলারের সহযোগিতা করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করত এবং তাদের সেই অন্ধকার জগতের মন্দ কার্যাবলীকে রঙ্গীন স্বপ্নাকারে সাজিয়ে আমার সম্মুখে পেশ করত। এভাবেই আমি অপরাধ জগতের সাথে জড়িয়ে পড়ি। অপরাধ করা ও করানোই হয়ে পরে আমার পেশা এবং নেশা।'

কিন্তু এত সব কিছুর মধ্যেও আমার মেয়ে শারজা ছিল আমার একমাত্র হৃদয়ের রত্না। ওকে আমি আমার মন্দ কার্যাবলী থেকে দূরে সরিয়ে রাখতাম সবসময়। যাতে ও আমার মত না হয়। কেননা ও ছিল আমার প্রাণপ্রিয় অর্ধাঙ্গিনী, আমার হৃদয়ের অধিকারী রাবেয়ার নারীছেড়া ধন। রাবেয়ার পবিত্র আমানত ছিল ও আমার কাছে। আমি অপরাধ জগতে পা দেয়ার পর ভুলে গিয়েছিলাম কি আমার ধর্ম, কি আমার কর্তব্য। অর্থাৎ মানবতা আর মানুষত্ব বিদায় হয়ে গিয়েছিল আমার থেকে। লোভ-লালসা, পরশ্রীকারতা, মদ-নারীই হয়ে উঠেছিল আমার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য– আমার স্বপ্ন বিলাশ। তদুপরি মেয়েটাকে সৎভাবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছি, রাবেয়ার আমানতের খেয়ানত করিনি। আর আল্লাহর খাছ মেহেরবাণীতে মেয়েও আমার সৎভাবেই গড়ে উঠেছে। অবশ্য তার ব্যাপারে তোমার কাছে আমার প্রশংসা করার প্রয়োজন পরে না। তার সৎচারিত্রিকতা সম্বন্ধে তুমি ভালই অবগত আছ। যেহেতু সে তোমাদেরই সাথী বোন।'

নিজের কাহিনী বলতে বলতে শাহীন রেজা অত্যন্ত আবেগপ্রবণ হয়ে উঠলেন। এবার সে উচ্চস্বরে কেঁদে বলে উঠলেন 'ঈগল! আমি এত নিকৃষ্ট এবং লোভী হয়ে পড়েছিলাম যে, তোমাকে পর্যন্ত মার্কিনীদের হাতে ধরিয়ে অর্থ উপার্জনের ফিকির করেছিলাম। সেদিন আমার মেয়ে সচতুরতার পরিচয় না দিলে তুমি ঠিকই ধরা পরে যেতে।'

'আচ্ছা আপনার প্রাণপ্রিয় স্ত্রীকে মার্কিনীরা হত্যা করা সত্বেও আপনি কেন এখন মার্কিনীদের দালালী করছেন? আপনার মনে কি মার্কিনীদের প্রতি এজন্য ঘৃনা সৃষ্টি হয় না? স্ত্রী হত্যার প্রতিশোধ নিতে মন বিদ্রোহী হয়ে উঠে না?

'ঈগল! আমি যে পথে পা বাড়িয়েছিলাম এ পথে মানুষের কোন সঠিক অনুভূতি থাকে না'– বলল শাহীন রেজা– 'থাকে শুধু লোভ আর লোভ। দিনার আর দিনার। এ দলের সদস্যদের অতিরিক্ত শরাব পানের ফলে সকল বাস্তব অনুভূতি দুরীভূত হয়ে যায়। দিনারের লোভ হীন এমন কোন কাজ নেই যা তারা করতে পারে না। যে দিনার দিবে তার পক্ষে নিশ্চিন্তে কাজ করবে' হোক সে দেশ জাতি এমকি তার নিজেরও শত্রু। আমিও ঠিক এ ধরনের একজন লোক। অবশ্য এখন আমি সমস্ত অন্যায় কাজ ছেড়ে দিয়েছি। আর তাও মার্কিনীদেরই জন্যে।'

'সেটা কি রকম– জিজ্ঞাসা ঈগলের। খুলে বলুন কিভাবে মার্কিনীরা আপনাকে মন্দ কার্যাবলী ত্যাগ করতে সহায়তা করল।'

'সেটা বলার জন্যই আমি এ মুহূর্তে তোমার কাছে এসেছি।'–বলল শাহীন রেজা– 'সেদিন আমার দেয়া তথ্যানুযায়ী মার্কিন বাহিনী সৈন্য পাঠিয়ে ঈগলকে অর্থাৎ তোমাকে ধরতে পারল না। উপরন্তু তাদের সৈন্যরাই হলো আহত নিহত। এ জন্য তারা আমার উপর সন্দেহ করতে থাকে যে, আমি তাদের নয় বরং মুজাহিদদের অফাদার। কিন্তু সরাসরি আমাকে কিছু বলল না। কেননা, খুব কমলোকই গাদ্দারীর খাতায় না লিখিয়েছে। তাই যে কয়জন আমার মতো গাদ্দার তাদের বাগদাদে প্রবেশকে স্বাগত জানিয়েছে, তাদেরকে তারা হাতছাড়া করতে চায় না। কারণ যে কোন বহিরাগত হানাদারদের দখলদারিত্ব অক্ষুণ্ন রাখতে স্বজাতীয় কিছু গাদ্দার অবশ্যই প্রয়োজন, যারা তাদের পক্ষে শ্লোগান দিবে, তাদের কাজে সহযোগিতা করবে, পূর্ব সরকারের কর্মকর্তা কর্মচারীদের গ্রেফতার করতে সাহায্য করবে, রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন গোপন বিষয়াবলী সম্পর্কে তথ্য দিবে, সর্বোপরি তাদের পক্ষে জনমত তৈরী করতে সহায়তা করবে এবং প্রতিরোধ যোদ্ধাদের মাঝে ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করবে ইত্যাদি কাজের জন্যই সর্বদেশে সকল গাদ্দারকে দখলদার বাহিনী অনেকটা সমীহ করে চলে। দু'একটি ভুল চুখ হলেও কিছু বলে না ঠিকই তবে সন্দেহের আওতায় রাখতে ভুল করে না।

আমার বেলায়ও দখলদার মার্কিনী বাহিনী এই নীতি অনুস্বরণ করল। ঘটনার বেশ কিছুদিন পর বাগদাদের গাদ্দারদের নিয়ে দখলদাররা একটি বৈঠকে বসল। সেখানে সকল গাদ্দারের কার্য্যাবলী সম্বন্ধে ব্যাপক আলোচনা-পর্যালোচনা হলো। কারো কাজে সন্দেহ করার মত কিছু ধরা পড়ল না। শুধু আমার কাজেই সন্দেহ প্রকাশ করা হলো। তারা জনতো আমার মেয়ে দেশ মুক্তির লড়াইয়ে মুজাহিদদের সাথে কাজ করে। তাই আমাকে আমার ভুল তথ্য দেয়ার জন্য জবাবদিহি করতে বলল। আমি নিজেকে নিদোর্ষ প্রমাণ করার আপ্রাণ চেষ্টা করলাম। কিন্তু তারা আমার কথার তেমন বিশ্বস্ততা খুজে পাচ্ছে না

বলে মত প্রকাশ করল। অবশেষে বলল, তুমি যদি সত্যিকারেই আমাদের কল্যাণকামী হয়ে থাকো, তবে তোমার মুজাহিদা কন্যাকে আমাদের হাতে তুলে দাও। তাদের এ কথা শুনে আমার মাথা বিগড়ে গেল। মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। যেই মেয়েকে আমি নিজের জীবনের চেয়েও বেশী ভালবাসি, মহব্বত করি। যার জন্য আমার সমুদয় অর্থ-সম্পদ বিসর্জন দিতে পারি। যাকে আমি নিজের পীর মনে করে মুখের দিকে তাকিয়ে পর্যন্ত কথা বলি না, আমার সেই আদুরিনী কন্যাকে বলছে ওরা তাদের হাতে তুলে দিতে? এমন অশ্রুতপূর্ণ কথা শুনে আমার ভিতরের মানুষত্ব জেগে উঠল। সে যেন আমাকে ধিক্কার দিচ্ছে এই বলে, 'দেখলে হে লোভী! এই হচ্ছে লোভ-লালসার ফল। এটা তোমার পাপের শাস্তি।'

সেই মুহূর্তে আমার মনে চাচ্ছিল, ঐ সেনা অফিসারের জিহ্বাটা টেনে ছিড়ে ফেলি। ঘুষি মেরে ওর অপবিত্র মুখটি থেতলে দেই। কিন্তু পরিণামের কথা চিন্তা করে নিজেকে সামলে নিলাম এবং সাথে সাথে সেই মজলিস ত্যাগ করে ওখান থেকে বেড়িয়ে এলাম। আমি কিছু না বলে চলে আসায় তারা মনে করেছে আমি তাদের প্রস্তাব মেনে নিয়েছি। কিন্তু এ মজলিসের পর দশ পনের দিন অতিবাহিত হয়ে গেলেও যখন আমি মেয়েকে নিয়ে তাদের কাছে হাজির হলাম না, তখন তারা লোক পাঠালো আমার মেয়েকে নিয়ে তাদের হাতে তুলে দেয়ার জন্য। পুনরায় এ কথাটি শুনে আমি আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলামনা। মার্কিনীদের সংবাদদাতা সেই ইরাকী গাদ্দারটিকে কষে এক ঘুষি লাগালাম। তাকে বললাম, ঐ মার্কিন শয়তানদের গিয়ে বল, আমি আমার জীবন থাকতে আমার প্রাণাধিক প্রিয় কন্যাকে ওদের হাতে তুলে দিব না। আমার ঘুষি খেয়ে এবং উত্তর শুনে সে চলে গেল।

এর কিছু সময় পরেই আমার বাড়িতে আসল মার্কিনীদের এক প্লাটুন সৈনিক। তারা আমাকে ও আমার মেয়েকে নিয়ে গেল। সেনাবাহিনীর ক্যাম্পে নেয়ার পরে আমাকে বেধে চাবুক গিয়ে পেটাতে শুরু করল। পিটাতে পিটাতে আমাকে অজ্ঞান করে ফেলল। আমার কলিজার টুকরা মেয়েকেও আমার চোখের সামনে নির্যাতন করলো। আমার কাছ থেকে তারা মুজাহিদদের সম্বন্ধে তথ্য উদ্ধারের জন্য ব্যাপক জিজ্ঞাসাবাদ করল। বিশেষত তোমার ব্যাপারেই বেশী জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। তোমার সম্বন্ধেতো আমার কিছুই জানা নেই, তাই আমার কিছু বলারও প্রশ্ন আসে না। কিন্তু আমার মেয়ে তোমার সম্বন্ধে সব কিছু জানা সত্বেও সে মুখ খুলে কোন কথাই বলেনি।

এভাবে আমাদেরকে পাঁচদিন পর্যন্ত একাধারে জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে, সেই সাথে নির্যাতনও চালাতে থাকে সমান গতিতে। কিন্তু তাতে কোনই ফলোদয় হচ্ছে না দেখে তারা আমাদের সাথে কোমল আচরণ করতে থাকে। হাত-পায়ের বাধন খুলে দেয়। ভালভাল খাবার পরিবেশন করে। অতঃপর বলে, তোমরা যদি স্বেচ্ছায় আমাদের প্রশ্নের উত্তর না দাও তোমাদেরকে আবু গারিব কারাগারে প্রেরণ করা হবে। সেখানে গেলে যত

কঠিন মানুষই হোক আমাদের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে পারে না। সুতরাং ভালোয় ভালোয় এখানে বসে সব বলে দাও, সসম্মানে ছেড়ে দেবো তোমাদের উভয়কে। আমি বললাম, আমাদের ভাবার জন্য কিছু সময় নিরিবিল থাকতে দাও। তাহলে প্রশ্নের উত্তর পেলেও পেতে পারো। আমি একথা এজন্য বলেছিলাম যাতে ওদের ওই শয়তানী চেহারা দর্শন থেকে কিছু সময় হলেও রেহাই পেতে পারি। আর পালাবার কোন পথ পেলে যাতে পালিয়ে যেতে পারি। আমার কথামতো সকল সৈন্যরা সেখান থেকে চলে গেল। ওরা চলে গেলে আমি শারজাকে বললাম, মা-মনি তুমি যেভাবে পার পালিয়ে যাও। আমাকে যদি ওরা মেরেও ফেলে, ক্ষতি নেই। শারজা বলল, আব্বাজান! আমি এখন থেকে পালাতে চাইলেও পারব না। ওদের টার্গেট যেহেতু আমি, তাই পালাতে গিয়ে ধরা পড়লে বরং কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। সেক্ষেত্রে আপনার পালানো সহজ ও নিরাপদ। আপনি পালিয়ে গিয়ে ঈগল ভাইয়াকে কোনমতে সংবাদ দিতে পারলে, তিনি আমাকে উদ্ধার করার ব্যবস্থা করতে পারবেন।

শারজার কথা আমার পুরোপুরি বুঝে আসছিল না। তারপরও আমি ওর কথাই মেনে নিলাম। বহু কষ্টে সেখান থেকে পালালাম। ওখান থেকে পালিয়ে ওর দেয়া ঠিকানুযায়ী তোমাকে খুজে আজ এখানে এসে পেলাম। এখন তুমি আমার নয়ন মনি, মা শারজাকে উদ্ধার করার ব্যবস্থা কর ঈগল! আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাকে এখন আবু গারিব কারাগারে নেয়া হয়েছে এবং সেখানে তার ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হচ্ছে। আর সে অপেক্ষা করছে যে, এই বুঝি ঈগল তাকে উদ্ধার করতে আসছে।' বলতে বলতে জোরে কান্না জুড়ে দিল শাহীন রেজা।

সব শুনে ঈগল বলল, আমি বিশ্বাস করি, আপনি যে কাহিনী বিবৃত করলেন তা সত্য, কিন্তু তদুপরি যদি আমি বলি যে, এ কাহিনী বানোয়াট এবং আমাকে ধোকা দেয়ার জন্য এ কাহিনী সাজানো হয়েছে; যেভাবে ইতিপূর্বে শারজাকে ধোকা দিয়ে আমার ঠিকানা নিয়ে আমাকে মার্কিনীদের হাতে ধরিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তবে আপনি কি বলবেন? কিভাবে আমি আপনাকে বিশ্বাস করব; আপনার পূর্বের কার্যাবলীর প্রত তাকিয়ে নিজেই বলুন তো?'

'আমার অবস্থা হয়েছে সেই মিথ্যুক রাখালের মত'– বলল শাহীন রেজা– 'যে বাঘ এসেছে, বাঘ এসেছে বলে দু'বার গ্রামবাসীকে ধোকা দিয়েছিল, কিন্তু তৃতীয়বার যখন সত্যিকার বাঘ এসেছিল এবং সে 'বাঘ এসেছে' বলে চিৎকার করছিল, তখন গ্রামবাসী তার আর্তনাদে সাঁড়া দিল না। তারা ভাবল, এবারও সে মিথ্যা বলছে। আর এই সুযোগে বাঘ সে রাখালের গরুও খেল, তাকেও খেল। ঈগল! আমার কথা যদি তোমার বিশ্বাস না হয় তবে তুমি পরীক্ষা করে দেখতে পার। আমার মেয়ের জীবন বাঁচাতে আমি যে কোন কঠিন থেকে কঠিনতর পরীক্ষার সম্মুখীন হতে প্রস্তুত আছি।'

'সে পরীক্ষা দিতে গিয়ে যদি জীবন দিতে হয়– বলল ঈগল! তবুও কি রাজী আছেন সে পরীক্ষা দিতে?'

'রাজী মানে একশ'বার রাজী'– বলল শাহীন রেজা– 'আমার মা-মনির জন্য যদি আমার জীবনও কোরবান করতে হয় তাতেও আমি রাজী; হাজার বার রাজী।'

'আচ্ছা, তবেই আমি আপনার কথাকে বিশ্বাস করব এবং শারজাকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করব ইনশাআল্লাহ'– বলল ঈগল– 'আপনাকে আত্মঘাতি হামলা চালাতে হবে, পারবেন তো?'

'কোথায় হামলা চালাতে হবে ঈগল জলদি বল'– বলল শাহীন রেজা– 'এতো আমার সুনসীব যে, সারা জীবন পাপের পথে থেকে এখন তওবা করার পর আমার মূল্যহীন জীবনটা আল্লাহর নামে উৎসর্গ করতে পারব!'

'মূল্যহীন নয়, তওবা করার পর আপনার জীবন হয়েছে মূল্যবান, বলল ঈগল– তবে দ্বীনের স্বার্থে আল্লাহর পথে জীবন কোরবান করতে পারাটা অবশ্যই সুনসীব। আর এটা মানুষের জন্য এক বিরাট সুবর্ণ সুযোগ যে, আল্লাহর দেয়া জীবন, যা নির্দিষ্ট সময়মত অবশ্যই মৃত্যু মুখে ঢলে পড়বে, তা আল্লাহরই রাস্তায় উৎসর্গ করলে বিনিময় নিশ্চিত চির সুখের আগার জান্নাত প্রাপ্তি। আপনিও আত্মঘাতি হামলা পরিচালনা করে নিশ্চিত জান্নাতের অধিকারি হতে যাচ্ছেন। অতএব, আপনি নিয়্যাতকে পরিশুদ্ধ করে নিন। কেননা পরিশুদ্ধ নিয়্যাত ব্যতীত কোন আমলই আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়।' এভাবে আত্মঘাতি হামলার পূর্ব প্রস্তুতির বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে ঈগল জ্ঞাত করাল শাহীন রেজাকে। সেও সব শুনে মানসিকভাবে তৈরী হতে লাগল।

শাহীন রেজা ঈগলের কাছে এসেছিল সকালবেলা। তখন সকাল ৭টা কি ৮টা বাজে। বিকাল তিনটার দিকে তাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে গাড়ীতে বসাল ঈগল। মাঝখানে ৬/৭ ঘণ্টা সময় পেয়েছে সে আত্মঘাতি হামলা পরিচালনার জন্য রিয়াজত মুজাহাদা করার। এতেই তার মনে শাহাদাতের মৃত্যুর জন্য এমন শওক পয়দা হয়েছে যে, পারলে সে উড়ে চলে যায় লক্ষ্যস্থলে। টার্গেট তার তথাকথিত জাতিসংঘের বাগদাদ অফিস। ইরাকসহ সমগ্র মুসলিম দেশের বিরুদ্ধে এই ইহুদী-খৃষ্টানদের স্বার্থ সংরক্ষণকারী বিশ্বসংস্থাটির একচোখা নীতির ফলে অন্যান্য ইরাকীর মত ঈগলেরও চক্ষু শূলে পরিণত হয়েছিল এর বাগদাদ অফিসটি। তাই সে আজকেই চিন্তা করছিল সেটি ধ্বংস করার জন্য। এজন্য লোক নির্বাচনের ব্যাপারে চিন্তা করার সময়ই এসে পড়ল শাহীন রেজা। তার ভাগ্যেই যে এ হামলাটি পরিচালনা লেখা ছিল, তা কে জানত!

বিকাল ৪টার পর শাহীন রেজা পৌছল বাগদাদের পূর্বাংশে অবস্থিত হোটেল ক্যানেলের সম্মুখে। এককালের এই হোটেল ক্যানেলই বর্তমানে ইরাকে জাতিসংঘের সদর দফতর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই হোটেল ভবনে জাতিসংঘের অন্যান্য সংস্থার

অফিসও রয়েছে। ইরাকে এক সময় নিযুক্ত জাতিসংঘের অস্ত্র পরিদর্শকরা এই ভবন থোকেই ইরাকে মার্কিনীদের কথিত জীবানু রসায়ন ও পরমাণু অস্ত্র সন্ধানের কাজ চালাতো। হোটেল থেকে কিছু দূরে গাড়ি থামাল শাহীন। গাড়ি থেকে নেমে চার পাশের সার্বিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। সবকিছু দেখা শেষে একবার গাড়ির বোমাটিও নিরিক্ষণ করে নিল, আঘাতের সাথে সাথে বিস্ফোরিত হবে কি না। এসব কাজ সারতে গিয়ে তার আরও কিছু সময় চলে গেল। অবশেষে গাড়ির ছিটে বসে ফুলস্প্রিটে গাড়ি চালিয়ে দিল হোটেলের ভবন লক্ষ্য করে।

ব্যাস কাম সারা! এক আঘাতেই প্রচণ্ড শব্দে বিস্ফোরিত হল গাড়ির বোমাটি। ধ্বংসে গেল ভবনের সিংহ ভাগ। কেপে উঠল পুরো এলাকা। বোমাটি এত শক্তিশালী ছিল যে, ভবনের আশপাশের এমনকি কয়েক কিলোমিটার দূরবর্তী বাড়িঘরের জানালার কাঁচও তাতে ভেঙ্গে পড়ে।

যে মুহূর্তে জাতিসংঘ অফিসে আঘাত হানে শাহীন রেজা, ঠিক সে সময়ে ঐ ভবনে একটি সাংবাদিক সম্মেলন হওয়ার কথা ছিল। এ জন্য অন্যান্য সময়ের চেয়ে ভবনে জন সমাগম ছিল বেশী। বিস্ফোরণে কমপক্ষে শতাধিক লোক হতাহত হয়। তাৎক্ষণিকভাবেই মারা যায় ২৬ জন। হতাহতের মধ্যে ইরাকী ও বিদেশী উভয় ধরণের লোক রয়েছে। হতাহত লোকদেরকে হেলিকপ্টার ও সেনাবাহিনীর ট্রাকে করে সরিয়ে নেয়া হয়। এ সময় ভয়ের তোরে মার্কিন সৈন্যরা সাইরেন বাজাতে থাকে। বিস্ফোরণের ফলে আকাশ ধোঁয়ায় ছেয়ে যায়। মার্কিন সৈন্যরা আরো বিস্ফোরণের আশংকায় ঘটনাস্থল থেকে সাংবাদিকদের সরিয়ে দেয়। জাতিসংঘের ইতিহাসে এ ধরণের হামলা এই প্রথম। যার প্রথম কৃতিত্ব ঈগলের, দ্বিতীয় কৃতিত্ব শাহীন রেজার। সফল এই হামলার মধ্যে দিয়ে শাহীন রেজা ঈগলের এই শর্ত পূরণ করল। পরীক্ষায় পাশ করল ১০০ ভাগ।

ঈগল শাহীন রেজার গাড়ি বিস্ফোরণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তার সকল কর্মতৎপরতা কম্পিউটারের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ করছিল। কারণ সে গাড়ির মধ্যে সেই যন্ত্রটি লুকিয়ে রেখেছিল যার মাধ্যমে কম্পিউটারে গাড়ির সমস্ত ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করা যায়। এর কথা স্বয়ং শাহীন রেজাও জানত না। কিন্তু টার্গেটে আঘাত হানার সাথে সাথে গাড়ি ও গাড়ির চালকের সাথে সে যন্ত্রটিও ধ্বংস্তুপের ভিতর চাপ পরে জ্বলে পুড়ে ছাই খাই হয়ে যায়। আর সেই সাথে ঈগলের কম্পিউটারেও ঘটনাস্থলের ছবি আসা বন্ধ হয়ে যায়।

কম্পিউটারের যোগাযোগ ছিন্ন হতেই ঈগল গাড়ি নিয়ে বের হল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করতে। সেখানে এসে দেখল মার্কিন সৈন্যরা পুরো ভবনটিকে ঘিরে রেখেছে। কাউকে সেখানে ঘেষতে দিচ্ছে না। দূর থেকে ঈগল বিস্ফোরিত গাড়ির যে হালত প্রতক্ষ্য করল, তাতে শাহীন রেজার লাশের কোন অস্থিত্ব থাকার কথা নয়। যদিও দু' এক টুকরা থেকেও থাকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে, তবুও তা সৈন্যদের এই নিচ্ছিদ্র বেষ্টনী ভেদ করে বের করে আনা

সম্ভব নয়। ঈগল ভাবল, দু'চারদিন পর তো সৈন্যরা এমননিতেই চলে যাবে। তখন এসে লাশের টুকরাগুলো নেয়া যাবে। এই ভেবে সেখান থেকে গাড়ি নিয়ে চলে এলো।

এদিকে বিদেশী সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে বাগদাদে জাতিসংঘের অফিসে শক্তিশালী গাড়ি বোমা বিস্ফোরিত হওয়ায় এবং অনেক সাংবাদিক হতাহত হওয়ায়, এমনকি এ ঘটনায় জাতিসংঘের বিশেষ প্রতিনিধি সেরজিও ভিয়েরা ডি মেলোর আহত হওয়ায় সারা দুনিয়ায় এ নিয়ে হৈ চৈ পরে যায়। অনেকেই এ ঘটনার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে দায়ী করেন। কেউ কেউ বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাস নিমূলের ভূয়া অযুহাতে একের পর এক মুসলিম রাষ্ট্রদখল করে চললেও জাতিসংঘ এ ব্যাপারে কার্যকর কোন পদক্ষেপ না নিয়ে বরং নীরব দর্শকের ভূমিকাই শুধু পালন করেছে। আর এ জন্য আক্রান্ত মুসলমানরা জাতিসংঘের প্রতি দারুন ক্ষুব্ধ। বাগদাদে জাতিসংঘ অফিসে গাড়িবোমা বিস্ফোরিত হওয়া, এ সকল বিক্ষুব্ধ মানুষের প্রতিশোধ গ্রহণের বহিঃপ্রকাশ বটে। জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিবও এ ব্যাপারে জাতিসংঘের দ্বৈত নীতিকে দায়ী করেছেন।

ঈগল জাতিসংঘ অফিসের ধ্বংসাস্তূপ পরিদর্শন শেষে চলে এলো হাসপাতালে। সালমান আহত হওয়ার পর এই প্রথম সে তাকে দেখকে এলো। সালমানের সার্বিক অবস্থার খোঁজ খবর নিতে লাগল সে। সালমান তাকে দেখে কেঁদে ফেলল। সে বলল, ভাই ঈগল! আমি এজন্য কাঁদছি না যে, আমি আহতে হয়েছি। আমি এ জন্য কাঁদছি যে, তুমি তোমার আদরের বোনটিকে দিলে আমার হেফাজতে; কিন্তু আমি তাকে হেফাজত করতে পারলাম না। তাকে আমি রক্ষা করতে পারলাম না ঐ হিংস্র হায়েনাদের বিষাক্ত থাবা থেকে। হায়! সে বেঁচে আছে না মরে গেছে তাও জানি না। যদি তার কোন খোঁজ পাওয়া যেত তাহলে কতই না ভাল হত। ঈগল তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও!'

'সে যেথাই থাক তাকে আমি খুঁজে বের করবোই।'– সালমানকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বলল ঈগল। তার জন্য তুমি পেরেশান হয়োনা। তুমি নিজেও মারাত্মক অসুস্থ, তোমার এখন পেরেশানি মুক্ত থাকতে হবে। আমি জানি সালমান ভাই! তোমার বাহ্যিক আঘাতের চেয়ে মনের আঘাত বেশী কষ্ট দিচ্ছে তোমাকে। প্রিয়া হারানোর ব্যাথা যে কতটা গভীর বেদনাবিধুর তা বুঝি আমি। আমিও তোমার মত একই ব্যাথায় ভুক্তভোগী। আমার প্রিয়তমা সুমাইয়াকে হত্যা করেছে ওই নরপিচাশের সৈন্যরা। তাঁর বিরহ যাতনা আমাকে অনেক কষ্টে সামাল দিতে হয়েছে। আজো তার কথা মনে পড়লে বুকটা ব্যাথায় চিনচিনিয়ে ওঠে। তারপরও আমি ধৈর্য্য ধারণ করেছি। তুমিও ধৈর্য্য ধারণ কর। আমরা আমাদের প্রিয়তমাদেরকে এ কালে না পেলেও পরকালে অবশ্যই পাব ইনশাআল্লাহ। কেননা, আল্লাহ তায়ালা ধৈর্য্য ধারণকারীদের পুরস্কার কখনও বিনষ্ট করেন না বলে তিনি ওয়াদা করেছেন।

'আমি অবশ্যই এ ব্যাপারে ধৈর্য্য ধারণ করবো ঈগল'– বলল সালমান।' তবে ইরাকে বসে ধৈর্য্য ধারণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, দু'একদিনে মধ্যেই ডাক্তার

আমাকে হাসপাতাল থেকে বিদায় করে দিবে। তখন আমাকে থাকতে হবে তোমার ফুফার বাংকারে। আর সেখানে থাকলে রুকাইয়ার স্মৃতি আমাকে অসম্ভব রকম পীড়া দিতে থাকবে। এমতাবস্থায় কিছুতেই আমি ধৈর্য্য ধারণ করতে পারব না। তাছাড়া আমার ডাক্তারী রিপোর্টেই তুমি দেখতে পেয়েছো রকেটের আঘাতে আমার বাম পা অকেজো হয়ে গেছে। এই অকেজো পা নিয়ে যুদ্ধের রিপোর্ট সংগ্রহ করাও আর আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। সুতরাং তুমি আমাকে পাকিস্তান পৌঁছানোর ব্যবস্থা কর। সেখানে গিয়ে আমি ইরাক থেকে সংগৃহীত তথ্যাবলী দিয়ে একাধিক বই রচনা করবো, যাতে বিশ্বের মুসলমানদেরকে তোমাদের বীরত্ব, তোমাদের বদান্যতা, প্রেম-ভালবাসা, অতিথেয়তা এবং ধৈর্য্যশীলতা সম্বন্ধে অবগত করতে পারি। আর আমার সেই বই পড়ে কোন আত্মসচেতন মুসলিম যুবক যদি তার ইরাকী ভাই বোনের এই কঠিন বিপদ মুহূর্তে তাদের পাশে এসে দাঁড়ায় এবং তাদের পক্ষে শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে শহীদ হয়, তবেই আমার এই পঙ্গুত্ব জীবন ধন্য হবে অযতা এখানে পড়ে থাকার চেয়ে। আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস যেসব মুসলিম নওযোয়ানের মধ্যে এতটুকু পরিমাণও আত্মতেজ-জাত্যাভিমান বিদ্যমান আছে, সে তার এ সকল অসহায় মা-বোনদের করুণ পরিণতির কথা শুনে কিছুতেই ঘরে বসে থাকতে পারবে না। তার বিবেকেই তাকে তাড়িত করবে।

'তোমার চিন্তা এবং ধারণা যথার্থ সালমান ভাই! সালমানের বক্তব্য শুনে বলল ঈগল– 'তবে সমস্যা হলো আজকাল যে অবস্থা, তাতে পাকিস্তান যাওয়াটাই তো মুশকিল হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

ঈগলকে তার কথা শেষ করতে না দিয়ে সালমান বলল, 'এ সময়ে পাকিস্তান যাওয়া যদিও কষ্টকর, তবে অসম্ভবও নয় ঈগল। তুমি আমাকে শুধু নিরাপদে ইরাকের সীমান্তটা পার করার ব্যবস্থা করতে পারলেই হবে। সীমান্ত অতিক্রম করে ইরান কিংবা সিরিয়া পৌঁছতে পারলে, সেখানে আমাদের পাকিস্তানী দূতাবাসের কর্মকর্তাগণই আমাকে ইসলামাবাদের বিমানে তুলে দিবেন। এভাবে সহজেই আমি পাকিস্তান পৌঁছতে পারবো।'

'ঠিক আছে সালমান ভাই'– বলল ঈগল– 'আমি তোমাকে নিরাপদে সীমান্ত পার করে দিবার ব্যবস্থা করছি।' বলেই সেখান থেকে চলে গেল ঈগল।

পরের দিন অপরাহ্নে মেজর আসাদুল্লাহ সাহেবের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে হাসপাতাল থেকেই পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করল সালমান। মেজর সাহেবের থেকে বিদায় নেয়ার সময় সেখানে এক হৃদয়বিদারক অবস্থার সৃষ্টি হলো। সালমানকে বিদায় দিতে গিয়ে অঝোর ধারায় কাঁদলেন মেজর সাহেব। পুত্র-কন্যা হারানো বেদনার পুি ভূত আসুরাজি বুঝি এই মুহূর্তে ঝাড়লেন তিনি। সালমানকে স্বীয় বুকের সাথে আঁকড়ে রাখলেন অনেকক্ষণ। সেও আপন শ্বশুড়ের বুকে মুখ লুকিয়ে ঢুকরে কাদলো অনেক্ষণ যাবৎ। অবশেষে ঈগলের শান্ত্বনা বানীতে তারা উভয়ে ধৈর্য্য ধারন করলেন। অতঃপর শেষবারের মতো সালমান তার শ্বশুড়কে সালাম করে গাড়িতে গিয়ে বসলো।

সন্ধ্যার পরে সালমানকে নিয়ে ইরাক সীমান্ত পার হয়ে সিরিয়া পৌছল ঈগল। ভালোয় ভালোয়ই তারা পাকিস্তানী দূতাবাসে গিয়ে পৌঁছল। পথে শুধু এক স্থানে সিরিয়ার সিকিউরিটি গার্ড তাদের পথ রোধ করেছিল। তাও সালমানের অবস্থা দেখে এবং তার ইন্টারন্যাশনাল জার্নালিজম পাচপোর্ড নিরীক্ষা করে সাথে সাথে ছেড়ে দেয়। সালমানকে দূতাবাস কর্মকর্তাদের হাতে বুঝিয়ে দিয়ে ঈগল সে সময়ই গাড়ী নিয়ে ইরাক চলে এলো।

দশ

আবু গারীব কারাগার। বাগদাদের উপকণ্ঠে এক বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে যার অবস্থান। বর্বর মার্কিন বাহিনী কর্তৃক নিরপরাধ ইরাকী বন্দীদের উপর অমানবিক নির্যাতনের এক প্রতক্ষ্য স্বাক্ষী এই কারাগার। মার্কিনীরা কারাগারের বন্দীদের জন্য এক সাক্ষাত জাহান্নামে পরিণত করেছে এটিকে। প্রতিরক্ষার দিক দিয়েও এটি একটি সুরক্ষিত মজবুত কেল্লা যেন। কারাগারের সুপ্রসস্ত বাউন্ডারী দেয়ালের বহিরাংশে প্রায় ১৫ মিটার পর পর দুটি কাটাতারের বেড়া দিয়েছে তারা, যা পূর্বে ছিল না। প্রথম বেড়াটি অন্তত ২৫ ফুট উঁচু। এর মধ্যে প্রতি দুই ইঞ্চি অন্তর অন্তর কাটাতার সাটানো। সে তারগুলো ব্লেডের মতো ধারালো। যা বিষাক্ত ও বিদ্যুৎযুক্ত। এই বেড়া যে কেউ স্পর্শ করলে সে আর জীবনে বেঁচে থাকতে পারবে না। বিদ্যুতের শক থেকে যদি সে বেঁচেও যায়, তাহলে বিষক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে সে ধুকে ধুকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে।

এই বেড়ার ১৫০ মিটার পরে এ ধরনের আরেকটি বেড়া। এটি ১৫ ফিট চওড়া এবং ঘন চিকন কাটাযুক্ত জালের মতো, দূর থেকে মনে হবে জালের স্তুপ। কিন্তু এগুলোতে রয়েছে বিদ্যুতের সংযোগ। এই ধরনের বেড়া দেয়ার উদ্দেশ্য হল, কখনও যেন কোন বন্দী পালাবার চেষ্টা করে সফল হতে না পারে কিংবা বিক্ষুব্ধ ইরাকী গেড়িলারা কখনও কারাগারের উপর চড়াও হয়ে বন্দীদের ছাড়িয়ে নিতে না পারে।

সভ্যতার দাবিদার মার্কিনীদের অসভ্য আচরণের সুস্পষ্ট নিদর্শন লক্ষ্য করা যায় ইরাকের এই আবু গারিব কারাগারে এলে। নির্দোষ ইরাকীদের বন্দী করে অত্যন্ত ঘৃণ্য ও পৈচাশিক পন্থায় তারা নির্যাতন চালায় এই কারাগারে। বন্দীদের উপর নির্যাতন চালাতে এই কারাগারে দায়িত্ব পালনকারী একটি মার্কিন গোয়েন্দা ইউনিটের কাছে খোদ মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর পেন্টাগন থেকে একটি দিক নির্দেশনামূলক দলিল পর্যন্ত পাঠানো হয়েছে। এ দলিলের শিরোনাম, 'বন্দীদের জিজ্ঞাসাবাদের নিয়মাবলী।' এ দলিলে বন্দীদের উপর নির্যাতনের যেসব ধারা উল্লেখিত হয়েছে তার অধিকাংশই জেনেভা কনভেনশন বহির্ভূত। বন্দীদের উপর নির্যাতনের অনুসৃত এসব পদ্ধতি ইরাকে মোতায়েন মার্কিন স্থল বাহিনীর কমান্ডার লেঃ জেনারেল রিকার্ডো সারচেজও অনুমোদন করেছেন।

এ সকল নির্দেশনা এবং অনুমোদনের আলোকেই বন্দীদের উপর অমানবিক নির্যাতন চালানো হয়। জানা গেছে, বন্দীদের জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য পূর্ব জার্মান গুপ্ত পুলিশ

বাহিনীর লোক ভাড়া করে এনেছে মার্কিনীরা। জিজ্ঞাসাবাদের পূর্বে বন্দীদেরকে এমনভাবে নির্যাতন করা হয়, যাতে বন্দীরা গোপন তথ্য প্রকাশ করার ক্ষেত্রে মুখ খুলতে বাধ্য হয়। তাদের নৃশংস নির্যাতনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– বন্দীদের মাথায় বস্তা চাপিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত এমনিভাবে তিন দিন তিন রাত ৭২ ঘণ্টা পর্যন্ত বিনিদ্র রাখা, বন্দীদের উলঙ্গ করে ফ্লোরে হামাগুড়ি দিতে বাধ্য করা, অতঃপর তাদেরকে একত্রিত করে নিষ্ঠুরভাবে হাত কড়া পড়িয়ে মহিলাদের আন্ডারপ্যান্ট দিয়ে মুখ ঢেকে মানব পিরামিড তৈরী করা, তৃষ্ণার্ত-ক্ষুধার্ত বন্দীদের বিবস্ত্র অবস্থায় বেধে রেখে সেলের সামনে বসে মার্কিনীদের খাবার খাওয়া এবং উচ্ছিষ্ঠাংশ বন্দীদের মুখে-গায়ে নিক্ষেপ করা, এক ধরনের ধাতব বস্তুর সঙ্গে বন্দীদের মুখ বেধে পিছনেও ধাতব বস্তু ঢুকানো, বন্দীদেরকে নড়বড়ে বাক্সের উপর দাঁড় করিয়ে হাত বৈদ্যুতিক তার ধরিয়ে দেয়া এবং বাক্স থেকে পড়ে গেলেই তার মৃত্যু অবধারিত হওয়া, বন্দীদের সেলের মধ্যে হিংস্র বাঘ শিকারী কুকুর ছেড়ে দেয়া, চাবুক দিয়ে বেদম প্রহার করা, গলায় রশি বেধে কুকুরের মত নির্মমভাবে টানা হেচড়া করা, বন্দীদের দ্বারা মেথরের কাজ করানো, কাউকে দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ নোংরা ময়লায় পরিপূর্ণ টয়লেটে আটকে রাখা, মহিলা বন্দীনীদের প্রকাশ্য উলঙ্গ করে পালাক্রমে ধর্ষণ করা ও তাদের উপর ভয়াবহ নির্যাতন করা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মানুষ নামের এই অমানুষ মার্কিনীদের অমানবিক নৃশংস নির্যাতন শুধু ইরাকী নারী পুরুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং তারা ইরাকী বৃদ্ধ ও শিশুদের উপরও অত্যন্ত নির্দয়ভাবে এ সকল নির্যাতন প্রয়োগ করে চলেছে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের নির্যাতনের বিষয়টি এই ঘটনা থেকেই প্রমানিত হয় যে, এক বন্দী বৃদ্ধাকে মেঝের উপর হামাগুড়ি দিতে বাধ্য করে বলা হল সে একটি গাধা এবং তারপর একজন সৈনিক তার পিঠের ওপর সওয়ার হয়ে বসে। পাঠক চিন্তা করতে পারেন কত নির্মম নিষ্ঠুর, বর্বর, নীচ ও অসভ্য জানোয়ারের মত আচরণ এই মার্কিনীদের।

মার্কিনীদের হাতে বন্দী নির্যাতনের কথা জানা ছিল ঈগলের। তাই সে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি শারজাকে তাদের হাত থেকে উদ্ধার করতে চাচ্ছিল। শারজাকে উদ্ধার করাই তার এখন সবচেয়ে মুখ্য কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একেতো মুজাহিদদের সহযোগীনী হিসেবে তাকে উদ্ধার করা একান্ত কর্তব্য। দ্বিতীয়ত তাকে উদ্ধার করার জন্য সে তার পিতা শাহীন রেজার কাছে ওয়াদাবদ্ধ। অতএব ঈগল নিজের জীবনবাজী রেখে হলেও তাকে উদ্ধার করার সংকল্প গ্রহণ করল। সেই লক্ষ্যে সালমানকে সিরিয়া পৌঁছে দিয়ে এসেই সে ক্যাপ্টেন পার্ল উইলসনকে কল করল। ক্যাপ্টেন জানালেন, 'শারজাকে রাখা হয়েছে আবু গারীব কারাগারের দ্বিতীয় তলার এক সেলে। তার সাথে অত্যন্ত অমানবিক আচরণ করা হচ্ছে সেখানে।'

'যেভাবেই হোক তাকে আমি উদ্ধার করতে চাই'– বলল ঈগল– আপনি আমাকে সহযোগিতা করতে পারবেন কি না বলুন?'

'ঈগল! তোমাকে আমি সহযোগিতা করব'– বললেন উইলসন– 'তুমি মধ্য রাত্রির পর বাগদাদের পশ্চিমের মহাসড়কের নিকট এসো।'

ক্যাপ্টেন পার্ল উইলসন চাকুরী করেন মার্কিন বাহিনীতে। ইতিপূর্বে ইরাকী গেড়িলাদের সহযোগিতা করার অভিযোগে তিনি অভিযুক্ত হয়েছিলেন লেফটেন্যান্টের কাছে। কিন্তু সুনির্দিষ্ট প্রমাণাদি না থাকায় পাকড়াওয়ের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন। পুনরায় ঈগলকে কিংবা অন্য কোন গেড়িলাদর সহযোগিতা করলে গ্রেফতার হওয়ার সমূহ ভয় আছে তার। তদুপরি তিনি এসব আমলে না নিয়ে ঈগলকে সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়ে দিলেন। কারণ নিরপরাধী ইরাকী জনসাধারণের উপর তাদের সৈন্যরা যে নৃশংস অত্যাচার-নির্যাতন চালাচ্ছে তা দেখে তিনি নিজের ভিতর আত্ম যন্ত্রণায় ভোগেন। নিজেকেও তিনি এ সকল অপরাধের ভাগীদার মনে করেন। এর থেকে কিছুটা নিষ্কৃতি পেতে তিনি ইরাকীদের সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত নেন। তাই ঈগলসহ যে কোন গেড়িলা মুজাহিদ কিংবা কোন সাধারণ ইরাকীও যদি তার শরণাপন্ন হয়, তাকে তিনি সহায়তা করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

ক্যাপ্টেন পার্ল উইলসনের জন্ম নিউ ইয়র্কের এক খৃষ্টান পরিবারে। তার মাতা ইউহানা মেরী একজন নামীদামী গায়িকা ছিলেন। ফ্রি সেক্সের দেশ আমেরিকায় যেভাবে সন্তান জন্ম দিতে বিবাহ করার প্রয়োজন হয় না, সেই রীতি অনুযায়ী উইলসনের মাতাকেও বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয়নি উইলসনকে জন্ম দিতে। কুমারী মাতার এই সন্তান ধীরে ধীরে বড় হল। সন্তানকে স্কুলে ভর্তি করে দেয়া হল। হঠাৎ একদিন স্কুল থেকে এসে পার্ল তার মাকে পিতার কথা জিজ্ঞেস করল। তার মা তাকে পিতৃ পরিচয় দিতে ব্যর্থ হল। পার্ল তখন মায়ের উপর ক্ষেপে পানির গ্লাস নিক্ষেপ করল তার গায়ে। গ্লাস ভেঙ্গে কেটে গেল তার মায়েরা অর্ধ খোলা পেট। সাধারন একটা গ্লাসের আঘাতে এমন যখম হল যে তার মাকে হাসপাতালে পর্যন্ত নিতে হল।

হাসপাতালের বেডে শুয়ে ইউহানা মেরী গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন ছেলের প্রশ্নটি নিয়ে। ভাবনার অথৈ সমুদ্রে হাতরিয়েও তিনি কুল-কিনারা করে উঠতে পারলেন না। অন্যান্য আমেরিকানদের মত তিনিও এতদিন বিশ্বাস করতেন, 'জীবন উপভোগের জন্য' কিন্তু তার ছেলের প্রশ্ন শুনে তিনি নতুন করে জীবন নিয়ে ভাবতে শুরু করলেন। সেখানে দেখতে পেলেন তিনিও তার পিতার পরিচয় জানেন না। চার ভাই বোন ছিলেন তারা। অথচ কেউই জানতো না কে তাদের জন্মদাতা। এসব ভেবে নিজের জীবনের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা আসল ইউহানা মেরীর। তিনি অনুভব করলেন, তিনি অনেক পাপ করেছেন। তাই হাসপাতাল থেকেই ফিরে গেলেন খৃষ্ট ধর্মীয় চার্চে। এরপর থেকে তিনি নিজেকে গান-বাজনা আর রঙ্গ রসের কুৎসিত আসর থেকে সযত্নে গুছিয়ে নিলেন। নিজেকে

নিয়োজিত করলেন ধর্মব্রত পালন ও সৃষ্টির সেবার কাজে। নিয়মিত ধর্মীয় বিধি-বিধান পালন করতে লাগলেন তিনি। ইউহানা মেরীর সবচেয়ে প্রশংসাযোগ্য যে দিকটি, তাহল সৃষ্টির প্রতি মমত্ববোধ। তিনি মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী জগতকে হৃদয়দিয়ে ভালবাসেন। এসবের প্রতি তার মায়া যেন উপচে পরে। কোন মানুষ, কোন প্রাণী, কোন গাছ কষ্ট পেলে তার অন্তরও ব্যথিত হয়। তার এই বিশেষ গুণটির পুরোপুরি অনুপ্রবেশ ঘটেছে ছেলে পার্লের মধ্যে। সেও মায়ের মতো মানুষকে ভালবাসতে শিখেছে। হোক সে মানুষ সেতাঙ্গ কিংবা কৃষ্ণাঙ্গ। খৃষ্টান হোক বা মুসলমান, ইহুদী হউক, সকলকে সমান চোখে দেখতে শিখেছে সে। সৃষ্টির উপকার করলে স্বয়ং স্রষ্টা খুশী হন, এই বিশ্বাসটি মায়ের কাছ থেকে শিখে মর্মগুলো গেথে নিয়েছে পার্ল উইলসন। এই উপলব্ধি থেকেই সে ইরাকের জনসাধারণের উপর তাদের সৈন্যদের অমানবিক আচরণ বরদাশ করতে পারে না। এজন্যই ইরাকী গেড়িলা কিংবা সাধারণ জনতাকে তিনি সহায়তা করে থাকেন নিজেকে ঝুকির মধ্যে ফেলেও।

* * *

রাত ৩টা। বাগদাদের পশ্চিমের মহাসড়কের পার্শ্বে ঈগল অপেক্ষা করতে লাগল ক্যাপ্টেন পার্ল উইলসনের জন্য। অপেক্ষার মুহূর্তগুলো অতি কষ্টে অতিবাহিত হতে লাগল তার। ২০মিনিট চলে গেলো। তিনি এলেন না। ঈগল চিন্তায় পড়ে গেল। তবে কি তিনি আসবেন না? নাকি আসতে কোন সমস্যা হচ্ছে তার? ওয়াদা মিস করার মানুষতো নন তিনি! না তিনি ভুলে গেছেন অয়াদার কথা।'

এসব চিন্তা করে ক্যাপ্টনকে মোবাইলে কল দেয়ার জন্য ঈগল তার মোবাইল অন করল। মোবাইল অন করে ঈগল দেখল তাতে একটি ম্যাসেস এসেছে– 'ঈগল, তুমি ডানে-বামে এবং উপরে তাকাও'-পার্ল। ম্যাসেজ অনুযায়ী ঈগর ডানে-বামে তাকালো কিন্তু রাতের অন্ধকারে তেমন কিছুই নজরে আসল না। উপরে তাকিয়েই চমকে উঠল সে। শূন্যের উপর ভাসমান ওটা কি! ঈগল ইতস্ত করতে লাগল। ভাসান বস্তুটি থেকে একটি লাইলনের রশি নিম্নগামি এসে তার সম্মুখে ঝুলে পড়ল। সাথে সাথে মোবাইলে রিং আসল। ওপ্রান্ত থেকে ভেসে এলো ক্যাপ্টেন পার্ল উইলসনের কণ্ঠ– ঈগল! আমি এসে গেছি। তুমি জলদি তোমার সম্মুখে ফালানো রশি বেয়ে আমার নিকট চলে এসো।' এই বলেই মোবাইলের লাইন কেটে দিলেন ক্যাপ্টেন পার্ল সাহেব।

ঈগল ক্যাপ্টেনের নির্দেশ মোতাবেক ঝুলানো রশি বেয়ে কপ্টারে উঠে গেল। এটি একটি অত্যাধুনিক স্যুপারফ্লুইটি হেলিকপ্টার। চলাচলে কোন শব্দ নেই এই হেলিকপ্টারের। অতি সংগোপনে পৌছে যেতে পারে দুশমনের এলাকায়। উড়তে পারে অনেক নিচ দিয়েও। ঘন্টার পর ঘন্টা ল্যান্ড করে থাকতে পারে আকাশে। আকারেও খুব একটা বড় নয় এই হেলিকপ্টার। অতিজোর পাঁচ-ছয়জন লোক চড়তে পারে এতে। এসব হেলিকপ্টার যাতায়াতের চেয়ে গোয়েন্দা কাজেই বেশি ব্যবহার করা হয়।

ঈগল কপ্টারে উঠার পরই কপ্টারটি সম্মুখে চলতে শুরু করল। ক্যাপ্টেন পার্ল ঈগলের কুশলাদি জিজ্ঞেস করার পর বললেন, তোমাদের বন্দিনীকে উদ্ধার করতে সহযোগিতা করার আশ্বাস দেয়ার পর তার ব্যপারে আমি পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করতে চেষ্টা করেছি। সফলও হয়েছি অনেকাংশে। তবে কারাগারে প্রবেশের ব্যাপারে আমি যে পরিকল্পনা করেছি, তা ঝুকিপূর্ণ; আবার নিরাপদও।'

'পরিকল্পনাটি ব্যাখ্যা করবেন কি?' জিজ্ঞেস করল ঈগল।

'হ্যা, অবশ্যই ব্যাখ্যা করব'–বললেন ক্যাপ্টেন পার্ল উইলসন– 'আমার পরিকল্পনা হচ্ছে, আমি হেলিকপ্টার নিয়ে আবু গারিব কারাগারের আকাশে ল্যান্ড করব, আর তুমি কপ্টার থেকে প্যারাস্যুট নিয়ে কারাগারে অবতরণ করবে। কারাগারের ভিতর তোমার অপারেশন হতে হবে ৩০-৪০ মিনিট। এই সময়ের মধ্যেই বন্দিনীকে নিয়ে বেরিয়ে আসতে হবে। বেরিয়েই কল করবে আমাকে। আমি তৎক্ষণাৎ হাজির হব কপ্টার নিয়ে। অতঃপর পূর্বের ন্যায় কপ্টার থেকে রশি ফেলে দিব। তোমরা উভয়ে মজবুত করে ধরে রাখবে রশি। আমি ঝুলন্ত অবস্থায় তোমাদেকে নিয়ে অনেক উপরে উঠে যাবো। এই অবস্থায় কপ্টার চালিয়ে কারাগারের আওতার বাইরে চলে এসে অবতরণ করে তোমাদের কপ্টারে তুলে গন্তব্যে পৌছে দেব। আমার এই পরিকল্পনা যদিও কঠিন ও বিপদজনক, ধরা পরার আশংকাও আছে এতে। তদুপরি কারাগারে প্রবেশের জন্য এ ছাড়া দ্বিতীয় কোন পন্থা আমার চিন্তায় আসছে না। কেননা আমাদের সেনাবাহিনীর হাতের ছোয়ায় তোমাদের আবু গারীব কারাগার আর সেই আগের আবু গারিব কারাগার নেই। বাহ্যিক নিরাপত্তার দিক দিয়ে এটি এখন এমন এক দুর্ভেদ্য কেল্লায় পরিণত হয়েছে যা থেকে বন্দী অপহরণ তো দূরের কথা বলতে গেলে একটি পাখিও এর ভিতর থেকে বের করে আনা সম্ভব নয়। আমি আমার এ পরিকল্পনাটিকে নিরাপদ বলছি এ জন্য যে, শেষ রাতের দিকে সৈন্যরা থাকে ঘুমকাতুরে। তাই এ সময়ে নিঃশব্দে কারাগারে প্রবেশ করলে তারা টের পাবে বলে মনে হয় না। তা ছাড়া এ পর্যন্ত কখনও কোন কয়েদী এই কারাগার থেকে পালাতে চেষ্টা করেনি। অবশ্য সে সুযোগেই তাদের নেই এবং কখনও কোন বহিরাগত কারাগারের ভিতরে প্রবেশের দুঃসাহস দেখাতে পারেনি। এজন্য সৈন্যরা রাতে কারাগারের ভিতরে বিক্ষিপ্তভাবে পাহারা দিলেও ততটা গুরুত্বের সাথে দেয় না। উপরন্তু এ সময় অনেক সৈনিক নেশাদ্রব্য সেবন করে চোখে সড়ষে ফুল দেখতে থাকে।'

'আপনার পরামর্শ অনুযায়ীই অভিযান পরিচালিত হবে– বলল ঈগল। তবে আমি কৌতুলহবশত একটি প্রশ্ন করতে চাই, আপনার এই কপ্টার কি যে কোন স্থানেই ল্যান্ড করতে পারে?'

'আলবৎ পারে– বললেন ক্যাপ্টেন পার্ল– 'শুধু যে কোন স্থানেই না, প্রয়োজনো তোমার বাড়ির ছাদেও এই হেলিকপ্টার অবতরণ করাতে পারি আমি।'

'তাহলে আমাকে কপ্টারে তুলতে অবতরণ না করে, রশি দ্বারা উঠালেন কেন'– মুচকি হেসে বলল ঈগল।

'তা এজন্য করেছি, যাতে তুমি পরবর্তীতে বন্দিনীকে নিয়ে ঝুলতে পারবে কিনা তা দেখার জন্যে– ক্যাপ্টেনও মৃদু হেসে বললেন– জাস্ট পরীক্ষা, বুঝলে!'

তাদের কথোপকথনের মধ্যেই হেলিকপ্টার এসে গেল আবু গরীব কারাগারে আকাশে। এখানে এসেই ক্যাপ্টেন পার্ল তার কপ্টারের লাইট নিভিয়ে দিলেন। কপ্টারটিকে নিচের দিকে নামিয়ে আনলেন। পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন কারাগারের ভিতরের অবস্থা। এখানকার অবস্থা ঠিক তদ্রূপই যেরূপ ধারণা করেছিলেন তিনি। বাড়তি যা দেখা গেল তা হল, পূর্বাংশে একদল মহিলা ও পুরুষ সৈনিকের মাতাল অবস্থায় উচ্ছৃংখল আচরণ। তিনি কপ্টরটি কারাগারের পশ্চিমাংশের আকাশে ল্যান্ড করলেন। পরিকল্পনা মোতাকেব ঈগল প্যারাসোটের সাহায্যে নিয়ে নেমে পড়ল কপ্টার থেকে। আর ক্যাপ্টেন উউলসন অন্যত্র চলে গেলেন হেলিকপ্টার নিয়ে।

ঈগল যখন হেলিকপ্টার থেকে কারাগারে অবতরণ করল তখন তিনটা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিট। কিন্তু কে বলবে এখন রাত! চতুর্দিকে জ্বালানো বৈদ্যুতিক বাতির আলোতে দিনের মত আলোকিত কারাগার এড়িয়া। স্থানে স্থানে দাঁড়িয়ে প্রহরা দিচ্ছে সৈন্যরা। তবে রাতের সৈনিক ঘুমের আক্রমণে অনেকেই ধরাশায়ী হয়ে ঝিমুচ্ছে। কেউ কেউ আবার নিষ্ঠার সাথেই দায়িত্ব পালন করছে; ঘুমের আক্রমণ থেকে দূরে থাকছে। তদুপরি তারা ঈগলের ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নিতে সামর্থ হল না। অবশ্য এ ব্যপারে তাদের ধোকায় ফেলেছে ঈগলের পোষাক। কেননা এ মুহূর্তে তার পরিধানে মার্কিন কমান্ডারের ইউনিফর্ম। তার হাটা চলায়ও একজন সেনা কমান্ডারের পূর্ণ অভিব্যক্তি পরিস্ফুটিত। তদুপরি অত্যন্ত সতর্ক পদ-বিক্ষেপে সে কারাগারের প্রশাসনিক ভবনের দিকে অগ্রসর হতে লাগল। এমন বৈরি পরিবেশেও ঈগলের মনে কোন ভয়ের উদ্রেক হল না।

ঈগল যখন কারাগারের মূল ফটকের কাছে আসল, ফটক রক্ষী তখন ঘুমের অতিশয্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই টক্কর দিচ্ছিল। ঈগল তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আস্তে কিন্তু এমন গাম্ভীর্যের সাথে দমক দিল যে, সৈনিকটি কমান্ডার বেশী ঈগলকে দেখে ভড়কে গেল। ভয়ে থর থর করে কাপতে লাগল। ঈগল বলল, 'গেটের চাবি দাও? আমি ভিতরে যাবো। রাতের দায়িত্বে এভাবে অবহেলা কর কেন? দিনের বেলা ঘুমুতে পারো না?'

ঈগলের নির্দেশে সৈনিকটি কাপা হাতে চাবি এগিয়ে দিল। মুখে কিছু বলার আর সাহস পেল না। ঈগল তার থেকে চাবি নিয়ে তালা খুলে কয়েদখানার ভিতরে প্রবেশ করলো। ভিতরে প্রবেশ করা মাত্র সেখানকার অবস্থা দর্শনে সে হতভম্ব হয়ে গেল। এতদিন মার্কিনীদের বন্দী নির্যাতন সম্বন্ধে সে যা শুনেছে তার এক ঝলক দেখল এই মাত্র। একদল কয়েদীকে উপুড় করে শুইয়ে তাদের পিঠে লাথি মারছে সৈন্যরা। বন্দীদের

আর্তনাদ ও চিৎকারে পুরো কারাগার যেন কেঁপে উঠল। এই গভীর রাতেও কেন বন্দীকে এতটুকু ঘুমুতে দিচ্ছে না জালিম পাষণ্ডরা।

কোন মানুষ– যার ভিতরে সামান্যতম দয়া আছে, মানবতা আছে কিঞ্চিৎ পরিমান। সে এই করুণ দৃশ্য দেখে, এমন মর্মান্তিক-হৃদয়বিদারক নৃশংস নির্যাতন প্রত্যক্ষ করে কিছুতেই নিজেকে স্থির রাখতে পারে না; পারল না ঈগলও। পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভুলে গেল সে। নির্যাতনরত মার্কিন সেনাদের সে এমন জোরে 'খামোশ' বলে ধমক দিল যে, গভীর রাতের সে আওয়াজ, সমগ্র কয়েদখানা প্রকম্পিত করে তুলল। মাইকের আওয়াজের তুলনায় সে আওয়াজ কোন অংশে কম ছিল না। সাথে সাথে সৈন্যরা আচম্বিত হয়ে নির্যাতন বন্ধ করে বিস্ফারিত নয়ণে ঈগলের দিকে তাকালো। ঈগল পুনরায় উচ্চ আওয়াজেই বলল, এই বদমায়েশের দল, জেনেভা কনভেনশন লংগণ করে বন্দীদেরকে এভাবে নিষ্ঠুর নির্যাতন করছ কোন ...

ঈগল তার কথা শেষ করতে পারল না। এরই মধ্যে একদল সৈনিক বাহির থেকে ভিতরে প্রবেশ করেই ঈগলকে গ্রেফতার করতে উদ্যত হল। ঈগল বুঝে ফেলল সে ধরা খেয়ে যাচ্ছে, তবু হার মানতে রাজি নয় সে। যে সৈনিক তাকে হাতকড়া পড়াচ্ছিল তাকে মারল এক চটকানি। সৈনিকটি ছিটকে পড়ল দু'হাত দূরে। অন্য সৈন্যরা তখন ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর। শুরু হল তাদের হাতাহাতি লড়াই। ঈগলের আত্মরক্ষামূলক কৌশলের সাথে সেখানে অবস্থানরত এবং এইমাত্র আসা ৫০-৬০ জন সৈনিক মিলেও কুলিযে উঠতে পারল না। রীতিমত যেন বাঘে-ছাগলে লড়াই শুরু হল। তার লৌহকঠিন মুষ্ঠাঘাতে আরো চার-পাঁচজন সৈনিক ধরাশায়ী হয়ে কাতরাতে লাগল।

ঈগল জানে মার্কিনীদের হাতে গ্রেফতার হলে অসহনীয় নির্যাতন ভোগ করে ধুকে ধুকে মরতে হবে। তারচেয়ে লড়াই করে শাহাদাত বরণ করাও অনেক উত্তম। তাই এ মুহূর্তে সে শাহাদাতের নেশায় পেরেশান হয়ে উঠল। ক্ষুধিত ব্যাগ্রর ন্যায় লড়তে লাগল মার্কিন সেনাদের সাথে। নিমিষেই এক সৈন্যর থেকে ছিনিয়ে নিল অস্ত্র। সেটা ঠেকিয়ে অন্যজন থেকে নিল আরেকটি। এবার অস্ত্র পেয়ে তার শক্তি যেন বেড়ে গেল কয়েকশত গুণ। সৈন্যরাও ঈগলের হাতে অস্ত্র দেখে ঘাবরে গেল। সে তখন ট্রিগারে আঙ্গুল রেখে বলল, 'যে যেখানে আছো সেখানেই দাঁড়িয়ে থাক। একটুও নড়াচড়া করলে একদম ব্রাশ ফায়ার করে উড়িয়ে দেব।'

অবস্থা বেগতিক দেখে সৈন্যরা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল। সৈন্যদের এমন অসহায় অবস্থা দেখে মুমূর্ষপ্রায় কয়েদীরা আনন্দে তাকবীর ধ্বনি দিল। ঈগল সৈন্যদেরকে তার দ্বিতীয় নির্দেশ দিবে ঠিক সেই মুহূর্তে প্রথমে চটকানি খাওয়া সৈনিক অনেক কষ্টে উঠে এসে পিছন দিক থেকে রাইফেলের বাট দিয়ে ঈগলের মাথায় সজোরে আঘাত হানল। আঘাত খেয়ে ঘুরে পড়ে গেল ঈগল। মার্কিন সেনারা যেন আজরাঈলের হাত থেকে

জীবন ভিক্ষা পেল। তারা ঈগলকে ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে গেল। শারজাকে মুক্ত করতে গিয়ে আজ ঈগল নিজেই বন্দী হয়ে গেল।

এগিকে ক্যাপ্টেন পার্ল উইলসন ঈগলকে হেলিকপ্টার থেকে নামিয়ে দিয়ে অন্যত্র কপ্টার ল্যান্ড করে তার ফেরার অপেক্ষা করতে লাগলেন। তিনি ঈগলকে যে সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন তা অতিবাহিত হয়ে আরো বেশ কিছু সময় অপেক্ষা করলেন; কিন্তু ঈগলের ফেরার কোন নাম নেই। এমতাস্থায় ঈগলের মোবাইলে কল দিলেন। তাও কোন সাড়া পেলেন না। এবার তার মনে সন্দেহ দানা বেধে উঠল– ঈশ্বর না করুন, সে আবার ধরা পরেই গেল কিনা' এই চিন্তা আসতেই তিনি কপ্টার নিয়ে কারাগারের আকাশে চলে এলেন ঠিক সেই মুহূর্তে সৈন্যরা অচেতন ঈগলকে চ্যাংদোলা করে কয়েকখানা থেকে বের করে টর্চার সেলে নিয়ে যাচ্ছিলো।

ঈগলের অবস্থা দেখে ক্যাপ্টেন পার্ল উইলসন অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে চলে এলেন সেখান থেকে। যথাস্থানে হেলিকপ্টরর রেখে কামরায় গিয়ে প্রবেশ করলেন। যেই না প্রবেশ করলেন অমনি ভূত দেখার মতোই চমকে উঠলেন তিনি; সেখানে অবস্থানরত লেফটেন্যান্টকে দেখে। বিস্ময়ঝড়া কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'স্যার! আপনি এখানে?'

'এলাম তোমার খোজ-খবর নিতে– বললেন লেফটেন্যান্ট।' তা এত রাতে কোথায় গিয়েছিলেন তুমি?'

'মনটা ভাল লাগছিল না তাই রাতের আকাশে একটু ঘুরে-ফিরে এলাম আর কি।' চটপট করে জবাব দিল পার্ল উইলসন।

মন ভালো লাগছে না কেন, দেশের কথা মনে পরেছে বুঝি? জিজ্ঞেস করলেন লেফটেন্যান্ট।

'জি স্যার তাই– বললেন উইলসন– আজ কতদিন মাকে দেখি না। আজ হঠাৎ মার কথা মনে পড়লো।'

'তোমার সাথে অন্য কেউ গেল নাকি?' প্রশ্ন লেফটেন্যান্টের। তার মুখে রহস্যময় এক কুটিল হাসি।

'জি না স্যার! আমার সাথে আর কেউ যায়নি– বললেন পার্ল উইলসন– আমি একাই গিয়েছিলাম ঘুরতে।'

'তবে হেলিকপ্টারে তোমার পাশে বসা এই লোক কে?' প্যান্টের পকেট থেকে কয়েকটি ছবি বের করে উইলসনের সামনে পেশ করে বলল লেফটেন্যান্ট।'

ক্যাপ্টেন পার্ল উইলসন কপ্টারের মধ্যে ঈগল ও তার পাশা পাশি বসার ছবি দেখে যেন আকাশ থেকে পড়লেন। খামোশ হয়ে গেল তার জবান। নিশ্চল মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলেন তিনি। ভাবছেন তার লেফটেন্যান্ট কিভবে সংগ্রহ করল এই ছবি? তাদের

অভিযানের খবর তো তৃতীয় কারো জানার বা প্রত্যক্ষ করার প্রশ্নই উঠে না। তবে এই ছবি ...

'কি চুপ করে আছো কেন– বললেন লেফটেন্যান্ট– উত্তর দাও কে এই লোক? যে তোমার সাথে ছিল আর তুমি এখন অস্বীকার করছ, তোমার সাথে কেউ ছিল না বলে?'

লেফটেন্যান্টের কথায় এবারও কোন উত্তর দিলেন না ক্যাপ্টেন পার্ল উইলসন। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে ক্ষেপে গেলেন লেফটেন্যান্ট। বজ্রকঠিন হুংকার ছেড়ে বললেন, 'চুপ করে আছো কেন উইলসন? আমার কথার উত্তর দিচ্ছ না কেন? তোমার বাড়াবাড়ি কিন্তু সীমা ছাড়িয়ে গেছে।'

'বাড়াবাড়ি আমি একা করিনি'– ক্যাপ্টেন উইলসনও চড়া গলায় বললেন– বাড়াবাড়ি করছে ইরাকে নিযুক্ত আমাদের পুরো ব্যাটলিয়ন। স্বয়ং আপনি নিজেও।'

ক্যাপ্টেন পার্লের উত্তর শুনে লেফটেন্যান্ট অনেকটা শান্তস্বরে কথা বলতে লাগলেন। কেননা, তিনি জানেন ক্যাপ্টেন পার্ল একনিষ্ঠ ধার্মিক খৃষ্টান। আর খৃষ্ট ধর্মের সর্মবাণী হচ্ছে শান্তির পরশ বিলানো। এক গালে চপেটাঘাত করলে অন্য গাল পেতে দেয়া। যদিও অপরাপর খৃষ্টানরা তা মানছে না, কিন্তু পার্ল খৃষ্ট ধর্মের এই নীতিকে কঠোরভাবে মেনে চলেন এবং দারুন জেদীও বটে। সুতরাং তাকে চটালে তিনি নিজেও ধরাশায়ী হবেন। তাই তিনি কণ্ঠ কিছুটা খাদে নামিয়ে বললেন, 'পার্ল আমরা কিসের বাড়াবাড়ি করলাম? তুমি তো নিজ জাতির সাথে প্রতারণা করছ। বাড়বাড়ি তো তুমি করছ!'

'কেন, মিথ্যা অজুহাতে অন্যের দেশ দখল করা, সে দেশের মানুষদের বিনা দোষে অত্যাচার নির্যাতন করা, সে দেশের নারীদের ধর্ষণ করা কি বাড়াবাড়ি নয়' আপনার সৈন্যরা কি তা করছে না?' অত্যন্ত ঝাঁঝের সাথে বললেন ক্যাপ্টেন পার্ল উইলসন।

'কিসের মিথ্যা অজুহাত পার্ল'– বললেন লেফটেন্যান্ট– 'ইরাক কি রাসায়নিক ও জীবাণূ অস্ত্র লুকিয়ে রাখেনি? প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন কি জাতিসংঘের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেনি? ইরাক কি জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ১৪৪১ রেজুলেশন ভঙ্গ করেনি? এই সকল কারণেই তো আমরা ইরাকে আক্রমণ করেছি। বাড়াবাড়ি আমরা করিনি করেছে সাদ্দাম। আমরা শুধু তাদের বাড়াবাড়িকে অবদমন করেছি এই যা। আর তুমি এখন ইরাকীদের সহযোগিতা করে নিজেকে বাড়াবাড়ির আওতায় ফেললে ইরাকীদের মতই।'

'দেখুন স্যার! আপনারা বলেছেন, ইরাক রাসায়নিক, জীবাণু, পরমাণু ইত্যাদি নিষিদ্ধ অস্ত্র উৎপাদন করছে, বিস্তৃতি ঘটাচ্ছে'– বললেন ক্যাপ্টেন পার্ল উইলসন– 'আচ্ছা! অস্ত্র পরিদর্শরা বিগত দশ বছর অনুসন্ধান করেও তার কোন অস্তিত্ব পেয়েছে কি? তাদের কথা না হয় বাদই দিলাম, স্বয়ং আমরা ইরাক দখল করেছি প্রায় ৬-৭ মাস হলো। আমরাও কি এত দিনে কোন নিষিদ্ধ অস্ত্রের ভাণ্ডার আবিষ্কার করতে পেরেছি? পারিনি আর পারবোও না

কখনও। কারণ অস্ত্র তো ইরাকে নেই। হয়তো ছিলোও না কখনও। তবে নিষিদ্ধ অস্ত্র নিয়ে যে মাতামাতি হয়েছে তা ঐ নিষিদ্ধ অস্ত্র যা স্বয়ং আমরাই ইরাককে দিয়েছিলাম ইরানকে ধ্বংস করতে। আর ইরাক তা সে সময়ই বিনষ্ট করে ফেলেছে। সুতরাং এখন নিষিদ্ধ অস্ত্রের ধুয়া তুলে ইরাক আক্রমণ সম্পূর্ণ অন্যায় ও মানবতাবিরোধী কাজ বৈ কিছু নয়।'

'ক্যাপ্টন উইলসন! তুমি একজন নিষ্ঠবান খৃষ্টান হিসেবে শুনে রাখো'– বললেন লেফট্যানেন্ট– 'ইরাকে অস্ত্র থাক বা না থাক, সে জাতিসংঘ সনদ লংঘন করুক আর না করুক, আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের নায়ক ওসামা বিন লাদেনের আল-কায়দা সংগঠনের সাথে তার সংশ্লিষ্টতা থাক বা না থাক তাতে কিছু যায় আসে না, ইরাক বিধর্মীদের দেশ, এদেশে আমাদের ধর্মের প্রচার করা একান্ত প্রয়োজন। শুধু ইরাক নয়, বিশ্বে খৃষ্টান রাষ্ট্র ছাড়া যতগুলো রাষ্ট্র আছে, তা হোক মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, মগ বা অন্য যে কোন জাতির, সেসব রাষ্ট্রে আমাদের যিশুর মহান বানীকে উচ্চকিত করার জন্য সেসব দেশ নিজেদের করায়ত্তাধীনে আনার বিকল্প নেই। তাছাড়া ওসব রাষ্ট্রে আমাদের যে সকল খৃষ্ট ভ্রাতারা বসবাস করে, তারা অধিকার বঞ্চিত পরাধীন। আর আমাদের স্বর্গীয় যিশুর অনুসারীগণ দুনিয়ার বুকে পরাধীন হয়ে থাকবে সেটা কিভাবে মানা যায়? তাই ওই সকল দেশ অবশ্যই আমাদের দখল করতে হবে এবং খৃষ্টের ভক্তদেরকে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তি দিতে হবে। এটা খৃষ্ট দুনিয়ার জন্য অবশ্য কর্তব্য-ফরজ। এই ফরজ পালনের মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বর্তমান খৃষ্টান দুনিয়ার দরদী কাণ্ডারী, আমাদের প্রাণপ্রিয় নেতা, মহান প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লু বুশ পুরো দুনিয়াকে কব্জা করার নিমিত্তে ক্রুসেড যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে নিষ্ঠার সাথে সে যুদ্ধ পরিচালনা করে যাচ্ছেন। এ কোন অন্যায় যুদ্ধ নয়; এ কোন মিথ্যার যুদ্ধ নয়।'

লেফটেন্যান্টের বক্তব্য শুনে ক্যাপ্টেন পার্ল উইলসন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন। ধর্মের নামে এসব মিথ্যাচারকে তিনি মেনে নিতে পারছিলেন না। তবুও অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'মিষ্টার স্যার! আপনার ভাষ্যমতে সমগ্র বিশ্বে আমাদের আধিপত্য বিস্তার করতে হবে। কিন্তু আমরা কেন শুধু মুসলিম বিশ্বের উপর হামলে পড়েছি? অন্য দেশকে কেন টার্গেট করছি না?'

'পার্ল! তুমি আসলে কিছুই বুঝ না'– বললেন লেফটেন্যান্ট– 'সারা বিশ্ব জয় কথাটা বলা যত সহজ, জয় করা ততটা সহজ নয়। এর জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা, বাস্তব সম্মত পদক্ষেপ। এ জন্য প্রথমেই সারা বিশ্ব বাসীকে ক্ষেপিয়ে তোলা যাবে না। আমাদের বর্তমান টার্গেট মুসলিম বিশ্বের দিকে নিবন্ধ রেখে বিশ্বের অপরাপর জাতিকে আমাদের পক্ষে এনে দুনিয়ার বুক থেকে এই জাতিটার অস্তিত্ব মুছে ফেলতে হবে। মুসলমানদের খতম করার পর অন্যান্য জাতিকেও একের পর খতম করতে থাকবো আমরা।

এই প্লানকে সামেন রেখে আমাদের বুদ্ধিমান নেতা প্রেসিডেন্ট বুশ সাহেব 'সন্ত্রাসবাদ বিরোধী লড়াই' নামে বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্রকে আমাদের পক্ষে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। গঠন করেছেন Global coalition/Grand coalition। আর মুসলমানদের নির্মুলের প্রথম দফা আফগানিস্তান শেষ করে এখন ইরাক। এরপর ইরান, সুদান, সিরিয়া কিংবা সৌদি আরব। এভাবেই ক্রমান্বয়ে আমাদের পুরোবিশ্ব দখলের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে; যাতে সারা বিশ্বে একমাত্র খৃষ্ট ধর্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্মের অস্তিত্ব বিরাজিত থাকতে না পারে।

সে যা হোক, তুমি হলে অন্য ধাচের মানুষ। এতসব বুঝবে না তুমি। তোমাকে আমি জিজ্ঞেস করছিলাম তোমার সাথে কপ্টারে বসা এই লোকটি কে? কিন্তু তার উত্তর দাওনি তুমি। তবে শুনো, আমি বলে দিচ্ছি– এ হচ্ছে বাগদাদের ঈগল। যে আমাদের বহু সৈন্যকে হত্যা করেছে। অসংখ্য গাড়ি, ট্যাঙ্ক, সাজানো যান ধ্বংস করেছে। বাগদাদে আমাদের সবচেয়ে খতরনাক ছিল এই লোকটি। আর তুমি আমাদের সৈন্য হয়ে সাহায্য করেছো তাকে। এ ব্যাপারে পূর্বেও আমি ক'বার তোমাকে সতর্ক করেছিলাম। কিন্তু তুমি আমলে নাওনি আমার কথা। সে জন্য তোমার চলার পথে আমি এমন এক যন্ত্র ফিট করে রেখেছিলাম যাতে তুমি যেথায় যাও, যেখানে যাও, যা কিছু কর সব আমার কম্পিউটার মনিটরে ম্যামরি হতে থাকে। আজ যখন তুমি রুম থেকে বেরিয়েছ তখনই আমি তোমার কার্যাবলী প্রত্যক্ষ করার জন্য কম্পিউটারের সম্মুখে বসে ছিলাম। অতঃপর কোথায় কিভাবে ঈগলকে হেলিকপ্টারে উঠিয়েছো নামিয়েছো এবং পরিকল্পনা করেছো সব ছিল আমার নখদর্পনে।'

একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন লেফটেন্যান্ট, 'তোমার সমস্ত কার্যাবলী আমি পরখ করেছি, বললে হয়তো তুমি বিশ্বাস করতে না, তাই তোমাদের সহ অবস্থান ছবি আমি প্রিন্ট করে নিয়ে এসেছি। আর ঈগল যখন কারাগারের অভ্যন্তরে প্রবেশ করল তখন আমার নির্দেশেই ওখানকার কমান্ডার তাকে গ্রেফতার করে। আজ তুম যে অপরাধ করেছো তার জন্য তোমার কঠিন শাস্তি হওয়া দরকার ছিল। কিন্তু তোমাকে আমি এজন্য শাস্তি দিব না যে, যাকে গ্রেফতার করতে আমরা পুরস্কার পর্যন্ত ঘোষণা করেছিলাম তাকে তোমার জন্য একেবারে নিজের নাগালের মধ্যে পেয়ে গেলাম। তবে শুনে রাখ ক্যাপ্টেন পার্ল উইলসন! ভবিষ্যতে এ ধরনের অন্যায় কাজ থেকে সতর্ক থোকো নতুবা কঠিন পরিস্থিতি অপেক্ষা করছে তোমার জন্য।' বলেই ঝড়ের গতিতে রুম থেকে বেড়িয়ে গেলেন লেফটেন্যান্ট সাহেব। তার বিবরণী শুনে ক্যাপ্টেন পার্ল থ খেয়ে খাটের উপর বসে পড়লেন। ঈগলের গ্রেফতারীর জন্য নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলেন।

* * *

আহত সালমান সিরিয়ায় পাকিস্তানের দূতাবাসে পৌছার পর তার অবস্থার আরো অবনতি ঘটল। সেজন্য দূতাবাস কর্মকর্তাগণ তাকে জরুরী ভিত্তিতে পাকিস্তান পাঠানোর চিন্তা করলেন। তারা এয়ার লাইন্সে যোগাযোগ করলেন পাকিস্তানগামী কোন বিমান আছে কি না। খোজ-খবর নিয়ে জানতে পারলেন, দু'চার দিনে কোন বিমান সিরিয়া থেকে সরাসরি পাকিস্তান যাবে না। তবে দু'একদিনের মধ্যে চীনর উদ্দেশ্যে একটি ফ্লাইট ছেড়ে যাবে। দূতাবাস কর্মকর্তাগণ বিমান কর্তৃপক্ষের সাথে এই মর্মে আলোচনা করলেন, যেন তারা চীনাগামী ফ্লাইটে তাদের একজন অসুস্থ সাংবাদিককে নিয়ে যায় এবং তাকে লাহের, করাচী কিংবা ইসলামাবাদের যে কোন এক বিমান বন্দরে নামিয়ে দিয়ে যায়। অসুস্থ সাংবাদিকের কথা শুনে বিমান কর্তৃপক্ষ রাজী হলেন তাকে নিতে।

পরের দিন চীনগামী সিরিয়ার এয়ার লাইন্সের কে যাত্রীবাহী বিমানে সালমানকে তুলে দিলেন দূতাবাস কর্মকর্তাগণ। সাথে দূতাবাসের এক জন অভিজ্ঞ ডাক্তারকে দিয়ে দিলেন। সালমানকে নিরাপদে তার গন্তব্যে পৌছিয়ে ফিরে আসবেন তিনি। পথে বিমানে যাতে কোন সমস্যা না হয় জে জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে সম্পন্ন করা হয়েছে। সঠিক সময় বিমান সিরিয়ার এয়ার বেস থেকে সুদূর চীনের উদ্দেশ্যে আকাশে উড্ডয়ন করল। অল্প সময়ের মধ্যেই সিরিয়াকে আল-বিদা জানিয়ে ইরাকের সীমানায় প্রবেশ করল বিমান। ইরাকের সীমানায় প্রবেশ করার পরই পাইলট ঘোষণা করলেন, আমরা এখন ইরাকের সীমানা অতিক্রম করছি। পাইলটের ঘোষণা শুনে সালমান সচকিত হয়ে ওঠল। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল প্রিয় ইরাককে। মনে পড়ে গেল তার প্রিয়তমা রুকাইয়ার কথা। তার কথা স্মরণে আসতেই এক অব্যক্ত বেদনা হৃদয়ের আঙ্গিনায় মোচড় দিয়ে উঠল। এখন আর পাকিস্তান যেতে ইচ্ছে করছে না তার। ভালবাসার স্মৃতি যেন রশি বেঁধে নিচে টানছে তাকে। তার ইচ্ছে করছে বিমান থেকে লাফিয়ে পড়ে তার প্রিয়াকে খুজে নিয়ে আসতে। এই দুনিয়ায় অনেক কিছুরই স্বাধ জাগে মানুষের অন্তরে, কিন্তু সাধ্যের অভাবে অনেক স্বাধই থেকে যায় অপূরণীয়। সালমানের অবস্থাও হয়েছে তাই; সে তার প্রিয়তমাকে নিয়ে কত স্বপ্ন দেখেছিল, কত ভালবাসার জাল বুনেছিল তাকে ঘিরে। কিন্তু তার সকল স্বপ্ন, সকল ভালবাসা ধূলিস্যাৎ করে দিল মার্কিনীদের বোমার আঘাত। তার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল মনের মানুষকে-প্রিয় অর্ধাংগীনীকে।

পলকহীন নয়নে সালমান তাকিয়ে দেখতে লাগল ইরাককে। কিন্তু ইরাকের দেখার আর কি আছে এখন? হ্যাঁ, দেখার তো একটা জিনিস আছে, তা হলো আধুনিক সভ্যতার দাবীদারদের সৃষ্ট ধ্বংশস্তূপ। তাই তাকিয়ে দেখছে সে। মসুল, কিরকুক, বাগদাদ,

কালবালা, ব্যবিলন, নাজাফ, বসরা হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে বিমান, আর এসব শহরে মার্কিনীদের পরিচালিত তাণ্ডবলীলার সাক্ষী হয়ে পরে থাকা বাড়ি ঘর, অফিস-আদালত, মসজিদ ও অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বিৎভস চিত্র। বিমানে যোগে সালমান পাকিস্তান যাচ্ছে ঠিকই কিন্তু তার হৃদয়-মন প্রীতি ডোরে আবদ্ধ হয়ে থেকে যাচ্ছে ইরাকে।

বিকাল পাঁচটায় পাকিস্তানের আকাশ সীমায় প্রবেশ করল বিমান। এবারও পাইলট ঘোষণা দিলেন, আমাদের বিমান এইমাত্র পাকিস্তানের সীমানায় প্রবেশ করল। বিমান পাকিস্তান এসেছে শুনে সালমানের অনুভূতির কোষগুলো দ্বিতীয়বার নড়েচড়ে উঠল। তবে এবারের উপলব্ধিটা ভিন্ন প্রণালীর, অন্য ধাচের। দীর্ঘ ৭-৮ মাস পর সে ফিরে এসেছে পাকিস্তানে। প্রিয় জন্মভূমিতে। সেখানে তার পথ পানে চেয়ে আছে মা-বাবা, ভাই-বোনেরা। অপেক্ষার প্রহল গুণছে পত্রিকা অফিসের সহকর্মীরা। আর অল্প সময় পরেই তাদের সাথে দেখা সাক্ষাত হবে। কুশল বিনিময় হবে। দীর্ঘ বিরহের কষ্ট লাঘব হবে। অপেক্ষার প্রহর গোনার অবসান ঘটবে। এমনিতর চিন্তায় তার মন প্রফুল্ল হয়ে উঠল। সামান্য সময়ের জন্য সে ভুলে গেল ইরাকের কথা, রুকাইয়ার কথা, ঈগল ও অন্যান্যদের কথা।

সন্ধ্যার কিছু পরেই ইসলামাবাদের আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে অবতরণ করণ সিরিয়ান এয়ার লাইন্সের যাত্রীবাহী বিমানটি। সালমানকে নামিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটি আকাশে উড্ডয়ণ করে চীনের রাজাধানী বেইজিংয়ে উদ্দেশ্যে চলে গেল। সিরিয়া থেকে সাথে আসা ডাক্তার আবু তালহা সালমানকে বিমান থেকে নামিয়ে বিমান বন্দরের লাউঞ্জে নিয়ে গেলেন। তাকে সেখানে রেখে পত্রিকা অফিসের ঠিকানায় একটি প্রাইভেট কার ভাড়া করলেন। সালমানকে কারে তুলে পত্রিকা অফিসেরর দিকে চললেন তিনি। আজ বহুদিন পর ইসলামাবাদের রাস্তায় চলছে সালমান। রাস্তার দু'ধারের পরিচিতি অপরিচিত দোকান-পাটগুলো আগের মতই আছে। স্থানে স্থানে দু'একটি নতুন বিল্ডিং নজরে পরছে, যা ইতিপূর্বে ছিল না। সালমান তৃপ্তি সহকারে প্রিয় শহরকে দেখছে। যে শহরের সাথে মিশে আছে তার শৈশব, কৈশোরও যৌবনের স্মৃতি। স্মৃতির সেই অ্যালবাম আজ নতুন করে পৃষ্ঠা উল্টাচ্ছে তার চোখের সম্মুখে। আর সে তা উপভোগ করছে একাগ্রচিত্তে-গভীর আত্মপোলব্ধির মাধ্যমে।

দেখলে দেখতে গাড়ী চলে এলো পত্রিকা অফিসের সম্মুখে। গাড়ীর ড্রাইভার ব্রেক করতেই সালমানের চিন্তায় ছেদ পড়ল। গাড়ীর গ্লাসের ফাক দিয়ে ডান দিকে তাকাতেই নজরে পড়ল তার প্রাণপ্রিয় পত্রিকার সাইনবোর্ড। ডাঃ তালহা সাহেবের সহযোগিতায় গাড়ী থেকে নেমে পত্রিকা অফিসে প্রবেশ করল সালমান। তাকে দেখে অফিসের সকলে বিস্ময়ে বিমূঢ় হলে গেল।

মুহূর্তেই সালমানের আগমন বার্তা পৌঁছে গেল অফিসের প্রতিটি দফতরে আর নিমিষেই সকল কর্মকর্তা কর্মচারীগণ এসে হাজির হলো সালমানের চতুপার্শ্বে। তারা যেন

তাদের এক হারানো ভাইকে খুজে পেয়েছে। দীর্ঘদিন সালমানের কোন যোগাযোগ না থাকায় তারা ধারণা করেছিলেন সে হয়তো শহীদ হয়েছে। কিন্তু আজ তার আগমনে খুশীর বন্যা বইতে লাগল সবার মনে। তারা তার কুশলাদি জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। ইরাকের ব্যাপারে বিভিন্ন প্রশ্ন করতে লাগলেন। যখন তারা জানতে পারলেন সে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে ফিরে এসেছে তখন সকলের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল। তারা তাকে কোন প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকলেন।

সাহসী সাংবাদিক সালমান কোরেশী ইরাক থেকে ফিরে এসেছে এই সংবাদ পৌঁছল প্রধান সম্পাদক জনাব মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ নঈমুল হাসান আল-হিজাজী সাহেবের দফতরেও। সংবাদ শুনেই তিনি দফতর থেকে বেড়িয়ে এসে সালমানকে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলেন। মাথায়-কপালে চুম্বন করতে লাগলেন। তাকে ফিরে পেয়ে তিনি এত খুশী হলেন যেন আপন হারানো সন্তানকে ফিরে পেয়েছেন তিনি। তাকে নিয়ে গেলেন নিজের দফতরে। সিরিয়া থেকে তার সাথে আসা ডাঃ আবু তালহাকে মেহমান খানায় পাঠিয়ে দিলেন।

দৈনিক আস-সাদিক পত্রিকার প্রধান সম্পাদক মাওলানা মুফতী মোঃ নঈমুল হাসান আল-হিজাজী তার স্নেহধন্য প্রিয় সাংবাদিক সালমান কোরেশীকে নিজের দফতরে এনে বসালেন আপন আসনে। সালমান সেখানে বসতে অস্বীকৃতি জানালে তিনি জোর পূর্বক তাকে বসিয়ে বললেন, 'ব্যাস! এখানে বসতে কোন দ্বিধা করো না। আমার চেয়ে তোমার সম্মান কোন অংশে কম নয় বরং তোমার মর্যাদা এখন আমার চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশী। কেননা, তুমি জিহাদের ময়দান থেকে প্রত্যাবর্তনকারী গাজী।' অতঃপর তিনি তার যাবীয় অবস্থার খোজ খবর নিতে লাগলেন। সালমানও তার পিতৃসমতুল্য সম্পাদক সাহেবের নিকট তার ইরাক সফরের বিবরণ দিতে লাগল। সে এক ইরাকী কন্যার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে শুনে সম্পাদক সাহেব অত্যন্ত খুশী হলেন। কিন্তু পরক্ষণেই যখন শুনলেন তাদের বাসর রাত্রির সেই দুঃখময় ট্যাজেড্রীর কথা, তখন তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। সে সাথে সালমানকে সান্ত্বনা দিলেন এবং সমবেদনা প্রকাশ করলেন।

সম্পদক সাহেব সবচেয়ে বেশী চমৎকৃত হলেন ঈগলের কাহিনী শুনে। তিনি সালমানকে বললেন, 'সালমান! তুমি সুস্থ হলে তোমার ইরাক সফরের ঘটনাবলী ধারাবাহিকভাবে পত্রিকায় লিখতে থাকবে। যা পকিস্তানের মুসলমনদের তাদের ইরাকী ভাইদের বর্তমান অবস্থার একটা স্বচ্ছ ধারণা দিতে সহায়তা করবে। আর ঈগলের যে কাহিনী তুমি আমাকে সংক্ষেপে শুনালে তা বিস্তারিতভাবে লিখে একটা বই তৈরী করে ফেলবে।'

'শ্রদ্ধেয় সম্পদক সাহেব। আপনি যা বললেন এই পরিকল্পনা আমি ইরাক থেকেই নিয়ে এসেছি'– বলল সালমান– 'আর মূলত এজন্যই আমার দেশে ফেরা। নতুবা শহীদে

কারবালার দেশ ছেড়ে, বাগদাদের ঈগলের সঙ্গ ত্যাগ করে, প্রাণপ্রিয় স্ত্রীর একটা সঠিক সংবাদ না নিয়ে, নিশ্চিত জান্নাত প্রাপ্তি-শহীদ হওয়ার এমন সুযোগ হাতছাড়া করে কখনই আমি ইরাক ত্যাগ করতাম না।'

এমনিভাবে কথাবার্তা বলতে বলতে এশার আযান পড়ে গেল। এশার নামায শেষে পত্রিকা অফিসেই সালমানের রাত যাপনের ব্যবস্থা করা হলো। সালমান বিছনায় গা এলিয়ে দেয়ার কয়েক মুহূর্তেই তার দু'চোখের পাতা এক হয়ে এলো। গভীর নিদ্রায় হারিয়ে গেল সে। ঘুমের মধ্যেই ইরাক সফর করতে লাগল। তার প্রিয়তমা রুকাইয়ার সন্ধানে সমগ্র ইরাক চষে বেড়াতে লাগল। খুঁজতে খুঁজতে হয়রান-পেরেশান হয়ে যখন সে আশা হারিয়ে ফেলল, ঠিক তখন দেখল রুকাইয়া অনেক দূরে এক স্থানে পায়চারি করছে। সে দৌড়ে গেল সেদিকে। অকুস্থলে গিয়ে দেখল সে নেই সেখানে। ছোট এক বালককে জিজ্ঞেস করল, রুকাইয়া গেল কোথায়? বালক বলল, সেতো আপনাকেই খুঁজতে গেল।

বালকের উত্তর শুনে সালমান পাগলের মতো এদিক-সেদিক ঘুরতে লাগল। হঠাৎ এক স্থানে পেয়ে গেল রুকাইয়াকে। সে তাকে পেয়ে আনন্দের অতিশয্যে জড়িয়ে ধরল বুকের সাথে। কিন্তু রুকাইয়া অস্থিরতার সাথে তার বাহুবন্ধন থেকে আলাদা হয়ে মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে রইল। সালমান জিজ্ঞেস করল, 'তুমি আমার সাথে রাগ করলে রুকাইয়া?'

'কেন রাগ করব না'– বলল রুকাইয়া। আপনি যখন আমাকে ভুলে নিজে দেশে একা চলে গেলেন, তখন আমি রাগ করব না করব কি! আমি যদি আপনাকে ভুলে অন্য কোথাও চলে যেতাম, তবে কি আপনি আমার সাথে রাগ করতেন না?'

রুকাইয়া একথা বলার পর ঘুম ভেঙ্গে গেল সালমানের। ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে সে স্বপ্নের বিষয়বস্তু নিয়ে শুয়ে শুয়েই চিন্তা করতে লাগল। তবে কি রুকাইয়াকে খুজে পাওয়া গেছে? সে কি আমি চলে আসার কথা শুনে আমার প্রতি রাগ করে আছে? তবে কি আমি ইরাক থেকে চলে এসে ভুল করলাম?'

বিছনায় শুয়ে এসব চিন্তা করছিল সালমান। ইতিমধ্যেই পাশের মসজিদ থেকে ভেসে এলো ফজরের আযান। আযান শুনেই শয্যা ত্যাগ করল সে। অনেক কষ্টে অযু করে রুমেই নামায আদায় করে আবার বিছানায় শুইল। দ্বিতীয়বার যখন ঘুম ভাংলো তখন সকাল দশটা বাজে। ঘুম ভাংতেই দারোয়ান এসে বিনয়ের সাথে সালাম দিয়ে বলল, হযরত আপনার গেস্ট এসেছে।

গেস্ট এসেছে শুনে চিন্তায় পড়ে গেল সালমান। এখানে আবার কোন গেস্ট এলো। আমি এলাম রাতে, এর মধ্যে আমি পাকিস্তান আসার খবর তো পত্রিকা অফিসের লোকজন ছাড়া অন্য কেউ জানার কথা নয়। অনেক সাত-পাঁচ ভেবে অবশেষে দারোয়ানকে বলল, 'ভিতরে পাঠিয়ে দাও।' দারোয়ান উত্তর পেয়ে পুনরায় সালাম করে বেড়িয়ে গেল কামরা থেকে।

সালমান গেস্টের প্রতিক্ষায় দরজার দিকে তাকিয়ে রইলো। কয়েক মুহূর্ত পরেই তিন-চারজন লোক দরজা দিয়ে হুরমুড় করে ভিতরে ঢুকলো। তাদের দেখে তো সে সংজ্ঞা হারাবার উপক্রম। এ যে বিনা মেঘে বৃষ্টিপাত। যাদের সাথে সাক্ষাত করার উদগ্র বাসনা বাধাহীন ঘোড়ার মত ছুটোছুটি করছিল পাকিস্তানের আকাশ সীমায় প্রবেশ কালে বিমানের পাইলটের ঘোষণা শোনামাত্র, এ মুহূর্তে তার দেহ এখানে থাকলেও মন পাখিটা গিয়েছে যাদের বিরহ যাতনা ঘুচাতে তারাই তার সামনে দাঁড়ানো! আপন মা জননীকে কাছে পেয়ে সে ভুলে গেল শারীরিক অসুস্থতার কথা। মায়ের বুকে মাথা লুকিয়ে খুজে পেল অনাবিল জান্নাতী সুখের পুলকতা। সেই সাথে পিতা, ভাই-বোন সকলকে কাছে পেয়ে সে যেন পরিপূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠল। তার শরীরে যেন এখন কোন আঘাতের ক্ষত নেই। আপন জনদের পরশে সব ব্যাথা, সব জালা, সব কষ্ট তিরোহিত হয়ে গেছে। এদের উপস্থিতিতে অসুস্থরা যেন সব ভয় পেয়ে পালিয়েছে।

সালমান তার আব্বা-আম্মা, ভাই-বোনকে কাছে পেয়ে অত্যন্ত খুশি। কিন্তু সে ভেবে পেল না তারা তার আসার সংবাদ পেলো কি করে। তাদের বাড়িতে তো কোন ফোন-মোবাইলের ব্যবস্থা নেই যে, পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তাদেরকে ফোন করে জানিয়েছে। তাই কৌতূহল নিবারণের জন্য সে জিজ্ঞেস করল, 'আম্মাজান! আমার আগমনের সংবাদ আপনারা জানলেন কি করে?'

সালমানের প্রশ্নের উত্তরে তার আম্মা সরাসরি কোন জবাব না দিয়ে দৈনিক আস-সাদিক পত্রিকার একটি কপি তার চোখের সামনে মেলে ধরলেন। সে দেখলো, আজকের পত্রিকায় তার পাকিস্তান প্রত্যাবর্তনের খবর প্রধান শিরোনামে ছাপা হয়েছে– "পাকিস্তানের অন্যতম জাতীয় দৈনিক আস-সাদিকের সাহসী সাংবাদিক সালমান কোরেশী গতকাল সন্ধ্যায় তাঁর ইরাক সফল শেষ করে দেশে ফিরেছেন। বর্তমানে তিনি গুরুতর অসুস্থ। সকল দেশবাসীকে তার সুস্থতার জন্য দু'আ করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে। তিনি সুস্থ হয়ে তাঁর ইরাক সফরের অভিজ্ঞতা দেশবাসীকে জ্ঞাত করবেন... ।"

সালমান পত্রিকা পড়া শেষ করতে পারল না। তার আগেই তার আম্মা পত্রিকা সরিয়ে ফেললেন। অতঃপর বললেন, 'সালমান! তুমি ইরাক থেকে ফিরে আসলে কেন? তোমাকে আমি এজন্য ইরাক যেতে অনুমতি দেইনি যে, তুমি সেখানে গিয়ে নিজেকে নিরাপদ দূরত্বে রেখে যুদ্ধের সংবাদ সংগ্রহ করবে আর নিজের অভিজ্ঞতার ঝুলিকে পরিপূর্ণ করে দেশে এসে সেই বস্তাপঁচা কারগুজারী পত্রিকায় ফলাও করে ছাপিয়ে তথাকথিত বুদ্ধিজীবিদের মত সুনাম-সুখ্যাতি কুঁড়াবে। যা তোমার আখেরাতের বরবাদীর কারণ হয়ে দাঁড়াবে। না! বেটা না! এ জন্য তোমাকে আমি ইরাক পাঠাইনি। আমি তো বরং এ জন্য তোমাকে ইরাক পাঠিয়েছিলাম যে, তুমি সেখান গিয়ে তোমার ইরাকী ভাই-বোনদের পক্ষে দখলদারদের বিতাড়নে স্বশরীরে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করবে।

জালিমদের বিরুদ্ধে মজলুমের ওলি হয়ে জিহাদ করতে করতে শহীদ হয়ে যাবে আর আমি একজন শহীদের মাতা হিসেবে গর্ববোধ করবো। কিন্তু তুমি তা না করে কেন ফিরে আসলে বেটা!

মায়ের কথা শুনে সালমান নিজেকে অপরাধী ভাবতে শুরু করল। আসলেই তো সে শহীদ হওয়ার মস্তবড় চমৎকার সুযোগ হাতছাড়া করে এসেছে। ইরাক বসে একটা আত্মঘাতী হামলা পরিচালনা করলেই তো শহীদ হওয়ার তামান্না পূরণ হয়ে যেত। যা হোক, সে তার আম্মাজানকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে ইরাক যাওয়া থেকে শুরু করে ফিরে আসা অবধি সমস্ত ঘটিত ঘটনাবলীর একটা সার নির্যাস তুলে ধরল তার সম্মুখে। তবে সুকৌশলে চেপে গেল রুকাইয়ার ব্যাপারটি। বলল না (তার) বিয়ের কথাটা। সব শুনে তার মা জননী শান্ত হলেন। নতুবা এই মহিয়সী মহিলা এ অস্থায়ই তার পুত্রধনকে ইরাক ফেরত পাঠিয়ে দিতেন। কেননা, তিনি ঐসব মায়েদের একজন, যারা স্বীয় কলজে ছেঁড়া রত্ন মানিকদেরকে দ্বীনোর জন্য হাসিমুখে বিলিয়ে দিতে, কোরবান করে দিতে কোনরূপ দ্বিধাবোধ করেন না, কুণ্ঠিত হন না। তাই আলাপ চারিতার পর তারা সপরিবারে বাড়ির দিকে রওয়ানা দিলেন।

* * *

দেখতে দেখতে আটটি মাস পেরিয়ে গেল, সালমান ইরাক থেকে এসেছে। সালমানের জীবনেও এসেছে অনেক পরিবর্তন। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ঘটেছে কিছু নতুন ঘটনার সংযোজন। তবে তার মধ্যে সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী এবং দুনিয়া আলোড়িত ঘটনা ঘটেছে ইরাকে। ২৫ বছরের সফল রাষ্ট্র নায়ক ইরাকী প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে তার গোপন আস্তানা থেকে গ্রেফতার করেছে মার্কিন বাহিনী। এ সংবাদ শুনে সালমান মর্মাহত হল। তার মন এই ভেবে কষ্ট পাচ্ছে যে, সাদ্দাম হোসেন ইরাকের বৈধ নাগরিক হওয়া সত্বেও তাকে গ্রেফতার হতে হল অবৈধ দখলদারদের হাতে। তাকে গ্রেফতার করার কি অধিকার আছে হানাদার বাহিনীর! অবশ্য বর্তমান পৃথিবীতে কারো কোন ন্যায্য অধিকারের প্রশ্ন তোলা অবান্তর; কেননা এখন 'জোর যার মুল্লুক তার' এই নীতিকেই প্রাধান্য দিচ্ছে বিশ্বের ক্ষমতাবানরা।

বর্তমানে সালমান শারীরিক দিক দিয়ে অনেকাংশেই সুস্থ। পত্রিকা কর্তৃপক্ষের সীমাহীন আগ্রহে ইসলামাবাদের কয়েকজন দানবীর ধনাঢ্য ব্যক্তি এগিয়ে আসে তার সুচিকিৎকার ব্যয়ভার বহন করতে। উন্নত ব্যবস্থাপনায় চিকিৎসার দরুন ধীরে ধীরে তার অচল পাটি সচল হয়ে উঠতে লাগল। অন্যান্য ক্ষতও সেরে গেল একে একে। তবে সুচিকিৎসার পাশাপাশি ডাক্তার ও নার্সদের অকৃত্রিম সেবা-যত্ন ও বিরাট অবদান রেখেছে তার সুস্থ হওয়ার পেছনে। এর মধ্যে নার্স হাবিবা খাতুনের অবদান সবচেয়ে বেশি। ডিউটির সময় ছাড়াও যেভাবে সে তার রুগীর সেবাযত্ন করেছে অন্যান্যরা তা ডিউটির সময়েও করে না।

নার্স হাবিবা ইসলামাবাদ মেডিকেল কলেজের অধ্যয়নরতা একজন সেরা ছাত্রী। যেমন রূপেগুনে তেমন পড়া শুনায়। সবদিক থেকে সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ এক অনন্য মেয়ে হাবিবা। তার মতো সুন্দরী-কমনীয়া মেয়ে সারা ইসলামাবাদে খুঁজে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। এমন ভূবনমোহিনী রূপ সত্বেও তার নেই কোন অহংকার, নেই কোন দেমাগ। তবে দারুন বুদ্ধিমান মেয়েটি। অন্যরা তার রূপ দেখে হিংসা করবে আর একশ্রেণীর কামুক-লম্পট পুরুষ তার খোলা-মেলা রূপ-যৌবন দেখে কামনা চরিতার্থ করার অসৎ সুযোগ খুঁজতে থাকবে তা সে মেনে নিতে পারে না। তাই মেডিকেল কলেজের ছাত্রী হওয়া সত্বেও সর্বদা নেকাব দিয়ে মুখমণ্ডল আকৃত করে রাখে। যেখানে অন্যান্য ছাত্র তথা নার্সরা মুখ ঢাকা দূরে থাক, মাথায় পর্যন্ত কাপড়টি তুলতে রাজী নয়, সেখানে তার নেকাব পড়া নিশ্চয়ই এক দুরুহ কাজ বটে। এজন্য তাকে অন্যান্য ছাত্রীদের কটাক্ষও মাঝে মাঝে বদাশত করতে হয়। তবু সে ধৈর্য্য ধারণ করে থাকে। তাদেরকে কিছু বলে না। কারণ সে জানে, এরা অজ্ঞ-নির্বোধ, এদের সাথে তর্ক জড়িয়ে কোন লাভ নেই। তবে এক্ষেত্রে ধৈর্য্য ধরলেও সে আরেক ক্ষেত্রে ধৈর্য্য ধারণ করতে পারে না। তাহলো, যেসব মেয়েরা বোরকা পরে ঠিক কিন্তু মুখ নেকাবাকৃত করে না। এসব মেয়েদের দেখলেও গা জ্বলে তার। তার কথা হচ্ছে, তোমরা বেপর্দায় থাকবে তো বোরকা পরো কেন? এমনিতেই তো থাকতে পারো। অযথা বোরকা পরে এর পবিত্রতা নষ্ট করছো কোন অধিকারে? এ ধরণের ফ্যাশনধারী বোরকা ওয়ালাদের তার সাথে সাক্ষাৎ হলে সে তাদের কিছু না বলে ছাড়ে না। হয়তো বুঝিয়ে নতুবা প্রয়োজনে বিতর্ক করে হলেও বিষয়টা তাদের বোধগম্য করিয়ে দেয় সে।

হাবিবা সালমানের বাল্য সহপাঠী। শিশু শ্রেণী থেকে প্রাইমারী সম্পূর্ণটা তারা একই সাথে পড়েছিল। হাবিবা তখন ততটা ভাল ছাত্রী ছিল না। সালমানের রোল ছিল দুই আর হাবিবার রোল ছিল ২০ এরকম। তদুপরি তাদের দুজনের মধ্যে বেশ মিল ছিল। এর কারণ, তাদের বাড়ি ছিল একই এলাকায়। হাবিবা কোন পড়া না পারলেই ছুটো আসতো সালমানের কাছে। আর সালমানও সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিত তাকে। সেই হাবিবা আজ ডাক্তার আর সালমান তার রোগী। তাই হাবিবা অকৃত্রিমভাবে সালমানের চিকিৎসা সেবা দিয়ে ছোট বেলার ঋণের বোঝা কিছুটা হালকা করতে চাইছে। কিন্তু ঋণ হাল্কা করতে এসে এ কোন মায়াবী সুতায় আটকে পড়ছে হাবিবা! সালমানের জন্য তার মন এত টানে কেন? এ কিসের টান! প্রেমের সুতায় বেঁধে টানছে না তো সালমান তাকে! তাইতো মনে হয়, নতুবা তাকে এক মুহূর্ত না দেখলেই তার মন বেকার হয়ে ওঠে কেন? এ কোন সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে আবার!

সালমান এখন বলতে গেলে পুরোপুরিই সুস্থ। ক্রাচে ভর দিয়ে নিজে নিজেই চলা ফেলা করতে পারে। আর কিছুদিন পর হয়তো ক্রাচেরও প্রয়োজন হবে না। তাই

হাসপাতাল থেকে চলে এলো সে। এখন নিয়মিত লেখালেখিও শুরু করে দিয়েছে। পত্রিকার সম্পাক সাহেব তার জন্য একটা স্পেশাল রুম দিয়ে দিয়েছেন। এখানে বসেই লেখা-লেখির কাজ করে সে। মাঝে-মধ্যে বাড়ি থেকে ঘুরে আসে। তার ইরাক সফরের ঘটনাবলী প্রতিদিন এক কলাম করে লিখে তা ছাপার জন্য কম্পিউটার অপারেটরের কাছে পাঠিয়ে দেয়। বাকী সময় ব্যস্ত থাকে বাগদাদের ঈগল এবং তার সহধর্মিনী রুকাইয়ার বীরত্ব গাথা সম্বলিত গ্রন্থটি রচনার কাজে।

এদিকে সালমানের পিতা রঈসুল হাসান কোরেশী তাঁর ছেলেকে বিবাহ করানোর মনস্তাব করলেন। মেয়ে হিসেবে ঠিক করলেন হাবিবাকে। কারণ, এমন একজন গুণবতী রূপসী মেয়েকেই তিনি তাঁর আদরের ছেলে সালমান বধূ হিসেবে দেখতে চান। তাই তিনি হাবিবাকে পুত্রবধূ হিসেবে বরণ করার মত ব্যক্ত করলেন স্ত্রী আয়শা বেগমের কাছে। তিনিও স্বামীর মতকে সমর্থন করলেন। হাঁসপাতালে তিনি হাবিবাকে দেখেছেন। তার সচ্চরিত্রতা, মার্জিত আচার আচরণ তাঁকে তখন আকৃষ্ট করেছিল। তাছাড়া, তিনি নারীসুলভ অনুভূতি দ্বারা আঁচ করতে পেরেছিলেন যে, হাবিবা তাঁর ছেলের প্রতি দুর্বল। কিন্তু সে সময় তা আমলে নেননি। কিন্তু আজ যখন তাঁর স্বামী হাবিবাকেই পুত্র বধূ হিসেবে পছন্দ করেছেন বলে জানালেন, তখন তিনিও রাজী হয়ে গেলেন।

পরের দিন বাড়ি আসলো সালমান। কথা পারলেন তার মা, 'বেটা সালমান! ইরাক গিয়ে যখন তুমি শহীদ হতে পারলে না, তখন এর একটা শাস্তি হওয়া দরকার। তুমি কি রাজী আছো সে শাস্তি ভোগ করতে?

'আম্মিজান! আপনি এর জন্য যে শাস্তিই দেন আমি তা মাথা পেতে মেনে নেবো!' হাসি মুখে মায়ের কথার উত্তর দিল সালমান।

'যদি সে শাস্তি হয় অত্যন্ত কঠিন, যা তোমার পক্ষে এখন মানা সম্ভব নয়, তবুও কি তুমি তা মানবে বেটা?' কিছুটা গাম্ভীর্যের সাথে বললেন আয়েশা বেগম।

'অবশ্যই আম্মিজান! বলল সালমান– 'আপনার শাস্তি মানতে গিয়ে যদি আমার জীবনও শেষ হয়ে যায় তবুও মানবো।'

'না বেটা, তোমাকে আমি এত কঠিন শাস্তি দিব না যে, তাতে জীবন বিলীন করতে হবে'– বললেন আয়শা বেগম– 'তোমাকে শুধু আমাদের পছন্দের একটা জিনিস নির্দ্বিধায় মেনে নিতে হবে।'

সালমান এখনও বুঝেনি তার আম্মাজান তাকে কি বলতে চাচ্ছে। তাই সে জিজ্ঞেস করল, 'কি সেই জিনিস আম্মাজান?'

'হাবিবাকে তোমার সাদী করতে হবে। তোমার আব্বাজানের অত্যন্ত পছন্দের পাত্রী। আমিও পছন্দ করি তাকে। পছন্দ করে ফাহিমা এবং যোবায়েরও।' এক নিঃশ্বাসে বলে ফেললেন আয়েশা বেগম।

সালমান তার আম্মাজানের কথা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়ল। তাকে এখন বিবাহ করতে হবে! কিন্তু সে তো বিবাহ করেছে। রুকাইয়াইতো তার একমাত্র বিবাহিতা স্ত্রী। অন্য কউকে আবার কি করে বিবাহ করবে সে। মুহূর্তে তার মন ছুটে গেল ইরাকের রাজধানী বাগদাদের সেই বাড়িতে যেখানে মেজর কন্যা রুকাইয়া সাথে তার স্বপ্নীল বাসর রচিত হয়েছিল। তার সে স্বপ্ন কন্যাকে সে নিজের পার্শে দণ্ডায়মান দেখতে পেল। সে যেন তাকে লক্ষ্য করে বলছে, 'ওগো! আমি তো তোমার একমাত্র বিবাহিতা বধূ। অন্য কাউকে কেন তুমি বিবাহ করবে? তুমি কি পারবে আমাকে ভুলে গিয়ে অন্য কারো গলে মালা পড়াতে? তুমি কি এতই পাষাণ? তুমি কি এতই নিষ্ঠুর? এই কি তোমার ভালবাসা, এই কি তোমার প্রেম যে, আমি একটু চোখের আড়াল হলাম আর তুমি আমাকে ভুলে স্বদেশে চলে গেলে এবং সেখানে গিয়ে নতুন করে বিবাহ করলে? এই কি তোমার ইনসাফ?

আর ভাবতে পারে না সালমান। সীমাহীন বেদনায় বুকটা তার ভেঙ্গে চৌচির হয়ে যাচ্ছে যেন। কিছুতেই দ্বিতীয় বিবাহ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। এদিকে তার মাকে সে পুরোপুরি ওয়াদা দিয়েছে, তাঁর কথা সে অবনত মস্তকে মেনে নেবে। এমতাবস্থায় বলতেও পারছে না যে, সে ইরাকে বিবাহ করেছে; বললেও হয়তো তার আম্মা বলবেন, তার কোন খোঁজ নেই এখন আর। এ আশাংকায় না বলাই শ্রেয় ভাবল। এভাবে মাথা নিচু করে বেশ সময় চিন্তা-ভাবনা করার পর হঠাৎ কিছু না বলেই সে তার আম্মার সামন থেকে চলে গেল।

সালমান কিছু না বলে চলে যাওয়ায় আয়শা বেগম ভাবলেন, ছেলে তাঁর লজ্জার কারণে কিছু বলতে পারেনি, সে বিয়েতে রাজি। তাই স্বামীকে মেয়ের বাড়িতে প্রস্তাব পাঠাতে বলে দিলেন। স্ত্রীর কথামত রঈসুল সাহান কোরেশী সেদিনই হাবিবাদের বাড়িতে গেলেন। হাবিবার পিতা আনোয়ার হোসেন পাটোয়ারী তখন বাড়িতেই ছিলেন। একই এলাকায় বাড়ি হওয়ার সুবাদে তারা একে অপরের পরিচিত ছিলেন। কুশল বিনিময়ের পরে রঈসুল হাসান বিবাহের আলোচনা তুলবেন। সালমানের কথা শুনে আনোয়ার হোসেন এক কথায় বিয়েতে রাজী হয়ে গেলেন। পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখ বিয়ের দিন তারিখ ধার্য করে ফেলেন তারা উভয়ে পরামর্শ করে।

বাড়ি থেকে বের হয়ে সোজা পত্রিকা অফিসে চলে এলো সালমান। তার মনে উথাল-পাতাল ঢেউ বইছে। উভয় সংকটে পরে কেবলই সে চিন্তার সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে। সব চিন্তা-ভাবনা থেকে মুক্ত থাকার জন্য সে লেখালেখির প্রতি মনোনিবেশ করল। কিন্তু না, লেখা-লেখিতেও মন বসছে না তার। তাই লেখা-লেখিও বন্ধ করে টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখা বিভিন্ন দেশী-বিদেশী দৈনিক-সাপ্তাহিক পত্রিকা হাতরিয়ে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট পড়তে লাগল। যেখানেই ইরাক সম্বন্ধে কোন সংবাদ দেখছে,

সাথে সাথে মনোযোগ সহকারে তা সম্পূর্ণ পড়ছে। অন্য সংবাদের শুধু হেটলাইন দেখেই রেখে দিচ্ছে।

এমনিভাবে পত্রিকা পড়া অবস্থায় একটি আন্তর্জাতিক সাপ্তাহিকের একটা সংবাদ সালমানের মনোযোগ আকর্ষণ করল। খবরের শিরোনাম হচ্ছে– বাগদাদে বিদেশী সাহায্যকর্মী অপহৃত। ভিতরে লিখেছে– ইরাকের রাজদানী বাগদাদের কেন্দ্রস্থল থেকে দু'জন বিদেশী সাহায্য কর্মীকে অপহরণ করেছে গেড়িলারা। সালফিস্ট ব্রিগেড অব সালাউদ্দিন আইয়ূবী' পরিচয় দানকারী গেড়িলা গ্রুপ গত সপ্তাহের শেষের দিকে এই দু'জন বৃটিশ মহিলা সাহায্য কর্মীকে অহরণ করেছে। আরবী টিভি চ্যানেল আল-জাজিরায় প্রেরিত এক ভিডিও টেপে উক্ত গেড়িলা সংঘঠন এই অপহরণের কথা স্বীকার করেছে। তারা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের হুশিয়ার করে সময়সীমা বেধে দিয়েছে। যদি নির্দিষ্ট সময়েরা মধ্যে তাদের দাবী পূরণ করা না হয় তবে তারা বন্দিনীদের হত্যা করে ফেলবে বলেও উল্লেখ করেছে। অপহরণকারীদের দাবী হচ্ছে, মার্কিন বাহিনীর হাতে বন্দী বাগদাদের ঈগলকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে...

এতটুকু পড়েই চমকে উঠল সালমান। তার সারা শরীর কেঁপে উঠল। 'ঈগল তাহলে বন্দী!' নিজের অলক্ষেই সালমানের গণ্ডবেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। এভাবে অনেকক্ষণ কাঁদলো সে বসে বসে। বন্দীশালায় ঈগলের উপর মার্কিনীরা যে নির্যাতনের খগড় চালাচ্ছে সে চিন্তা করে তার জন্য মনটা একেবারে পেরেশান হয়ে উঠল সালমানের। অনেক কষ্টে নিজেকে বুঝ দিয়ে সংবাদের বাকী অংশ পড়ার জন্য সে পত্রিকার পাতায় চোখ বুলাল– সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, উক্ত মহিলা কর্মীদ্বয়কে তাদের অফিস থেকে অপহরণ করেছে সালাফিষ্ট ব্রিগেড অব সালাহউদ্দীন আইয়ূবী গ্রুপের মহিলা সদস্যরা। টেলিভিশন ফুটেছে দেখা যায়, 'বন্দী খানায়ও তাদের প্রহরা দিচ্ছে তরুণী যুবতীরা। রুকাইয়া নামে পরিচয়দানকারী এক যুবতী গেড়িলা উক্ত বন্দীদ্বয়ের পার্শে দাঁড়িয়ে ঘোষণাপত্র পাঠ করছে– আমি ঈগলের বোন রুকাইয়া বিনতে আসাদুল্লাহ ঘোষণা দিচ্ছি, আগামী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে যদি আমার ভাই বাগদাদের ঈগলকে মুক্তি দেওয়া না হয়, তবে এই বন্দীদ্বয়কে শিরোচ্ছেদের মাধ্যমে হত্যা করা হবে।'

সালমান এক নিঃশ্বাসে খবরের বাকি অংশটুকু পাঠ করে তড়িতাহতের মতো নিশ্চল-নিস্পলক তাকিয়ে রইল পেপারটির দিকে। সে বিশ্বাসই করতে পারছে না যে, এই সংবাদটি সত্যি। তার প্রিয়তমা বেঁচে আছে, সুস্থ শরীরে জিহাদ করছে, ভাবতেই তার মন উতালা হয়ে উঠল। প্রিয়ার কুশল জানতে তার মন দিওয়ানা-পাগলপারা হয়ে গেল। সে কিছুতেই মনকে স্থির করতে পারছে না। পাখা থাকলে এখনই উড়ে ইরাক চলে যেত। সে বার বার পত্রিকার পাতটি চুমু খেতে লাগল। যে পত্রিকা তার মন মানুষীর খবর নিয়ে এসেছে সেটাকে সে কিভাবে যত্ন করবে তা দিশা করতে পারছে না। তাই সেটাকে বুকে

জড়িয়ে অনেকক্ষণ বসে রইল। এ সংবাদটি যদি পত্রিকায় না এসে কোন ব্যক্তি নিয়ে আসতো, তবে নিশ্চয়ই সে তাকে অনেক বড় একটা এনাম দিত।

* * *

পত্রিকান্তরে রুকাইয়ার সংবাদ জানার পরে, সালমানের মধুময় জীবনের প্রথম বাসরে হারানো অর্ধাঙ্গিনীকে ফিরে পাওয়ার উত্তাল বাসনা জেগে উঠলো তার মনমুকুরে। এক অজানা প্রেমানুভূতি ফের তাকে টানতে লাগল ইরাকের দিকে। না জানি তার প্রিয়তমা তার পথ পানে চেয়ে কতরাত নির্ঘুম কাটিয়ে দিয়েছে সে খবর কে রেখেছে? তাই পুনারায় ইরাক ফিরে যাবার পূর্ণ প্রস্তুতি নিতে লাগল সে। শারীরিক দিক থেকে আল্লাহর অশেষ রহমতে এখন সে পুরোপুরি সুস্থ। তবে ইরাক যাওয়ার পূর্বে সে তার বই লেখাটা শেষ করে যেতে চায়। যেটা সে ইরাকের উপর ভিত্তি করে লিখছে। যার মধ্যে স্থান পেয়েছে তার প্রিয়তমা এবং ঈগলের বীরত্ব গাঁথা!

দিন রাত অবিরামভাবে লিখে ছ'দিনের মাথায় বই লেখা শেষ করলো সালমান। লেখা শেষ হলে সে সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে তার শ্রদ্ধেয় সম্পাদক সাহেবের নিকট গেল। তাকে সমস্ত ঘটনা খুলে বলল। সব শুনে নঈমুল হাসান সাহেব বললেন, 'তুমি কি তবে পুনরায় ইরাক যেতে চাচ্ছ?'

'হুজুর যদি অনুমতি দেন, তবে যাওয়ার ইচ্ছা রাখি।' বিনীত স্বরে বলল সালমান।

'যদি আবার আহত হও?' চিন্তিতভাবে বললেন সম্পাদক সাহেব।

'বেয়াদবি ক্ষমা করবেন হুজুর'– বলল সালমান– 'আমার তকদীরে যা লেখা আছে তা হবেই। তাছাড়া, এবার ইরাক গেলে আমার মনের তামান্না পূরণ না করে আর ফিরছি না। আপনি আমার জন্য দুআ করবেন যেন আমি আমার সে তামান্নাকে পূরণ করতে পারি।'

'তোমার মনে কিসের তামান্না বাবা সালমান?' জিজ্ঞেস করলেন নঈমুল হাসান আল-হিযাযী।

'আমার মনে সেই জিনিসের তামান্না, সেই জিনিসের তামান্না বারংবার ব্যক্ত করেছেন স্বয়ং আল্লাহর প্রিয় রাসূল (সাঃ)।' বলল প্রিয় সম্পকের প্রিয় সাংবাদিক সালমান কোরেশী।

'বুঝতে পেরেছি তোমার মনে শাহাদাতের তামান্না বিরজিত– বললেন সম্পাদক সাহেব– 'তবে সেই সাথে কিছু প্রিয় মিলনের তামান্নাও কম নয়, কি ঠিক বলিনি?' বলে হেসে দিলেন তিনি।

সম্পাদক সাহেবের কথায় সালমান ভীষণ লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে ফেলল। তিনি তার চিবুক ধরে উপরে তুলে বললেন, এতে লজ্জার কি আছে বেটা! তুমি তোমার

বিবাহিতা স্ত্রীর কাছে যাবে, তা তো অন্যায় কিছু নয়। আচ্ছা, কখন যাবে বলে চিন্তা করেছো?

'আগামী পরশুর ফ্লাইটে সিরিয়া যাবো– বলল সালমান– 'সেখান থেকে সুযোগ মতো ইরাক যাবো ঠিক করেছি।'

'তা বেটা, বলতো আমি তোমার কি সহায়তা করতে পারি?' জিজ্ঞেস করলেন সম্পাদক সাহেব।

আপনি আমার জন্য দু'আ করুন'– বলল সালমান– এটাই আমার পথ চলতে সবচেয়ে বেশী সহায়ক হবে।'

সালমানের কথা শুনে সম্পাদক সাহেব অত্যন্ত খুশী হলেন। তিনি সাথে সাথে আলমারী খুলে দুই লক্ষ রুপির একটি চেক সই করে তার হাতে দিলেন। সালমান তো সেটা হাতে নিয়ে হতভম্ব হয়ে গেল। সে বলল, 'পীর আমার! মুরিশদ আমার! আমি তো কোন রুপি চাইনি আপনার কাছে; চেয়েছি শুধু দু'আ।'

'শুন বেটা! দাওয়াই ছাড়া শুধু দু'আয় কি কার্যোদ্ধার হয়? মৃদু হেসে বললেন সম্পাদক সাহেব– 'তাই যদি হত, তবে তুমি ইরাক যাচ্ছ কেন? এখানে বসে স্ত্রীকে ফিরে পাওয়ার এবং শাহাদাতের তামান্না জানিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করলেই তো পারতে! তুমি বিদেশ যাচ্ছো, তাও আবার সরাসরি নয় ভায়া। সুতরাং পথের রাহা খরচের জন্য ওগুলো প্রয়োজন হবে। তুমি হয়তো মনে করছো তোমাকে আমি অযাচিত সাহায্য করছি। কিন্তু না, মনে করতে পারো তোমাকে তোমার পাওনা পরিশোধ করে দিয়েছি; তবে পরেরটা একটু আগে দিয়েছি এই যা।'

সম্পাদক নইমুল হাসান আল-হিযাযীর কথা শুনে সালমান তার সৌম্য-কান্তি, নির্মল-প্রশান্ত ঈমানদীপ্ত মুখাবয়বের দিকে নির্বাক তাকিয়ে রইল। মুখে আর কিছু বলতে পারল না। শুধু তার হস্তদ্বয় ধরে ভক্তি ও শ্রদ্ধাভরে চুম্বর করল। সম্পাদক সাহেব তাকে টেনে আপন বক্ষের সাথে জড়িয়ে ধরলেন। অতঃপর মাথা ও কপালে চুমু খেয়ে চোখের পানি ফেলে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করলেন, 'হে আল্লাহ! তুমি তোমার পথের এই মুজাহিদকে হেফাযত কর! এর মনের সৎ ইচ্ছাগুলোকে তুমি পূর্ণ করে দাও। সহীসালামতে একে এর জীবন সঙ্গিনীর নিকট পৌঁছে দাও।'

সালমান সম্পদক সাহেবের আলিঙ্গন মুক্ত হয়ে তাকে সালাম করে নিজের রুমে চলে এলো। অতঃপর মাতা-পিতাকে উদ্দেশ্য করে একটি চিঠি লিখল–

শ্রদ্ধেয় আব্বা-আম্মা!

আপনাদের দু'জনের পবিত্র চরণে জানাই সশ্রদ্ধ সালাম। পর কথা হল, আপনারা হাবিবা নামক ডাক্তার মেয়েটির সাথে আমার বিবাহ দিতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু আমি সেদিন

কিছু না বলেই চলে এসেছিলাম। আসলে তখন লজ্জা ও ভয়ে আমি কিছু বলতে পারিনি। এখন বলছি শুনুন, হাবিবা হোক আর অন্য যে কোন মেয়ে হোক, কাউকে আর বিবাহ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা, আমি ইরাকী এক কন্যাকে বিবাহ করেছি। আপনাদেরকে বিষয়টি জানাইনি এজন্য যে, সে মেয়েটি বাসর রাতেই আমার থেকে হারিয়ে যায়। মার্কিনীদের বোমা হামলায় যে রাতে আমি মারাত্মক আহত হয়ে মরতে মরতে বেঁচে যাই, সে রাতই ছিল আমাদের বাসর রাত। পরে আর কোথাও তাকে খুজে পাওয়া যায়নি। সে বেঁচে আছে না শহীদ হয়েছে তা আমরা কেউই জানতে পারছিলাম না। কিন্তু সে দিন যখন আপনারা আমার বিবাহ নিয়ে কথা পারলেন আর আমি কিছু না বলে চলে এলাম, তখন অফিসে এসে পত্রিকা পড়তে গিয়ে হঠাৎ জানতে পারলাম সে বেঁচে আছে এবং রীতিমত জিহাদ করে যাচ্ছে। আর যেই ঈগলের কাহিনী আপনাদের শুনিয়েছিলাম, সে এখন মার্কিনীদের হাতে বন্দী। তাই আমি আবার ইরাক চলে গেলাম। আপনারা আমার জন্য দু'আ করবেন, আমি যেন সেই বীর মুজাহিদ বাগদাদের ঈগলকে মুক্ত করতে পারি এবং জিহাদ করতে করতে শহীদ হয়ে শাহাদাতের তামান্নাকে পূর্ণতা দান করতে পারি।

ইতি

আপনাদের স্নেহসিক্ত সালমান।

চিঠি লেখা শেষ করে সালমান সেটি ইসলামাবাদ ত্যাগ করার দিন পোস্ট করবে বলে ভাজ করে পকেটে রেখে দিল। অতঃপর ইরাক যাওয়ার প্রস্তুতির প্রতি মনোনিবেশ করল।

২০০৪ সনের ১৫ই মার্চ সালমান পি. আই. এ যোগে ইসলামাবাদ ত্যাগ করে ইরাকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিল। বিমান আকাশে উড্ডয়ন করে বেশ সময় চলার পরই আফগানিস্তানের আকাশ সীমায় প্রবেশ করল। পাইলটের ঘোষণা শুনে সালমান নীচের দিকে তাকিয়ে দেখল মার্কিনীদের সৃষ্ট আরেক মৃত্যুপুরী। সে অসহ্য হয়ে এই যন্ত্রণাদায়ক দৃশ্য থেকে চোখ বন্ধ করে নিল। চোখ বন্ধ অবস্থায় চলন্ত বিমান থেকে তার মন পানি উড়াল দিয়ে ছুটে গেল প্রিয়ার দেশে তদাবস্থায়ই সে গুনগুনিয়ে আবৃতি করতে লাগল–

নিরাশা প্রিয়ার টানে

স্বজাতীয় মজলুমের আহ্বানে

ছুটে চলি ব্যাকুল মনে

দিগন্তের সীমান্ত পানে।

ভ্রমর যেমন ফুলের সন্ধানে

ছুটে যায় ভোর বিহনে
ক্লান্ত হয় না সারা দিন মানে
ঘুরে ফিরে বন থেকে বনে।
আমিও এক ভ্রমর সম
খুঁজে ফিরি তব প্রিয়তম
শ্রান্ত ক্লান্তহীন তনু মম
যেন কঠিন শীলা পাথর সম।
শুধুই নয় প্রিয়ার টান
হৃদয়ে আমার সর্বক্ষণ
বিপন্ন মুসলমানের কান্দন
মন ভেঙ্গে চৌচির এখন।

প্রথম খণ্ডের এখানেই

সমাপ্ত

বাগদাদের ঈগল

মাছুম বিল্লাহ

প্রকাশক ঃ
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রশীদ
রামদাসপুর, ভোলা
মোবাইল ঃ ০১৭১৩১০০০৮৩
০১৮১৯১৮৭৯৪০

প্রকাশকাল ঃ
প্রথম মুদ্রণ ঃ
জানুয়ারি ২০০৭ ইং

মুদ্রণে ঃ
আল আকাবা প্রেস
শিরিষ দাস লেন, ঢাকা-১১০০

মূল্য ঃ ১৭০ (একশত সত্তর) টাকা মাত্র

বিশিষ্ট লেখক সাংবাদিক ও চিন্তাবিদ
মাওলানা ওবায়দুর রহমান খান নাদভী'র

বাণী,

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম
যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর, অসংখ্য সালাম হযরত নবী করীম (সঃ) ও তাঁর পরিজন এবং সহচরবৃন্দের প্রতি।
মুসলিম জাতি আল্লাহ মনোনীত দ্বীনের ধারক-বাহক জাতি। মহাগ্রন্থ আল কোরআন মানবজাতির প্রতি মহান রাব্বুল আলামীনের চূড়ান্ত বাণী। এ বাণীর বাহক ও বর্তমানে মুসলিম জাতি। সুতরাং বিশ্বব্যাপী মুসলিম জনগোষ্ঠী ইসলামের কাঙ্খীত কর্মক্ষেত্র। মুসলিম বিশ্বে ইহ ও পরকালীন শান্তি আর কামিয়াবীর নিশ্চয়তার আশ্বাস কেবল ইসলামই দিয়ে থাকে। অতএব, ইসলামের গ্রহণ যোগ্যতা বা ইসলামের প্রতি মানবমনের সহযাত আকর্ষণ ইসলামকে দিন দিনই জনপ্রিয় করে তুলছে। ইসলামের সত্যতা শ্রেষ্ঠত্ব এবং এর মধ্যকার অন্তর্নিহিত শক্তি ও সৌরভ ইসলামকে বিশ্বময় প্রতিষ্ঠিত করতে পারে অনায়াসে। কিন্তু এ মহান কাজটির পথে একদল লোক বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এরা পথভ্রষ্ট ও অভিশাপগ্রস্ত । এরা নিজেদের কায়েমী স্বার্থ নেতৃত্ব, প্রভুত্ব ও ভোগবিলাস ধরে রাখার জন্য আল্লাহর দ্বীন ও মানুষের মাঝে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এদের অত্যাচার থেকে মানুষকে মুক্ত করা এবং এদের অধিকার চর্চাকে খর্ব করার কাজকে বলা হয় 'আল্লাহর পথে সংগ্রাম'। দুনিয়া ব্যাপি এর সংগ্রাম কেয়ামত পর্যন্ত চলছে, চলবে। অমুসলিমরা মুসলিম অঞ্চলে কোন উদ্দেশ্য সংঘাত চাপিয়ে দিলে তাদের প্রতি উত্তর দেয়া মুসলিমদের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। এ ধরনের দ্বন্ধ-সংঘাত এখন বিশ্বের বহু জায়গায় চলছে। মুসলিম জাতির উপর অবর্তিত এসব পরিস্থিতির কথা বিশ্বাসী ব্যাক্তিবর্গের অনুভূতিকেই নাড়া দেয়। এসব কথাও অনুভূতি লেখকের অন্তরকে আরোবেশি আন্দোলিত করে। ফলে জন্ম নেয় কথা কবিতা, গল্প ও উপন্যাসের। পাঠকের হাতের বই 'বাগদানের ঈগল' এমনি একটি উদ্দীপন। লেখক প্রিয় ভাজন মাসুম বিল্লাহ'র প্রথম উদ্যোগ। তিনি কবিতা ও কথা উভয়টি লিখতে সচেষ্ট। প্রথম প্রথম যেমন হয় তার লেখার মানও সেরকম। দিনে দিনে তার কলম আরও সুফলপ্রসু হবে বলে আশা করি। এ বইয়ের প্রকাশনার সাথে যুক্ত সকলকে আল্লাহ উত্তম বিনিময় দান করুন। লেখকের জন্য আপনারা সবাই দোয়া করবেন। আল্লাহ তার বিশ্বাস চিন্তা ও কার্যক্রমে আরো বরকত দিন।

১৩.০১.২০০৭

উবায়দুর রহমান খান নাদভী
সহকারী সম্পাদক দৈনিক ইনকিলাব

প্রকাশনায়
মাদানী লাইব্রেরী
ঢাকা